পৌরনীতি

পৌরনীতি

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন এম-এ., পি-এইচ-ডি (লণ্ডন)
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞানের উপাধ্যায় ও
আশুতোষ কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

MAHARAJA BIR BIKRAM COLLEGE LIBRARY. 29.7.54 Agartala.

পঞ্চম সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৬০

MAHARAJA BIR BIKRAM COLLEGE 628 LIBRARY. 29.7.54 Agartala.

বুকল্যাণ্ড লিমিটেড
১, শঙ্কর ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬

বুকল্যাণ্ড লিমিটেড

১, শঙ্কর ঘোষ লেন,

কলিকাতা-৬

শাখা :

কলিকাতা ঃ

২১১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

এলাহাবাদ ঃ

৪৪, জনস্টনগঞ্জ, এলাহাবাদ-৩

পাটনা ঃ

পাটনা মার্কেট, ১১২ নং রুম

মুরাদপুর, পাটনা-৪

মূল্য সাড়ে সাত টাকা

বুকল্যাণ্ড লিমিটেডের পক্ষ হইতে শ্রীজানকীনাথ বসু এম-এ কর্তৃক প্রকাশিত, ও বসুশ্রী প্রেস, ৮০।৬ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীগৌরীশংকর রায়চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বহু বন্ধুর নিকট হইতে যে অযাচিত ভাবে প্রচুর সাহায্য পাইয়াছি তাহা না বলিয়া লেখা শেষ করিতে পারি না। বইখানিতে ভাষার বহু গলদ রহিয়াছে। আরও থাকিত যদি শ্রীউমা সেন আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য না করিতেন। তিনি ও শ্রীজানকীনাথ বসু প্রুফ দেখিয়া ও অন্যান্য বিষয়ে আমার সহায়তা করিয়াছেন। কাগজ ও মুদ্রণযন্ত্রের বর্তমান পরিস্থিতিতে বইখানি যে শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে, সেইজন্য শ্রীগণেশচন্দ্র বসু, ও শ্রীমান গৌরীশঙ্কর রায়চৌধুরীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। বাংলায় বই লিখিবার চেষ্টা আমার এই প্রথম। সেইজন্য ইহাতে বহু অসঙ্গতি ও অনেক দোষত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। প্রথম অপরাধীর অপরাধের গুরুত্ব কম করিয়া দেখা হয় বলিয়া সুধিবৃন্দের মার্জনা পাইব, আশা রাখি।

রাখিপূর্ণিমা, ১৩৫৫ — শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

যে ভুল ত্রুটি আমার চোখে পড়িয়াছে ও বন্ধুরা যেগুলি আমাকে জানাইতেছেন, পুনর্মুদ্রণের সুযোগে তাহা সংশোধন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই সম্বন্ধে বহু বন্ধু আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

এই সংস্করণে ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, কমিউনিটি প্রোজেক্ট, খাদ্য সমস্যা ও অন্যান্য অনেক নূতন বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। বসুশ্রী প্রেসের শ্রীগণেশচন্দ্র বসু অতি অল্প সময়ের মধ্যে বইখানি ছাপা শেষ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

আশ্বিন, ১৩৬০

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন

সূচীপত্র

পরিচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
	রাষ্ট্রবিজ্ঞান	
প্রথম	পৌরনীতির বিষয়বস্তু …	১—৬
দ্বিতীয়	সমাজ …	৭—১০
	রাষ্ট্র …	১১—১৬
চতুর্থ	রাষ্ট্রজন্মের ইতিবৃত্ত …	১৭—২৬
পঞ্চম	জাতি ও রাষ্ট্র …	২৭—৩৩
ষষ্ঠ	বিভিন্ন শ্রেণীর সরকার …	৩৪—৩৮
সপ্তম	গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র …	৩৯—৪৭
অষ্টম	অন্যান্য শাসন প্রণালী : মন্ত্রিপরিষদ ও রাষ্ট্রপতির শাসন …	৪৮—৫৪
নবম	রাষ্ট্রের কার্যাবলী …	৫৫—৬১
দশম	সংবিধান …	৬২—৬৫
একাদশ	নাগরিক …	৬৬—৬৯
দ্বাদশ	নাগরিকের অধিকার এবং কর্তব্য …	৭০—৭৯
ত্রয়োদশ	সুনাগরিক …	৮০—৮২
চতুর্দশ	আইন ও স্বাধীনতা …	৮৩—৯২
পঞ্চদশ	সাম্য …	৯৩—৯৪
ষোড়শ	গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগ ও ক্ষমতা বিভাজন	৯৫—১০৪
সপ্তদশ	নির্বাচক-মণ্ডলী	১০৫—১১৬
অষ্টাদশ	রাজনৈতিক দল ও জনমত	১১৭—১২৪
ঊনবিংশ	স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন …	১২৫—১২৮
বিংশ	বিশ্বমানবতার পথে …	১২৯—১৩৬

পরিচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা

ভারতীয় শাসনতন্ত্র

প্রথম	শাসনতন্ত্রের ক্রমবিকাশ ...	১৩৯—১৪৫
দ্বিতীয়	১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন ...	১৪৬—১৫৩
তৃতীয়	ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রগঠনের পথে ..	১৫৪—১৫৮
চতুর্থ	ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র ...	১৫৯—১৬৫
পঞ্চম	কেন্দ্রীয় সরকার ...	১৬৬—১৭৫
ষষ্ঠ	কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ ...	১৭৬—১৮২
সপ্তম	বিষয় বিভাগ ...	১৮৩—১৮৪
অষ্টম	প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ...	১৮৫—১৮৯
নবম	রাজ্যসরকার ...	১৯০—১৯৩
দশম	রাজ্যের আইনসভা ...	১৯৪—২০০
একাদশ	অন্যান্য রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ...	২০১—২০২
দ্বাদশ	বিচার ব্যবস্থা ...	২০৩—২০৫
ত্রয়োদশ	সামন্ত রাজ্য ...	২০৬—২০৯
চতুর্দশ	রাজ্যের শাসন ও সরকারী কর্মচারী ...	২১০—২১৪
পঞ্চদশ	আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ...	২১৫—২২৮
ষোড়শ	আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলির সমস্যা ...	২২৯—২৩৬

ধনবিজ্ঞান

প্রথম	ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও আলোচ্য বিষয়...	২৩৯—২৪৯
দ্বিতীয়	অর্থনৈতিক জীবনের ক্রমবিকাশ	২৫০—২৫৩
তৃতীয়	কয়েকটি মৌলিক সংজ্ঞা ...	২৫৪—২৫৮
চতুর্থ	ভোগ এবং অভাব ...	২৫৯—২৬৪
পঞ্চম	উপযোগ ও চাহিদা ..	২৬৫—২৭৪
ষষ্ঠ	ভোগ সম্বন্ধে কয়েকটি সমস্যা ...	২৭৫—২৭৭
সপ্তম	উৎপাদন ...	২৭৮—২৮১
অষ্টম	জমি ...	২৮২—২৮৬

পরিচ্ছেদ	বিষয়		পৃষ্ঠা
নবম	শ্রম	...	২৮৭—২৯০
দশম	মূলধন	...	২৯১—২৯৭
একাদশ	উৎপাদনের সংহতি	...	২৯৮—৩১২
দ্বাদশ	✓ব্যবসায়ের উদ্যোক্তা ও বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান		৩১৩—৩১৯
ত্রয়োদশ	বিনিময় এবং বাজার	...	৩২০—৩২৩
চতুর্দশ	প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মূল্যনিরূপণ	...	৩২৪—৩৩২
পঞ্চদশ	✓একচেটিয়া কারবার	...	৩৩৩—৩৩৫
ষোড়শ	অর্থ	...	৩৩৬—৩৪৭
সপ্তদশ	অর্থের মূল্য	...	৩৪৮—৩৫৪
অষ্টাদশ	ক্রেডিট	...	৩৫৫—৩৫৮
ঊনবিংশ	ব্যাঙ্ক	...	৩৫৯—৩৬২
বিংশ	আন্তর্জাতিক বাণিজ্য	...	৩৬৩—৩৬৯
একবিংশ	✓বণ্টন এবং জাতীয় আয়	...	৩৭০—৩৭৩
দ্বাবিংশ	খাজনা	...	৩৭৪—৩৭৯
ত্রয়োবিংশ	মজুরী	...	৩৮০—৩৮৮
চতুর্বিংশ	সুদ	...	৩৮৯—৩৯২
পঞ্চবিংশ	✓লাভ	.	৩৯৩—৩৯৫
ষড়বিংশ	করনীতি	...	৩৯৬—৪০৬

ভারতীয় ধনবিজ্ঞান—

প্রথম	ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ	...	৪০৯—৪১৭
দ্বিতীয়	জনসংখ্যা	...	৪১৮—৪২৩
তৃতীয়	সমাজ-সংহতি	...	৪২৪—৪২৭
চতুর্থ	কৃষি	...	৪২৮—৪৪৫

পরিশিষ্ট

পঞ্চম	সমবায়	...	৪৪৬—৪৫২
ষষ্ঠ	ভূমিব্যবস্থা	...	৪৫৩—৪৫৭
সপ্তম	দুর্ভিক্ষ	...	৪৫৮—৪৬৪

পরিচ্ছেদ	বিষয়		পৃষ্ঠা
অষ্টম	কুটিরশিল্প	...	৪৬৫—৪৭০
নবম	শিল্প ও শ্রমিক	...	৪৭১—৪৭৮
দশম	সরকার ও শিল্প	...	৪৭৯—৪৮২
একাদশ	রেলপথ ও যানবাহন	...	৪৮৩—৪৮৭
দ্বাদশ	ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য	...	৪৮৮—৪৯৪
ত্রয়োদশ	মুদ্রানীতি ও ব্যাঙ্কিং	...	৪৯৫—৫০৩
চতুর্দশ	বণ্টন	...	৫০৪—৫০৯
পঞ্চদশ	ভারতের করনীতি	...	৫১০—৫১৮
ষোড়শ	অর্থনৈতিক পরিকল্পনা	...	৫১৯—৫২৫
	প্রশ্নাবলী	...	৫২৭—৫৪৭

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

প্রথম পরিচ্ছেদ

পৌরনীতির বিষয়বস্তু

পৌরনীতির মূল কথা হইতেছে যে মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বাস না করিলে তাহার চলে না। জন্মগ্রহণের পর হইতেই নানা ভাবে তাহাকে অন্যের উপরে নির্ভর করিতে হয়। শৈশবে পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য না পাইলে সে বাঁচিতে পারিত না। সুতরাং প্রয়োজনের জন্যই মানুষকে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে হয়। শুধু প্রয়োজনের দিক দিয়া নহে, ভাল লাগে বলিয়াও মানুষ সমস্ত সত্ত্বা দিয়া অন্য মানুষের সঙ্গ কামনা করে, তাহার বন্ধুত্ব চায়, ভালবাসা চায়। এই কামনা চরিতার্থ করিবার জন্য সে স্ত্রীপুত্র লইয়া পরিবার গঠন করিয়াছে। শুধু একটি পরিবারের বেষ্টনীর মধ্যে তাহার তৃপ্তি হয় না বলিয়া সে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব লইয়া বৃহত্তর সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে। এই ভাবে পরিবার, গ্রাম, জনপদ ও জাতির মধ্যে বাস করিয়া মানুষ নিজের নিঃসঙ্গতা দূর করিতে চায়, বহুর মধ্যে নিজেকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে চায়।

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য লোকের সঙ্গে বাস করার অনেক সুখ-সুবিধা আছে, ইহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে আমরা সাধারণত অনেক অধিকার দাবী করিয়া থাকি। তেমনি আবার অন্যদের প্রতি আমাদের প্রত্যেকেরই কতকগুলি দায়িত্ব বা কর্তব্য রহিয়াছে। অন্যের সঙ্গে বাস করিলে অনেক সময়ে নিজের ইচ্ছামত সব কিছু করা যায় না। বহু বিষয়ে আমাদিগকে অন্যদের মত ও কার্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে হয় ও সকলের সুখসুবিধার জন্য নানা দিকে ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। সমাজবদ্ধ মানুষের প্রত্যেকেরই এইরূপ কতকগুলি অধিকার এবং অনেক কর্তব্য আছে। এই অধিকার ও কর্তব্যের বিশ্লেষণই পৌরনীতির বিষয়বস্তু।

পৌর কথাটি আসিয়াছে সংস্কৃত "পুর" শব্দ হইতে, ইহার অর্থ হইতেছে পুরবাসী বা নাগরিক। নাগরিক হিসাবে মানুষের বহু কর্তব্য এবং দায়িত্ব আছে; অনেক অধিকার এবং সুবিধা আছে। এই কর্তব্য পালনের জন্য

ও অধিকার ভোগের সুবিধার জন্য নাগরিকগণ নানা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলে। গ্রামবাসীদের সুবিধার জন্য পঞ্চায়েৎ স্থাপন করা হইয়াছে। আবার জাতির স্বার্থ রক্ষার জন্য রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি নাগরিকের কর্তব্য পালনে সহায়তা করে, তাহার অধিকারের সীমা নির্দেশ করে। সুতরাং এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির স্বরূপ আলোচনা করাও পৌরনীতির উদ্দেশ্য।

পৌরনীতিতে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আলোচনা করি। প্রথমত, নাগরিক হিসাবে মানুষের অধিকার ও কর্তব্য এবং সমাজের সহিত তাহার সম্বন্ধ নির্ণয়; দ্বিতীয়ত, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান-গুলির স্বরূপ বিশ্লেষণ। তৃতীয়ত, কোন রাষ্ট্রই স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে না, অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত তাহাকে সহযোগিতা করিতে হয়। যে ভাবে এই সহযোগিতা করিবার উপায় গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা সাধারণ নাগরিকের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। এইজন্য তাহাকে আন্তর্জাতিক সংহতি সম্বন্ধেও জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে। এই সমস্ত স্থানীয়, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে জ্ঞান নাগরিকের কর্তব্য পালনে সাহায্য করিবে। নাগরিককে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও জানিতে হইবে, কারণ প্রতি পদক্ষেপে অর্থনীতির প্রভাব রহিয়াছে এবং অর্থনীতি তাহার সমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রিত করে।

অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সহিত পৌরনীতির সম্বন্ধ: পৌরনীতি একটি সামাজিক বিজ্ঞান। সমাজের জীব হিসাবে মানুষের নানা সমস্যাই ইহার অধীতব্য বিষয়। এই বিজ্ঞানের সহিত সমাজ-বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

পৌরনীতি ও সমাজবিজ্ঞান (Civics and Sociology): সমাজ-বিজ্ঞানে সমাজের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। যুগে যুগে এবং দেশের বিভিন্ন সামাজিক জীবন বিশ্লেষণ করাই ইহার উদ্দেশ্য। ইহাতে সমাজের সকল দিকই আলোচিত হয়। সমাজবিজ্ঞান হইতে পরিবার, রাষ্ট্র ও সমাজের উৎপত্তি এবং বিকাশের সন্ধান জানিতে পারা যায় বলিয়া পৌরনীতি অনেকাংশে সমাজবিজ্ঞানের নিকট ঋণী। কিন্তু পৌরনীতির

বিষয়বস্তু সমাজবিজ্ঞানের ন্যায় ব্যাপক নহে। কেবলমাত্র নাগরিক হিসাবে মানুষের কর্ম পৌরনীতির আলোচ্য বিষয়। সমাজবিজ্ঞানের অধীতব্য বিষয় আরও বিস্তৃত। তাহাতে নাগরিক জীবনের কর্তব্য ও অধিকার ছাড়াও অনেক বিষয়ের আলোচনা করা হয়।

পৌরনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Civics and Politics): অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং পৌরনীতির সম্বন্ধ সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ। গ্রীক ভাষায় এই নাম দুইটির প্রতিশব্দের উৎপত্তি এমন দুইটি কথা হইতে যাহার অর্থ একই।

পৌরনীতিতে নাগরিক হিসাবে মানুষের আচরণ এবং কর্ম বিশ্লেষণ করা এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি অনুসন্ধান করা হয়। আবার রাষ্ট্র ও সমাজই হইল রাষ্ট্রনীতির আলোচ্য বিষয়। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও পৌরনীতির অনেক বিষয়ের মিল আছে। এই দুইটি বিজ্ঞানেই নাগরিকের সংহতি এবং রাষ্ট্রের নানা অনুষ্ঠানের কথা আলোচিত হয়।

এই দুইটি বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট রহিয়াছে। নাগরিকের বিভিন্ন সমস্যাই পৌরনীতির আলোচ্য বিষয়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্র আরও ব্যাপক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে জাতিগত ও আন্তর্জাতিক নানা বিষয় আলোচিত হয়। কিন্তু সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে পৌরনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান অপেক্ষা অনেক বেশী বিষয়ে আলোচনা করে। নাগরিক জীবনের সর্বদিক ইহার অন্তর্ভূত। যেমন নাগরিক জীবনের অর্থনৈতিক দিকও পৌরনীতিতে আলোচিত হইবে; কিন্তু রাষ্ট্রনীতিতে তাহা করা হয় না। পৌরনীতিতে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান ছাড়াও আরও অনেক দিক আলোচনা করা হয়। নাগরিক জীবনে মানুষ দৈনন্দিন যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয় তাহার অধিকাংশই পৌরনীতির সীমাভুক্ত। রাষ্ট্রনীতিতে এই সব দৈনন্দিন সমস্যার দিকে ততটা দৃষ্টি দেওয়া হয় না। শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা কি, তাহার আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে করা হয়। পৌরনীতি শ্রেষ্ঠ নাগরিককে তাহাই শিক্ষা দেয়।

পৌরনীতি ও অর্থনীতি (Civics and Economics): পৌরনীতিতে নাগরিকের কার্য আলোচনা হয় বলিয়া নাগরিকের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা ইহাতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতিতে পৌরনীতির অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। অর্থনীতির মূল সূত্রগুলি না জানিলে কাহারও পক্ষে আদর্শ

নাগরিক হওয়া সম্ভব নহে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা নাগরিকের জীবন প্রভাবিত করে। অর্থনীতির জ্ঞান নাগরিকের কর্তব্য সম্পাদন করিতে সহায়তা করে, দারিদ্র ও বেকারসমস্যা সমাধান করিতে সাহায্য করে। সুতরাং অর্থনীতির জ্ঞান বাদ দিয়া পৌরনীতি বিশেষ কার্যকরী হইতে পারে না। কিন্তু পৌরনীতিতে নাগরিকদের অর্থনৈতিক দিক ছাড়াও অন্যান্য অনেক বিষয়ের আলোচনা করা হয়।

পৌরনীতি ও ইতিহাস (Civics and History): ইতিহাস মানবসভ্যতার কাহিনী। ইতিহাসের সহিত পৌরনীতির অতি নিকট সম্বন্ধ। ইতিহাস পাঠে বর্তমান সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির বিকাশের সূত্র জানা যায়। অতীত জানা থাকিলেই বর্তমান সম্বন্ধে সম্যক ধারণা হওয়া সম্ভব। এই জ্ঞান হইতে মঙ্গলময় ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার উপযোগী নূতন নূতন উপাদান মিলিবে। কিন্তু ইতিহাসের নিকট পৌরনীতির অপরিসীম ঋণ থাকিলেও উভয়ের অধীতব্য বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। নাগরিক জীবনের ঐতিহাসিক একটা দিক অবশ্যই আছে। কিন্তু পৌরনীতিতে একমাত্র তাহারই আলোচনা হয় না, আরও অন্যান্য দিক তাহাতে আলোচিত হয়। ইতিহাস অতীত লইয়াই ব্যস্ত। পৌরনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য নাগরিকের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে জানা।

পৌরনীতি ও নীতিশাস্ত্র (Civics and Ethics): মানুষের আদর্শ আচরণ কি হওয়া উচিত নীতিশাস্ত্র পাঠে তাহাই জানিতে পারা যায়। কোনটি ভাল, কোনটি মন্দ, নীতিশাস্ত্র তাহারই নির্দেশ দেয়। নীতিশাস্ত্র হইতে পৌরনীতি অনেক কিছুই গ্রহণ করিতে পারে। নীতির দিক হইতে ভালমন্দের আলোচনা এবং আচারব্যবহার ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নৈতিক ভিত্তি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে মানুষ আপন কর্তব্য বিষয়ে অবহিত হইতে পারে। যে আদর্শ নাগরিক হইতে চায়, তাহাকে মানুষ হিসাবেও আদর্শ হইতে হইবে। কিন্তু পৌরনীতি এবং নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পৌরনীতিতে নৈতিক আলোচনা করা হয় না। নীতিশাস্ত্রে মানুষের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হয়। আর পৌরনীতিতে কেবল মাত্র মানুষের বাহ্যিক কার্যের আলোচনা হয়।

পৌরনীতির আলোচনাপ্রণালী (Methods of Studies): অন্যান্য

সমাজবিজ্ঞান যে প্রণালীতে আলোচনা করা হয়, পৌরনীতিতেও তাহাই অনুসৃত হইবে। পৌরনীতির দুইটি বৈশিষ্ট্য আছে। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের কোন সিদ্ধান্ত ঠিক কি না, তাহা আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি। কিন্তু শিক্ষার্থীর পক্ষে পৌরনীতির কোনও সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করা সম্ভব নহে। দ্বিতীয়ত, পৌরনীতি মুখ্যত বাস্তব বিষয়, ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে আদর্শ নাগরিক গড়িয়া তোলা। কেবল মাত্র তত্ত্ব আলোচনা করিয়া সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নহে। এইজন্য এই শাস্ত্র পাঠের সময় অনুমানের উপরে নির্ভর না করিয়া প্রত্যক্ষ বিষয় হইতে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে।

পৌরনীতির শিক্ষার্থীকে চারিদিকে দেখিয়া অনেক কিছু শিখিতে হয়। তাহাকে পারিপার্শ্বিক সমাজ-জীবন বিশ্লেষণ করিতে হইবে। অত্যন্ত ধৈর্য ধরিয়া তাহাকে দেখিতে হইবে যে, সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা প্রণালী কিরূপ, কি কাজ তাহারা করে, কোন বিষয়ে তাহারা চিন্তা করে, কিরূপ আচরণ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান তাহাদের কার্য প্রভাবান্বিত করে। যদি সাধারণ লোকের প্রতি সহানুভূতি থাকে, তবেই সে সাধারণ লোকের অধোগতি এবং দারিদ্র্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রেরণা পাইবে এবং এই সব কারণগুলি দূর করিয়া প্রত্যেক নরনারী যাহাতে উন্নত জীবন যাপন করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিবে।

পৌরনীতির গুরুত্ব (Utility of Civics): পৌরনীতির গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। নাগরিকদের উপরে গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। যে দেশের নরনারী শিক্ষিত এবং নাগরিকের কর্তব্য সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত, সে দেশে গণতন্ত্র সর্বাপেক্ষা অধিক সাফল্য লাভ করিবে। পৌরনীতির উদ্দেশ্য উন্নত নাগরিক গড়িয়া তোলা। অতএব, এইরূপ একটি বিষয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে কোনই তর্ক উঠিতে পারে না।

সাধারণ সমষ্টিগত মঙ্গল বিধান করিতে যদি কোন নাগরিকের ইচ্ছা হয়, তবে প্রথমে তাহার নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। নিজের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা রাখিয়া তাহাকে সামাজিক অবস্থার অনুসন্ধান করিতে হইবে। নাগরিক জীবনের বিভিন্ন দিক এবং সমাজের নানা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে তাহার পরিষ্কার জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। নাগরিকের অধিকার এবং কর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে

সে ঠিক পথে চলিতে পারিবে। যদি সে মনে করে যে সমাজের কয়েকটি বিষয় সংস্কার করা প্রয়োজন, তবে পৌরনীতির তথ্যাদি তাহাকে এই কার্যে সাহায্য করিবে। স্বাধীন ভারত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া উঠিবে। গণতন্ত্র সফল করিতে হইলে আমাদের দেশের যুবক সম্প্রদায়কে এমনভাবে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে দেশের প্রতি নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে তাহাদের স্পষ্ট ধারণা থাকে। পৌরনীতি শাস্ত্র পাঠে ভবিষ্যৎ নাগরিকের কর্তব্য সম্বন্ধে ধারণা জন্মিবে। কঠোর দারিদ্রজনিত যে সব সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহার সমাধান করিতে এই বিজ্ঞান সাহায্য করিবে। তাহা হইলে আমাদের দেশের যুবক সম্প্রদায় বুঝিতে পারিবে যে, দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে তাহাদের কি কি কাজ করিতে হইবে। অতএব, পৌরনীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান আহরণ করা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমাজ

সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের কর্ম বিশ্লেষণ করাই পৌরনীতির উদ্দেশ্যে। কিন্তু সমাজ কাহাকে বলিব? বহুলোক যখন কোনও একটি বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়, তখন সেই ঐক্যবদ্ধ মানুষগুলিকে একটি সমাজ নামে আখ্যা দেওয়া হয়। শ্রমিকেরা নিজেদের অসুবিধা দূর করিবার জন্য ও অবস্থার উন্নতির জন্য শ্রমিকসংঘ গঠন করে। ধর্মপ্রচারের জন্য মঠ স্থাপন করা হয়। বিদ্যা প্রচারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তোলা হয়। এই এক একটি প্রতিষ্ঠানে বহুসংখ্যক লোক কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ হইয়াছে। শ্রমিকসংঘ, মঠ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি সমাজের এক একটি উদাহরণ। সমাজের প্রকৃতি একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। মানুষের এই সমাজ একটি ঘড়ির মত। ঘড়ির সমস্ত অংশ স্বতন্ত্রভাবে এক জায়গায় জমা করিলে ঘড়ি চলে না। প্রত্যেক অংশ যথাযথ স্থানে রাখিয়া ঠিক মত চালাইলে তবেই ঘড়ি চলে। এই ঠিক মত চালানোকে আদর্শগত ঐক্য বলা যাইতে পারে। বহু লোক যখন এই ভাবে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়, তখন তাহাকে সমাজ বলে।

সমাজের প্রয়োজন (Utility of Society): কি ভাবে ও কবে সমাজের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা সঠিক বলা যায় না। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, মানুষ কোনও দিনই সংঘবদ্ধ না হইয়া বাস করে নাই। মানুষ সামাজিক জীব। আপন প্রকৃতিগত সংস্কারের বশে সে অন্যের সঙ্গ কামনা করে। স্ত্রীপুত্রের স্নেহ, ভালবাসা, বন্ধুবান্ধবদের সখ্য ও সঙ্গ তাহার একান্ত কাম্য। এগুলি না পাইলে তাহার মনে হয় যেন বাঁচিয়া কোন লাভ নাই। এইজন্য মানুষ সমাজ ব্যতীত বাস করিতে পারে না। ইহা ছাড়াও স্বাভাবিক প্রয়োজনে মানুষ নিজের সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে। বোধ হয় পরিবারই হইল আদিমতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান। শৈশবে পিতামাতা এবং পরিবারের লোকের সদাজাগ্রত যত্ন ছাড়া কোন শিশুই বাঁচিতে পারে না। অতএব কোনও একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান ছাড়া মানুষ বাঁচিতে পারে না। বহুদিন পূর্বে গ্রীক পণ্ডিত আরিস্টটল ইহা বুঝিতে পারিয়া বলেন যে, জীবন রক্ষার জন্যই মানুষ সমাজ গঠন করে।

বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা পাইতে, আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিতে ও শিশুর প্রাণ রক্ষা করিতে মানুষকে সমাজ গড়িতে হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, বাঁচিবার জন্য মানুষকে কঠোর জীবন-সংগ্রামের সম্মুখীন হইতে হয়। আদিমকালে আহার্য সংগ্রহ করিতে, জীবন রক্ষা করিতে প্রতি পদে পদে তাহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। আদিতেই মানুষ উপলব্ধি করিয়াছিল যে একতাই বল। যাহাতে পরস্পরের সাহায্য লাভ তাহার পক্ষে সম্ভব হয়, সেজন্য মানুষ অপরের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইয়া দল অথবা গোষ্ঠী রচনা করিয়াছে। এইরূপ বিভিন্ন দল অথবা গোষ্ঠীর ভিতরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাহার নিজের দলের ঐক্য দৃঢ়তর করিয়া তুলিয়াছে। মানুষের সহিত পশুর পার্থক্য এইখানে যে, মানুষের বিচারশক্তি আছে, যাহা পশুর নাই। বিচার করিবার শক্তি আছে বলিয়াই মানুষ সমাজে বাস করিবার সুবিধা বুঝিতে পারে। উপরোক্ত বিষয়গুলি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, মানুষ কেন সমাজে বাস করে।

সমাজের উদ্দেশ্য (Functions of Society): গ্রীক পণ্ডিত আরিস্টটল বলিয়াছেন যে, জীবন রক্ষার জন্য সমাজের উৎপত্তি হইয়াছে। এইভাবে হয়ত সমাজের উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু সমাজকে বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছে আরও উন্নত জীবন-যাপনের সুবিধার্থে। সমাজের উদ্দেশ্য হইতেছে প্রত্যেকের মঙ্গল সাধন করা। একমাত্র সমাজে বাস করিলেই মানুষের পূর্ণ বিকাশ হওয়া সম্ভব। প্রত্যেকে যদি পরস্পরের সহযোগিতা করে তবে আহার্য এবং পানীয় সংগ্রহ, আশ্রয়-নির্মাণ এবং বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় সহজ হইয়া যায়। ব্যাপকভাবে খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইলে মানুষ অভাবের তাড়না হইতে রক্ষা পায় এবং আরামে থাকিতে পারে। তাহার ফলে কলা এবং গীতবাদ্য, শিল্পকলা প্রভৃতি চারুশিল্প এবং বুদ্ধিগত বিষয় লইয়া চর্চা করিবার মত অনেক সময় মানুষের হাতে থাকে। সমাজের সম্পদ যত বাড়িবে, সমাজ যত সংস্কৃত হইয়া উঠিবে, সকলের পক্ষে ঠিক সেই পরিমাণ শিক্ষায়, জ্ঞানে এবং বুদ্ধিতে দীপ্ত জীবনযাপন করা সম্ভব হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তির এইরূপ মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও সমগ্রভাবে উন্নতি হইবে। আদর্শ সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির আপন আপন শক্তি সম্যক্ স্ফুরণের সমান সুবিধা থাকিবে।

আদর্শ সমাজ আন্তর্জাতিকতা সমর্থন করে। পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতা

করিলে যেমন সমাজের উন্নতি হয়, তেমনি বৃহত্তর সমাজে—যেখানে সমগ্র মানব জাতির একত্র সমাবেশ, সর্বদেশের সর্বজাতি যেখানে এক—সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতির কর্তব্য একে অপরের সহযোগিতা করা। প্রত্যেক দেশের প্রতিটি জাতি নিজেদের বৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করিবার সুযোগ পাইয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি অর্জন করিবে। আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকের আন্তর্জাতিকতার কথা চিন্তা না করিয়া উপায় নাই। কারণ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথেই যুদ্ধ ও অনিবার্য ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

ব্যক্তি ও সমাজ (The Individual and Society): এইবারে ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যাইবে। সমাজ ছাড়িয়া কোনও ব্যক্তির পক্ষে জীবন ধারণ করা সম্ভব নহে। আরিস্টটল বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি একা বাস করিতে চায় সে হয় দেবতা, না হয় পশু। সমাজকে ছাড়িয়া দিয়া কোন ব্যক্তির কথা আমরা চিন্তা করিতে পারি না। আপনার স্বভাবে এবং প্রয়োজনে মানুষ সমাজ-নির্ভর না হইয়া পারে না। তেমনি আবার মানুষকে বাদ দিয়া সমাজের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সুতরাং সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে বিরোধের কোন কারণ নাই। জীবনযাত্রা যতই জটিল হইয়া উঠে ততই সমাজের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। শৈশব হইতে সুরু করিয়া জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মানুষকে সমাজের উপর নির্ভর করিতে হয়। অন্যের সহযোগিতা ছাড়া মানুষ নিজের আহার্য সংগ্রহ করিতে অথবা আশ্রয় নির্মাণ করিতে পারে না। নিজের ব্যক্তিগত চেষ্টায় অনেক সময় জীবন অথবা ধনসম্পদ রক্ষা করাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। শিক্ষালাভ অথবা বুদ্ধির বিকাশ হওয়াও অপরের সাহায্যের উপর নির্ভর করে। নিজের প্রয়োজন মিটাইতে এবং মানসিক ও নৈতিক উন্নতি করিতে অপরের সহায়তা চাই। সমাজও আবার ব্যক্তির উন্নতিতে উন্নত হয়। এইভাবে ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সহায়তায় মানুষের জীবনযাত্রা উন্নত হইয়া উঠে।

আদিমকালে ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজের প্রাধান্য দেওয়া হইত বেশী। তখনকার দিনে ধারণা ছিল সমাজ ছাড়া ব্যক্তির আর কোনও অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা জন্মিয়াছে। আধুনিক মত হইতেছে যে, কোন মানুষের যেমন সমাজ ছাড়া অস্তিত্ব নাই,

তেমনি সমাজও একান্তভাবেই ব্যক্তিনির্ভর। এইজন্য সমাজের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষের মঙ্গল সাধন করা।

সমাজ ও রাষ্ট্র (The Society and the State): কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ মানুষকে সমাজ বলে। এইরূপ বহু বিষয়ে উদ্দেশ্যগত ঐক্য থাকিতে পারে। সুতরাং পৃথিবীতে নানা প্রকারের সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। শিশুর প্রাণরক্ষার্থে পরিবার গড়িয়া উঠিয়াছে। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে শ্রমিকসংঘ এবং নিয়োগ-সহায়কসমিতি গঠিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া মানুষ ক্লাব, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অনুরূপ বহুতর সমাজ গঠন করিয়াছে

রাষ্ট্রও একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। ইহার উদ্দেশ্য মানুষের রাজনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধ করা। রাষ্ট্র সামাজিক প্রতিষ্ঠান হইলেও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান হইতে ইহার যথেষ্ট পার্থক্য আছে। রাষ্ট্র একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ এবং এই সীমার মধ্যে রাষ্ট্রের স্থান সকলের উপরে। কিন্তু সমাজ কোনও বিশেষ সীমার মধ্যে আবদ্ধ নহে। কখনও হয়ত একটি ছোট গ্রাম অথবা পাড়ায় তাহার স্থান। কখনও বা তাহা ব্যাপক হইয়া সমস্ত দেশে এমন কি পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ে। দুইয়ের মধ্যে আরও একটি মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। নিজের রাজ্যের মধ্যে রাষ্ট্রই প্রধান। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা আছে। কিন্তু অপর কোনও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সভ্যদের উপর সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্র

রাষ্ট্র (State) : এইবারে রাষ্ট্র কাহাকে বলা হয় তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে। যখন একদল লোক এক নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বাস করিয়া স্বাধীন শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে, তখন তাহারা একটি রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে বলা হয়। আমেরিকার ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি উইলসন বলেন, "রাষ্ট্র হইতেছে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাসকারী আইন দ্বারা সংঘবদ্ধ একদল লোক।"

রাষ্ট্র চারিটি উপাদানে গঠিত—(১) জনসমষ্টি, (২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (৩) গভর্ণমেণ্ট এবং (৪) সার্বভৌম ক্ষমতা। রাষ্ট্র কি তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে একে একে এই চারিটি উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

জনসমষ্টি না থাকিলে রাষ্ট্র গঠিত হয় না। লোক নাই অথচ রাষ্ট্র আছে ইহা অসম্ভব। কিন্তু কত লোক লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইবে তাহার কোন নিয়ম নাই। দক্ষিণ-আমেরিকায় পানামা বলিয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্র আছে, তাহার লোক সংখ্যা পাঁচ লক্ষ মাত্র। বাংলা দেশে কুচবিহার রাজ্যের লোক সংখ্যাও তাহার চাইতে বেশী। আবার চীন এবং ভারতবর্ষের মত রাষ্ট্রে বহুসংখ্যক লোক বাস করে। কম হউক বা বেশীই হউক, অন্তত কিছু সংখ্যক লোক না থাকিলে রাষ্ট্রগঠন সম্ভব নহে।

দ্বিতীয় উপাদান হইতেছে কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড। যাহারা রাষ্ট্র গঠন করিবে তাহাদের কোনও একটি অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বাস করিতে হইবে। আদিম কালে যাযাবর জাতিরা এক স্থান হইতে অন্যস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহাদের মধ্যে স্বাধীন শাসনব্যবস্থা থাকিলেও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। কোনও একটি স্থানে স্থায়ীভাবে বাস করিলেই বলা যাইবে যে, তাহারা রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। রাষ্ট্রের অধীনে একটি দেশ থাকা প্রয়োজন। এই দেশের আয়তন ছোট হউক বা বড় হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না। হল্যাণ্ডের সীমা মাত্র সাড়ে বারো হাজার বর্গমাইল, আবার আমেরিকার সীমা ৩০,০২৬ বর্গমাইল জুড়িয়া। ছোট হউক বড় হউক প্রত্যেক রাষ্ট্রের খানিকটা ভূখণ্ড থাকা চাই।

তৃতীয় উপাদান গভর্ণমেণ্ট বা সরকার। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে একদল

লোক বাস করিয়া গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা না করিলে রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে বলা যায় না। এই গভর্ণমেণ্টের শাসন অধিকাংশ লোকের মানিয়া লইতে হইবে। সরকার যে সব ব্যবস্থা প্রণয়ন করিবে অধিকাংশ লোকে তাহা মানিয়া চলিবে। হাল ছাড়া যেমন নৌকা হয় না, তেমনি গভর্ণমেণ্ট ব্যতিরেকে রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে পারে না। গভর্ণমেণ্ট রাষ্ট্র তরণীর হাল।

শেষ এবং প্রধানতম উপাদান হইতেছে সার্বভৌম ক্ষমতা। ইহার অর্থ হইতেছে চরম ক্ষমতা। রাষ্ট্র দেশের মধ্যে ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের উপর চরম ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকারী এবং রাষ্ট্রের উপর বৈদেশিক কোন শক্তির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে না। ইহাই রাষ্ট্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সহিত রাষ্ট্রের প্রধান পার্থক্য এইখানে। অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সার্বভৌম ক্ষমতা নাই। একটি জনসমষ্টি কোন দেশে স্থায়ীভাবে বাস ও একটি গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। কিন্তু তাহাদের সার্বভৌম ক্ষমতা না থাকিলে সেই দেশকে রাষ্ট্র বলা হয় না। অথবা যদি তাহারা কোন বৈদেশিক শক্তির অধীনে থাকে, তাহা হইলে তাহাদের দেশ রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য হইবে না। কোন দেশকে রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য করা হইবে কি না, তাহা বিচারের কষ্টিপাথর হইতেছে সেই দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা আছে কিনা।

একদল লোক নির্দিষ্ট অঞ্চলে সংঘবদ্ধ হইয়া স্বাধীনভাবে আইন এবং শৃংখলা বজায় রাখিবার জন্য শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিলেই সেই দেশকে রাষ্ট্র বলা যায়।

ভারতবর্ষ কি রাষ্ট্র? ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পূর্বেকার ভারতবর্ষকে রাষ্ট্র বলা যাইত না। তখন আমাদের দেশে বহু লোক বিরাট ভূখণ্ড জুড়িয়া বাস করিত এবং একটি শক্তিশালী সরকারও প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু ভারতীয়দের হস্তে সার্বভৌম ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং ভারতবর্ষকে তখন রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করা হইত না। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পর হইতে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইয়াছে। এখন এই দুইটি দেশকে রাষ্ট্র নামে অভিহিত করা হয়।

পূর্বে আমাদের দেশে যে সামন্ত রাজ্যগুলি ছিল তাহাদের একটিকেও রাষ্ট্র বলা যায় না। এই রাজ্যগুলিতে রাষ্ট্রের তিনটি উপাদান, যথা, বহুলোক, একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে বাস ও গভর্ণমেণ্ট বর্তমান ছিল। কিন্তু এই রাজ্যগুলির সার্বভৌম ক্ষমতা ছিল না। কাজেই তাহাদের কোনটিকেই রাষ্ট্র বলা যায় না।

ডোমিনিয়নগুলি সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র। বর্তমানে কানাডা, সাউথ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, পাকিস্তান ও সিংহল এই ছয়টি ডোমিনিয়ন আছে। ইহারা সকলেই ব্রিটিশ রাষ্ট্র-সংঘের সভ্য। কিন্তু কোনও ভাবেই তাহারা ব্রিটিশ সরকারের অধীন নহে। আভ্যন্তরীণ অথবা পররাষ্ট্রীয় সব ব্যাপারেই তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। কাজেই ডোমিনিয়নগুলিকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলা হয়। নিউ ইয়র্ক কি একটি রাষ্ট্র? আমেরিকা ৪৮টি রাজ্য লইয়া গঠিত। তাহার মধ্যে নিউ ইয়র্ক একটি রাজ্য। এই রাজ্যে বহু লোক স্থায়ীভাবে বাস করে ও একটি গভর্ণমেণ্ট রহিয়াছে। কিন্তু নিউ ইয়র্ক রাজ্যের সার্বভৌম ক্ষমতা নাই বলিয়া ইহাকে রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করা যায় না। এই একই কারণে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যকে ইংরাজীতে স্টেট্ বলিলেও রাষ্ট্র বলিয়া ধরা হয় না। ইহাদের কাহারও সার্বভৌম ক্ষমতা নাই।

রাষ্ট্র এবং সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (The State and other Associations): রাষ্ট্র একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। জনসাধারণ আরও অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছে, যেমন মঠ, বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রমিকসংঘ ইত্যাদি। রাষ্ট্রের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠান-গুলির বহু বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। রাষ্ট্রের মত ইহারাও কতকগুলি লোক লইয়া গঠিত এবং রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার জন্য যেমন গভর্ণমেণ্ট আছে, ইহাদেরও তেমনি কার্যকরী সমিতি থাকে।

কিন্তু রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেক প্রভেদ রহিয়াছে। প্রথমত, রাষ্ট্র বলিতে একটি নির্দিষ্ট দেশকে বুঝায়। রাষ্ট্রের কথা বলিলে আমরা একটি দেশের কথা বুঝি। রাষ্ট্র হিসাবে যখন ভারতবর্ষের কথা বলি, তখন ভূগোলে যে সীমাকে ভারতবর্ষ বলে তাহার কথাই বুঝি। কিন্তু অপর কোনও প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব কোন একটি দেশের মধ্যে নিবদ্ধ নাও হইতে পারে। এইরূপ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসীদের লইয়াও গড়িয়া উঠিতে পারে। এমন কি সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া একটি সংঘ গড়িতে কোন বাধা নাই।

দ্বিতীয়ত, একজন লোক একটিমাত্র রাষ্ট্রের সভ্য হইতে পারে। একই সময়ে দুইটি রাষ্ট্রের সভ্য হওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু সে অনায়াসেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইতে পারে। একই লোক শ্রমিকসংঘের সভ্য, কোনও ক্লাবের সদস্য, সাহিত্যসভার সভ্য প্রভৃতি হইতে পারে।

কিন্তু সে একই সময়ে ভারতবর্ষ, ইরাণ বা ইংলণ্ডের নাগরিক হইতে পারে না।

তৃতীয়ত, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে যোগদান করা বাধ্যতামূলক নয়। যে কেহ যে কোন সংঘে যোগ দিতে পারে আবার নাও পারে। কিন্তু রাষ্ট্র এমন একটি প্রতিষ্ঠান যে তাহাতে সকলকেই যোগ দিতে হইবে। উহা বাধ্যতামূলক। আমেরিকার অধিবাসীরা জন্ম হইতেই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সভ্য। সাধারণত তাহারা এই সভ্যপদ ত্যাগ করিতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সভ্যেরা যখন খুশী সেই প্রতিষ্ঠানের সভ্যপদ ত্যাগ করিতে পারে, ও অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে পারে।

চতুর্থত, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান এক বা একাধিক উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত হয়। যেমন শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে শ্রমিকসংঘ গঠিত হয়। প্রত্যেক সংঘের বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু রাষ্ট্র নাগরিকের সাধারণ স্বার্থ রক্ষার্থেই গঠিত হয়। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য অনেক ব্যাপক। সমগ্রভাবে জনসাধারণের মঙ্গলবিধান করাই রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সুতরাং রাষ্ট্রের ও অন্য প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে।

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আরও একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা আছে এবং রাষ্ট্র নাগরিকদিগকে সর্বপ্রকারে শাসন করিতে পারে। যে কোন শাস্তি এমন কি মৃত্যুদণ্ড দিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রের আছে। অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের এইভাবে শাসন করিবার ক্ষমতা নাই। তাহারা দোষী সভ্যকে বড়জোর সভ্যপদচ্যুত করিতে পারে।

৭. রাষ্ট্র ও গভর্ণমেণ্ট (State and Government) : রাষ্ট্র ও গভর্ণমেণ্টকে লোকে সাধারণত পৃথকভাবে দেখে না। অনেক সময় আমরা বলি রাষ্ট্র ইহা করিয়াছে বা করে নাই। এ কথার অর্থ এই যে, সরকার বা গভর্ণমেণ্ট এই কাজ করিয়াছে, অথবা করে নাই।

কিন্তু রাষ্ট্র এবং সরকারের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। [illegible] চারিটি উপাদান লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়, গভর্ণমেণ্ট তাহার অন্যতম। রাষ্ট্রতরণীর কর্ণধার হইতেছে সরকার। সরকার ব্যতীত রাষ্ট্র থাকিতে পারে না সন্দেহ নাই। মানুষকে চালনা করে তাহার মস্তিষ্ক এবং মস্তিষ্ক না থাকিলে মানুষ বাঁচিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া মস্তিষ্কই মানুষের সব নহে। সেইরূপ

সরকারই রাষ্ট্র নহে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পূর্বে ভারতবর্ষে সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু তখন ভারতবর্ষকে রাষ্ট্র বলা যাইত না।

দেশের সমগ্র জনসাধারণ লইয়াই রাষ্ট্র গঠিত হয়। কিন্তু শাসন পরিচালনা করে দেশের সামান্য একাংশ লোকে। ভারতবর্ষে ৩৫ কোটি লোকের বাস। কিন্তু ভারতশাসন বর্তমানে পরিচালিত হইতেছে মন্ত্রিপরিষদ এবং সরকারী কর্মচারীদের সাহায্যে। কাজেই রাষ্ট্রের সভ্যসংখ্যা সরকারের সভ্যসংখ্যা হইতে বহুগুণ বেশী।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্র একটি চিরন্তন প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সরকারের মাঝে মাঝে পরিবর্তন হয়। ভারতবর্ষে এখন কংগ্রেসী সরকার চালু আছে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বর্তমানে এই সরকারের কর্ণধার। কিন্তু যদি কোন দিন কংগ্রেস সাধারণের বিশ্বাস হারায়, তবে আর কোন রাজনৈতিক দলের নেতারা ভারতবর্ষের শাসন পরিচালনা করিবেন। তখন সরকার পরিবর্তিত হইবে বটে, কিন্তু রাষ্ট্র হিসাবে ভারতবর্ষের অস্তিত্ব তাহাতে একই থাকিয়া যাইবে।

সরকার অত্যন্ত বাস্তব ব্যাপার। সরকারের পরিচালনা করে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক। সরকারী শাসন নানা ব্যাপারে প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু রাষ্ট্র একটি কল্পনা মাত্র। রাজনৈতিক আলোচনায় ইহা কল্পিত হইয়াছে। রাষ্ট্র যেন আত্মা এবং সরকার যেন তাহার দেহ। আত্মা সম্বন্ধে কেবল কল্পনা করা যায়। কিন্তু দেহ চাক্ষুষ বস্তু। আত্মা যেমন অবিনশ্বর, রাষ্ট্রেরও তেমনি মৃত্যু নাই। আত্মা নিজে কোনও কাজ করে না, আত্মার কর্ম যদি কিছু থাকে, তবে দেহই তাহা সম্পাদন করে। রাষ্ট্রের সকল কাজও সরকারই সম্পাদন করে। কিন্তু দেহ যেমন আত্মা হইতে পৃথক, রাষ্ট্রও সেইরূপ সরকার হইতে ভিন্ন।

সার্বভৌমত্ব (Sovereignty): সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রের মৌলিক উপাদান। এই ক্ষমতাই রাষ্ট্রকে অপরাপর প্রতিষ্ঠান হইতে স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে।

কিন্তু এই সার্বভৌম ক্ষমতা কি? রাষ্ট্রের অধীনে যত ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান আছে, তাহার উপরে সর্বময় কর্তৃত্বকে সার্বভৌম ক্ষমতা বলে। "নিজের রাজ্যের মধ্যে সমস্ত জনসাধারণ, প্রতিষ্ঠান এবং বস্তুর উপরে সর্বময় এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতা"কেই সার্বভৌম শক্তি বলা হয়। রাষ্ট্রের অধীনস্থ অঞ্চলে যে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান অথবা বস্তু থাকুক না কেন, তাহার উপরে সর্বময় ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকার রাষ্ট্রের আছে। কাহারও এই ক্ষমতা

অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাহিরের দিক হইতে দেখিলে বলিতে হইবে যে, অপর কোন বৈদেশিক শক্তি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাষ্ট্রের শক্তি ব্যাহত করিতে পারে না। সার্বভৌম শক্তি সর্বপ্রকার বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত। রাষ্ট্রের এই সীমাহীন এবং সর্বময় শক্তিই সার্বভৌমত্ব।

সার্বভৌম ক্ষমতাকে সাধারণত রাজনৈতিক এবং আইনগত—এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। আইনগত সার্বভৌম ক্ষমতা (Legal Sovereignty) তাহাকেই বলে যাহা আইন প্রণয়ন করিয়া উহা কার্যে পরিণত করে। যে প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনভাবে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা আছে, তাহারই আইনগত সার্বভৌম ক্ষমতা আছে বলা যায়। ইংলণ্ডে এই ক্ষমতার অধিকারী পার্লামেণ্ট ও রাজা। পার্লামেণ্ট কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার পর রাজা সে আইনে তাঁহার সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ইংলণ্ডের নাগরিকগণ সকলেই এই আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য।

রাষ্ট্রে যাহাদের ইচ্ছা অবশেষে বলবতী হয়, তাহাদেরই রাজনৈতিক সার্বভৌম ক্ষমতার (Political Sovereignty) অধিকারী বলা হয়। ইহা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ব্যক্তি বা অনুষ্ঠান সে দেশে আর কেহ নাই। আইনগত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীকেও এই শক্তির কাছে নতি স্বীকার করিতে হয়। গ্রেট ব্রিটেনে রাজা ও পার্লামেণ্ট আইনগত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু নির্বাচকমণ্ডলী রাজনৈতিক সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। নির্বাচকমণ্ডলী অর্থাৎ ভোটদাতারা কোনও বিষয়ে একটি অভিমত ব্যক্ত করিলে পার্লামেণ্ট তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য। ভারতবর্ষেও নির্বাচকমণ্ডলী রাজনৈতিক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

কোন কোন লেখক জনসাধারণের সার্বভৌম ক্ষমতার (Popular Sovereignty) কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে শেষ পর্য্যন্ত জনসাধারণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তাহারাই এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকে। রাজনৈতিক এবং আইনগত সার্বভৌম ক্ষমতা ইহার নিকট নত হইতে বাধ্য। জনসাধারণের এই সার্বভৌম ক্ষমতার উপর আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্রজন্মের ইতিবৃত্ত

কি ভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা আমরা সঠিক জানি না। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু গবেষণা হইয়াছে এবং বহু মত প্রকাশিত হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদে প্রধান প্রধান মতবাদগুলি আলোচনা করিয়া উহাদের যথার্থতা বিচার করা হইবে।

রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি মতবাদ (The Theory of Divine Origin) : পুরাকালে অনেকের মত ছিল যে বিধাতার নির্দেশ অনুযায়ী রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে। বিধাতা মানুষকে সংঘবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছেন। রাজা বিধাতার প্রতিনিধি এবং সেই হিসাবে রাজা সমস্ত শাসন ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং রাজ-আজ্ঞা পালন বিধাতার নির্দেশ এবং রাজ-আজ্ঞা অমান্য করা পাপ। প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষের রাজারা নিজেদের সূর্য, চন্দ্র অথবা অন্য কোন দেবতার বংশধর বলিয়া দাবী করিতেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে এই মতবাদের প্রচলন হইয়াছিল। কিন্তু এখন কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তি এই মত সমর্থন করেন না। রাষ্ট্র বিধাতা কর্তৃক সৃষ্ট নহে। মানুষ নিজ প্রয়োজনেই অপরাপর লোকের সাহায্যে রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। রাজা বিধাতার নির্দেশ অনুযায়ী শাসন-ক্ষমতার অধিকারী, ইহা অপেক্ষা ক্ষতিকর মতবাদ আর নাই। ইহার অর্থ রাজা যদৃচ্ছভাবে অত্যাচার করিলেও প্রজাদের বিদ্রোহ করিবার অধিকার নাই। বিধাতার এমন অভিপ্রায় কখনও ছিল না যে, তাঁহার প্রতিনিধি মানুষের উপরে অবাধ অত্যাচার চালাইবে কিংবা স্বৈরাচারী হইবে। কিন্তু এই মতবাদের মধ্যে একটি সত্য নিহিত আছে। বিধাতা রাজাকে আপনার প্রতিনিধি করিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করেন নাই একথা সত্য। কিন্তু মানুষের মনে সামাজিক প্রবৃত্তি বিধাতাই দান করিয়াছেন। এই সহজাত প্রবৃত্তির বশে মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং তাহার ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে।

বলপ্রয়োগে রাষ্ট্রের উৎপত্তি মতবাদ (The Theory of Force) কোন কোন লেখকের মতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে শক্তি প্রয়োগের দ্বারা।

একজন লোক অথবা একদল লোক অপর সকলের উপরে জোর করিয়া নিজের বা নিজেদের অধিকার স্থাপন করে। একজন শক্তিমান পুরুষ আপনার শক্তিবলে অনুচরদল বা সৈন্যদল গঠন করিয়া নূতন নূতন দেশ জয় করিয়াছে। এইভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সৃষ্টি এবং শাসন প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কেবল যে এইভাবে শক্তি প্রয়োগের ফলে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নহে। রাষ্ট্র বজায় রাখিতে হয় শক্তির প্রয়োগে। রাষ্ট্র অমিত শক্তির অধিকারী বলিয়াই লোকে রাষ্ট্রের শাসন মানিয়া চলে। শাসনের মূল হইতেছে শক্তি। শাসনকারীর হস্তে শক্তি আছে বলিয়াই লোকেরা শাসন মানিয়া চলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে রাষ্ট্রের প্রাণ হইতেছে শক্তি।

আদিম যুগে হয়ত রাষ্ট্র গঠনে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হইয়াছিল। রাষ্ট্রের শাসন বজায় রাখিতেও শক্তির প্রয়োজন আছে সন্দেহ নাই। যাহারা আইন ভঙ্গ করে, তাহাদের শাস্তি দিবার শক্তি রাষ্ট্রের না থাকিলে দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া একথা মনে করিবার কোন কারণ নাই যে, কেবলমাত্র শক্তি প্রয়োগেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্র নানা উপাদানের সম্মেলনে গঠিত হইয়াছে। শক্তি হয়ত তাহার মধ্যে একটি উপাদান। কিন্তু কেবলমাত্র শক্তি প্রয়োগের ফলেই যে রাষ্ট্র গঠন সম্ভব হইয়াছে তাহা স্বীকার করা যায় না। মানুষের মনে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিবার প্রবৃত্তিও আর একটি উপাদান। ইহা না থাকিলে শুধু বাহুবলে রাষ্ট্র গঠন সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ।

কেবল মাত্র শক্তি প্রয়োগ করিয়া কিংবা শাসনের ভয় দেখাইয়া রাষ্ট্র বজায় রাখা যায় না। শক্তি প্রয়োগের হুমকি দেখাইয়া অথবা সঙ্গীনের সাহায্যে কোন রাষ্ট্রই দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। রাষ্ট্র যদি লোকের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সমর্থন লাভ করিতে না পারে, কেবল শক্তি প্রয়োগের উপরেই যদি তাহার অস্তিত্ব নির্ভর করে, তবে সে রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া পড়িতে বাধ্য। রাষ্ট্র শক্তি প্রয়োগ করে, শাস্তি দেয় নিশ্চয়ই। কিন্তু এই ক্ষমতার আসল উৎস পুলিস বা সৈন্য-বাহিনী নয়, জনসাধারণের সমর্থন। রাষ্ট্র যদি অধিকাংশ লোকের সমর্থন লাভ করিতে না পারে, তবে শুধু সৈন্যবলে রাজ্যশাসন সম্ভব হয় না। সে রাষ্ট্রের পতন অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য ইংরাজ দার্শনিক গ্রীন বলিয়াছেন "রাষ্ট্রের ভিত্তি সাধারণের ইচ্ছার উপরেই প্রতিষ্ঠিত, শক্তির উপরে নহে।" যে সরকার

সাধারণের ইচ্ছা উপেক্ষা করে তাহার শাসন বিফল হইতে বাধ্য। কেবল মাত্র বল প্রয়োগ করিয়া কোন রাষ্ট্রকেই বাঁচাইয়া রাখা যায় না।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ (Social Contract Theory): সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেক লেখক এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে একটি সামাজিক চুক্তির ফলেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে। এই মতবাদ অবশ্য আরও অনেক প্রাচীন। গ্রীকপণ্ডিত প্লেটো এবং আমাদের দেশে কৌটিল্যের রচনায় এই মতের উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই মতবাদের গোড়ার কথা হইতেছে যে, এমন একদিন ছিল যখন রাষ্ট্র বা সমাজ বলিয়া কোন প্রতিষ্ঠানই ছিল না। মানুষ তখন যে অবস্থায় বাস করিত তাহাকে "প্রাকৃতিক অবস্থা" বা state of nature বলা হয়। এই অবস্থায় রাষ্ট্র বা কোনরূপ সমাজ বন্ধন ছিল না। প্রত্যেকটি লোক নিজের অভিরুচি মত জীবন যাপন করিত। কাহাকেও শাসন বা নিয়ন্ত্রণ করিবার মত কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। কিন্তু কালক্রমে এইরূপ প্রাকৃতিক অবস্থায় জীবন যাত্রার পথে নানা বিঘ্ন উপস্থিত হইল। এই অবস্থায় কোনও রূপ সামাজিক শৃংখলা ছিল না এবং অপরাধ করিলে শাস্তি দিবার কেহ ছিল না। ফলে নানা প্রকারের অসুবিধার সৃষ্টি হইতে লাগিল। এই অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে লোকেরা নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি করিল। ইহাই সামাজিক চুক্তি এবং এই চুক্তি অনুযায়ী মানুষ রাষ্ট্র গঠন করিয়া সংঘবদ্ধ হইল। এই মতবাদের প্রচারকারী হিসাবে হব্‌স্‌, লক ও রুসো এই তিন জনের নাম করা যায়। হব্‌স্‌ এবং লক সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে বাস করিতেন। রুসো অষ্টাদশ শতকের ফরাসী দেশের অধিবাসী। তিনজনের মত মোটামুটি এক হইলেও কয়েকটি বিষয়ে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে।

হব্‌সের মতে মানুষ আদিমকালে যে প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে বাস করিত তাহাতে একান্তভাবে শৃংখলার অভাব ছিল। এই পরিবেশে সকলে বলং বলং বাহু বলং এই নীতি অনুসারে চলিত। একজন অন্য জনের সঙ্গে অবিরাম দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিত। এইরূপ প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের জীবন ছিল "সঙ্গীহীন, দীন, কদর্য, পাশব, এবং স্বল্পায়ু"। এই অসহনীয় অবস্থা হইতে পরিত্রাণ লাভের আশায় সমস্ত লোকে মিলিয়া একটি লোকের সঙ্গে চুক্তি করে। এই লোকটির নিকট নিজেদের সমস্ত তথাকথিত স্বাভাবিক অধিকার সমর্পণ

করিয়া তৎপরিবর্তে জীবন এবং সম্পত্তি রক্ষার অঙ্গীকার পায়। এই লোকটিই রাজা হিসাবে পরিচিত হইল এবং সাধারণের উপরে তিনি অব্যাহত ক্ষমতা লাভ করিলেন। লোকেরাই তাঁহার সহিত চুক্তি করিয়াছিল। তিনি কাহারও সহিত চুক্তিবদ্ধ ছিলেন না। হব্‌সের এই মতবাদে স্বৈরাচারতন্ত্রের সমর্থন করা হয়।

লকের মত হব্‌সের মত হইতে কয়েকটি বিষয়ে স্বতন্ত্র। তাঁহার মতে প্রাকৃতিক অবস্থায় যে কোন শৃংখলা ছিল না তাহা নহে। প্রাকৃতিক পরিবেশে শান্তি বিরাজ করিত। লোকে যুক্তি মানিয়া চলিত ও কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের বশ্যতা স্বীকার করিত। এই প্রাকৃতিক অবস্থা শান্তিময় হইলেও নানা অসুবিধার জন্য মানুষ এই অবস্থা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। প্রাকৃতিক নিয়ম কি তাহা লইয়া মতভেদ হইতে পারে এবং তাহা বিচার করিয়া মীমাংসা করিবার কেহ ছিল না। যাহারা প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করিত তাহাদিগকে শাসন করিবার মত কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থা ছিল না। এইসব অসুবিধা দূর করিবার জন্য লোকে নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি করিয়া একজনকে রাজা করিল। কিন্তু তাহারা রাজার নিকট সব অধিকার বিসর্জন দিল না। তাহারা মাত্র কয়েকটি অধিকার রাজার হস্তে সমর্পণ করিল এবং চুক্তি অনুযায়ী রাজা তাহাদের অন্য অধিকারগুলি রক্ষা করিতে বাধ্য। যদি রাজা স্বেচ্ছায় অথবা অক্ষমতা হেতু চুক্তি লংঘন করেন তবে রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার ক্ষমতা লোকেদের আছে। লক এইরূপে গণতন্ত্র সমর্থন করিয়াছেন।

হব্‌সের মতে প্রাকৃতিক অবস্থার মত দুরবস্থা আর নাই। লকের মতে প্রাকৃতিক অবস্থা ইহা অপেক্ষা ভাল ছিল। কিন্তু **রুসোর** কল্পিত প্রাকৃতিক অবস্থা সর্বাপেক্ষা মনোরম। ইহা যেন স্বর্গরাজ্য। সেখানে কেহ রাজা ছিল না, প্রজাও ছিল না, সকলেই সকলের সমান। কিন্তু এই রামরাজ্যেও বিঘ্ন সৃষ্টি হইতে লাগিল। জনসংখ্যা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পায় ও লোকেদের মধ্যে নিজস্ব সম্পত্তিবোধ জন্মাইতে লাগিল। তাহার ফলে নানা রকম অসুবিধা দেখা দিল। তাই লোকে নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া সমাজ তথা রাষ্ট্রের পত্তন করে। রুসোর মতে লোকেরা আপন আপন অধিকার কিছুই কোন একটি ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করে নাই। তাহারা নিজেদের হস্তেই সার্বভৌম ক্ষমতা রাখিয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই মতবাদ ইউরোপে গণতন্ত্র স্থাপনে খুবই সহায়তা করে। কিন্তু তাহার পরে এই মতের তীব্র সমালোচনা হইয়াছে। এখন আর কেহ ইহা সমর্থন করে না। প্রথমত, এই মতের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। আমরা এমন একটিও দেশের কথা জানি না যেখানে লোকে চুক্তি করিয়া রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। রাষ্ট্র গঠন করিবার জন্য কোন চুক্তি কোন দিন করা হয় নাই। মানুষ সমাজ ছাড়া একটি দিনও থাকিতে পারে না। নিতান্ত আদিম প্রকৃতির মানুষের মধ্যেও কোন না কোন ধরণের সামাজিক প্রতিষ্ঠান ছিল। মানুষ যে কোনদিন "প্রাকৃতিক অবস্থায়" বাস করিত তাহা নিছক কল্পনা মাত্র বলা হয়।

দ্বিতীয়ত, এই মতবাদে বলা হইয়াছে যে, আদিতে মানবসমাজে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। তাহা হইলে রাষ্ট্র সম্বন্ধে কোন ধারণাও মানুষের ছিল না। রাষ্ট্র সম্বন্ধে ধারণাই যদি না থাকে, তবে তাহারা রাষ্ট্র গঠন করিল কি প্রকারে? তৃতীয়ত, প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের কতকগুলি সহজাত অধিকার ছিল বলা হইয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্র না থাকিলে কোন অধিকার থাকাও সম্ভব নহে। যদি এমন কোন শক্তির অস্তিত্ব না থাকে যাহা মানুষের অধিকার রক্ষা করিবে, তাহা হইলে সকলের পক্ষে কোনরূপ অধিকার ভোগ করা সম্ভব নহে। দুর্বল সবলের উপর কোন অধিকার দাবী করিতে পারিবে না। অতএব রাষ্ট্র না থাকিলে কাহারও অধিকার থাকিতে পারে না। চতুর্থত, অনেকে বলেন যে, এই মতের পরিণাম অত্যন্ত বিপদ্‌জনক। রাষ্ট্র যদি আমাদের চুক্তির ফলে গঠিত হইয়া থাকে তবে কোন সময়ে রাষ্ট্র চুক্তি অনুযায়ী কার্য করিতেছে না মনে করিয়া রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ করিতে পারি। এই মত মানিয়া লইলে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি হইতে বাধ্য।

সুতরাং এই মতবাদের বহু ত্রুটি রহিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাতে অনেকখানি সত্য নিহিত আছে। ইহা প্রচলিত হইবার ফলে পূর্বোক্ত দুইটি মতবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি যেভাবেই হইয়া থাকুক না কেন, একটি সত্য এই মতবাদে প্রকাশ পাইয়াছে যে, রাষ্ট্রের ভিত্তি হইতেছে সাধারণের সম্মতির উপর। অতএব এই মতবাদ আধুনিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে বলা যায়।

আধুনিক মত (The Modern Theory): রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি

নহে। রাষ্ট্রের সৃষ্টি মানুষই করিয়াছে। আমাদের মত সাধারণ মানুষই ইহার স্রষ্টা। যদিও ইহা মানুষের সৃষ্টি, তথাপি মানুষ পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী বা চুক্তির দ্বারা ইহা সৃষ্টি করে নাই। কোন প্রকার সামাজিক চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্র গঠিত হয় নাই। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব চিরকালই আছে। পৃথিবীতে এমন কোনদিন ছিল না যখন মানুষ রাষ্ট্র বা কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে বাস করিয়াছে। সে রকম অবস্থা কল্পনাই করা যায় না। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ছাড়া সে বাস করিতে পারে না। সামাজিক প্রবৃত্তির বশে মানুষ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বাস করে। পরিবারই আদিমতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সেই একই প্রয়োজনে কয়েকটি পরিবার মিলিয়া একটি গোষ্ঠী রচনা করিয়াছে; কয়েকটি গোষ্ঠী মিলিয়া আবার একটি উপজাতির উদ্ভব হইয়াছে। এই উপজাতি কালক্রমে প্রসারিত হইয়া রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি। পরিবার, গোষ্ঠী, উপজাতি এবং রাষ্ট্র—এইভাবে রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ হইয়াছে।

পরিবার (Family) : আদিমতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান হইল পরিবার। স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া এক একটি পরিবার গড়িয়া উঠে। এইভাবে যাহারা একত্র বাস করে তাহাদের মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ বিদ্যমান। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং শিশু-প্রতিপালনের প্রয়োজনে মানুষ পরিবার গঠন করিয়া লইয়াছে।

দুই প্রকারের পরিবার দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমশ্রেণীর পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষই সর্বময় কর্তা, পরিবারের সকলে তাহাকে মানিয়া চলে। ইহাকে 'প্যাট্রিআর্কাল' পরিবার বলে। কারণ, প্রাচীন রোমে বয়োজ্যেষ্ঠকে 'প্যাট্রিআর্ক' বলিত। পরিবারের সমস্ত লোকের ও তাহাদের ধনসম্পত্তির উপরে 'প্যাট্রিআর্ক', বা কর্তার সর্বময় অধিকার ছিল। বংশাবলী পুরুষানুক্রমে হিসাব করা হইত।

আদিম সমাজে আর একপ্রকার পরিবারের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। এই পরিবারে বংশ-পরিচয় পিতার দিক হইতে হিসাব করা হইত না। মাতার দিক হইতেই সমস্ত পরিচয় লওয়া হইত। এই ধরণের পরিবারকে 'ম্যাট্রিআর্কাল' বলা হয়। এই সব পরিবারে কখনও কখনও বর নিজের পরিবার ত্যাগ করিয়া কন্যার পরিবারে বাস করিত। যদিও এই পরিবারে বংশ-পরিচয় মাতার দিক হইতে লওয়া হয়, তথাপি মা অবশ্য 'প্যাট্রিআর্ক'-এর মত সর্বময় কর্ত্রী ছিলেন না।

এইরূপ 'ম্যাট্রিআর্কাল' পরিবারের সন্ধান পাইয়া অনেক লেখক বলিয়াছেন যে, এই ধরণের পরিবার আদিমতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান। আদিম মানুষ এক একটি আত্মীয়-সম্প্রদায়ের মধ্যে বাস করিত এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পরিচায়ক এক একটি চিহ্ন ছিল। এই চিহ্নকে টোটেম বলা হয়, ইহা সাপ, পাখী প্রভৃতি নানাপ্রকারের ছিল। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে, এই ধরণের সামাজিক সংগঠন পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যায় নাই। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া রাষ্ট্রের বিকাশ হইয়াছে। একথা বলিলে ভুল হইবে যে, পৃথিবীর সর্বত্রই প্যাট্রিয়ার্কাল বা ম্যাট্রিয়ার্কাল পরিবারের মধ্য দিয়া একই ভাবে রাষ্ট্রের বিকাশ হইয়াছে।

গোষ্ঠী (Clan): পরিবার আদিমতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান। মানুষের সামাজিক প্রবৃত্তি কিন্তু পরিবারের বেষ্টনীর মধ্যেই সন্তুষ্ট থাকে নাই। যৌন আকাংখা স্ত্রী-পুরুষকে একত্রিত করিয়াছে। উহাই আবার বহু পরিবারের মধ্যে ঐক্য বন্ধন সৃষ্টি করিয়াছে। নিজের পরিবারে বিবাহ করা কিভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহা অনুমান করা শক্ত। কিন্তু এই রীতি বহুলপ্রচলিত। অন্য পরিবারে বিবাহ হইবার দরুণ বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তা সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ গঠিত কয়েকটি পরিবারকে গোষ্ঠী বলা হয়। এইভাবে বহু গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইয়াছে, ও ইহা সকলের মধ্যে ঐক্য দৃঢ়তর করিয়া তাহাদিগকে সামাজিক প্রবৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ করিতে সাহায্য করিয়াছে। ব্যক্তিগত স্বার্থের বাহিরে অন্য বিষয় তাহারা ভাবিতে শিখিয়াছে। গোষ্ঠীর কল্যাণে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিতে প্রেরণা পাইয়াছে।

সম্প্রদায় (Tribe) : যে কারণে কয়েকটি পরিবার ঐক্যবদ্ধ হইয়া গোষ্ঠী রচনা করিয়াছে, সেই একই কারণে কয়েকটি গোষ্ঠী এক বা একাধিক প্রধানের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে। এই সংগঠনকে উপজাতি বলা হয়। উপজাতির সকলে প্রধানের শাসন মানিয়া চলিত। এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে প্রাথমিক রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে বলা যাইতে পারে। কালক্রমে উপজাতিরা কোন এক বিশেষ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করে। উপজাতির প্রধান ব্যক্তি তাহার অধীনে লোকদের উপর প্রভুত্ব বৃদ্ধি করিতে থাকে। এইভাবে ধীরে ধীরে পুর্ণাঙ্গভাবে রাষ্ট্রের জন্ম হয়। আধুনিক রাষ্ট্র এইরূপ অসম্পূর্ণ অবস্থারই রূপান্তর।

রাষ্ট্রবিকাশের উপাদান (Factors in the growth of the State) : রাষ্ট্রের বিকাশ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় কয়েকটি প্রধান উপাদান লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। উপাদানগুলি এই : আত্মীয়তা, ধর্ম, অর্থনৈতিক প্রয়োজন, শক্তির প্রয়োগ, শৃংখলা ও বিপদ হইতে রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি।

রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে **আত্মীয়তাবোধ** বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে। রক্তের সম্বন্ধ স্বীকারকে আত্মীয়তাবোধ বলে। রক্তের সম্বন্ধ বহুলোক এবং পরিবারের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিয়াছে। পরিবার বহুসংখ্যায় বৃদ্ধি পাইয়া গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইয়াছে। গোষ্ঠীর সকলের মধ্যে আত্মীয়তাবোধ থাকায় ঐক্য বজায় রহিয়াছে। এক বা একাধিক প্রধানের অধীনে অনেকগুলি গোষ্ঠী সংঘবদ্ধ হইয়া উপজাতি গড়িয়া উঠিয়াছে। পিতার কর্তৃত্ব গোষ্ঠী-প্রধানের হস্তে চলিয়া গিয়াছে। এইভাবে আত্মীয়তাবোধ আদিমতম সমাজ সৃষ্টি করিয়াছে এবং এই সমাজই রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হইয়াছে।

আত্মীয়তাবোধের পরেই যাহা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছে তাহা হইল **ধর্মজ্ঞান**। লোকের মনের উপরে ধর্মের প্রভাব অপরিসীম। ধর্ম মানুষকে ভক্তি এবং মান্য করিতে শিখাইয়াছে। রাজার কর্তৃত্ব লোকে মানিত, কারণ তাহাদের ধারণা ছিল যে তিনি বিধাতার প্রতিনিধি। পিতার কর্তৃত্ব কেবল মাত্র রক্তের সম্বন্ধের জন্যই যে লোকে মানিত তাহা নয়। পিতাকে মান্য করা ধর্মের অন্যতম নির্দেশ। বন্য এবং দুর্দ্ধর্ষ আদিম মানুষ এইভাবে মান্য করিতে ও শাসন স্বীকার করিতে শিখে। আদিম যুগে লোকে আইন মানিত, কারণ তাহাদের ধারণা ছিল আইন ধর্মের নির্দেশ। ধর্মের প্রভাবে রাষ্ট্র-বিকাশের পথ সুগম হইয়াছে।

পরবর্তী উপাদান হইতেছে **অর্থনৈতিক**। আহার, বাসস্থান এবং অন্যান্য প্রয়োজনে লোকে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে। বহুদিন পূর্বে আরিস্টটল বলিয়াছেন যে, অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই পরিবার ক্রমশ বিস্তৃত হইয়া উপজাতিতে পরিণত হইয়াছে, গ্রাম গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহাই ক্রমে রাষ্ট্রের রূপ ধারণ করিয়াছে। অর্থনৈতিক কারণ যে রাষ্ট্র সংহতির অন্যতম প্রধান উপাদান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এইরূপে আত্মীয়তাবোধ, ধর্মজ্ঞান ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের বশীভূত হইয়া

মানুষ ক্রমেই বৃহত্তর সমাজ গড়িতে থাকে। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও বিত্তসম্পত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে **শৃংখলা এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন** বিশেষ করিয়া অনুভূত হয়। কোন জাতি যখন স্থায়ীভাবে বাস আরম্ভ করিল, তখনই লোকের জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষা করার প্রয়োজন হইল। আদিম যুগে বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ প্রায়ই হইত। এইরূপ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় হিসাবে শাসনশক্তি গঠনের প্রয়োজন হইল। বহিরাক্রমণ দেশের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির সহায়ক। বাহিরের আক্রমণের সম্মুখীন হইবার জন্য সকলকে বিশেষভাবে সংঘবদ্ধ হইতে হইয়াছে। আইন-শৃংখলা বজায় রাখার ও বহিরাক্রমণের সম্মুখীন হইবার প্রয়োজনীয়তা শাসনতন্ত্র-গঠনের সহায়তা করিয়াছে। এইভাবে আত্মীয়তাবোধ, ধর্মজ্ঞান প্রভৃতি উপাদানের সহায়তায় রাষ্ট্রের ক্রমবিবর্তন হইয়াছে।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি (Nature of the State) : রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি মতবাদ প্রচারিত ছিল। ইহা "জৈব প্রকৃতি" (Organic theory) মতবাদ নামে পরিচিত। এই মতবাদে রাষ্ট্রকে মানবদেহের সহিত তুলনা করা হয়। এই মতটি অত্যন্ত পুরাতন। বহুলেখকই রাষ্ট্র ও মানব দেহের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে প্লেটো এবং আরিস্টটল অন্যতম। আমাদের দেশের ধর্মশাস্ত্রকারেরাও অনেকেই জীবদেহের সহিত রাষ্ট্রের সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আধুনিক কালে ব্লানৎস্লি (জার্মান পণ্ডিত) ও ইংরাজ পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সার এই মতের সমর্থক ছিলেন।

রাষ্ট্রের সহিত মানবদেহের বহু সাদৃশ্য আছে। মানব-দেহ যেমন অসংখ্য জীবকোষ দ্বারা গঠিত, রাষ্ট্রও সেইরূপ বহু ব্যক্তিকে লইয়া প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রের জীবকোষ নাগরিকগণ। মানবদেহে প্রত্যেকটি জীবকোষের ভিন্ন ভিন্ন কাজ আছে। প্রত্যেক ব্যক্তিও রাষ্ট্রের জন্য কিছু কিছু কাজ করিতেছে। দেহের যেমন হাত পা মুখ প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গ রহিয়াছে, রাষ্ট্রেরও সেইরূপ বিভিন্ন অঙ্গ আছে। মানবদেহে স্নায়ুমণ্ডলী সর্ব অঙ্গের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে, রাষ্ট্রের মধ্যে সরকার সর্বব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। দেহে রক্তচলাচলের জন্য ধমনী আছে— রাষ্ট্রে চলাচলের জন্য রেলপথ প্রভৃতি যানবাহন রহিয়াছে। জার্মান লেখক ব্লানৎস্লি এমন কথাও বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রের লিঙ্গ আছে। রাষ্ট্র হইতেছে পুরুষ ও তাহার স্ত্রীলিঙ্গ হইতেছে গির্জা। সুতরাং রাষ্ট্র বহুলোকের

মিলিত সংঘমাত্র নহে। রাষ্ট্রেরও প্রাণ রহিয়াছে ও জীবন্ত প্রাণীর মতই রাষ্ট্র সজীব।

রাষ্ট্র এবং জীবদেহের মধ্যে যে অনেক সাদৃশ্য আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রভেদও যথেষ্ট আছে। মানবদেহ হইতে একটি জীবকোষ ছিন্ন করিয়া লইলে তাহা মরিয়া যায়। কিন্তু রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও মানুষ বাঁচিতে পারে। দ্বিতীয়ত, জীবকোষের কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই। নিজের বিকাশ নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। কিন্তু মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা আছে। নিজ চেষ্টায় এবং ইচ্ছাশক্তির দ্বারা মানুষ নিজের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। জীবকোষ ইচ্ছাশক্তিরহিত বস্তু। মানুষের ইচ্ছা ও বুদ্ধি আছে। হার্বার্ট স্পেন্সার স্বীকার করিয়াছেন যে, মানবদেহে সমস্ত চেতনাশক্তি শুধুমাত্র মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত আছে। কিন্তু রাষ্ট্রের চেতনাশক্তি বহু মানবের মধ্যে ছড়াইয়া আছে। কাজেই রাষ্ট্র ও প্রাণীদেহ সম্বন্ধে তুলনা বেশীদূর চলে না। এই মত স্বীকার করিলে বলিতে হয় জীবকোষের ন্যায় মানুষ আপনার বুদ্ধি এবং বিকাশের জন্য সর্বতোভাবে রাষ্ট্রের উপরে নির্ভরশীল। ইহা সত্য নহে। রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রয়োজন ব্যক্তির মঙ্গল সাধনের জন্যই। রাষ্ট্রের জন্য মানুষ জীবন ধারণ করে না। এই সমস্ত কারণে এই মতবাদ বর্তমানে কেহ সমর্থন করে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জাতি ও রাষ্ট্র

জাতি (Nation) : জাতি কাহাকে বলে? একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে যদি কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তাহাদিগকে জাতি নামে আখ্যা দেওয়া হয়। বংশগত ঐক্য, ধর্ম কিংবা ভাষা ও সাহিত্যগত ঐক্য, আচারব্যবহারের ঐক্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য জাতিগঠনের উপাদান। কোন দেশের অধিবাসীদের মধ্যে যদি এই প্রকারের বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে, তবে তাহাদিগকে জাতি হিসাবে অভিহিত করা হয়।

এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, জাতি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে। একদল লোক একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্বাধীন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলে তাহাকে রাষ্ট্র বলা হয়। জাতি বলিতেও একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে অবস্থানকারী স্বাধীন একদল লোককে বুঝায়। কাজেই এই পর্যন্ত জাতি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু সাদৃশ্য এইখানেই শেষ। জাতির সংজ্ঞায় এমন অনেক বিষয় আছে যাহা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত নহে। জাতি অর্থে আমরা বুঝি এমন একদল লোক যাহাদের মধ্যে একই ধর্ম, কুল, ভাষা, রীতিনীতি ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান আছে। রাষ্ট্র-গঠনের জন্য এই সব বৈশিষ্ট্য থাকার প্রয়োজন নাই। রাষ্ট্রের কথা বলিলে আমরা একটি জনসমষ্টি সার্বভৌম শাসন প্রতিষ্ঠানের কথা বুঝি। কিন্তু জাতি বলিতে একটি জনসমষ্টির ভাষাগত, ধর্মগত, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ঐক্যের কথা বুঝি। অনেক জাতি আজও আপন আপন স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। জার্মানী এখনও স্বাধীন শাসন প্রবর্তন করিবার অধিকার পায় নাই। আবার একটি রাষ্ট্র একটি জাতি দ্বারা গঠিত হইবে এমনও কোন কথা নাই। বেলজিয়মে দুইটি জাতি ও সুইজারল্যাণ্ডে তিনটি জাতি আছে।

জাতীয়তা (Nationality) : আর একটি পরিভাষা এখানে ব্যবহার করা হইতেছে। অনেক লেখক জাতি এবং জাতীয়তা সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করেন। তাঁহারা জাতি অথবা জাতীয়তা কথা দুইটিতে কোনরূপ পার্থক্য না করিয়াই ব্যবহার করেন। কিন্তু কথা দুইটির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

ধর্ম, ভাষা, রীতিনীতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য ইত্যাদি এক—এইরূপ একদল লোকের মনে যে একাত্মবোধ, তাহার নাম জাতীয়তা। কোন ব্যক্তিসমষ্টির মধ্যে এইরূপ জাতীয়তাবোধ থাকিলেই তাহাদের জাতি বলিয়া গণ্য করা হয় না। যাহাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ বর্তমান তাহারা যদি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করে বা করিবার জন্য সচেষ্ট হয় তবে তাহাদের জাতি বলিয়া গণ্য করা হয়। জাতীয়তার সহিত রাজনৈতিক সংগঠন যুক্ত হইলেই জাতি গঠিত হয়। কোন মানবসমষ্টির যদি ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য বা সংস্কৃতিগত ঐক্যবোধ থাকে, তবে তাহাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ আছে বলা হয়। আর এইরূপ জাতীয়তাবোধ-সম্পন্ন ব্যক্তিসমূহের যদি স্বাধীন রাষ্ট্র সংগঠন থাকে, তবে তাহাদের জাতি আখ্যা দেওয়া হয়।

জাতীয়তার উপাদান (Elements of Nationality): জাতীয়তার উপাদান হিসাবে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করা হয়। যথা, কুলগত ঐক্য, ধর্মগত ঐক্য, ভাষা ও সাহিত্যগত ঐক্য, আচারব্যবহার প্রভৃতির ঐক্য, সাংস্কৃতিক ঐক্য। কিন্তু জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করিতে এই বৈশিষ্ট্যগুলির কতটুকু প্রয়োজন?

কুলগত ঐক্য জাতীয়তার একটি প্রধান ভিত্তি বলিয়া ধরা হয়। একই সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত বলিয়া ধারণা থাকিলে লোকেদের মধ্যে ঐক্যবোধ দৃঢ় হইবার সম্ভাবনা। সকলেরই এক কুলে জন্ম এই ধারণা থাকিলে জাতীয়তাবোধ দৃঢ় হয় ইহা সত্য, কিন্তু আধুনিক কালে বিভিন্ন সম্প্রদায় অথবা জাতি পরস্পরের সহিত এমনভাবে মিলিয়া গিয়াছে যে, কেহই একটি বিশেষ জাতি হইতে উদ্ভূত এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না। সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসিগণ বিভিন্ন জাতির মিশ্রণে গঠিত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ অত্যন্ত প্রবল। কাজেই জাতীয়তাবোধ জন্মাইবার জন্য কুলগত ঐক্য থাকার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

সকলেই এক ধর্মাবলম্বী হইলে জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি পায় সন্দেহ নাই। অনেক সময়ে ধর্মের বিভিন্নতা জাতীয়তাবোধের অন্তরায় হইতে পারে। ভারতবর্ষে তাহা হইয়াছিল। পরধর্মমতসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পাইলে ধর্মমতের ঐক্য থাকা জাতীয়তাসৃষ্টির জন্য অপরিহার্য বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। চীনদেশবাসিগণ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইলেও তাহাদের জাতীয়তাবোধ অব্যাহত।

ভাষা ও সাহিত্যগত ঐক্য জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির প্রধানতম সহায়ক। যাহারা একই ভাষায় কথা বলে এবং একই সাহিত্য পাঠ করে, তাহাদের মধ্যে একত্ববোধ সহজেই গড়িয়া উঠে। কিন্তু ইহাও জাতীয়তাবোধের জন্য অপরিহার্য নহে। অনেক ক্ষেত্রে ভাষার বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও জাতীয়তাবোধ গড়িয়া উঠিয়াছে। আবার ইংলণ্ড এবং আমেরিকা এক ভাষাভাষী হইয়াও স্বতন্ত্র জাতি। সুইজারল্যাণ্ডে তিনটি ভাষা আছে। কানাডায় ইংরাজী এবং ফরাসী দুইটি ভাষাই চলে। তথাপি ঐ দুইটি দেশের লোকের জাতীয়তাবোধ কিছুমাত্র কম নহে।

আচার-ব্যবহারে ঐক্য এবং একই ঐতিহ্য জাতি-গঠনে অপরিহার্য বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন। যাহাদের ইতিহাস একই, যাহাদের আচারব্যবহারে কোনও পার্থক্য নাই, তাহারা অনায়াসেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারিবে। তাহার ফলে তাহাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ গড়িয়া উঠিতে পারে। জাতীয়তা-গঠনে এই দুইটি উপাদান প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু অপরিহার্য নহে। ইতিহাস অথবা আচার-ব্যবহার স্বতন্ত্র থাকা সত্ত্বেও একাত্মবোধ গড়িয়া উঠিতে কোন বাধা হয় না।

এই সব উপাদনের কোনটিই জাতীয়তা গঠনের পক্ষে অপরিহার্য নহে। জাতীয়তা হইতেছে মনের দিক হইতে একাত্মবোধ। জাতি, ধর্ম, ভাষা প্রভৃতি সর্বপ্রকার বাহ্যিক ব্যাপারে স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও এই একাত্মবোধ গড়িয়া উঠিতে পারে। এইগুলির একটি অথবা একাধিক বিষয়ে ঐক্য থাকিলে হয়ত জাতীয়তা বোধ তাড়াতাড়ি গড়িয়া উঠে। কিন্তু ইহার কোন একটি না থাকিলেও জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ হইতে পারে।

জাতীয়তা ও ভারতবর্ষ (Is India a Nation): ভারতবাসীকে কি একজাতিভুক্ত বলা যায়? কোন জনসমষ্টির মধ্যে যদি কুল, ধর্ম, ভাষা ও আচার-ব্যবহারের ঐক্য থাকে, তবেই তাহাদের এক-জাতীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। ভারতবর্ষে কি ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি আছে?

অনেকের মতে ভারতবর্ষে জাতি, ধর্ম, ভাষা ও সাহিত্যগত ঐক্য নাই। ভারতবর্ষে বহু জাতির, বহু ভাষাভাষীর বাস। ধর্মগত বিভেদ এখানে অত্যন্ত প্রবল। দেশের বিভিন্ন অংশে রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার ভিন্ন রকমের। অতএব যে সব কারণে জাতীয়তাবোধ জন্ম লাভ করে, তাহার

কোনটিই ভারতবর্ষে বিদ্যমান নাই বলা যায়। কিছুদিন পূর্বেও মুসলীম লীগ দল প্রচার করিত যে, ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান দুইটি জাতির অস্তিত্ব আছে। এই প্রচারের ফলে দেশে যে রক্তপাত এবং অনর্থ সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা কাহারও অজানা নাই।

এই মতে কিছু সত্য আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রত্যেক নিরপেক্ষ লোকের দৃষ্টিতে ইহা ধরা পড়িবে যে, ধর্ম, ভাষা প্রভৃতির পার্থক্য সত্ত্বেও ভারতবর্ষের একটি অন্তর্নিহিত ঐক্য আছে। পূর্ববর্ণিত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও জাতীয়তাবোধ দেখা দিতে পারে; সুইজারল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে তাহা দেখা দিয়াছে। ভারতবর্ষেও তাহা দেখা দিতেছে। পরাধীনতা বহুশ্রেণীর লোককে এক জাতিতে পরিণত করিয়াছে। পরাধীনতার বন্ধন এবং নির্যাতন ভারতবর্ষের সকলকে এক জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। ইংরাজ শাসনের আমল হইতে দেশে সর্বত্র একই ধরণের শিক্ষা প্রচলিত আছে। তাহার ফলে দেশের সকলের মধ্যে একই রকম মনোভাব, আশা-আকাংখা জন্মলাভ করিয়াছে। ইহাতে সকল সম্প্রদায় ধীরে ধীরে একতাবদ্ধ হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ অত্যন্ত সাময়িক ব্যাপার। সাম্রাজ্যবাদীর চক্রান্ত এই বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছিল এবং তাহা জিয়াইয়া রাখিয়াছিল। এখন দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীর সকল চক্রান্ত বিফল করিয়া ভারতবর্ষ এক বিরাট জাতি হিসাবে জগতে পরিচিত হইতেছে। ধর্ম কখনই জাতীয় ঐক্যের পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায় নাই। জাতীয়তা একটি ভাবধারা। এই ভাবধারার অস্তিত্ব ভারতবর্ষে আছে। ভারতবাসী অনুভব করে যে, তাহারা একটি বিশেষ জাতি—এই জাতি পৃথিবীর অপর কোন জাতি অপেক্ষা হীন নহে। ভারতবর্ষের অতীত গৌরবময়, ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল।

এক জাতি, এক রাষ্ট্র ঃ প্রত্যেক রাষ্ট্র মাত্র একটি জাতি লইয়া গঠিত হওয়া উচিত এই মতবাদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। প্রত্যেক রাষ্ট্র মাত্র একটি জাতি লইয়া গঠিত হইবে। যে সমস্ত রাষ্ট্রে একাধিক জাতি বাস করে, সেইগুলি এক জাতির ভিত্তিতে ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইবে। নিজের অভিরুচি অনুযায়ী সরকার গঠনের অধিকার প্রত্যেক জাতির আছে। যদি কোন জাতি অন্য জাতির সহিত একই রাষ্ট্রের অধীনে থাকিতে চায়, তবে তাহাতে আপত্তি করিবার কিছু নাই। কিন্তু নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিতে

চাহিলে তাহার দাবী মানিয়া লইতে হইবে। ইহাকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (Right of self-determination) বলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রেসিডেণ্ট উইলসন যে চৌদ্দ দফা শান্তি-সর্ত প্রচার করেন, ইহা তাহার অন্যতম সর্ত ছিল।

এই নীতির স্বপক্ষে অনেক কথাই বলা যায়। একটি রাষ্ট্রের অধীনে যদি কয়েকটি জাতি বাস করে, তবে বিভিন্ন জাতিগত এবং সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে রাষ্ট্রের শান্তি নষ্ট হইতে পারে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঈর্ষার সৃষ্টি হইয়া রাষ্ট্রের উন্নতি ব্যাহত হইবে। কিন্তু যদি রাষ্ট্র একটি জাতির ভিত্তিতে সৃষ্ট হয় তবে এই সব বিঘ্ন দূর হইবে। প্রত্যেক জাতি আপনার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সংস্কৃতি এবং সভ্যতার উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে। দ্বিতীয়ত, একটি জাতি যদি একটি রাষ্ট্র গঠন করে তাহা হইলে শক্তিমান জাতি দুর্বল জাতির উপর অত্যাচার করিতে পারে না। অবনত জাতিরা স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

কিন্তু অনেক লেখক ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, একই রাষ্ট্রের অধীনে বহু জাতির বাস থাকিলে পরস্পরের মধ্যে মেলামেশা সহজ হয়। তাহার ফলে সকল জাতিই শক্তিমান হইয়া উঠে; পরস্পরের মিলনের ফলে প্রত্যেকের সংস্কৃতি নূতন জীবন লাভ করে। দ্বিতীয়ত, এই নীতি কার্যে পরিণত করিতে অনেকগুলি বাধা আছে। অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন জাতি এমনভাবে মিশিয়া আছে যে, তাহাদের আলাদা করিয়া স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব নহে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে চেকোস্লোভাকিয়া যখন স্বাধীনতালাভ করিল, তখন বহু জার্মান সে দেশে রহিয়া গেল। এই জন্য পরবর্তী কালে বহু গোলযোগ দেখা দিয়াছিল। ১৯৪৭ সালে হিন্দু ও মুসলমান ভিন্ন জাতি এই মতের ভিত্তিতে ভারত দ্বিখণ্ডিত করা হইয়াছে। কিন্তু বহু হিন্দু পাকিস্থানে ও বহু মুসলমান ভারতে রহিয়া গিয়াছে। তাহার ফলেও নানা অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। এক জাতি লইয়া এক রাষ্ট্র গঠন করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব নহে।

এই নীতি পরিপূর্ণভাবে কার্যে পরিণত করিলে বহু রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া গড়িতে হয়। সুইজারল্যাণ্ডকে ভাঙ্গিয়া তিনটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করিতে হইবে। বেলজিয়ামকে দ্বিধা বিভক্ত করিতে হইবে। ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সংখ্যা বাড়িবে। এতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি বজায় রাখা এক প্রকার অসম্ভব।

অতএব এক জাতির ভিত্তিতে আধুনিক রাষ্ট্রের গঠন করা সম্ভব নয়। ছোট ছোট জাতি একটি রাষ্ট্রের অধীনে থাকিলে লাভবান হইতে পারে। সোভিয়েট রাসিয়ার অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলি তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। প্রত্যেক জাতি শুধু এই দাবী করিতে পারে যে, তাহার ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিকশিত করিবার অধিকার তাহার থাকিবে।

জাতীয়তার অধিকার (Rights of Nationalities) : প্রত্যেক জাতিরই রাষ্ট্র গঠন করিবার অধিকার থাকিবে এ কথা সমর্থন করা যায় না। আদর্শ হিসাবে এই দাবী সব সময়ে মানিয়া লওয়া চলে না। বিভিন্ন জাতি যদি একই রাষ্ট্রের অধীনে বাস করে, তবে তাহা সমগ্র মানব জাতির পক্ষে কল্যাণকর হয়। যদি বহু জাতির সমন্বয়ে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয় তাহা হইলে প্রত্যেক জাতি শুধু এই দাবী করিতে পারে যে, তাহার আপন বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ বিকাশের পথে রাষ্ট্র কোন বাধা দিবে না। এই অধিকার রাজনৈতিক সাম্য হইতে উদ্ভূত। কোন জাতিরই ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য বিকাশের পথে কোন বাধা থাকা উচিত নয়। প্রত্যেক জাতির লোককে সমান ভোটাধিকার ও সরকারী কার্যে নিযুক্ত হইবার অধিকার দিতে হইবে। আপন আপন বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মের অনুষ্ঠানেও কোন বাধা থাকিবে না। প্রত্যেক জাতির শিশুদের নিজ নিজ ভাষায় শিক্ষা দিতে হইবে। রাষ্ট্রের কর্তব্য প্রত্যেক জাতির লোকের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রত্যেক স্কুলে অনুরূপ শিক্ষার প্রচলন করা। ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সরকারী অর্থ সকল জাতির মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করিয়া দিতে হইবে।

জাতীয়তাবাদ ও আধুনিক রাষ্ট্র : ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্বেকার একশত বৎসরকে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের যুগ বলা যাইতে পারে। বিরূপ সমালোচনা সত্বেও এই মত প্রচলিত হয় যে, একটি জাতি লইয়া একটি রাষ্ট্র গঠিত হইবে। বহু জাতির সমন্বয়ে যে সব রাষ্ট্র গঠিত তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হইত। পরাধীন জাতিরা স্বাধীনতা-সংগ্রামে লিপ্ত হইতে থাকে। এই জাতীয়তাবাদের প্রভাব সমসাময়িক রাষ্ট্রে অনেক পরিবর্তন আনিয়াছে।

বহু জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রগুলি একে একে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে গ্রীস এবং বলকান রাষ্ট্রগুলি স্বতন্ত্র হইয়া যায়। বিভিন্ন রাষ্ট্র

নূতন ভাবে সংগঠিত হইয়াছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উইলসন ঘোষণা করেন যে, প্রত্যেক পরাধীন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে। প্রথম যুদ্ধে পরাজিত রাষ্ট্রগুলি জাতীয়তার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত হয়। পোলাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি জাতিগুলি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইল।

উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদের প্রভাবে কয়েকটি সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয়। শক্তিমান জাতিরা দেশের উৎপন্ন বিক্রয়ের জন্য এবং বাড়তি জনসংখ্যার বসতির জন্য উপনিবেশ জয় করিতে আরম্ভ করে। এইভাবে জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হইল। বড় জাতিরা সমগ্র পৃথিবী জয়ের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। শক্তিমান জাতিদের মধ্যে বিরোধে বহুবার পৃথিবীর শান্তি নষ্ট হইয়াছে।

ফলে অনেক আধুনিক লেখকরা জাতীয়তাবাদের কুফলের প্রতি বেশী দৃষ্টি দিয়াছেন। অনুদার এবং উগ্র জাতীয়তাবাদ বহু বিপদের কারণ। গত দুইটি মহাযুদ্ধ এই উগ্র জাতীয়তাবাদের ফল। ফ্যাসিস্তবাদী গর্বিত জাতিগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্বল জাতিদের আক্রমণ করার ফলেই গত মহাযুদ্ধ বাধিয়াছিল। জাপানের উগ্র জাতীয়তাবাদের ফলে মাঞ্চুরিয়া এবং ইতালীর জাতীয়তাবাদে আবিসিনিয়া পর্যুদস্ত হয়।

আন্তর্জাতিকতা যে জাতীয়তাবাদ অপেক্ষা উন্নততর আদর্শ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ব্যক্তির স্বার্থ-সাধন অপেক্ষা সমাজের উন্নতির চেষ্টা ভাল। তেমনি কেবলমাত্র একটি বিশেষ লোকসমাজের জন্য আত্মনিয়োগ করা অপেক্ষা সমগ্র মানবসমাজের হিতসাধনের চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়। আন্তর্জাতিকতা প্রসার লাভ করিলে যুদ্ধ বাধিবার ভয় দূর হইবে, অকারণ নরহত্যা বন্ধ হইবে। অতএব সমস্ত মানবসমাজ লইয়া একটি রাষ্ট্র গঠন করা আমাদের সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

অবশ্য আন্তর্জাতিকতার অর্থ ইহা নহে যে, কোন পরাধীন জাতিই জাতীয়তার দাবীতে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিবে না; কিংবা কোন দেশের স্বাধীনতা লোপ হইয়া যাইবে। সমস্ত পরাধীন জাতিকে স্বাধীনতা দিতে হইবে। তাহা না হইলে আন্তর্জাতিকতা পরিহাসমাত্র থাকিয়া যাইবে। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রকে সমান বলিয়া গণ্য না করিলে পৃথিবীতে যুক্তরাষ্ট্র স্থাপিত হইবে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিভিন্ন শ্রেণীর সরকার

অরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ ঃ বহু লেখক বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্ট-গুলিকে তাহাদের প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ উহার মধ্যে প্রাচীনতম। তাঁহার মতে, দুইটি বিষয় দেখিয়া গভর্ণমেণ্টের শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম, গভর্ণমেণ্টের চরম ক্ষমতা কতজন লোকের উপর ন্যস্ত এবং দ্বিতীয়, গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য কি ?

দেশের শাসনক্ষমতা যদি একজনের হাতে থাকে, তাহা হইলে সেই গভর্ণমেণ্টকে রাজতন্ত্র (Monarchy) বলা যায়। যদি একাধিক কিন্তু অল্প-সংখ্যক লোকের হাতে ঐ ক্ষমতা থাকে, তবে তাহা অভিজাততন্ত্র (Aristo-cracy)। যদি বহুলোক শাসনক্ষমতার অধিকারী হয়, তবে তাহাকে পলিটি বলা হয়।

দ্বিতীয়ত, শাসনের ভালমন্দ দেখিয়াও শ্রেণীবিভাগ করা হয়। শাসনক্ষমতা যাহার বা যাহাদেরই হস্তে ন্যস্ত থাকুক না কেন, তাহা সকলের হিতার্থে পরিচালিত হইলে সেই গভর্ণমেণ্টকে ভাল এবং স্বাভাবিক বলা যায়। কিন্তু শাসনকর্তা বা কর্তারা যদি কেবলমাত্র নিজের স্বার্থ চিন্তা করিয়া ক্ষমতার ব্যবহার করেন, তবে সেই গভর্ণমেণ্টকে মন্দ বা কুশাসক আখ্যা দেওয়া হয়। শাসন-ক্ষমতা যদি একটি লোকের হাতে থাকে এবং তিনি কেবলমাত্র নিজের স্বার্থানু-যায়ী কাজ করেন তবে সেই শাসনকে বলা হয় স্বৈরাচারতন্ত্র (Tyranny)। ইহা রাজতন্ত্রের বিকৃতরূপ। তেমনি অভিজাততন্ত্রের বিকারকে বলা হয় ধনিকতন্ত্র (Oligarchy)। যখন কয়েকটি ধনীলোক নিজেদের স্বার্থসাধনের জন্য শাসন পরিচালনা করে, তাহার নাম ধনিকতন্ত্র। পলিটির বিকারকে তিনি আখ্যা দিয়াছেন গণতন্ত্র (Democracy)। আরিস্টটলের মতে গণতন্ত্রে সংখ্যা-গরিষ্ঠ গরীবের দল স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধনিকদের উপর অত্যাচার করে। ইহা নিকৃষ্ট শাসনতন্ত্রের পর্যায়ে পড়ে।

আরিস্টটলের উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ নানা দিক হইতে ত্রুটিপূর্ণ। আরিস্টটল

গণতন্ত্রকে নিকৃষ্ট বলিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে গণতন্ত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ শাসন-প্রণালী বলিয়া স্বীকৃত। আধুনিক যুগে প্রায় প্রত্যেক দেশের শাসনই মিশ্র ধরণের। কোন দেশেই অবিমিশ্র রাজতন্ত্র অথবা গণতান্ত্রিক শাসনের অস্তিত্ব নাই। বরং উভয়েরই কিছু কিছু অংশ লইয়া গঠিত। ইংলণ্ডে রাণী আছেন। আইনের চক্ষে তিনিই আজও সমস্ত ক্ষমতার মালিক। কিন্তু তাই বলিয়া ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালী অবিমিশ্র রাজতন্ত্র নহে। ইংলণ্ডের আসল ক্ষমতার অধিকারী জনসাধারণ। রাণী জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

আরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ

কাহার হাতে ক্ষমতা	সুশাসন (শাসন সকলের হিতার্থে)	কুশাসন (শাসকশ্রেণীর স্বার্থেই শাসনক্ষমতার প্রয়োগ)
একজন	রাজতন্ত্র	স্বৈরাচারতন্ত্র
একাধিক	অভিজাততন্ত্র	ধনিকতন্ত্র
বহু	পলিটি	গণতন্ত্র

আধুনিক শ্রেণীবিভাগ (Modern Classification) : বর্তমান-কালের লেখকগণ সোজাসুজিভাবে একটি শ্রেণীবিভাগ করেন, যথা একনায়কতন্ত্র এবং গণতন্ত্র।

একনায়কতন্ত্র বা ডিক্টেটরী শাসনে সমস্ত ক্ষমতা একজনের হাতে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল। বর্তমানে রাসিয়া, বুলগেরিয়া ও স্পেন একনায়কশাসিত দেশগুলির অন্যতম। একনায়কতন্ত্রে দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান নাও উঠাইয়া দেওয়া হইতে পারে। হিটলার রাইখস্টাগের সভা আহ্বান করিতেন। মাঝে মাঝে গণভোট গ্রহণ করিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া হিটলারী শাসনকে গণতন্ত্র বলা যায় না।

দেশের শাসনক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী যখন দেশের জনসাধারণ, তখন তাহাকে গণতন্ত্র বলে। ইংলণ্ড, আমেরিকা, ভারত, পাকিস্তান গণতান্ত্রিক দেশ। জনসাধারণের ইচ্ছায় ইহাদের শাসন পরিচালিত হয়।

বিভিন্ন দিক হইতে বিচার করিয়া গণতন্ত্রকেও আবার উপশ্রেণীবিভক্ত করা যায়।

কোন কোন গণতান্ত্রিক দেশে রাজা আছেন, কিন্তু রাজার হাতে প্রকৃত শাসনক্ষমতা নাই। তিনি নামেই মাত্র রাজা, শাসনক্ষমতা থাকে মন্ত্রীদের হাতে। মন্ত্রীরা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত ও তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী শাসন করেন। এই জাতীয় গণতন্ত্রকে **সীমাবদ্ধ অথবা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র** (Limited Monarchy) বলা হয়। অন্যান্য গণতান্ত্রিক শাসনকে সাধারণতন্ত্র অথবা রিপাবলিক বলা হয়। রিপাবলিকে কোন রাজা নাই। ভারত ও আমেরিকা সাধারণতন্ত্র। ভারতের রাষ্ট্রপতি জনসাধারণের প্রতিনিধিদের ভোটে নির্বাচিত।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কেন্দ্রীভূত অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয় এই দুই শ্রেণীর হইতে পারে। একক (Unitary) রাষ্ট্রে একটি গভর্ণমেণ্টের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া থাকে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠান হয়ত থাকিতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারই এই সব প্রতিষ্ঠানকে কতকগুলি বিশেষ কাজ করিবার ক্ষমতা দিয়া থাকে, এবং উহার অতিরিক্ত কিছু তাহারা করিতে পারে না। তাহারা সর্বপ্রকারে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। **কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে** (Federation) দুইটি শ্রেণীর সরকার থাকে। প্রত্যেক সরকারেরই কার্যক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট। আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকার আপনার সীমার মধ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করে। কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। ইংলণ্ডে একক শাসনতন্ত্র বহাল আছে; আমেরিকা, ভারত ও পাকিস্তান প্রত্যেকেরই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার।

শাসনকার্যের ভার দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার অথবা রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত থাকিতে পারে। আইনপরিষদের কর্তৃত্বাধীনে মন্ত্রীদের হাতে শাসনভার থাকে। মন্ত্রীরা আইনপরিষদের সদস্য এবং নিজেদের কাজ সম্বন্ধে তাহাদিগকে আইনপরিষদে জবাবদিহি করিতে হয়। ইহাকে **মন্ত্রিপরিষদের শাসন** (Cabinet System) বলা হয়। আইনপরিষদে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব গৃহীত হইলে মন্ত্রীদের পদত্যাগ করিতে হয়। তখন নূতন মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। ভারত ও ইংলণ্ডে এইরূপ শাসন প্রচলিত। **রাষ্ট্রপতির শাসনে** (Presidential System) রাষ্ট্রপতিই প্রধান কর্মকর্তা। তিনি জনসাধারণের ভোট দ্বারা নির্বাচিত হন ও সমস্ত শাসনক্ষমতা তাঁহার হস্তে ন্যস্ত। কিন্তু রাষ্ট্রপতি আইন-পরিষদের সভ্য নহেন। তাঁহাকে নিজের কর্মনীতির জন্য আইনপরিষদে কোন জবাবদিহি করিতে হয় না। জনসাধারণ তাঁহাকে নির্বাচন করে; জনসাধারণের কাছেই তাঁহার দায়িত্ব। আমেরিকার শাসনব্যবস্থা এইরূপ।

সরকারের শ্রেণীবিভাগে আধুনিক মত

গণতন্ত্র — ডিক্টেটরী

গণতন্ত্র: সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র — সাধারণতন্ত্র

(প্রধান কর্মকর্তা বংশানুক্রমিক অথবা তদনুযায়ী নির্বাচিত হয়)

একক — যুক্তরাষ্ট্রীয়

(সরকারের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত অথবা তদনুযায়ী বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারে বিভক্ত)

দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার শাসন — রাষ্ট্রপতির শাসন

রাজতন্ত্র (Monarchy) : এই শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা রাজার হস্তে ন্যস্ত। রাজতন্ত্র দুইপ্রকার—সীমাবদ্ধ এবং অসীম।

অসীম রাজতন্ত্রে (Absolute monarchy) রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক রাজা স্বয়ং। নিজের কাজের জন্য তাঁহাকে কাহারও নিকটে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। এই ধরণের রাজতন্ত্র আজকাল বিরল। আফগানিস্থানের রাজা ইহার একমাত্র দৃষ্টান্ত।

সীমাবদ্ধ অথবা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজা (Limited or Constitutional Monarchy) শুধু নামে দেশের কর্তা। তিনি রাজত্ব করেন, কিন্তু শাসন করেন না। প্রকৃত ক্ষমতা মন্ত্রীদের হাতে এবং তাঁহারা আইনপরিষদের নিকট দায়ী। এই কারণে রাজা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এই শ্রেণীর শাসনকে গণতন্ত্র বলা যায়।

অসীম রাজতন্ত্রে কয়েকটি সুবিধা আছে। ভাল রাজা হইলে তাঁহার শাসনব্যবস্থাও ভাল হইবে। যখন যেখানে যাহা দরকার, রাজা শীঘ্র তাহার ব্যবস্থা করিতে পারেন। লোকের অভাব-অভিযোগ দূর করিতে তিনি সর্বদা তৎপর। তিনি ভাল ভাল আইন প্রণয়ন করেন, অপ্রয়োজনীয় এবং খারাপ আইন বাতিল করিয়া দেন। ভাল লোককে যথাযোগ্য স্থানে নিয়োগ করেন। ফলে শাসনব্যবস্থা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে চলে। রামচন্দ্রকে এই দিক হইতে আদর্শ

পৌরাণিক রাজা বলা হয়। ইতিহাসে অশোক এবং আকবর এইরূপ রাজার সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

এইরূপ শাসনব্যবস্থার প্রচুর সমালোচনা করা যায়। রাজা যে ভালই হইবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। ইংলণ্ডের প্রথম চার্লসের মত অত্যাচারী কিংবা মাহমুদ তোগলোকের ন্যায় খামখেয়ালি রাজারও অভাব নাই। দ্বিতীয়ত, রাজা ভাল হইলেও এইরূপ শাসন বাঞ্ছনীয় নয়। হারুন-অল-রসিদের মত রাজা হয়ত সকলের ভাল করিতে পারে। কিন্তু রাজাই যদি সব কিছু করেন তবে জনসাধারণ নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিখে না। শিক্ষক যদি ছাত্রের সব অঙ্কই করিয়া দেয়, তবে ছাত্র কিছুই শিখিতে পারে না। রাজা প্রজার জন্য সব ব্যবস্থা করিলে প্রজা নিজে কিছু করিবার মত শিক্ষা পায় না। ইহার ফল ভাল নহে।

অভিজাততন্ত্র (Aristocracy) : ইংরাজিতে এই শাসনের নাম aristocracy। পূর্বে aristocracy বলিতে দেশের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ লোকের শাসন বুঝাইত। গ্রীক শব্দ aristos কথাটির অর্থ শ্রেষ্ঠ। ক্রমে ক্রমে তাহা হইতে অল্প কয়েকজনের শাসনকে অভিজাততন্ত্র বলা হয়।

গ্রীকরা মনে করিত, এইরূপ শাসনব্যবস্থাই সর্বাপেক্ষা ভাল। দেশের মধ্যে যাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ লোক তাহারা শাসন পরিচালনা করেন বলিয়া শাসন ভাল হইতে বাধ্য। সমস্ত পদে যোগ্যতম ব্যক্তি নিযুক্ত হয়। তাহারা ভাল আইন প্রণয়ন করে ; শাসনকার্য বিচক্ষণতার সহিত পরিচালিত হয়।

কিন্তু শ্রেষ্ঠ লোক কে ? অসুবিধা এইখানে। শ্রেষ্ঠ লোক বাছিয়া লইবার কোনও উপায় নাই, তাহা নির্ণয় করিবার মত কোন পরীক্ষার ব্যবস্থা নাই। অভিজাত-শাসনতন্ত্র ধনীদের দলের হাতে পড়িয়া প্রায়ই ধনিকতন্ত্রে পর্যবসিত হয়। তখন তাহারা নিজেদের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই চিন্তা করে না। শ্রেষ্ঠ লোক চিনিবার যদি কোন উপায় থাকিত, তবুও অভিজাততন্ত্র কাম্য হইত না। কারণ সাধারণ লোকের এই শাসনে কোনও হাত থাকে না। ফলে তাহাদের রাজনৈতিক শিক্ষালাভ হয় না। নাগরিকদের মানসিক বিকাশের পথ বন্ধ হইয়া যায়। আধুনিক জগতে গণতন্ত্রের পরিবর্তে অপর কোনও শাসন কল্পনা করা যায় না। কারণ একমাত্র গণতন্ত্রেই সাধারণ লোক নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে এবং নিজের সত্তার সম্যক্ বিকাশের পথ পায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র

আধুনিক যুগের শাসনতন্ত্রকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়—গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্র। দুইটিই অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বর্তমান কালে গণতন্ত্র অথবা একনায়কতন্ত্র লইয়া একটি জটিল সমস্যা দেখা দিয়াছে। এই পরিচ্ছেদে উভয়ের গুণাগুণ বিচার করা হইবে।

গণতন্ত্র (Democracy): আরিস্টটল গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়াছেন এইভাবে। দেশ শাসনের ক্ষমতা যখন এক বা কয়েকজন লোকের পরিবর্তে বহু লোকের হাতে থাকে, তখন তাহাকে গণতন্ত্র বলা হয়। আরিস্টটলের আমলে রাষ্ট্রের ভিত্তি দাসত্ব প্রথার উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। যাহারা ক্রীতদাস, শাসন-ব্যাপারে তাহাদের কোনও অধিকার ছিল না। আধুনিক কালে দাসত্বপ্রথা বিলোপের পরে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা আরও ব্যাপকভাবে ধরা হয়। যে শাসন-ব্যবস্থায় চরম ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে থাকে তাহাই গণতন্ত্র। অবশ্য জন-সাধারণ যে নিজেরাই শাসন করে তাহা নহে। কিন্তু দেশের শাসন ক্ষমতার উৎস তাহারাই। প্রেসিডেণ্ট লিনকন বলেন, "দেশের লোকের জন্য দেশবাসীদ্বারা দেশশাসনকে" গণতন্ত্র বলে।

গণতন্ত্রের অর্থ ইহা হইলেও কোন দেশেই সমস্ত লোককে শাসনকার্যের অধিকার দেওয়া হয় নাই। কিছুদিন পূর্বেও ইংলণ্ডে সাবালক মাত্রেরই ভোটাধিকার ছিল না। ফরাসী দেশে নারীর ভোটাধিকার ছিল না। তথাপি এই দুই দেশের শাসনকে গণতন্ত্র বলা হইত। দেশের সমস্ত ব্যাপারে জনসাধারণের ইচ্ছাই গ্রাহ্য হইবে এবং জনমত অনুযায়ী শাসন পরিচালিত হইবে,—ইহাই হইল গণতন্ত্রের মুখ্য লক্ষণ।

গণতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Democracy): দুই শ্রেণীর গণতন্ত্র আছে—এক প্রত্যক্ষ, অপর পরোক্ষ অথবা প্রতিনিধিমূলক। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে (Direct Democracy) জনসাধারণ নিজেরাই শাসন পরিচালনা করে। সমস্ত নাগরিক একত্র হইয়া আলোচনা ও ভোটদ্বারা স্থির করে কোন আইন চালু করা দরকার, অথবা রাষ্ট্রের কি কি বাবদ ব্যয় করা

প্রয়োজন। তাহারাই কর্মচারী নিয়োগ করে। গ্রীস দেশের নগর-রাষ্ট্রগুলিতে প্রাচীনকালে এই ধরণের শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। আরিস্টটল এইরূপ গণতন্ত্রের কথাই জানিতেন। রাষ্ট্রের আয়তন ছোট এবং জনসংখ্যা নিতান্ত কম হইলেই এইরূপ শাসনব্যবস্থা চলিতে পারে। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রের বিরাট আয়তন এবং জনসংখ্যার বাহুল্যের জন্য এই ব্যবস্থা অচল। একমাত্র সুইজারল্যাণ্ডের ছোট ছোট দুই চারিটি প্রদেশে (কাণ্টনে) এখনও এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা (Representative Democracy) প্রচলিত। এই ব্যবস্থায় জনসাধারণ নিজেরা শাসন পরিচালনা করে না। তাহারা নির্দিষ্ট সময় অন্তর কয়েকজন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করে। এই প্রতিনিধিরা আইনপরিষদে মিলিত হইয়া আইন পাস করে এবং কর্মকর্তাদের কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। জনসাধারণ এইভাবে পরোক্ষে প্রতিনিধিদের মারফতে দেশ শাসন করে। ইহাকে পরোক্ষ অথবা প্রতিনিধি-মূলক গণতন্ত্র বলা হয়। আধুনিক রাষ্ট্রের অগণিত জনসংখ্যার পক্ষে এই ধরণের গণতন্ত্রই উপযুক্ত।

প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি (Methods of Direct Democracy): আধুনিক গণতান্ত্রিক সমস্ত রাষ্ট্রই প্রতিনিধিমূলক। কিন্তু কিছুদিন হইল দেখা যাইতেছে যে, কোন কোন দেশের লোক প্রতিনিধিমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কার্যকলাপে সন্তুষ্ট নহে। প্রতিনিধিরা একবার নির্বাচিত হইলে জনসাধারণের কথা অনেক সময়েই মনে স্মরণ রাখে না। কাজেই এইসব দেশের গণতন্ত্রে কয়েকটি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে। এইগুলির নাম রেফারেণ্ডাম বা গণভোট, ইনিসিয়েটিভ বা গণ-উদ্যোগ এবং রিকল বা পুনর্নির্বাচন। এই তিনটি উপায়ে জনসাধারণ প্রতিনিধিদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। যে বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাহা প্রতিনিধিদের ক্ষমতার বাহিরে রাখা হয়। জনসাধারণ ভোট দিয়া সেই সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যদি জনসাধারণের মতামত জানা প্রয়োজন হয়, তবে গণভোটের ব্যবস্থা করা হয়। নির্দিষ্ট দিনে এই বিষয়টির খসড়ার উপর জনসাধারণের ভোট গ্রহণ করা হয়। অধিকাংশ ভোটদাতা সম্মতি

দিলে খসড়াটি আইন বলিয়া গণ্য হয়। অধিকাংশের অমত থাকিলে তাহা অগ্রাহ্য হয়। সুইজারল্যাণ্ড, ইতালী এবং আয়ারল্যাণ্ডের গঠনতন্ত্রে গণভোটের ব্যবস্থা আছে।

ভোটদাতাদের একটি নির্দিষ্টসংখ্যক লোক যদি কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা বাঞ্ছনীয় মনে করে, তবে তাহারা নিজেরা উদ্যোগী হইয়া ইহার খসড়া তৈয়ারী করে। খসড়াটি আইনপরিষদের নিকট প্রণয়নের জন্য প্রেরিত হয়। আইনপরিষদ সম্মতি না দিলে খসড়াটি সম্বন্ধে গণভোট গ্রহণ করা হয়। গণভোটে অধিকাংশ লোকের সমর্থন থাকিলে তাহা আইন বলিয়া গণ্য হয়। ইহাকে গণ-উদ্যোগ ব্যবস্থা বলে।

রিকল অথবা ডাকিয়া পাঠাইবার ব্যবস্থা নিম্নরূপ। জনসাধারণ যদি কোন প্রতিনিধি বা সরকারী কর্মচারীর কার্যে অসন্তুষ্ট হয়, তবে একটি নির্দিষ্টসংখ্যক ভোটদাতা দাবী করিলে, সেই প্রতিনিধি ও কর্মচারীকে পদত্যাগ করিতে, কিংবা পুনর্নির্বাচনের জন্য দাঁড়াইতে হইবে। যদি অধিকাংশ ভোটদাতা বিরুদ্ধে ভোট দেয়, তাহা হইলে সে পদত্যাগ করিতে বাধ্য। এই উপায়ে জনসাধারণ প্রতিনিধিদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ এবং অপ্রিয় প্রতিনিধি অথবা কর্মচারী পরিবর্তন করে।

গণতন্ত্রের গুণ (Merits of Democracy or Representative Democracy) : গণতন্ত্রের প্রধান গুণ হইতেছে এই যে, ইহা সাম্য এবং স্বাধীনতার ভিত্তিতে গঠিত। যে মতবাদ প্রচার করে যে—একদল লোক শাসন করিবার জন্য, আর সকলে শাসন মানিবার জন্য সৃষ্ট, গণতন্ত্র সেই মতের তীব্র বিরোধী। শ্রেণীধর্মনির্বিশেষে প্রত্যেক লোককে নিজের ক্ষমতার পূর্ণতম বিকাশের সুযোগদান একমাত্র গণতন্ত্রেই সম্ভব।

গণতন্ত্রের মূল কথা হইতেছে যে, রাষ্ট্র কাহারও বা কোন শ্রেণীর লোকের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। তাহার সহিত সকলের স্বার্থই জড়িত আছে। সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করে, তাহা প্রতিপদে সকলের জীবন প্রভাবিত করে। কাজেই সরকার কোন্ নীতি অনুসরণ করিয়া চলিবে, তাহা স্থির করিবার জন্য সকলের মতামত গ্রহণ করা উচিত। একমাত্র গণতন্ত্রেই সরকারী নীতি সকলের মতামত অনুসারে স্থির করা হয়।

গণতন্ত্রের আর একটি গুণ হইতেছে যে, ইহাতে প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের

স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষিত হইতে পারে। যদি কোন শ্রেণীর লোকের হস্তে ভোটদানের ক্ষমতা দেওয়া না থাকে, তবে তাহাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে। যাহাদের হাতে ক্ষমতা থাকে, তাহারা সেই ক্ষমতা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োগ করিবে, ইহাই স্বাভাবিক। সুতরাং জনসাধারণের হাতে রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা দিলেই সরকার দেশের সকলের স্বার্থ রক্ষা করিয়া চলিবে। অনেক সময়ে এইরূপ যুক্তি দেওয়া হয় যে, দেশের মধ্যে যাহারা বিজ্ঞ বা শিক্ষিত তাহারা জনসাধারণের স্বার্থ পূর্ণভাবে রক্ষা করিতে পারিবেন। কিন্তু এই যুক্তি ভিত্তিহীন। এই শ্রেণীর লোকের উদ্দেশ্য হয়ত সাধু হইতে পারে। কিন্তু জনসাধারণের প্রকৃত স্বার্থ তাহাদের পক্ষে বুঝা সম্ভব নহে। জুতার কোনখানে কাঁটা বেঁধে, তাহা যে জুতা পায়ে দেয় কেবল সেই জানে। এইজন্য অভিজাতশ্রেণীর লোকের পক্ষে জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ অনুভব করা কঠিন। তাহাদের যথেষ্ট সাধু অভিপ্রায় থাকিতে পারে, কিন্তু জনসাধারণের হস্তে শাসনক্ষমতা না থাকিলে তাহাদের স্বার্থ রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা কম।

গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠগুণ হইতেছে শিক্ষামূলক। জনসাধারণ যদি অনুভব করে যে, শাসন ব্যাপারে নীতি নির্দিষ্ট করিতে তাহাদের মতামতের মূল্য আছে, তবে রাজনৈতিক বিষয়ে তাহারা আরও মনোযোগী হইবে। ইহাতে সাধারণ লোকের দেশপ্রীতি বৃদ্ধি পায়। সরকার তাহাদের নিজেদেরই প্রতিষ্ঠান ও গভর্ণমেণ্ট তাহাদেরই স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য গঠিত। এই অনুভূতি হইতেই দেশপ্রেমও বৃদ্ধি পায়। কাজেই অন্যান্য শাসনব্যবস্থা অপেক্ষা গণতন্ত্রে বিপ্লব হইবার সম্ভাবনা কম। জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র অধিক স্থায়ী হয়।

ত্রুটি (Defects of democracy): অতি পুরাতন কাল হইতেই গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা হইয়াছে। গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটল ইহাকে সর্বনিকৃষ্ট শাসনতন্ত্র বলিয়াছেন। মহামতি কার্লাইল ইহাকে নির্বোধের রাজত্ব বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। সাধারণ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ করা হয়। প্রথমত, গণতন্ত্রে সাধারণ লোকের হস্তে রাজশক্তি ন্যস্ত থাকে। কিন্তু সাধারণ লোকের রাজনীতিজ্ঞান নাই, উপযুক্ত শিক্ষারও অভাব। আধুনিক সমাজের সমস্যা বুঝিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। সাধারণ লোক

অধিকাংশই নিষ্ক্রিয়। দেশের সমস্যা কি, তাহা তাহারা জানে না এবং জানিলেও তাহার ব্যবস্থা করিবার মত জ্ঞান বা চেষ্টা তাহাদের নাই। কাজেই গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্র কর্মকুশল নহে। সকলেই সমান, এই মতবাদের উপর গণতন্ত্র গঠিত। কাজেই সাধারণ লোক মনে করে যে বিশেষজ্ঞের কোন দরকার নাই ; সরকারী কর্মচারীদের বিশেষ কোন যোগ্যতা থাকা নিষ্প্রয়োজন। সকলেই সব কাজ করিতে পারে। কিন্তু শাসন পরিচালনা করিতে বিশেষ কুশলতা প্রয়োজন। সাধারণ লোককে শাসনের কাজে নিয়োগ করিলে কর্মকুশলতা হ্রাস পাইতে বাধ্য। তৃতীয়ত, গণতন্ত্রে নিয়মানুবর্তিতা অনেক কম। সকলেই মনে করে যে, সে স্বাধীন এবং কাহারও কথা মানিয়া চলিতে বাধ্য নয়। ফলে দেশে উচ্ছৃংখলতা বৃদ্ধি পায়।

অনেকে বলেন যে, গণতন্ত্র সাধারণের রাষ্ট্র হইলেও ইহাতে জনসাধারণের স্বার্থের দিকে মোটেই দৃষ্টি দেওয়া হয় না। গণতন্ত্রে দলগত শাসন চলে। অনেক সময়ে দলের নেতারা দলের স্বার্থরক্ষা করিতে গিয়া দেশের ও জনসাধারণের স্বার্থ বিসর্জন দেয়।

স্যার হেনরি মেইন বলেন যে—শিল্প, বিজ্ঞান এবং সাহিত্যপ্রসারে গণতন্ত্র সহায়ক হয় না। তাঁহার মতে অভিজাততন্ত্রে সাহিত্যের যেরূপ বিকাশ হইয়াছে, কোন গণতন্ত্রে তাহা হয় নাই।

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগ সব সময়ে সত্য নহে। সাধারণ ভোটদাতাকে অজ্ঞ মনে করা উচিত নহে। প্রত্যেক নির্বাচক-মণ্ডলীতে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ভিন্ন রকমের। কেহ কেহ হয়ত শাসন-ব্যাপারে উদাসীন। কিন্তু এমন লোকের অভাব নাই যাহারা বুদ্ধিমান এবং রাজনৈতিক বিষয়ে সচেতন। তাহাদের মতামতের প্রভাবে জনমত গড়িয়া উঠে। গণতন্ত্রকে অক্ষম মনে করিবারও কোন সংগত কারণ নাই। ফ্যাসিস্ট ইতালী অপেক্ষা গণতান্ত্রিক ব্রিটেনের শাসন কোনও অংশে কম কর্মকুশল ছিল না। বর্তমান যুগে গণতন্ত্র ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পন্থা নাই।

একনায়কতন্ত্র (Dictatorship) : এই শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা একজনের হাতে ন্যস্ত থাকে। এইরূপ শাসনপদ্ধতি অতি প্রাচীনকালেও ছিল। পুরাকালে অনেক সময়ে রাষ্ট্রনায়কেরা সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে নিজেদের ক্ষমতা

প্রতিষ্ঠিত করিত। কোন সেনানায়ক সেনাবাহিনীর সম্পূর্ণ সমর্থন লাভ করিলে, দেশের লোকের উপরে অনায়াসে আপনার কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে পারিত। নেপোলিয়নের শাসন এই ধরণের ছিল। বর্তমানে স্পেনে এই ধরণের রাষ্ট্র রহিয়াছে। আধুনিক কালে কোনও একটি দল দেশের শাসন ক্ষমতা সম্পূর্ণ হস্তগত করিতে পারিলে, সেই দলের নেতা সর্বাধিনায়ক হইয়া বসে। ফ্যাসিস্ট ও নাৎসী দলের নেতারা এইরূপ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ক্ষমতা হাতে আসিবার পর নেতা তাহার দলের সাহায্যে দেশ শাসন করে। অন্য বিরোধী দলকে জোর করিয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। এইসব ডিক্টেটারদের আদর্শ হইল "এক দেশ, এক জাতি, এক নেতা।" এই কারণে এই সব দেশকে 'সামগ্রিক' অথবা 'টোটালিটেরিয়ান' রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া হইত। নাগরিকদের সামগ্রিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের সর্বদিকে ও সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বিদ্যমান থাকে। জার্মানী ও ইতালী এইরূপ সামগ্রিক রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত ছিল।

সামগ্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ কি? এই রাষ্ট্রগুলি সাধারণত উগ্র জাতীয়তাবাদী। ইহাদের মধ্যে রাষ্ট্র সমাজসংহতির পূর্ণতম এবং শ্রেষ্ঠ রূপ। প্রত্যেক ব্যক্তি রাষ্ট্রের মধ্যেই নিজের পূর্ণবিকাশ লাভ করে ও রাষ্ট্রের বাহিরে তাহার কোনও প্রকার অস্তিত্ব নাই বলিলেও চলে। প্রত্যেককে সর্বতোভাবে রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে। প্রত্যেকটি লোক একইভাবে চিন্তা করিতে শিখিবে এবং প্রত্যেককে দলের তত্ত্ব শিখিতে হইবে। তাহারা সামরিক শিক্ষার উপরে বিশেষ জোর দেয়। মুসোলিনি বলিতেন, "মানুষের জীবন হইতেছে অন্তহীন সংগ্রাম এবং জাতির জীবনেও এই অন্তহীন সংগ্রাম চলিয়া থাকে।" সুতরাং তিনি শান্তিবাদীদের বিদ্রূপ করিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহের আদর্শ প্রচার করিতেন। স্বৈরাচারী শাসন সাধারণত সাম্রাজ্যবাদী। হিটলার সর্বদাই 'লেবেনস্রাউম' বা বাঁচিবার মত স্থানের দাবী করিতেন, মুসোলিনি এবিসিনিয়ায় রোমসাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত আদর্শের সহিত গণতন্ত্রের আদর্শের মৌলিক পার্থক্য আছে। গণতন্ত্র একথা স্বীকার করে না যে, ব্যক্তিকে সর্বতোভাবে রাষ্ট্রের অধীন হইতে হইবে। রাষ্ট্রই চরম কাম্য নহে। মানব-কল্যাণ সাধন করিবার জন্য রাষ্ট্র একটি উপায়মাত্র। রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি নয়, ব্যক্তির জন্যই রাষ্ট্র। দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্রে মতের বিভিন্নতা সহ্য করা হয়। গণতন্ত্রে বিভিন্ন দলগঠন সমর্থন করা

হয় এবং জনসাধারণকে বক্তৃতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া হয়। দলের কোন নেতাকে দেবতার সমপর্যায়ে দাঁড় করানো গণতন্ত্রের আদর্শ নহে। দেশের সমস্ত লোকে একটি মত এবং একদল মানিয়া চলিবে, গণতন্ত্র কখনও তাহা বলে না। তৃতীয়ত, গণতন্ত্র শান্তিবাদী। দেশের ভিতরে অথবা বাহিরে কোন রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানকল্পে পাশবিক শক্তি প্রয়োগ করা গণতন্ত্রের অভিপ্রেত নয়। লাঠ্যৌষধি প্রয়োগে যে সকল রোগ নিরাময় হয়, ইহা গণতন্ত্র বিশ্বাস করে না। নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তি গণতন্ত্রে বড় করিয়া দেখা হয়। সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধান কল্পে মারামারি-কাটাকাটি না করিয়া ধীরভাবে আলোচনাই গণতন্ত্রের পথ।

একনায়কতন্ত্রের গুণাগুণ (Merits and Demerits) : একনায়কতন্ত্রের দুইটি বিশেষ গুণ আছে বলিয়া দাবী করা হয়। গণতান্ত্রিক শাসনে কোন কাজ করিতে গেলে বহু সময় এবং আলোচনা প্রয়োজন। সেখানে সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কাজ করিতে হয়। একনায়কতন্ত্রে সরকারী কাজ অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়। ডিক্টেটরকে কাহারও সহিত আলোচনা করিতে হয় না। অন্য পাঁচজনের মত জানিবার জন্য সময় নষ্ট করিতে হয় না। কাজেই তাহার পক্ষে যত দ্রুত কাজ করা সম্ভব গণতন্ত্রে তাহা সম্ভব নহে। আধুনিক অর্থনৈতিক অবস্থার জটিলতায় এবং জরুরী অবস্থা উপস্থিত হইলে ডিক্টেটর সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্রের মূল কথা হইল যে, সাধারণ লোক বুদ্ধিমান ও সে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যাপার যথেষ্ট বোঝে। কিন্তু বাস্তবিক সাধারণ লোক অত্যন্ত অজ্ঞ। সাধারণ লোকের স্বাধীনতার কোনও প্রয়োজন নাই। তাহাদের প্রয়োজন এমন নেতার, যিনি শুধু বাক্যজাল বিস্তার করিবেন না। যতশীঘ্র সম্ভব যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। একনায়কের উদ্দেশ্য যদি সাধু হয়, তবে সে দেশের শাসন ভালভাবেই পরিচালিত হইবে। ডিক্টেটর পুরাতন আইন সংশোধন করিয়া ভাল আইন প্রণয়ন করিবে। সরকারী কাজে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত লোক নিয়োগ করিবে। তাহা হইলে সকলেই সুখে শান্তিতে বাস করিতে পারিবে।

কিন্তু একনায়কতন্ত্রের প্রধান ত্রুটি হইতেছে যে, ইহা সাধারণ লোকের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়। নেতাকে বাহবা দেওয়া ও তাহার আদেশে কামানের গুলির সম্মুখে ঝাঁপাইয়া পড়া ব্যতীত সাধারণ লোকের

শাসন-ব্যাপারে আর কিছুই করণীয় থাকে না। নেতাই সব কিছু ভাবিয়া দেখিবেন, সকল কাজ করিবেন। বাপ-মা ছেলের সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করিয়া দিলে ছেলের অবস্থা যাহা দাঁড়ায়, সাধারণ লোকের অবস্থাও সেইরূপ হইবে। কোন কিছু নিজে নিজে করিবার ক্ষমতা তাহাদের লোপ পাইবে। এমন হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয় যে, দেশপ্রেম তাহাদের মন হইতে লোপ পাইবে। বহুদিন পূর্বে ইংরাজ দার্শনিক মিল বলিয়াছিলেন যে, একনায়কতন্ত্রে একমাত্র দেশপ্রেমিক হইতেছে ডিক্টেটর। ডিক্টেটরেরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য চাহে না; বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনপ্রণালী এবং মতামতের বৈচিত্র্য থাকুক, ইহা ডিক্টেটরের কাম্য নহে। মানুষকে তাহারা একই ছাঁচে ঢালিয়া কলের পুতুল বানাইয়া তুলিতে চায়।

একনায়কতন্ত্র অপেক্ষা গণতন্ত্র কোন অংশেই কম কর্মকুশল নহে। গত মহাযুদ্ধে গণতন্ত্রেরই জয় হইয়াছে, একনায়কতন্ত্রের শাসনের পরাজয় হইয়াছে। স্বৈরাচারতন্ত্রের কোন ভিত্তি নাই। একজন ডিক্টেটরের পরে যদি আর একজন ঠিক সমান কার্যক্ষম ডিক্টেটর না পাওয়া যায়, তবে তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহার শাসনও শেষ হইবে। এইজন্য স্বৈরাচারী শাসন কখনও স্থায়ী হয় না। গণতন্ত্রের হয়ত অনেক ত্রুটি আছে। কিন্তু আধুনিক জগতে গণতন্ত্রের পরিবর্তে অন্য শাসন স্থাপন করা সম্ভব নহে। মানবজাতির সকল আশা আকাংখা গণতন্ত্রের সহিত জড়িত।

গণতন্ত্র কার্যকরী করিবার উপায় (Conditions for the success of democracy): গণতন্ত্রই যদি শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা হয়, তবে গত যুদ্ধের পূর্বে ইয়োরোপের অধিকাংশ দেশে গণতন্ত্র কেন পরিত্যক্ত হইয়াছিল? গণতন্ত্র সার্থক করিতে হইলে কয়েকটি ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ইংরাজ দার্শনিক মিল তিনটি ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন। প্রথমত, সেই দেশের লোককে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র হইতে হইবে এবং গণতান্ত্রিক শাসন পরিচালনা করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা অর্জন করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, নিজেদের স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে তাহাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইবে। গণতন্ত্র আক্রান্ত হইলে তাহা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। অবহেলায় অথবা হঠাৎ ভীত হইয়া গণতন্ত্র বিসর্জন দিলে চলিবে না। জনসাধারণের ঔদাসীন্য এবং গণতন্ত্রের

জন্য সংগ্রামবিমুখতার ফলে ইতালী এবং জার্মানীতে একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল। তৃতীয়ত, প্রত্যেক নাগরিককে নিজ নিজ কর্তব্য পালনে অবহিত থাকিতে হইবে। সদুপায়ে ভোট দিয়া শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। সর্বসাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে জনসাধারণের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। জীবিকানির্বাহ করিবার মত উপযুক্ত কাজ পাইবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের আছে। রাষ্ট্রকে এই অধিকার রক্ষা করিতে হইবে ও দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, যাহাতে প্রত্যেক নাগরিক যথোপযুক্ত কাজ এবং মজুরী পাইতে পারে। বেকার হইয়া পড়িবার ভয় দূর করিবার ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে করিতে হইবে। যে বেকার এবং আহার্য সংগ্রহ করিতে পারে না, তাহার কাছে স্বাধীনতা অর্থহীন। যে তাহাকে কাজ এবং আহার্য দিবার প্রতিশ্রুতি দিবে, সে তাহারই অনুসরণ করিবে। কাজেই এমন একটি সমাজব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে হইবে, সেখানে অর্থনৈতিক অসাম্য যেন বেশী না থাকে। অর্থনৈতিক অসাম্য বজায় থাকিলে গণতন্ত্রও ক্রমে লোপ পাইবে।

গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য শিক্ষাবিস্তার নিতান্ত প্রয়োজন। এইজন্য আরিস্টটল রাষ্ট্র কর্তৃক শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার মতে প্রত্যেক নাগরিককে রাষ্ট্রের আদর্শ অনুসারে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। নাগরিকের উপরে কি কি দায়িত্ব আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে, সে শিক্ষা নাগরিকের থাকিলে তবে গণতন্ত্র সফল হইতে পারে।

একথা স্বীকার্য যে, আধুনিক কালের নানারূপ জটিল সমস্যার সমাধান গণতান্ত্রিক অনেক রাষ্ট্রেই সম্ভব হয় নাই। তাই বলিয়া গণতন্ত্র বর্জন করিয়া একনায়কতন্ত্রের আশ্রয় লইতে হইবে, ইহার চেয়ে ভুল আর কিছু নাই। গণতন্ত্রের অনেক নিন্দনীয় বিষয় আছে বলিয়া, আমরা ইহার গুণাবলী ভুলিয়া যাইতে পারি না। গণতন্ত্রের দোষ আছে বলিয়া অধিক দোষদুষ্ট একনায়কতন্ত্র গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অন্যান্য শাসনপ্রণালী

গণতান্ত্রিক শাসন—একক এবং যুক্তরাষ্ট্র, এই দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই শ্রেণীবিভাগ এবং অন্যান্য শ্রেণীগুলি বর্তমান পরিচ্ছেদে আলোচিত হইবে।

একক শাসন (Unitary Government): যখন দেশের সকল ক্ষমতা একটি মাত্র গভর্ণমেণ্টের হাতে থাকে, তখন তাহাকে একক বা কেন্দ্রীভূত শাসন বলে। রাজধানীতে যে গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহাই সমগ্র দেশের শাসন পরিচালনা করে। দেশের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে পৌরসভা প্রভৃতির স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান থাকিতে পারে। কিন্তু এই সব প্রতিষ্ঠানের স্বাধীন কোন ক্ষমতা থাকে না। ইহাদের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট হইতে লব্ধ। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট আপনার ক্ষমতার কিছু অংশ ইহাদের হাতে ছাড়িয়া দেয়। ইংলণ্ডে একক শাসন আছে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ভারতবর্ষেও এইরূপ শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

এই ধরণের গভর্ণমেণ্টের অনেক সুবিধা আছে। এইরূপ শাসনব্যবস্থায় দেশের সর্বত্র একই ধরণের শাসন এবং একই আইন প্রচলিত থাকে। ফলে ইহাতে অনেক সুবিধা হয়। কিন্তু এইরূপ শাসনব্যবস্থা সব সময়ে সুবিধাজনক হয় না। একটি বিরাট দেশের সর্বস্থানে ও সর্ববিষয়ে দৃষ্টি রাখা একটি গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব নহে। একটি গভর্ণমেণ্টকে সব দিকের শাসন চালাইতে হইলে অনেক কাজ তাহার পক্ষে করা আদৌ সম্ভব হইবে না। ফলে দেশের লোকের ক্ষতি হইবে। একটি সরকারই যদি দেশের সব কাজ করিতে চায়, তবে কোন কাজই সে ভালভাবে করিতে পারে না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা (Federal Government): যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না হইয়া কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক অনেকগুলি গভর্ণমেণ্টের মধ্যে বিভক্ত থাকে। এই গভর্ণমেণ্টগুলির প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট এবং কেহই অন্যের কার্যক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রে দুই শ্রেণীর গভর্ণমেণ্ট থাকে—কেন্দ্রীয়, বা যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং কয়েকটি আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট। এই দুই শ্রেণীর গভর্ণমেণ্টের কার্যক্ষেত্র

ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। যে সমস্ত বিষয়ের সহিত সমস্ত অঞ্চলগুলির সাধারণ স্বার্থজড়িত তাহাদের শাসনভার যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেক অঞ্চলের বিশেষ স্বার্থজড়িত বিষয়গুলির ভার সবই প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এইভাবে গঠিত হইয়াছিল। যে সকল উপনিবেশ ব্রিটেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া সফল হইয়াছিল, তাহারা নিজেদের কিছু কিছু ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ছাড়িয়া দিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত করে। কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রদেশগুলি নিজেদের ক্ষমতার কিছু কিছু কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের হাতে ছাড়িয়া দেয়। প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টই নিজের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক গভর্ণমেণ্ট কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অধীন নহে।

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of a federation): যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকিবে। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রে দুই শ্রেণীর গভর্ণমেণ্ট থাকে। কেন্দ্রীয় অথবা যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্ট এবং অপরগুলি হইল প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক গভর্ণমেণ্ট। দুই গভর্ণমেণ্টই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে স্বাধীন, একে অন্যের কার্যক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, দেশের সংবিধানে প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কার্যক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট থাকিবে। সাধারণত, দেশরক্ষা, মুদ্রা, ডাকবিভাগ, ব্যাংক প্রভৃতি বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অধীনে থাকে। কারণ এইগুলি সাধারণ বিষয় ও দেশের সমস্ত অঞ্চলের সমান স্বার্থ এইগুলির সহিত জড়িত। যেগুলি নিতান্তই স্থানীয় বিষয় তাহা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের হাতে থাকে।

তৃতীয়ত, প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কর্মক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করিতে হইলে, রাষ্ট্রের সংবিধানে লিখিত হওয়া প্রয়োজন। সংবিধানে লিখিত না হইলে কাহার কতটুকু ক্ষমতা ইহা লইয়া কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের মধ্যে বিবাদ বাধিতে পারে।

চতুর্থত, দুই গভর্ণমেণ্টের কার্যক্ষেত্র কাগজে-কলমে ভাগ করিয়া দেওয়া হইলেও তাহাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে। এই বিরোধ মীমাংসা করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় স্থাপন করা হয়। এই বিচারালয়ের প্রধান কাজ হইতেছে সংবিধান বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করা। দুই গভর্ণমেণ্টের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা এই বিচারালয়ে হইবে।

পঞ্চমত, যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিককে দুইটি গভর্ণমেণ্ট মানিয়া চলিতে হইবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্ট যে আইন পাস করিবে এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট যাহা পাস করিবে, দুই প্রকারের আইনই প্রত্যেক নাগরিককে মানিতে হইবে। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের লোককে প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় আইন মানিয়া চলিতে হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রগুলিকে ক্ষমতাবিভাগের ধরণ লইয়া দুই শ্রেণীভুক্ত করা হয়। একটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অপরটি কানাডার যুক্তরাষ্ট্র। আমেরিকার কয়েকটি নির্দিষ্ট বিভাগ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অধীনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য সব বিষয়গুলির ভার প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের হাতে। অর্থাৎ অবশিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী আঞ্চলিক গভর্ণমেণ্টগুলি। কানাডার কয়েকটি বিশেষ বিভাগ মাত্র প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে দেওয়া হইয়াছে। অপর সমস্ত বিভাগ এবং কার্যাদি যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক পরিচালিত হয়। অর্থাৎ অবশিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট। ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্র দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত।

গুণ (Merits of federation): বৃহৎ দেশ শাসন করিবার পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র খুব কার্যকরী। বড় দেশের প্রত্যেক প্রান্তের প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করা একটি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব নহে। সব কাজ করিতে গিয়া অনেক কাজই সন্তোষজনকভাবে করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। যুক্তরাষ্ট্রে এই অসুবিধা দূর হয়। যে সব সাধারণ বিষয়গুলির সম্বন্ধে দেশের সবত্র একই ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্ট সেই গুলি করিয়া থাকে। নিজ নিজ প্রদেশের সীমানায় যাহা কিছু করা প্রয়োজন, তাহা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট করিয়া থাকে। দুই গভর্ণমেণ্টের কোনটি সাধ্যাতিরিক্ত কিছু করিতে চেষ্টা করে না। কোন গভর্ণমেণ্টের উপরেই বহু কাজের চাপ পড়ে না। রাজনীতির ক্ষেত্রে শ্রম বিভাগ বলিতে যাহা বুঝায় যুক্তরাষ্ট্রে তাহা কার্যত সম্ভব হয়। আঞ্চলিক স্বাধীনতার সহিত জাতীয় ঐক্যের সঙ্গতি রক্ষা করা একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রে সম্ভব।

একক কেন্দ্রীভূত শাসনে দেশের সব অঞ্চলের জন্য একই আইন পাস করা হয়। কিন্তু দেশের বিভিন্ন অংশের সমস্যা ভিন্ন রকম হইতে পারে। কাজেই একই আইন সর্বত্র প্রযুক্ত হইলে অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা। বাংলা দেশের

সমস্যা বিহার অথবা আসাম হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে। দিল্লী অনেক দূরে। দিল্লীর গভর্ণমেণ্ট স্থানীয় অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত না হইতেও পারে। ১৯৪২ সালের দুর্ভিক্ষের খবর কলিকাতার কাগজে প্রকাশিত হইলে, দিল্লীর সরকার তাহাকে "অতিরিক্ত নাটুকে বিবরণ" আখ্যা দিয়াছিল। লোক অনাহারে পথে মরিতেছিল, কিন্তু দিল্লীর সরকার কিছুদিন পর্যন্ত একটি অঙ্গুলিও উত্তোলন করে নাই। ঠিক এতটা না হইলেও, এই ধরণের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাব কেন্দ্রীয় সরকারে থাকিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রাদেশিক সরকার নিজ নিজ অঞ্চলের প্রয়োজনমত আইন পাস করিতে পারে।

কেন্দ্রীভূত শাসন অপেক্ষা যুক্তরাষ্ট্রে জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষা লাভের সুযোগ বেশী। তাহারা প্রাদেশিক সরকারের শাসন ব্যাপারে যোগ দিলে রাজনীতি সম্বন্ধে তাহাদের উৎসাহ বর্ধিত হয়। নাগরিকদের কর্তব্য সম্বন্ধে তাহারা অধিক মাত্রায় অবহিত হয়।

ভারতবর্ষের মত দেশে, যেখানে প্রাদেশিক বৈচিত্র এবং ভাষাগত প্রভেদ এত বেশী, সেখানে যুক্তরাষ্ট্র হইতে অপর কোন প্রকার শাসনব্যবস্থা কল্পনাই করা যায় না। আধুনিক কালে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার কথাটি খুবই উল্লেখ করা হয়। ভারতবর্ষের মত বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে এই নীতি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। জাতীয় ঐক্য ব্যাহত না করিয়া যদি কোন শাসনব্যবস্থা প্রচলন করিতে হয়, তবে তাহা একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের নীতি গ্রহণ করিলে সম্ভব হয়। রাসিয়াতে এই নীতির সফল প্রয়োগ আমরা দেখিয়াছি।

ত্রুটি (Defects of federation) : যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি বড় ত্রুটি আছে। দেশে অনেকগুলি গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত করিতে হয়। ফলে শাসনব্যয় অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। একক শাসনব্যবস্থায় ব্যয় কম হইবে।

দুইটি স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করায় শাসন ব্যাপারে নানারূপ জটিলতা দেখা দিতে পারে। ভারতবর্ষে রাজ্যসরকারগুলি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থানুযায়ী বিক্রয়কর ধার্য করিয়াছে। তাহার ফলে ব্যবসায়ীদের নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে শাসনের দায়িত্ব দুইটি গভর্ণমেণ্টের মধ্যে বিভক্ত। দায়িত্ব ভাগ করিয়া দেওয়ার অর্থই হইল দায়িত্ব কিছু কিছু লোপ করা। কোন নূতন পরিস্থিতি উপস্থিত হইলে প্রত্যেক গভর্ণমেণ্ট আপন দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে

চাপাইবার চেষ্টা করিবে। ১৯৪২ সালে ভারতবর্ষে ঠিক এই অবস্থা হইয়াছিল। বাংলা দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছিল। আবার প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাড়ে দোষ চাপায়। কিন্তু ইতিমধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক না খাইয়া মারা পড়ে।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টই দুর্বল হইতে বাধ্য। কারণ প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টেরই ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। শাসনের বিষয়গুলির উপর কাহারও সর্বময় প্রভুত্ব নাই। ফলে দুই গভর্ণমেণ্টই দুবল। আন্তর্জাতিক এবং আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে এই দুর্বলতা অধিক মাত্রায় দেখা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্টে সর্বদাই একটা ভয় থাকে। কয়েকটি রাষ্ট্র একত্রিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্র পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিতে পারে। তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয় সর্বদাই থাকে।

এই সব ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ক্রমশঃই বিভিন্ন দেশে গৃহীত হইতেছে। একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই বিশিষ্ট বিষয়গুলিতে কেন্দ্রীভূত শাসন ও অন্যান্য বিভাগে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা সম্ভব হয়। কোনও কোনও লেখক একথা বলেন যে, সমস্ত পৃথিবী একসময় যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ হইবে। জাতীয়তাবাদের সহিত আন্তর্জাতিকতার বিরোধ দূর করিতে পারা যুক্তরাষ্ট্রেরই সম্ভব।

মন্ত্রিপরিষদ ও রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থা

মন্ত্রিপরিষদের শাসনব্যবস্থা (Cabinet system): যখন দেশের শাসনক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকে তাহাকে মন্ত্রিপরিষদের শাসনব্যবস্থা বলা হয়। মন্ত্রীরা সাধারণত আইনপরিষদের সভ্য। ব্যক্তিগতভাবে এবং যুক্তভাবে তাহারা নিজেদের কাজের জন্য আইনপরিষদের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য। আইনপরিষদে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব পাস হইলে তাঁহারা পদত্যাগ করেন। যাঁহাদের উপরে আইনপরিষদের সভ্যদের অধিকাংশের বিশ্বাস আছে, তাঁহারা নূতন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন, এইজন্য ইহাকে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থাও (Responsible Government) বলা হয়। আইনপরিষদের সভ্যদের অধিকাংশ যে দলের আনুগত্য স্বীকার করে তাহার নেতাদের লইয়াই মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। একজন মন্ত্রীর অধীনে এক বা একাধিক বিভাগ

দেওয়া হয়। মন্ত্রিপরিষদের উপরে একজন রাজা বা রাষ্ট্রপতি থাকিতে পারেন, কিন্তু শাসন-ব্যাপারে তিনি হস্তক্ষেপ করেন না। গ্রেট ব্রিটেন ও তাহার ডোমিনিয়নগুলিতে এই ধরণের শাসন প্রচলিত। ভারতের শাসনতন্ত্রও এই ধরণে গঠিত। মন্ত্রীরা আইনপরিষদের নিকট দায়ী বলিয়া এইরূপ শাসনকে "ক্যাবিনেট বা পার্লামেণ্টারি" শাসনপদ্ধতিও বলা হয়।

গুণাগুণ (Merits of Cabinet system) : এই পদ্ধতির একটা প্রধান গুণ হইতেছে যে, শাসনকর্তা এবং আইনপরিষদের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। মন্ত্রীরা শাসন পরিচালনা করেন। তাঁহারা আইনপরিষদের সভ্য। তাঁহারা যতদিন আইনপরিষদের সমর্থন লাভ করিতে পারেন, ততদিনই মন্ত্রী থাকেন। কাজেই মন্ত্রীদের পক্ষে স্বেচ্ছাচারী হওয়া সম্ভব নহে। দ্বিতীয়ত, শাসনব্যবস্থা তাঁহাদের হাতে থাকাতে, তাঁহারা বুঝিতে পারেন কিরূপ আইন দেশে প্রয়োজন। আইনপরিষদে তাঁহারা সেই আইন পেশ কবেন। আইন-পরিষদে মন্ত্রীদের সমর্থন আছে বলিয়া, এই আইন পাস হইয়া যায়। এইজন্য আইনপরিষদ এবং শাসনকর্তাদের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ বাধিতে পারে না।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকই এই পদ্ধতির শাসন পচ্ছন্দ করে। কিন্তু ইহার যে ত্রুটি আছে, সে সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। মন্ত্রিপরিষদ অনেক মন্ত্রী লইয়া গঠিত হয়। অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়। জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে যখন সংহত এবং দ্রুত কাজ করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তখন এই ব্যবস্থায় অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে। মন্ত্রীদের হয়ত এই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকিতে পারে। ফলে একমত হইয়া কোন কাজ করা এবং কোন দ্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব হইবে। একজন লোকের হাতে ক্ষমতা থাকিলে, তিনি যাহা হয় স্থির করিয়া কাজ করিতে পারেন। যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইলে মন্ত্রিপরিষদের শাসন রাষ্ট্রপতির শাসন অপেক্ষা কার্যকরী নাও হইতে পারে। অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গত দুইটি বিশ্বযুদ্ধে ইংলণ্ড মন্ত্রিপরিষদের শাসনে থাকা সত্ত্বেও জয়লাভ করিয়াছে।

রাষ্ট্রপতিশাসন (Presidential system) : রাষ্ট্রপতির বা "প্রেসিডেন্সিয়াল" শাসনপদ্ধতিতে শাসন-ক্ষমতা একজনের হাতে থাকে। তিনি রাষ্ট্রপতি নামে পরিচিত। তিনি সাধারণের ভোট দ্বারা নির্বাচিত ও কয়েক বৎসর ধরিয়া শাসন কার্য পরিচালনা করেন। রাষ্ট্রপতি আইনপরিষদের সভ্য

নহেন। তাঁহাকে নিজের কাজের জন্য আইনপরিষদে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। আইনপরিষদ অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণ করিলেও রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করিতে বাধ্য নহেন। কাজের সুবিধার জন্য রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু মন্ত্রিরা আইন পরিষদের সভ্য নহেন, বা পরিষদের নিকট দায়ী নহেন।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। প্রতি চার বৎসর পর পর জনসাধারণ ভোট দিয়া একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের সভায় যোগ দেন না।

গুণাগুণ (Merits of Presidential system): কোন জরুরী অবস্থা উপস্থিত হইলে এই পদ্ধতির শাসন খুবই কার্যকরী। সমস্ত শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে থাকে। তাঁহাকে অনেক লোকের সহিত আলোচনা করিতে হয় না। কাজেই কোনও একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে তাঁহার সময় নষ্ট হয় না। যুদ্ধবিগ্রহের মত জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি তাড়াতাড়ি কাজ করিতে পারে।

যে কয় বৎসরের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন, সেই কয় বৎসর তাঁহাকে গদি হইতে সরানো যায় না। কাজেই কয়েক বৎসর একাদিক্রমে একই পন্থা অনুসরণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ইহা বিশেষ কার্যকরী হয়।

কিন্তু মন্ত্রিপরিষদের পরিবর্তন অল্প সময় অন্তর হইতে পারে। ফলে সরকারীনীতির ঘন ঘন পরিবর্তনে শাসনে অব্যবস্থা হইতে পারে। রাষ্ট্রপতিশাসন এই দিক দিয়া শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু এইরূপ শাসন ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহাতে শাসনকর্তা এবং আইনপরিষদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে। আইনপরিষদ রাষ্ট্রপতিকে পছন্দ না করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি যে দলের লোক, তাহার বিপরীত দল হইতে অধিক সংখ্যায় আইনপরিষদে নির্বাচিত হইতে পারে। তখন একে অপরকে দাবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে। ফলে রাষ্ট্রের শাসনকর্তা এবং আইনপরিষদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিতে বাধ্য। এই সংঘর্ষ দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হয়ত রিপাবলিক্যান দলের লোক। কিন্তু কংগ্রেসে যদি ডেমোক্রেটিক দলের প্রাধান্য থাকে, তবে রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হইবে। ফলে শাসনকার্যে ও আইন প্রণয়নে বিশৃংখলা উপস্থিত হইবে।

নবম পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্রের কার্যাবলী

রাষ্ট্রের কি কি কাজ করা উচিত? এই বিষয়ে সকল লেখক একমত নহে। রাষ্ট্রের কার্যাবলী কি হওয়া উচিত এই সম্বন্ধে অন্তত দুইটি সুস্পষ্ট মত আছে। একদল লোক বলেন যে, রাষ্ট্রের কার্যাবলী যত কম হইবে ততই ভাল। এই দলকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বলা হয়। আবার আর একদল আছেন যাঁহারা বলেন যে, নাগরিকদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধনই রাষ্ট্রের কার্য। সুতরাং রাষ্ট্রের কাজ সীমাবদ্ধ নহে, বহু বিস্তৃত। এই মতবাদকে সমাজতন্ত্রবাদ বলে। এই দুইটি মতের সত্যাসত্য নির্ধারণ করিয়া রাষ্ট্রের কার্যক্রম কি হওয়া উচিত তাহা স্থির করা যাইতে পারে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism) : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে রাষ্ট্রের কার্যাবলী যতদূর সম্ভব সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। এখন প্রশ্ন হইতেছে, কেন কার্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করা হইবে এবং সর্বনিম্ন কার্যক্রমই বা কি হওয়া উচিত?

স্বাতন্ত্র্যবাদীরা নানা কারণে রাষ্ট্রের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখিতে চায়। তাহাদের মতে রাষ্ট্র কাহারও ভাল করিতে পারে না। তথাপি ইহার প্রয়োজন রহিয়াছে। কারণ মানুষ স্বার্থপর। তাহার প্রকৃতিতে অনেক গলদ রহিয়াছে। এইজন্য পৃথিবীতে নানা প্রকারের অন্যায় কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এইসব অন্যায় আচরণ প্রতিরোধ করিতে এবং মানুষের জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষা করিতে রাষ্ট্রের প্রয়োজন আছে। কিন্তু রাষ্ট্রের ভাল করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া যত কম কাজ রাষ্ট্রকে করিতে দেওয়া হইবে ততই দেশের মঙ্গল। রাষ্ট্র শুধু মানুষের জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করিবে।

দ্বিতীয়ত, নিজের ভাল পাগলেও বোঝে। প্রত্যেক লোকে জানে তাহার ভাল কিসে হইবে এবং নিজের যাহাতে ভাল হয় সে তাহাই করিবে। প্রত্যেকেই নিজের ভাল দেখিলে সমাজেরও তাহাতে উন্নতি হইবে। কারণ প্রত্যেককে লইয়াই সমাজ গঠিত। এই জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছামত নিজ ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেওয়া উচিত। রাষ্ট্রের হস্তে বেশী ক্ষমতা দিলে সে লোকের কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে, তাহা হইলে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশে

বাধা পড়িবে। সব ব্যাপারেই যদি রাষ্ট্র অগ্রসর হইয়া কাজ করে তবে লোকেরা রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িবে। নিজের গুণগুলি বিকাশ করিতে চেষ্টা করিবে না। শিশুর সব কাজই যদি তাহার পিতামাতা করিয়া দেয়, তবে সে নিজে কিছু করিতে শিখে না। লোকেরও ঠিক সেই দশা হইবে। সুতরাং রাষ্ট্র নিজে খুব কম কাজ করিয়া বেশী কাজ লোকের হাতে ছাড়িয়া দিবে। এই জন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে ফরাসী ভাষায় Laissez-faire বলা হয়; ইহার অর্থ "ছাড়িয়া দাও"।

অ্যাডাম স্মিথ প্রভৃতি অনেক অর্থনৈতিক পণ্ডিত এই মত সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে পরস্পরের মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতা না থাকিলে কোন বিষয়ে আর্থিক উন্নতি হইবে না। সরকারই যদি সব কাজ করিয়া দেয় তবে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং তাহা ক্ষতিকর হইবে। তাহাদের মতে কোন অর্থনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা রাষ্ট্রের পক্ষে উচিত নহে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন রাষ্ট্রের সর্বনিম্ন কার্যক্রম কি হইবে তাহার উত্তর সহজেই অনুমেয়। রাষ্ট্রের কাজ অনেকটা ফুটবল খেলার রেফারির মত। রেফারী নিজে খেলে না। সে শুধু দেখে যে, নিয়ম অনুযায়ী দুই দল খেলিতেছে কি না। খেলায় জয়-পরাজয় দুই দলের খেলোয়াড়দের উপরই নির্ভর করে। সেইরূপ রাষ্ট্রের কাজ হইতেছে শুধু দেখা যে লোকেরা আইন মত কাজ করিতেছে কি না। অন্য কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য নহে। পৃথিবীকে যদি রঙ্গমঞ্চের সহিত তুলনা করা হয়, তবে রাষ্ট্রেও কাজ হইবে মঞ্চাধ্যক্ষের মত। রাষ্ট্র নিজে অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিবে না, অভিনয় করিবে নাগরিকেরা। রাষ্ট্রের কর্তব্য শুধু এইটুকু দেখা যে, প্রত্যেক অভিনেতা নিজ নিজ অংশটুকু সুষ্ঠুভাবে অভিনয় করিতেছে কি না। ইহার বেশী কিছু করা রাষ্ট্রের উচিত হইবে না। রাষ্ট্র কারখানানিয়ন্ত্রণ করিবে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করিবে কিংবা হাসপাতাল স্থাপন করিবে তাহা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা চাহেন না। দেশের মধ্যে আইন এবং শৃংখলা রক্ষা, সুবিচারের ব্যবস্থা ও বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিলেই রাষ্ট্রের কর্তব্য শেষ হইবে। ইহার অধিক কিছু করা রাষ্ট্রের পক্ষে উচিত হইবে না।

সমালোচনা: অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে

বহু লোক এই মত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু নানা দিক হইতে এই মতের সমালোচনাও হইয়াছে।

প্রথমত, রাষ্ট্রকে অমঙ্গলজনক প্রতিষ্ঠান মনে করিবার কোন কারণ নাই। রাষ্ট্র একটি মঙ্গলবিধায়ক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়তা করে এবং সকলের মঙ্গলসাধন করিয়াছে। কাজেই শুধুমাত্র পুলিসের কাজ করিবার জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন এ কথা স্বীকার করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, সকলেই সব সময়ে নিজের ভালমন্দ ভাল বুঝিতে পারে, ইহা ঠিক নহে। অনেক সময়েই লোকে নিজের ভালমন্দ বোঝে না, বুঝিতে চেষ্টাও করে না। কলেরা রোগীর জামাকাপড় পুকুরে ধুইলে জল দূষিত হয়, একথা প্রায় সকলেই জানে। কিন্তু ভারতবর্ষের গ্রামের লোকেরা পুকুরেই রোগীর জামাকাপড় ধুইয়া থাকে। শিক্ষা সকলেরই প্রয়োজন। কিন্তু চাষী নিজের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠায় না। রাষ্ট্রের এসব ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা এবং লোকের অজ্ঞতা এবং অসহায় অবস্থা নিরাকরণে সাহায্য করা কর্তব্য।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের করণীয় অনেক কাজ আছে। ধনী মালিক এবং নিঃস্ব শ্রমিকের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকা উচিত, এ কথা বলা অর্থহীন। যদি অবাধ প্রতিযোগিতা রাখিতে হয়, তবে তাহা হওয়া উচিত সমানে সমানে। প্রতিযোগিতার ফলে গরীবের দুঃখ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহারা অসহায় হইয়া পড়িয়াছে। প্রতিযোগিতার ফলে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হইয়াছে। নিঃস্ব শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করিবার অধিকার রাষ্ট্রের আছে এবং রাষ্ট্র সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবার ব্যবস্থা করিবে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা অসম্ভব। এই মত অনুযায়ী কাজ করিলে রাষ্ট্র পরিচালিত সব হাসপাতাল ও চিকিৎসালয় বন্ধ করিয়া দিতে হয়। বর্তমান যুগের মানুষ এই ব্যবস্থা সমর্থন করিতে পারে না।

সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism): সমাজতন্ত্রবাদীরা রাষ্ট্রের কার্য ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিতে চাহে না। জনসাধারণের মঙ্গল-বিধানের জন্য যাহা কিছু করা দরকার, তাহার সবটাই রাষ্ট্র করিতে পারিবে। তাহাদের মতে পুলিসের ন্যায় কেবলমাত্র সাধারণের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে আবদ্ধ না

থাকিয়া জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মঙ্গলময় হস্ত প্রসারিত হওয়া উচিত।

সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে জমি এবং মূলধনের মালিক হইবে রাষ্ট্র, ব্যক্তি নহে। সবপ্রকার উৎপাদনের উপাদানের মালিক হইবে রাষ্ট্র, বিশেষ করিয়া জমি এবং মূলধনের। বর্তমানে পুঁজিবাদীরা মুনাফা অর্জনের জন্য শিল্প পরিচালনা করিয়া থাকে। এই ব্যবস্থা রদ করিয়া দিতে হইবে। রাষ্ট্রই বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় শিল্প পরিচালনা করিবে। বর্তমানে যেভাবে জাতীয় আয় সকলের মধ্যে ভাগ করা হয় সমাজতন্ত্রবাদে তাহা হইবে না। বর্তমানে বড়লোকের সংখ্যা সামান্য ও অধিকাংশ লোকই গরীব। এই ব্যবস্থা যুক্তিহীন। রাষ্ট্রের উচিত জাতীয় আয় সকলের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া, যাহাতে প্রত্যেকে তাহার গুণানুযায়ী সমান সমান অংশ পাইতে পারে।

সমাজতন্ত্রবাদের স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি দেখানো হয়। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের যে সব ত্রুটি, তাহা হইতে সমাজতন্ত্রবাদ সম্পূর্ণ মুক্ত। ইহাতে রাষ্ট্রকে অমঙ্গলদায়ক প্রতিষ্ঠান বলিয়া ভাবা হয় না। বরং রাষ্ট্র যে সাধারণের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে পারে তাহাই বলে। মানুষ সব সময়ে আপনার মঙ্গলামঙ্গল বুঝিতে পারে না। অর্থনীতির ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা সমাজে নানারূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছে। রাষ্ট্রের কর্তব্য তাহা দূর করা।

দ্বিতীয়ত, আধুনিক সমাজব্যবস্থার ত্রুটি কোনখানে তাহা সমাজতন্ত্রবাদে প্রদর্শিত হইয়াছে। বর্তমানে জাতীয় আয়বণ্টননীতি অসাম্যমূলক। জনসাধারণ অত্যন্ত গরীব। শ্রমিকেরা অনেক সময়েই তাহাদের শ্রমের উপযুক্ত মূল্য পায় না। জাতীয় আয়ের অধিকাংশই মূলধনের মালিক এবং জমিদার আত্মসাৎ করে। অতএব জমি ও মূলধন ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিতে দেওয়া হইবে না। জাতীয় আয় যাহাতে সকলের মধ্যে যতদূর সম্ভব সমানভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তৃতীয়ত, সমাজতন্ত্রবাদে জনসাধারণ ন্যায়বিচার পাইবে। জমি প্রকৃতির দান। কাজেই জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি না হইয়া সাধারণের সম্পত্তি হইবে ইহাই ন্যায়সঙ্গত। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া শ্রমিক এবং কৃষকই সমস্ত দ্রব্য উৎপাদন করে। এই উৎপাদনের আয়ের মোটা অংশ মূলধনের মালিকদের লইতে দেওয়া হইবে না।

ভিন্ন প্রকারের সমাজতন্ত্রবাদ: সমাজতন্ত্রবাদের বহু প্রকারভেদ আছে, যথা সমাজতন্ত্রবাদ, সংঘবাদ (Guild socialism), সিণ্ডিক্যালিজম প্রভৃতি। খাঁটি সমাজতন্ত্রবাদীরা সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাস করে না। তাহাদের মতে, রাষ্ট্র উৎপাদননিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা শান্তিপূর্ণ উপায়ে গ্রহণ করিবে। সংঘবাদ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাস করে না। প্রত্যেক বিশেষ শিল্পের শ্রমিকেরা সংঘ গঠন করিবে এবং এই সংঘই উক্ত শিল্প পরিচালনা করিবে। কিন্তু শিল্পের মালিক হইবে রাষ্ট্র। সিণ্ডিক্যালিস্টরা শিল্পকে একমাত্র শ্রমিকের দিক হইতেই পুনর্গঠিত করিতে চায়। শ্রমিকসংঘই সর্বপ্রকারে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিবে।

সাম্যবাদ (Communism) সমাজতন্ত্রবাদ হইতে স্বতন্ত্র। সাম্যবাদে বলা হয় যে, শ্রমিকেরা সশস্ত্র বিপ্লব করিয়া রাষ্ট্রের প্রকৃতি পরিবর্তিত করিবে। সমাজতন্ত্রবাদ শান্তিপূর্ণ উপায়ের পক্ষপাতী। প্রত্যেকে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করিবে এবং নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ পাইবে। ইহাই সাম্যবাদের আদর্শ। সাম্যবাদের লক্ষ্য সমাজতন্ত্রবাদ অপেক্ষা আরও দূরে। উৎপাদনের মালিক হইবে জনসাধারণ। সমাজতন্ত্রবাদে সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপ করিবার কথা বলা হয় না। সাম্যবাদে ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বীকৃত হয় না। কার্যক্ষেত্রে অবশ্য দেখা যায় যে, রাসিয়াতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বহু পরিমাণে স্বীকৃত হইয়াছে। লোককে আপনার উপার্জন হইতে সঞ্চয় করিতেও দেওয়া হয়।

সমালোচনা: সমাজতন্ত্রবাদের প্রধান ত্রুটি হইতেছে যে, ইহা রাষ্ট্রের ক্ষমতা অসীম বলিয়া মনে করে। রাষ্ট্র আপনার কার্য সরকারের মারফতে চালায় এবং সরকারী কার্য পরিচালনা করে চাকুরেরা। মাহিনা করা সরকারী কর্মচারী সাধারণ ব্যবসায়ীদের মত অতটা কার্যক্ষম না হইতেও পারে। শিল্প সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার ক্ষমতা সাধারণত এই সব কর্মচারীদের না থাকাই সম্ভব। প্রত্যেক ব্যবসায়ী জানে যে, যদি সে ব্যবসায় ঠিক মত চালাইতে না পারে, তবে তাহাকেই লোকসান দিতে হইবে। কাজেই ব্যবসায়ীকে কঠোর পরিশ্রম করিয়া ব্যবসায় সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে হয়। কিন্তু সরকারী কর্মচারীর মনে এই ধরণের কোন প্রেরণা থাকে না। সে মাহিনা লইয়া কাজ করে মাত্র, ব্যবসায়ে লাভালাভের জন্য নিজেকে দায়ী মনে করে না। কাজেই সমাজতন্ত্রবাদে উৎপাদন হ্রাস পাইতে পারে। সমাজতন্ত্রবাদে ব্যক্তি-স্বাধীনতা

অনেকাংশে ব্যাহত হইবে। প্রতি পদেই লোককে অনেক নিয়মকানুন মানিয়া চলিতে হইবে।

রাসিয়া ও আর কয়েকটি দেশে সাম্যবাদ পুরাপুরি চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়া চলে। আধুনিক রাষ্ট্র কেবলমাত্র পুলিসের মত আইন এবং শৃংখলা বজায় রাখিয়া সন্তুষ্ট থাকে না। সবসাধারণের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র আজকাল বহুবিধ কাজ করিয়া থাকে।

সরকারের কাজ (Functions of Government): সরকার দুই শ্রেণীর কাজ করে। এক জাতীয় কাজ হইতেছে মৌলিক, অপরিহার্য; এই সব কাজ না করিলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকিবে না। অন্য কাজগুলি জনহিতকর বটে, কিন্তু তাহা ইচ্ছাধীন। অর্থাৎ রাষ্ট্র তাহা করিতে পারে, আবার নাও করিতে পারে।

(ক) **অপরিহার্য কাজ** (The essential or constituent function): রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য যাহা না করিলেই নহে, তাহাই অপরিহার্য কাজ। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি এই বিভাগে পড়ে।

(১) বহিরাক্রমণ হইতে দেশরক্ষা: ইহার জন্য রাষ্ট্রকে সৈন্য, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী প্রভৃতি উপযুক্ত সংখ্যায় রাখিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বৈদেশিক বিভাগের মারফতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের অধিকার বজায় রাখিতে হইবে।

(২) আভ্যন্তরীণ আইন ও শৃংখলা রক্ষা: ইহার প্রয়োজনীয়তা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হয় না। জীবন ও ধনসম্পত্তি যদি নিরাপদ না থাকে, যদি দেশে অশান্তি সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে সে দেশের পক্ষে কোন উন্নতি করা অসম্ভব। দেশে আইন ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার মত পুলিসবাহিনী থাকিবে। চুরি-ডাকাতি, অন্যান্য অপরাধ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা যাহাতে না হইতে পারে, রাষ্ট্রকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) **বিচার-ব্যবস্থা**: ন্যায় বিচারের জন্য দেশে নিরপেক্ষ ও নিপুণ বিচার-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইবে।

(খ) **ইচ্ছাধীন কার্য** (Optional function): এই কাজগুলি না করিলে যে, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় থাকিবে না তাহা নহে। কিন্তু বর্তমান কালে

প্রত্যেক রাষ্ট্রই জনসাধারণের কল্যাণ-সাধনের জন্য এই সব কাজ করিয়া থাকে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা এই কাজগুলি রাষ্ট্রের কর্তব্য বলিয়া মনে করে না।

কাজগুলি এই :

(১) শিক্ষাবিস্তার : আধুনিক রাষ্ট্র নাগরিকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে। যথাযথ শিক্ষা লাভ না করিলে, নাগরিকেরা তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারিবে না। পূর্বে শিক্ষাব্যবস্থা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইত। কিন্তু রাষ্ট্র স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মিউজিয়ম, লাইব্রেরী, আর্ট গ্যালারি প্রভৃতি স্থাপন করিয়া সাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা করে।

(২) স্বাস্থ্যোন্নতিবিধান : রাষ্ট্র যে সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে, তাহা এখন স্বীকৃত। রাষ্ট্র বর্তমান কালে হাসপাতাল, দাতব্য ঔষধালয় এবং চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য নানা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে।

(৩) শিল্প ও বাণিজ্যনিয়ন্ত্রণ : মুদ্রা প্রস্তুত এবং অন্যান্য আর্থিক বিষয়ে আধুনিক গভর্ণমেণ্ট নানাবিধ নিয়ন্ত্রণ-আইন প্রণয়ন করে। ব্যাংক প্রভৃতির উপরেও নিয়ন্ত্রণ-আইন জারি করে! আমদানী দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য করিয়া শিল্প-প্রসারের সহায়তা করে।

(৪) শ্রমিকের স্বার্থসংরক্ষণ : শ্রমিক দিনে কত ঘণ্টা কাজ করিবে, কারখানার অন্যান্য অবস্থাই বা কিরূপ থাকিবে, এই সব বিষয় আধুনিক সরকার আইন করিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। রুগ্ন এবং বেকার অবস্থায় রাষ্ট্র শ্রমিকদের আর্থিক ও অন্যবিধ সাহায্য করে।

(৫) নিঃস্ব ও বৃদ্ধের সহায়তা : বর্তমান রাষ্ট্র নিঃস্বদের প্রতিপালনের ব্যবস্থা করে। বৃদ্ধকে সাহায্য করিবার জন্য ভাতা দেয়।

(৬) চলাচল ব্যবস্থা : রাষ্ট্র পথঘাট, রেল, স্টীমার, নৌচলাচল প্রভৃতির ব্যবস্থা করে। সাধারণের হিতার্থে ডাকবিভাগ, রেল, টেলিফোন প্রভৃতিও পরিচালনা করিয়া থাকে।

দশম পরিচ্ছেদ

সংবিধান

প্রত্যেক দেশের শাসনই কয়েকটি বিধিবদ্ধ আইন ও নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এই সব আইন এবং নীতির সমষ্টিকে সংবিধান (Constitution) বলে। যে নিয়ম অনুযায়ী দেশের শাসনব্যবস্থা গঠিত হয়, যাহার বলে গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কাজ বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং যাহা গভর্ণমেণ্টের নীতি ও উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করে, তাহাকেই সংবিধান বলা হয়। শাসনব্যবস্থার কাঠামো সংবিধান হইতেই উদ্ভূত। গভর্ণমেণ্টের প্রত্যেক বিভাগ কি ভাবে গঠিত হইবে, তাহা সংবিধানে নির্দেশ দেয়। সংবিধানের কি ভাবে পরিবর্তন করা যাইবে, তাহার সুস্পষ্ট বিধানও ইহাতে লিখিত থাকে। দেশের লোকের মৌলিক অধিকার কি, তাহা সংবিধান হইতে জানিতে পারা যায়। অবশ্য সব দেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার কি তাহা বলা হয় না।

সংবিধান লিখিত বা অলিখিত দুইই হইতে পারে। শাসনব্যবস্থার সব কিছুরই যখন লিখিত দলিল পাওয়া যায়, তখন সেই সংবিধানকে লিখিত (Written Constitution) বলা হয়। আমেরিকা এবং ভারতবর্ষের সংবিধান লিখিত।

যে দেশের শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ সম্বন্ধে কোনও লিখিত দলিল নাই, তখন সেই দেশের সংবিধানকে অলিখিত (Unwritten Constitution) বলা হয়। বহু দিনের আচারব্যবহার এবং অনুসৃত নীতি সকল রাজনৈতিক দলদ্বারা স্বীকৃত হইয়া তদনুযায়ী গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত হয়। ব্রিটেনের সংবিধান উহার একমাত্র দৃষ্টান্ত।

সংবিধানের মধ্যে এইরূপ পার্থক্য সব সময়ে সুস্পষ্ট থাকে না। প্রত্যেকটি লিখিত সংবিধানেই কিছু কিছু অলিখিত অংশ থাকে। তেমনি আবার অলিখিত সংবিধানেও কোনও কোনও অংশ লিখিত থাকে। ব্রিটিশ সংবিধানের অনেক অংশ লিখিত। উদাহরণস্বরূপ ১৯১১ সালের ব্রিটিশ পার্লামেণ্টারি আইন এবং 'ইকুয়াল ফ্রান্‌চাইজ' বা সমভোটাধিকার আইনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় আইনটিতে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে বয়ঃপ্রাপ্ত সকলকেই ভোটাধিকার দেওয়া হইয়াছে।

এইজন্য সংবিধানের উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ আজকাল পরিত্যক্ত হইয়াছে।

এখন সংবিধানকে সুপরিবর্তনীয় এবং দুষ্পরিবর্তনীয় এই দুইভাগে ভাগ করা হয়।

সুপরিবর্তনীয় এবং দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানঃ লর্ড ব্রাইস সংবিধানকে এই দুইভাগে শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। সংবিধান পরিবর্তিত করিবার উপায় কিরূপ, তাহা হইতেই এই ভাগ করা হয়। আইনপরিষদ যে প্রণালী অবলম্বনে সাধারণ আইন প্রণয়ন করে, সেই একই পদ্ধতি দ্বারা যদি সংবিধানের পরিবর্তন করা যায়, তবে সেই সংবিধানকে সুপরিবর্তনীয় বলা হয়। কিন্তু যদি সংবিধান পরিবর্তন করিতে ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়, তবে তাহাকে দুষ্পরিবর্তনীয় বলে।

সুপরিবর্তনীয় সংবিধান (Flexible Constitution) : যে পদ্ধতিতে সাধারণ আইন পাস করা হয়, দেশের সংবিধানে যদি ঠিক সেইভাবেই পরিবর্তন করা যায়, তবে তাহাকে সুপরিবর্তনীয় বলা হয়। সংবিধান পরিবর্তন করিবার জন্য সে দেশে কোনও বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয় না। আইনপরিষদের উভয় সভায় আইনটি যথারীতি তিনবার পঠিত হইবার পরে আইন পাস হয়। সংবিধানও ঠিক এইভাবে সংশোধিত হইতে পারে। এই সংবিধানকে ইংরাজীতে "ফ্লেক্সিবিল" বলে।

ব্রিটিশ সংবিধান সুপরিবর্তনীয়। সাধারণ আইন যে ভাবে পাস হয়, সংবিধানেরও ঠিক সেই নিয়মে পরিবর্তন করা যায়। আইন পাস করিবার ও সংবিধান পরিবর্তন করিবার পদ্ধতি একই। এই পরিবর্তনের খসড়া আইন-পরিষদের উভয় সভায় তিনবার পঠিত হয়। দুই সভার সমর্থন লাভ করিবার পর রাজার সম্মতির জন্য তাহা প্রেরিত হয় এবং তাঁহার সম্মতি লাভের পর আইন বলিয়া গণ্য হয়।

সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের প্রধান গুণ এই যে, পরিবর্তন সহজ বলিয়া দেশের অবস্থা বদলাইলে সংবিধানেরও অনায়াসে পরিবর্তন করা যায়। যখন সংবিধানের পরিবর্তন প্রয়োজন, সেই সময়ে তাহা সাধিত না হইলে দেশে অনেক সময়ে বিপ্লব অনিবার্য হইয়া পড়ে। সুপরিবর্তনীয় সংবিধানে বিপ্লব অপ্রয়োজনীয়। সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের স্থিতিস্থাপকতা অত্যন্ত বেশী।

ঠিক এই কারণেই এই সংবিধান স্থায়ী নহে। পরিবর্তন সহজ বলিয়াই অনেক সময়ে অবাঞ্ছনীয় পরিবর্তন করা যাইতে পারে। অনেক সময়ে হয়ত

সাময়িক উত্তেজনার বশে চট করিয়া সংবিধানের পরিবর্তন করা হয়। তাহার ফল অনেক সময়ে ভাল নাও হইতে পারে।

দুষ্পপরিবর্তনীয় সংবিধান (Rigid Constitution) : এই ধরণের সংবিধান পরিবর্তন করিতে হইলে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। সাধারণ আইন যে ভাবে পাস করা হয়, সংবিধানের পরিবর্তন সেভাবে করা যায় না। তাহার জন্য বিশেষ পদ্ধতির ব্যবস্থা আছে। সংবিধানের নিয়মাবলী সাধারণ আইনের উর্ধ্বে ; কাজেই তাগ পরিবর্তনের জন্য ভিন্ন রকমের ব্যবস্থা থাকে। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান মাত্রেই লিখিত থাকে।

আমেরিকার সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। আমেরিকার কংগ্রেস (আইন-সভা) সাধারণ আইন পাস করিতে পারে। কিন্তু সংবিধান পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা কংগ্রেসের নাই। ইহার পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। আইনপরিষদের উভয় সভায় পরিবর্তনের প্রস্তাবটি দুই-তৃতীয়াংশ সভ্য দ্বারা অনুমোদিত হইলে, তাহা প্রত্যেক রাজ্যের আইনসভায় প্রেরিত হয়। এই সভাগুলির চার ভাগের তিন ভাগ প্রস্তাবটি মঞ্জুর করিলেই, তবে সেই পরিবর্তন কার্যকরী হয়। কিন্তু সাধারণ আইন আইনসভার অধিকাংশ কর্তৃক গৃহীত হইলে তাহা আইনে পরিণত হয়।

ভারতের বর্তমান সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। কারণ, সাধারণ আইন-প্রণয়নের পদ্ধতিতে সংবিধানের পরিবর্তন করা যাইবে না। সংবিধান পরিবর্তনের প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় আইসভার দুইটি পরিষদেই দুই-তৃতীয়াংশ সভ্যের ভোটে অনুমোদিত হইলে তবেই তাগ কার্যকরী হইবে। কিন্তু সাধারণ আইন অধিকাংশ সভ্যের মতানুযায়ী পাস হয়।

এইরূপ সংবিধানের কয়েকটি গুণ আছে। ইহা সাধারণত লিখিত থাকে বলিয়া, তাহার বিধানগুলি সুস্পষ্ট এবং পরিষ্কার। ইহার প্রধান গুণ স্থায়িত্ব। জনমতের সাময়িক খামখেয়ালির সঙ্গে সঙ্গে সংবিধানের পরিবর্তন করা যায় না। কোনও সংস্কার অথবা সংশোধন সহজসাধ্য নহে। কাজেই নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে, তাগ পরিবর্তিত হইবে না। এই কারণে আজকাল প্রায় সকল দেশই এই জাতীয় সংবিধানের পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছে।

দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের কতকগুলি ত্রুটিও আছে। কালক্রমে দেশের অবস্থান্তর ঘটে! সংবিধানে তখন পরিবর্তন করা উচিত। কিন্তু সংশোধন

সহজসাধ্য নয় বলিয়া, যথাসময়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা যায় না। ইহা অত্যন্ত বিপদজনক। কাম্য পরিবর্তন সাধন করিতে না পারিয়া, জনসাধারণ বিপ্লব ঘটাইতে পারে। সব ব্যাপারেই অত্যধিক অনমনীয়তা বিপদ ডাকিয়া আনে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নাগরিক

নাগরিক হিসাবে মানুষের কর্ম বিশ্লেষণ করাই পৌরনীতির উদ্দেশ্য। এইজন্য প্রথমেই নাগরিক সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

নাগরিক কথাটির সাধারণ অর্থ হইতেছে নগরের অধিবাসী। কিন্তু পৌরনীতিতে এবং রাজনৈতিক আলোচনায় নাগরিক শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটল বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে অথবা বিচারব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করে, কেবলমাত্র তাহাকে নাগরিক আখ্যা দেওয়া যায়। বর্তমানে কেহই এই মত গ্রহণ করে না। গ্রীক দেশের নগররাষ্ট্র অপেক্ষা বর্তমান যুগের রাষ্ট্রের আয়তন বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাষ্ট্রের পরিধিবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকের সংজ্ঞাও পরিবর্তিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি নিজে সেই দেশবাসী বলিয়াই রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে, রাষ্ট্রের সকল অধিকার ভোগ করে, তাহাকেই নাগরিক বলা হয়। এক দেশের নাগরিক, সে পৃথিবীর অপর কোনও দেশে যাইয়া বিপদে পড়িলে আপন রাষ্ট্রের সাহায্য পাইবে। তাহাকেও তাহার পরিবর্তে রাষ্ট্রের জন্য কিছু কিছু কাজ করিতে হইবে। যেমন, প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রের জন্য যুদ্ধ করিতে, ও এমন কি প্রাণ দিতে পর্যন্ত তাহাকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যাহারা ভারতবর্ষকে নিজের দেশ বলিয়া মনে করে ও ভারতীয় রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে তাহাদিগকে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া ধরা হয়।

কোন কোন লেখক, নাগরিক এবং দেশবাসীর (National) মধ্যে পার্থক্য করেন। তাঁহাদের মতে যাহারা ভারতবর্ষকে নিজের দেশ বলিয়া মনে করে ও ভারতীয় রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে তাহাদের সকলেই ভারতের নাগরিক নহে। ভোটাধিকার, সরকারী কার্যে নিযুক্ত হইবার অধিকার প্রভৃতি সর্বপ্রকার রাজনৈতিক অধিকার যাহার আছে সেই নাগরিক। দেশবাসী হিসাবে মাত্র যাহার পরিচয়, তাহার এইসব অধিকার থাকে না। তাহার ভোটাধিকার নাও থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাকেও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য দেখাইতে হইবে এবং তাহার পরিবর্তে রাষ্ট্র তাহাকে সর্বত্র রক্ষা করে।

নাগরিক ও বিদেশী (Citizen and Alien) :—রাষ্ট্রের অধিবাসীদের দুইভাগে ভাগ করা যায়—নাগরিক ও বিদেশী। কয়েকটি বিষয়ে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। উভয়ে একই রাষ্ট্রে বাস করে। উভয়কেই কর দিতে হয় এবং রাষ্ট্রের আইন মানিয়া চলিতে হয়। কিন্তু নাগরিকের অবস্থা বিদেশী অপেক্ষা স্বতন্ত্র। ইংরাজ, জার্মান প্রভৃতি বহু বিদেশী ভারতে বাস করিতেছে। কিন্তু তাহারা ভারতের নাগরিক নহে। তাহারা আপন আপন দেশের নাগরিক। যাহারা ভারত রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে কেবলমাত্র তাহারাই ভারতীয় নাগরিক। বিদেশীরা ভারতে বাস করিলেও স্ব স্ব রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে। আমেরিকার কোন নাগরিক ভারতে বাস করিলেও তাহাকে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করা যাইবে না। ভারত রক্ষার জন্য সে যুদ্ধ করিতে বাধ্য নহে। কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক ভারতীয়কে এ বিষয়ে বাধ্য করিতে পারে। নাগরিক দেশের ভিতরে অথবা বিদেশে সর্বত্রই নিজ রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণ দাবী করিতে পারে। ভারতবাসী যে দেশেই থাকুক না কেন, বিপদে পড়িলে ভারত সরকার বিদেশেও তাহার স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু আমেরিকার নাগরিক ভারতে দীর্ঘদিন বাস করিলে ভারত গভর্ণমেণ্ট তাহাকে ভারতের বাহিরে কোনরূপ সাহায্য করিবে না। রাষ্ট্র যে সমস্ত রাজনৈতিক এবং নাগরিক অধিকার স্বীকার করে, তাহা সবই নাগরিকের প্রাপ্য। কিন্তু সাধারণত বিদেশীদের রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয় না। কোন বিদেশী লোক ভারতবর্ষে বাস করিলেও, সেই দেশের আইনসভার সভ্যপদ প্রার্থী হইতে পারে না। এই অধিকার একমাত্র ভারতীয় নাগরিকের আছে।

কোন কোন রাষ্ট্রে বিদেশীদের উপরে নানারূপ বাধা আরোপ করা হয়, যাহা নাগরিকের উপরে প্রযোজ্য নহে। যেমন, অনেক সময়ে বিদেশীদের সেই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে থাকা কালীন পুলিসের নিকট নাম লিখাইতে হয়। কিন্তু নাগরিককে তাহা করিতে হয় না।

কে নাগরিক হইতে পারে? দুইটি উপায়ে কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া যায়। প্রথমটি জন্মগত, দ্বিতীয়টি স্বেচ্ছাকৃত।

দুইটি নিয়মে জন্মগত অধিকারে নাগরিক হওয়া যায়। ল্যাটিন ভাষায় একটিকে বলে জাস সোলি (Jus soli)। অপরটি জাস সাঙ্গুইনিস

(Jus sanguinis) নামে অভিহিত। প্রথম নিয়ম অনুযায়ী যে কেহই রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে তাহাকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হয়। পিতামাতা যে দেশের নাগরিকই হউক না কেন তাহাতে কিছু আসে যায় না। পিতামাতা হয়ত ফরাসী হইতে পারে। কিন্তু তাহাদের শিশু যদি ইংলণ্ডে জন্ম লাভ করে, তবে সেই শিশু ইংলণ্ডের নাগরিক হইবে। ইহাকে Jus soli বলা হয়। আমেরিকাতে এইভাবে নাগরিক হওয়া যায়। কোন ভারতীয় নাগরিকের সন্তান যদি আমেরিকায় জন্ম লাভ করে, তবে আমেরিকার আইন অনুযায়ী তাহাকে আমেরিকার নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হইবে।

দ্বিতীয় নিয়মে বলে যে, পিতামাতা যে দেশের নাগরিক, তাহাদের সন্তানও সেই দেশের নাগরিক হইবে। ইহাকে Jus sanguinis বলে। ফরাসী দেশে এই নিয়ম প্রচলিত আছে। পিতামাতা যদি ফরাসী দেশের নাগরিক হয়, তবে তাহাদের সন্তান যে কোন দেশে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সে ফরাসী নাগরিক হিসাবেই পরিচিত হইবে। ইংলণ্ডেও এই নিয়ম বহাল আছে। ব্রিটিশ নাগরিকদের সন্তান যেখানেই জন্মলাভ করুক সে ব্রিটিশ নাগরিক।

এই দুই শ্রেণীর নাগরিককে স্বাভাবিক নাগরিক (Natural citizenship) বলা হয়।

আর এক উপায়ে নাগরিক হওয়া যায়। অনেক সময় বিদেশীকে রাষ্ট্রের নাগরিক করিয়া লওয়া হয়। একজন বিদেশী যদি রাষ্ট্রের নাগরিক হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে ও কতকগুলি নিয়ম পালন করে, তবে তাহাকে নাগরিক হইবার সুযোগ দেওয়া হয়। এই উপায়ে একজন বিদেশী অপর একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারে। যে বিদেশী এই উপায়ে নাগরিক হয়, তাহাকে অধিকারপ্রাপ্ত নাগরিক (Naturalised citizen) বলা হয়।

কয়েকটি সর্তে বিদেশীকে নাগরিকের অধিকার দেওয়া হয়। প্রথমত, তাহাকে কয়েক বৎসর একাদিক্রমে সেই রাষ্ট্রে বাস করিতে হইবে; অথবা রাষ্ট্রের অধীনে চাকুরী করিতে হইবে। একাদিক্রমে বাস, অথবা কয়েক বৎসর রাষ্ট্রের অধীনে চাকুরী করা নাগরিক অধিকার পাইবার প্রধান সর্ত। দ্বিতীয়ত, তাহাকে সেই দেশের ভাষা জানিতে হইবে। তৃতীয়ত, কোন কোন দেশে জমি কিনিলেও নাগরিকের অধিকার পাওয়া যায়। চতুর্থ, কোথাও কোথাও কোন নারী যদি অপর দেশের নাগরিককে বিবাহ করে, তবে তাহাকে স্বামীর দেশের

নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হয়। এই সব সর্ত পালিত হইলে বিদেশীকে নাগরিকের সনন্দ দেওয়া হয়।

স্বাভাবিক অথবা অধিকারপ্রাপ্ত নাগরিকের মধ্যে সাধারণত কোন পার্থক্য করা হয় না। উভয়েই সমান সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করে। কোন কোন রাষ্ট্রে অবশ্য ইহাদের মধ্যে সামান্য পার্থক্য করা হয়। যেমন আমেরিকায় অধিকারপ্রাপ্ত নাগরিক রাষ্ট্রপতি অথবা উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হইতে পারে না।

নাগরিক অধিকারলোপ (Loss of citizenship) : নাগরিক অধিকার যেমন অর্জন করা যায়, তেমনি উহা হারানোও সম্ভব। বিবাহের দ্বারা অনেক সময়ে নাগরিক অধিকার লোপ পায়। যে নারী অপর রাষ্ট্রের নাগরিককে বিবাহ করে, তাহার জন্মগত নাগরিক অধিকার লোপ পায় এবং সে তাহার স্বামীর দেশের নাগরিক হয়। দ্বিতীয়ত, অনেক সময়ে কোন নাগরিক বিদেশী রাষ্ট্রে চাকুরী গ্রহণ করিলে, তাহাকে নিজ দেশের নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হয় না। দুই একটি রাষ্ট্রে এইরূপ নিয়ম আছে যে, সৈন্যবাহিনী হইতে পলাতক হইলে, নাগরিক অধিকার থাকে না। নিজের দেশ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশের নাগরিক হইলে দেশের নাগরিক অধিকার তাহার থাকে না। পূর্বে এই প্রকারের পরিবর্তন রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হইত না। কিন্তু বর্তমান কালে কেহ যদি ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে চায়, তবে পুরাতন রাষ্ট্র তাহাতে বাধা দেয় না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

নাগরিকের অধিকার এবং কর্তব্য

নাগরিক কাহাকে বলে তাহার সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। এখন নাগরিকের কর্তব্য এবং অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

প্রত্যেক রাষ্ট্রেই নাগরিকদিগের কতকগুলি অধিকার ভোগ করিতে দেওয়া হয়। নাগরিক অন্যান্য সকলের ও রাষ্ট্রের নিকট হইতে যে যে স্বত্ব দাবী করিতে পারে, তাহাকে নাগরিক অধিকার (Rights) বলে। আমার কোন অধিকারে বা স্বত্বে অন্য কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। যদি কেহ হস্তক্ষেপ করে, তবে রাষ্ট্র তাহাকে সমুচিত শাস্তি দিবে। সুতরাং রাষ্ট্রের সমর্থন না থাকিলে কোন বিষয়েই নাগরিকের অধিকার জন্মায় না। একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের ইচ্ছামত পূজা অথবা ধর্মাচরণের অধিকার আছে। এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার শক্তি কাহারও নাই। নিজের খুশীমত ধর্মাচরণ করিতে যদি অপর কেহ বাধা দেয়, তাহা হইলে রাষ্ট্র অপরাধীকে শাস্তি দিবে। রাষ্ট্র রক্ষা করে বলিয়াই নাগরিক অধিকার রক্ষিত হয়। তাহা না হইলে দুর্বলের বা গরীবের কোন অধিকার থাকিত না।

রাষ্ট্র কেন নাগরিককে কতকগুলি অধিকার দেয়? এই সব অধিকার ব্যতীত কোন ব্যক্তির পক্ষে নিজের শক্তির বিকাশসাধন করা সম্ভব নহে। কোন মানুষকে তাহার ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশ-লাভের সুযোগ দিতে হইলে, তাহাকে কয়েকটি মৌলিক অধিকার দিতে হইবে। রাষ্ট্রের কর্তব্য হইতেছে, যাহাতে নাগরিকের মানসিক এবং নৈতিক গুণাবলী পূর্ণ বিকাশ লাভ করে, সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া। এইজন্য রাষ্ট্র বহু নাগরিকঅধিকার স্বীকার করে। যে রাষ্ট্র তাহার নাগরিকদিগের সবচেয়ে বেশী অধিকার মানিয়া লইয়াছে তাহাকেই শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করা হয়।

অধিকারের শ্রেণী বিভাগ (Classification of Rights): অধিকারকে সাধারণত দুইভাগে ভাগ করা হয়—নৈতিক এবং আইনগত।

দেশের জনসাধারণের মধ্যে যে সমস্ত নৈতিক নিয়ম বর্তমান, তাহার ভিত্তিতেই নৈতিক অধিকার (Moral Right) গড়িয়া উঠে। এই অধিকার

রক্ষা করে জনমত। কেহ যদি কোন নৈতিক অধিকার ভঙ্গ করে, তবে নিজের বিবেক ও জনমতের নিকট তাহাকে ছোট হইতে হয়। কিন্তু এই অধিকার ভঙ্গকারীকে রাষ্ট্র কোন শাস্তি দিবে না। রাষ্ট্র এই অধিকার রক্ষার জন্য কোন চেষ্টা করিবে না।

আইনগত অধিকার (Legal Right) রাষ্ট্র স্বীকার করে, এবং তাহা রক্ষা করে। কেহ এই শ্রেণীর অধিকারে হস্তক্ষেপ করিলে রাষ্ট্র তাহাকে শাস্তি দেয়।

আইনগত অধিকার আবার দুইটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত। কেবলমাত্র নাগরিকের ধনপ্রাণ রক্ষিত হইবার যে অধিকার, তাহাকে **পৌর অধিকার** (Civil Rights) বলা হয়। কাহারও প্রাণহানি হইবার আশংকা থাকিবে না। প্রত্যেকেই নিজের সম্পত্তি বিনা বাধায় ভোগ করিতে পারিবে। অন্য লোকের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারিবে এবং নিজের অভিরুচি অনুযায়ী ধর্মাচরণ করিতে পারিবে। এইগুলি পৌর অধিকার। এই অধিকারগুলি না থাকিলে সভ্য জীবনযাপন সম্ভব নয়। সামাজিক জীবনের ভিত্তি এই অধিকার-গুলির উপর। ইহা ব্যতীত সুষ্ঠু জীবনযাত্রা অসম্ভব।

যে অধিকার বলে নাগরিকেরা দেশের সরকারের কার্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, তাহাই **রাজনৈতিক অধিকার** (Political Rights)। ভোটাধিকার, সরকারী চাকুরী পাইবার অধিকার এবং রাজনৈতিক সভা ইত্যাদি করিবার অধিকার, এই পর্যায়ে পড়ে।

পৌর অধিকার (Civic Rights) : সভ্য জীবনযাপনের এবং মানসিক ও নৈতিক বৃত্তিসমূহের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য যে সমস্ত অধিকার প্রয়োজন, তাহাকে পৌর অধিকার বলে। আধুনিক যুগে প্রত্যেক রাষ্ট্রেই নাগরিকের কতকগুলি অধিকার স্বীকৃত। এই অংশে এক একটি করিয়া অধিকারগুলির বিষয় বলা হইবে।

জীবন-রক্ষণের অধিকার (Right to life) : এই অধিকারের অর্থ, রাষ্ট্র নাগরিকের জীবন রক্ষা করিবে, দেশের অভ্যন্তরে অপরের আক্রমণ হইতে এবং বহিরাক্রমণ হইতে নাগরিককে রক্ষা করিবে। এই অধিকারের বলে নাগরিক আক্রান্ত হইলে আত্মরক্ষার জন্য বলপ্রয়োগ এবং একান্ত প্রয়োজন হইলে অপরের প্রাণনাশ পর্যন্ত করিতে পারে।

স্বাধীনতার অধিকার (Right to liberty) : এই অধিকারের অর্থ এই যে, রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে যে কোন নাগরিক অবাধে চলাফেরা করিতে পারিবে। সরকার বা অপর কোন ব্যক্তি জোর-জবরদস্তি করিয়া কাহারও চলাফেরায় বাধা দিতে পারিবে না। সরকারী কর্মচারী কাহাকেও অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করিতে, অথবা বিনা বিচারে আটক রাখিতে পারিবে না। কাহাকেও অন্যায় ভাবে আটক করা হইলে, সে হেবিয়াস কর্পাস আইন অনুযায়ী আদালতে দরখাস্ত করিতে পারে। বিচারপতি তখন সেই ব্যক্তিকে আদালতে উপস্থিত করিতে আদেশ দেন এবং তাহাকে বেআইনি ভাবে আটক রাখা হইয়াছে কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখেন। আটক রাখা বে-আইনি বিবেচিত হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দেওয়া হয়।

সম্পত্তি ভোগের অধিকার (Right to property) : নিজের সম্পত্তি ভোগ করিতে সকলের অবাধ অধিকার আছে। কেহ অপরের গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিতে পারিবে না, এবং বিনা ওয়ারেণ্টে কোন সরকারী কর্মচারী কাহারও গৃহে খানাতল্লাসী করিতে পারিবে না।

চুক্তিবদ্ধ হইবার অধিকার (Right of contract) : একজন নাগরিকের, অপর এক বা একাধিক ব্যক্তির সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার অধিকার আছে। এই চুক্তি দুই পক্ষের উপরই প্রযোজ্য। কিন্তু চুক্তির বিষয়টি যদি সাধারণ স্বার্থের পরিপন্থী হয়, তবে রাষ্ট্র সেই চুক্তি প্রয়োগ করিতে দিবে না, এবং চুক্তি বাতিল হইয়া যাইবে।

ধর্মাচরণের স্বাধীনতা (Right of worship and conscience) : প্রত্যেক ব্যক্তি যে ধর্মে অথবা ধর্মানুষ্ঠান বিশ্বাস করে, তাহা অনুসরণ করিবার পূর্ণ অধিকার তাহার আছে। চিন্তার স্বাধীনতা সবত্রই স্বীকৃত। চিন্তার স্বাধীনতা স্বীকার করিলে ধর্মমত সম্বন্ধে সহিষ্ণু হইতেই হইবে।

সংস্কৃতি এবং ভাষাসংরক্ষণের অধিকার (Right to culture and languages) : প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি উন্নত করিয়া তুলিবার অধিকারী। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এই অধিকার বিশেষ প্রয়োজন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাহাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে, এবং তাহার উন্নতি করিতে পারিবে। তাহারা এই বিষয়ে রাষ্ট্রের নিকট সর্বপ্রকার সুযোগ এবং সুবিধা দাবী করিতে পারে।

আইনের দৃষ্টিতে সাম্য (Right to equality before law) : ধনী দরিদ্র সকলেই আইনের দৃষ্টিতে সমান বলিয়া গণ্য হইবে। প্রধান মন্ত্রী, ক্রোড়পতি এবং একজন সাধারণ গরীব নাগরিকের মধ্যে আইনের চক্ষে কোন পার্থক্য থাকিবে না।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা (Right to freedom of speech) : এই অধিকারের অর্থ এই যে, নাগরিক সব সময়ে তাহার মতামত নির্ভীকভাবে ব্যক্ত করিবার অধিকারী। সরকারী নীতির সমালোচনা করিবার অধিকার তাহার আছে। এইজন্য সরকার তাহাকে কোন শাস্তি দিতে পারিবে না। সরকারের নিকট এই সমালোচনা যতই অপ্রীতিকর হউক না কেন, শুধু মাত্র এই কারণেই সমালোচককে শাস্তি দেওয়া যাইবে না। নাগরিকের মতামত প্রকাশে বাধা আরোপ করিবার ক্ষমতা সরকারের থাকিবে না।

এই অধিকারটি অত্যন্ত মূল্যবান। এই অধিকার না থাকিলে গণতন্ত্র বজায় রাখা সম্ভব নহে। সরকারের অন্যায় কাজ একমাত্র স্বাধীন সমালোচনা দ্বারাই সংশোধিত হইতে পারে। সমালোচনার ফলে সরকার ঠিক পথে চালিত হয়। কোন বিশেষ মতামত প্রকাশ বন্ধ করিবার অধিকার সরকারকে যদি দেওয়া হয়, তাহা হইলে অপ্রীতিকর সমালোচনার সবপ্রকার পথ সে বন্ধ করিয়া দিবে। সবকারের ভুল প্রদর্শন করা বন্ধ হইলে, তাহারাও আপনার ভুল আদৌ বুঝিতে পারিবে না। তাহা হইলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। লোকের মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার কাড়িয়া হইলে তাহার ফলে একটি বিপদ উদ্ভূত হইতে পারে। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন যে, মানুষকে তাহার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী চিন্তা করিতে বাধা দিলে সে ক্রমে ক্রমে চিন্তা করাই পরিত্যাগ করিবে। চিন্তাশক্তিবর্জিত মানুষকে প্রকৃতপক্ষে আর নাগরিক আখ্যা দেওয়া যায় না।

খবরের কাগজের স্বাধীনতা (Right to freedom of the press) : মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা হইতে এই অধিকার উদ্ভূত। সাধারণ সভায় যেমন প্রত্যেকের স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার আছে, তেমনি সেই মত পুস্তকাকারে অথবা খবরের কাগজে প্রকাশ করিকার অধিকারও তাহার আছে। খবরের কাগজে সবপ্রকার মতামত এবং সমালোচনা প্রকাশ করা যাইবে ; প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হইতেছে সাধারণের মঙ্গলসাধনের চেষ্টা করা। এই মঙ্গলসাধনকল্পে সর্বপ্রকার মতামত ছাপাইয়া প্রকাশের স্বাধীনতা

তাহাকে দেওয়া উচিত। সরকার যদি তাহার এই কাজে বাধা দেয়, তবে তাহার কর্তব্যচ্যুতি হইবে।

কিন্তু মতামত প্রকাশের অধিকার আছে বলিয়া, কাহারও অশ্লীল অথবা গালিসূচক কিছু প্রকাশ করিবার অধিকার অবশ্য নাই।

সাধারণসভায় যোগ দিবার অধিকার (Right to public meeting): সংঘ গঠন করিয়া আপন আপন চিন্তা এবং ভাব কার্যে পরিণত করিবার স্বাধীনতা প্রত্যেক নাগরিকের আছে। এই উদ্দেশ্যে সাধারণ সভা আহ্বান করিবার অধিকার তাহার থাকা উচিত। যে কোন বিষয়ে সভা আহ্বান করিতে বাধা দেওয়া সরকারের উচিত নহে।

এই অধিকারটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মত প্রকাশের স্বাধীনতা হইতে ইহাও উদ্ভূত বলা যায়। আধুনিক জগতে কোন ব্যক্তির পক্ষেই আপনার কল্পিত কার্য একা সম্পাদন করা সম্ভব নয়। অপরের সাহায্য তাহার প্রয়োজন। সাধারণ সভায় কোন একটি জরুরী বিষয় আলোচিত হইলে, লোকে সেই আলোচনা হইতে শিক্ষা লাভ করিবে। একটি বিষয়ের পক্ষে এবং বিপক্ষে কি বক্তব্য আছে, তাহা লোকে সাধারণসভার বক্তৃতা হইতে জানিতে পারে। সাধারণের সমক্ষে সরকারের সমালোচনা তাহাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করে এবং ফলে তাহারা কোন অন্যায় কাজ করিতে পারে না।

এই অধিকার সীমাবদ্ধ। যে সভায় হিংসাত্মক কার্যের প্ররোচনা দেওয়া হয়, কিংবা দেশে অশান্তির সৃষ্টি করে, তাহা সরকার বন্ধ করিয়া দিতে পারে।

কর্ম ও শিক্ষালাভের অধিকার (Right to work and education): বর্তমানে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, সরকার নাগরিকদের জীবিকার্জনের পথ করিয়া দিতে বাধ্য। যদি কেহ চেষ্টা করিয়াও কোন জীবিকার সন্ধান না পায়, তাহা হইলে রাষ্ট্রের কর্তব্য হইবে তাহার জীবিকার উপায় খুঁজিয়া দেওয়া। রাষ্ট্রের কর্তব্য বেকার নাগরিককে প্রতিপালন করা। প্রত্যেকের এই অধিকার আছে যে, সে তাহার আপন শ্রমের যথোপযুক্ত মূল্য পাইবে। দিনে কত ঘণ্টা কাজ সে করিবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। কাজের সময় অতিরিক্ত দীর্ঘ হইবে না। প্রত্যেক নাগরিককে এমন অবসর দিতে হইবে, যখন সে তাহার মানসিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে পারে।

রাষ্ট্রের কর্তব্য প্রত্যেক নাগরিকদের জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা। প্রত্যেকেরই শিক্ষা লাভ করিবার অধিকার আছে। শিক্ষালাভ না করিলে কেহ ভাল নাগরিক হইতে পারে না।

রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights): গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের কতকগুলি রাজনৈতিক অধিকার আছে। ভোটাধিকার, সরকারী কাজ পাইবার অধিকার, এবং সরকারের নিকট আর্জি পেশ করিবার অধিকার ইহার অন্তর্ভুক্ত। মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদিও ইহার অধীনে পড়ে।

(ক) **ভোটাধিকার** (Right to vote): আধুনিক রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিক নিজের সরকার নির্বাচন করিবার অধিকারী। ইহার অর্থ এই যে, প্রত্যেকের ভোটাধিকার থাকিবে। অবশ্য সকলেই এই অধিকার পায় না। বিদেশী, দেউলিয়া, কয়েকটি বিশেষ অপরাধে অপরাধী, এবং নাবালককে ভোটাধিকার দেওয়া হয় না।

(খ) **সরকারী চাকুরী পাইবার অধিকার** (Right to hold public offices): ইহার অর্থ এই যে, সরকারী চাকুরী লাভ করিতে কোনও নাগরিকের পক্ষেই কোন আইনগত বাধা থাকিবে না।

(গ) **আর্জি পেশ করিবার অধিকার** (Right to petition): আপনার অভাবঅভিযোগ দূর করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকে সরকার অথবা আইনসভার নিকট আর্জি পেশ করিতে পারিবে।

সব রাষ্ট্র হয়ত উপরোক্ত সমস্ত অধিকার স্বীকার করে না। কিন্তু যে রাষ্ট্র যত প্রগতিশীল, সে তাহার নাগরিকের জন্য তত বেশী অধিকার স্বীকার করে। উপরোক্ত অধিকারগুলি যত অধিকমাত্রায় রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হইবে, ততই তাহাকে সু-রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করা যাইবে।

অধিকার ও কর্তব্যের সম্বন্ধ (The relation of rights and duties): আধুনিক রাষ্ট্রে নাগরিকের যেমন কতকগুলি অধিকার আছে, তেমনি কতকগুলি কর্তব্য আছে। কারণ কর্তব্য-পালন না করিলে অধিকার থাকিবে না। নাগরিক যে সকল সুবিধা ভোগ করে, এবং রাষ্ট্র যে সকল সুবিধা তাহাকে দেয়, তাহাই নাগরিকের অধিকার। অধিকার থাকিলেই কর্তব্য থাকে। রাষ্ট্রের কর্তব্য নাগরিকের অধিকার রক্ষা করা। অন্যথায় অধিকার

থাকা না থাকা সমান। যখন একজনের একটি বিষয়ে অধিকার স্বীকৃত হইল, তখন অন্য লোকের কর্তব্য হইতেছে যে, তাহাদের কার্যের দ্বারা ঐ ব্যক্তির অধিকার ব্যাহত না করা। কাজেই একজনের অধিকার স্বীকৃত হইলে, অপরের এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট হইয়া যায়। অন্যেরা ঐ ব্যক্তির অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবে না, এবং রাষ্ট্র কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দিবে না। সুতরাং আমি অধিকার ভোগ করিতে পারিব কি না তাহা অন্যের ও রাষ্ট্রের কর্তব্যপালনের উপর নির্ভর করিতেছে।

অধিকারভোগ হইতে দুইটি কর্তব্য নাগরিকের উপরে আসিয়া পড়ে। নিজে যে অধিকার ভোগ করিতেছে অপরের অনুরূপ অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা প্রত্যেকের কর্তব্য। একজনের ন্যায় আর সকলেরও ঐ সমস্ত অধিকার রহিয়াছে। কাজেই তাহার কর্তব্য অন্যের অধিকার কোনপ্রকার ব্যাহত না করা। দ্বিতীয়ত, বিনামূল্যে অধিকার ভোগ করা যায় না। নাগরিক হিসাবে কর্তব্য সম্পাদন করিবে বলিয়াই প্রত্যেকে কতকগুলি অধিকার পাইয়া থাকে। নাগরিকের অবশ্য করণীয় কাজগুলির জন্যই অধিকারের প্রয়োজন। রাষ্ট্র অধিকার দেয় এই আশাতে যে, প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিবে। সুতরাং প্রত্যেকের কর্তব্য, আপন আপন শক্তির পূর্ণ বিকাশ করিয়া সাধারণের হিতার্থে আত্মনিয়োগ করা।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, অধিকার পাইলেই কর্তব্যও আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। এই কর্তব্য নাগরিকের এবং রাষ্ট্রের। কাজেই অধিকারের সহিত কর্তব্যের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। অধিকার ভোগ করিতে হইলে কর্তব্যপালন করিতে হইবে।

নাগরিকের কর্তব্য (Duties of citizenship): আধুনিক নাগরিকের অধিকার কি, তাহা আলোচিত হইয়াছে। অধিকার এবং কর্তব্য অবিচ্ছেদ্য বলিয়া কর্তব্যগুলি কি তাহার আলোচনা হওয়া দরকার। পৌরনীতিতে আমরা নাগরিকের কর্তব্য লইয়াই আলোচনা করি, কারণ পৌরনীতির উদ্দেশ্য—উন্নততর নাগরিক গড়িয়া তোলা। আপন আপন কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন না করিলে কেহ সুনাগরিক হইতে পারে না। নাগরিকের কর্তব্য নিম্নরূপ:

(ক) **আনুগত্য** (Allegiance): দেশ আক্রান্ত হইলে প্রত্যেক

নাগরিকেয় কর্তব্য দেশ রক্ষার জন্য অগ্রসর হওয়া। নিজের জীবন বিসর্জন দিয়াও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করা তাহার কর্তব্য। সরকারী কর্মচারীকে তাহার কর্ম সম্পাদন করিতে সাহায্য করাও নাগরিকের কর্তব্য। অপরাধ দমন করিতে এবং অপরাধীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পুলিসের সাহায্য করাও প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

(খ) **আইন মান্য করিয়া চলা** (Obedience to laws): আইন মানিয়া চলা নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য। সাধারণের কল্যাণের জন্যই রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে। অতএব প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য আইন মানিয়া চলা। নাগরিকেরা আইন মানিয়া না চলিলে, সরকারী কাজ ভালভাবে চলিতে পারে না।

তাই বলিয়া সর্বপ্রকার আইন বিনা দ্বিধায় মানিতে হইবে, এমন কথা নাই। নাগরিকেরা কোন আইন অমঙ্গলজনক বলিয়া মনে করিলে, তাহার পরিবর্তন অথবা রদ করিবার জন্য ন্যায়সঙ্গত পন্থা অবলম্বন করিতে পারে। আইনানুমোদিত উপায়ে অবাঞ্ছিত আইন সংশোধনের চেষ্টা করাও অবশ্য কর্তব্য।

(গ) **নিয়মিত করদান** (Payment of taxes): প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য নিয়মিত কর দেওয়া। সরকার পরিচালনা করিতে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। লোকে কর না দিলে সরকার পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে।

(ঘ) **ভোটাধিকার ব্যবহার করা** (Honest exercise of the vote): ভোটাধিকারের বিপরীত দিক হইতেছে ঐ অধিকার বিচার করিয়া ব্যবহার করা। নিবাচনের সময়ে ভোট দেওয়া সকলের কর্তব্য। রাজনৈতিক দলগুলির কর্মসূচী মনোযোগ দিয়া অনুধাবন করিতে হইবে, এবং ভোট দানের সময় কোনরূপ লাভালাভের আশা না রাখিয়াই উপযুক্ত প্রার্থীকে ভোট দিতে হইবে। বিচার করিয়া এবং সাধুভাবে ভোটাধিকার ব্যবহার না করিলে নির্বাচনের সময় উপযুক্ত প্রার্থী নিবাচিত হইবে না। অনুপযুক্ত লোক দ্বারা সরকার গঠিত হইলে তাহারা জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করিতে অক্ষম হইবে।

(ঙ) **সরকারী কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা** (Public service): প্রত্যেক নাগরিকের সরকারী কাজ পাইবার অধিকার আছে। আবার

সরকারী চাকুরীয়াদের কর্তব্য হইতেছে, সৎ উপায়ে এবং উৎসাহ সহকারে নিজের কাজ সম্পাদন করা। তাহা ছাড়া প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য, গ্রাম অথবা শহরের সাধারণ বিষয়গুলিতে সক্রিয়ভাবে যোগ দেওয়া।

(চ) নাগরিকের অন্যান্য কর্তব্য আছে। সবসাধারণের বিষয়গুলির প্রতি উদাসীন থাকা কাহারও উচিত নহে। সব সময়ে কেবল মাত্র নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলাও অকর্তব্য। দলাদলির মনোভাব বর্জন করা উচিত। নিজের অধিকার এবং স্বাধীনতা সম্বন্ধে সবদা সচেতন থাকিতে হইবে। নিজের সন্তানদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইবে।

পূবে বলা হইয়াছে, অধিকার অপেক্ষা কর্তব্যের উপর বেশী জোর দিতে হইবে। নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন হইলে, কিছু দিনের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে নাগরিকের অধিকার সমস্তই লুপ্ত হইয়াছে। স্বাধীনতা বজায় রাখিতে সবদা সচেষ্ট থাকিতে হয়। কর্তব্য-সম্পাদনে সর্বদা উন্মুখ না থাকিলে কিছুদিনের মধ্যেই নাগরিকের সকল অধিকার লোপ পাইবে।

ভারতবর্ষে নাগরিক অধিকার (Rights of an Indian Citizenship) : আধুনিক রাষ্ট্রে নাগরিকের কি কি অধিকার আছে, বা থাকা উচিত, তাহা পূবে বলা হইয়াছে। ভাবতবর্ষের নাগরিক কি কি অধিকার ভোগ করে ?

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের পূবে ইংরেজী আমলে আমাদের পৌর অধিকার খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। সরকার যে কোনও সময়ে যাহাকে খুশী গ্রেপ্তার করিয়া অনির্দিষ্ট কাল আটক রাখিতে পারিত। বর্তমানেও অনুরূপ আইন আছে বটে, কিন্তু তাহা কেবলমাত্র দেশের আভ্যন্তরীণ শৃংখলা বজায় রাখিতে প্রয়োগ করা হয়। মত প্রকাশের স্বাধীনতাও তখন ছিল না। খবরের কাগজ ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধানতা নানাভাবে খব করা হইয়াছিল। সংগঠন এবং সাধারণ সভা আহ্বান করাও সম্ভব হইত না। ১৪৪ ধারা জারি করিয়া যে কোনও সময়ে একটি সভা বে-আইনি ঘোষণা করিয়া বন্ধ করিয়া দিবার অধিকার পুলিসের ছিল। অনেক সংঘকে বে-আইনি ঘোষণা করিয়া, তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। কোন আদালতে এইরূপ আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন চলিত না। দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বহুবার নিপীড়িত হইয়াছে। এইরূপে নাগরিকের অধিকার নানাভাবে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে।

বর্তমানে দেশ স্বাধীন হইবার পরেও উপরোক্ত ধরণের কয়েকটি আইন প্রচলিত আছে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বেকার একটি বৎসরের শোচনীয় সাম্প্রদায়িক কলহ এবং পাঞ্জাবের বীভৎস ধ্বংসলীলার কথা স্মরণ রাখিয়া, কিছু দিনের জন্য অনুরূপ আইনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। একটি জাতির হস্ত হইতে আমরা ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছি। এইরূপ ক্ষমতা-হস্তান্তরের সময় সর্ব দেশেই অরাজকতা দেখা দিয়া থাকে। এই অরাজকতা প্রতিরোধ করিবার জন্য সরকারকে কিছু কিছু বিশেষ ক্ষমতা দিতেই হইবে।

সুখের বিষয়, আমাদের নূতন শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকার বলিয়া একটি বিশিষ্ট পরিচ্ছেদ আছে এবং ইহাতে পৌর স্বাধীনতার অধিকার প্রায় সমস্তই মানিয়া লওয়া হইয়াছে। জাতি ধর্মনির্বিশেষে সকলকে সমান অধিকার দেওয়া হইয়াছে। অস্পৃশ্যতা বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছে। ধর্মমতের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সভাসমিতির স্বাধীনতা—সমস্তই মৌলিক অধিকার হিসাবে গণ্য করা হইবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
সুনাগরিক

কাহাকে সুনাগরিক বলিব? কোন্ গুণ থাকিলে একজন সুনাগরিক বলিয়া পরিচিত হইবে? লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন, সুনাগরিকের অন্তত তিনটি গুণ থাকা উচিত—বুদ্ধি, আত্মশাসন এবং বিবেক।

সুনাগরিককে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান হইতে হইবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকেরা ভোট দিয়া সরকারী নীতি নিয়ন্ত্রিত করে। কাজেই সরকারী কার্যনীতি কি হওয়া উচিত ও সবসাধারণের হিতাহিত কিসে হইবে, তাহা বুঝিবার মত বুদ্ধি নাগরিকের থাকা প্রয়োজন। সরকারের বিভিন্ন পদে যাহাতে যথোপযুক্ত ব্যক্তি নিযুক্ত হইতে পারে, তাহা বিচার করিবার মত বুদ্ধিও সুনাগরিকের থাকা প্রয়োজন। সুনাগরিক সুশিক্ষিত হইবে। ভাল-মন্দ বিচার-বোধ এবং সবসাধারণের বিষয় নিরাসক্ত ভাবে বিবেচনা করিতে পারার ক্ষমতা তাহার থাকিবে।

সুনাগরিকের আত্মশাসনের ক্ষমতা থাকা চাই। প্রয়োজন হইলে তাহাকে জনসাধারণের স্বার্থের জন্য নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কোনও একটি ব্যাপারে যদি তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ দেশের স্বার্থের বিপরীত হয়, তাহা হইলে আত্ম-দমন করিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিতে হইবে। গণতান্ত্রিক দেশে সব কিছু ভোট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একজন নাগরিক অধিকাংশের মত হইতে পৃথক মত পোষণ করিতে পারে, এমন কি সেই মত অন্যায় মনে করিতে পারে। কিন্তু এই মত মানিয়া লইবার মত সংযম তাহার থাকা দরকার।

সুনাগরিক নিজের কর্তব্য নিষ্ঠা ও সাধুতার সহিত সম্পন্ন করিবে। সে সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য সম্পাদনের সহায়তা করিতে সব সময়ে প্রস্তুত থাকিবে। ঠিক মত কর দেওয়া এবং সমাজের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত থাকা তাহার অন্যতম কর্তব্য। তাহাকে দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার ও কষ্ট বরণ করিতে হইবে। বিচার করিয়া এবং সাধুভাবে ভোটাধিকার ব্যবহার করিয়া শ্রেষ্ঠ প্রার্থীকে নির্বাচিত করিতে হইবে। সংক্ষেপে বলা

যায় নিজের বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী আপনার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়া সমাজসেবার আদর্শে যে অনুপ্রাণিত হয়, সেই সুনাগরিক।

সুনাগরিক হইবার বাধা (Hindrances to Good Citizenship): মন্দ নাগরিক কে? চরিত্রের কোন্ কোন্ ত্রুটি থাকিলে সুনাগরিক হওয়া যায় না? লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন, উদ্যমহীনতা, স্বার্থপরায়ণতা এবং দলাদলি মনোবৃত্তিই সুনাগরিক হইবার বাধা। যে ব্যক্তি অলস, স্বার্থান্বেষী এবং দলাদলিপ্রিয় সে কখনই সুনাগরিক হইতে পারে না।

উদ্যমহীনতার অর্থ সবসাধারণের বিষয়ে উৎসাহহীনতা। সর্বসাধারণের ব্যাপারে সকলের স্বার্থ জড়িত। সকলের সহযোগিতা দ্বারাই তাহা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যাহা সর্বসাধারণের কাজ তাহা কোন ব্যক্তিবিশেষের কাজ নহে বলিয়া, কেহই সে সম্পর্কে মাথা ঘামায় না। ভাগের মা গঙ্গা পায় না। সকলেই মনে করে যে অপরে উহা করিবে। এই ভাবে প্রত্যেকে সাধারণের কার্যে মনোযোগী হইয়া পড়ে। অনেকে নির্বাচনের সময় ভোট দিতেও যায় না। কেহ কেহ সাধারণের কাজে নিযুক্ত হইতে চাহে না, বা কোন পদপ্রার্থী হইতে চাহে না। দেশের জন্য অস্ত্রধারণ করিতেও সে অস্বীকার করে। সে মনে করে, সাধারণের কাজে তাহার মাথা ঘামানো নিষ্প্রয়োজন। ফলে, এই দাঁড়ায় যে, সাধারণের বিষয় সম্বন্ধে সে আদৌ চিন্তা করে না। কর্মে অলসতা ক্রমে ক্রমে চিন্তাতেও অলসতা আনিয়া দেয়। যদি অধিকাংশ লোকের মধ্যে এইরূপ উদাসীনতা দেখা দেয়, তবে সুশাসন অসম্ভব হইয়া পড়ে। সরকারের কার্যকলাপের উপরে কেহ দৃষ্টি রাখে না বলিয়া, সরকারী চাকুরিয়ারাও তাহাদের কর্মে উদাসীন হইয়া পড়ে এবং শাসনব্যবস্থার গুরুতর অবনতি ঘটে। হয়ত সরকার অত্যাচারী হইয়া উঠিতে পারে। চিরজাগরুক থাকিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হয়। নাগরিক উদাসীন হইয়া পড়িলে তাহার অধিকার লোপ পাইবে।

দুঃখের বিষয়, আধুনিক রাষ্ট্রে এই উদ্যমহীনতা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। আধুনিক রাষ্ট্রের বিরাট জনসংখ্যা তাহার অন্যতম কারণ। লোকে মনে করে, এই কোটি কোটি লোকের মধ্যে সে একা; একা তাহার পক্ষে জনমত প্রভাবান্বিত করা অসম্ভব। নিজেকে এইরূপ অসহায় মনে করিয়া সে সর্বসাধারণের ব্যাপারে উদাসীন হইয়া উঠে। অন্য কারণও অবশ্য আছে।

রাজনীতি অপেক্ষা খেলাধূলা, আমোদপ্রমোদ, ব্যবসাবাণিজ্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি লোককে অধিক আকৃষ্ট করে। এই কারণে তাহারা রাজনৈতিক বিষয় অবহেলা করে এবং সর্বসাধারণের কাজ সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়ে।

সর্বদাই ব্যক্তিগত স্বার্থ অন্বেষণ নাগরিকের একটি বিরাট ত্রুটি। লোকে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সাধারণ স্বার্থের বিরোধী কাজ করে। নিজের স্বার্থের খাতিরে ভোটদাতাকে ঘুষ দিয়া নির্বাচিত হইবার চেষ্টা করে। কিছুদিন ধরিয়া আমাদের দেশে যে ব্ল্যাক মার্কেট চলিয়াছে, তাহার জন্য শুধুমাত্র ব্যবসায়ীরাই দায়ী নহে। আমরা নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করিয়া ব্ল্যাক মার্কেট প্রশ্রয় দিয়াছি। সরকারী কর্মচারীদের সম্বন্ধে যে অসাধুতার অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার জন্য সাধারণ নাগরিকেরাও অনেকাংশে দায়ী। অনেকে ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা ভাবিয়া যেমন টাকার জোরে নির্বাচিত হয়, তেমনি নির্বাচিত হইবার পরও নিজের স্বার্থের কথাই তাহারা ভাবে। কর ধার্যের ব্যাপারে নানা কারসাজী করা, সরকারী চাকুরীতে আত্মীয়-স্বজন এবং নিজের সমর্থকদিগের নিয়োগ করা প্রভৃতি সর্বপ্রকার কুকার্যই তাহাদের পক্ষে সম্ভব।

সু-নাগরিক হইবার পথে দলাদলির স্পৃহা একটি প্রধান বাধা। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছাড়া গণতন্ত্র চলে না। বিভিন্ন দলের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত প্রতিযোগিতা থাকিলে সরকার স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু এই প্রতিযোগিতা সব সময়ে স্বাস্থ্যকর থাকে না এবং সেই জন্য দেশে নানারূপ আপদের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক দলই তখন দেশের স্বার্থের কথা ভুলিয়া দলের স্বার্থের কথা চিন্তা করে। তখন তাহারা এমন কর্মপন্থা বাছিয়া লইবে, যাহাতে দেশের স্বার্থ অপেক্ষা দলের স্বার্থ অধিক রক্ষিত হয়। এইরূপ তীব্র দলীয় মনোভাবের ফলে অনেক সময়েই অবাঞ্ছিত দলগত মারামারি হইতে দেখা যায়।

সুনাগরিক হইবার পথে আরও একটি বাধা আছে। যে অজ্ঞ, সে কখনও সুনাগরিক হইতে পারে না। অজ্ঞ নাগরিক সর্বসাধারণের বিষয়ে কোন কিছু সিদ্ধান্ত করিতে পারিবে না। সুনাগরিককে শিক্ষিত হইতে হইবে।

সুনাগরিককে উপরোক্ত ত্রুটিগুলি দূর করিতে হইবে। সবসাধারণের কাজে তাহার অমনোযোগী হইলে চলিবে না। সহজলভ্য সুশিক্ষা তাহাকে পাইতে হইবে। তাহাকে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিতে হইবে। তাহাকে অনাবশ্যক দলাদলির ঊর্ধ্বে থাকিতে হইবে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

আইন ও স্বাধীনতা Law & liberty

একটি সংঘ গঠিত হইলেই তাহার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কিছু কিছু নিয়ম প্রণয়ন করা হয়। সংঘের সভ্যেরা সেই নিয়ম মানিয়া চলে। এই নিয়মগুলি অবশ্য সংঘের প্রত্যেক অথবা অধিকাংশ সভ্যের সমর্থনেই গঠিত হয়। কিন্তু নিয়ম একবার গঠিত হইলে প্রত্যেক সভ্য তাহা মানিতে বাধ্য।

রাষ্ট্রও একটি সংঘ। নিজের কর্মক্ষেত্র নির্ধারিত করিতে এবং নাগরিকদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করে। এই নিয়মগুলিই আইন। যে নিয়মকানুন রাষ্ট্রের কর্মসূচী নির্ধারিত করিয়া নাগরিকের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে তাহাকে আইন বলে। দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করিবার ইচ্ছা হইলে, রাষ্ট্র প্রথমে আইন পাস করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের কাজ নিজে গ্রহণ করে। অতএব আইনের দুইটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, নিয়মগুলির দ্বারা জনসাধারণের কাজ নিয়ন্ত্রিত করা হয় এবং দ্বিতীয়ত ঐ নিয়ম রাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থিত হওয়া চাই। কেহ ঐ নিয়ম অমান্য করিলে সরকার তাহাকে শাস্তি দিবে।

আইনের উৎস (Sources of Law): আধুনিক রাষ্ট্রে আইন-প্রণয়নের ভার বিধানপরিষদের উপর ন্যস্ত থাকে। কোন বিষয়ে আইন করার প্রয়োজন হইলে, আইনের খসড়াটি বিধানপরিষদে পেশ করা হয়। পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে আইনটি প্রণয়ন করা হয়। বিধানপরিষদই আইনের প্রধান উৎস সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্যান্য সূত্র হইতেও আইনের সৃষ্টি হইয়াছে।

দেশের প্রচলিত রীতিনীতি (Customs) হইতে বহু আইনের জন্ম হইয়াছে। কালক্রমে লোকে বহু বিষয়ে প্রচলিত রীতি মানিয়া চলে। রাষ্ট্র এই নীতি গ্রাহ্য করে এবং তাহা প্রবর্তিত রাখিতে সহায়তা করে। হিন্দু আইন অনেক স্থলেই কেবলমাত্র রীতিনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

আদি যুগে ধর্ম হইতেই অনেক আইনের সৃষ্টি হইয়াছে। বিভিন্ন ধর্মে কতকগুলি নিয়ম প্রচলিত থাকে। যে যে ধর্মে বিশ্বাস করে, সে সেই ধর্মের নিয়ম মানিয়া চলে। পরে এই নিয়মগুলি আইন হিসাবে গৃহীত হয়।

পণ্ডিতেরা কোন কোন রীতি অথবা ধর্মের নিয়ম লইয়া যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেও অনেক আইনের প্রচলন হয়। তাঁহারা রীতি ও ধর্মানুষ্ঠানের নিয়ম আলোচনা করিয়া ভাষ্য করেন এবং কখনও কখনও রীতি পরিবর্তিত করিবার নিদেশ দেন। এই ভাষ্য এবং পরিবর্তিত রীতি অনেক সময় আদালতে মানিয়া লওয়া হয় এবং তাহা কালক্রমে আইন হিসাবে গণ্য হয়। হিন্দু ও মুসলমানের আইন এই প্রকার ভায্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুদের মধ্যে মনু, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি পণ্ডিতদের ভাষ্য আইন হিসাবে গৃহীত। মুসলমান ধর্মে এই ভাষ্য হাদিজ নামে পরিচিত। হাদিজের নিদেশও আইন হিসাবে স্বীকৃত।

বিচারকেরাও অনেক সময়ে আইন সৃষ্টি করেন। মকদ্দমা বিচার করিতে গিয়া বিচারকদের আহনের ব্যাখ্যা করিতে· হয়। এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বিচারকেরা অনেক সময়ে আইন পরিবর্তিত করেন। আইনের আমলে পড়ে না, এমন বিষয়েও অনেক সময়ে বিচারককে রায় দিতে হয়। এইভাবে বিচার-সৃষ্ট আইনও যথেষ্ট আছে।

ন্যায় হইতেও আইনের উদ্ভব হয়। ইহাকে ইংরাজীতে Equity বলে। যে সমস্ত বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট আহন থাকে না তাহা বিচারকেরা অনেক সময় কেবলমাত্র ন্যায়ের দিক হইতে বিচার করেন। তাঁহারা রায় দিতে গিয়া দেখাইতে পারেন যে, কোন আইনের বিশেষ ধারা ন্যায়সঙ্গত নহে। এইরূপ ন্যায়ের আলোচনা দ্বারাও আইন সংশোধিত হয়।

আইন এবং নীতি (Law and Morality) : আইন ও নীতিজ্ঞানের সম্বন্ধ কি? নীতিজ্ঞান মানুষের আচরণ ও চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করে। আইন লোকের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। কাজেই উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। অনেক সময়ে নীতিশাস্ত্রের সূত্র হইতে আইনের সৃষ্টি হয়। যাহা নীতিবিগর্হিত, আইনও তাহা প্রতিরোধ করে। ব্যাভিচার নীতির দিক হইতে নিন্দনীয়। আইনেও ইহা নিষিদ্ধ। যাহা নীতির দিক হইতে নিন্দনীয়, তাহা অনেক সময়েই বে-আইনী ঘোষিত হয়। অনেক ক্ষেত্রেই আইন নীতিজ্ঞানের অনুগমন করে। তাই প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন বলিয়াছেন যে, "আইন দেশের নৈতিক প্রগতির দর্পণ"।

কিন্তু এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও, আইন এবং নীতির মধ্যে অনেক

প্রভেদ রহিয়াছে। প্রথমত, আইন রাষ্ট্র দ্বারা সমর্থিত। আইন অমান্য করিলে অমান্যকারীকে রাষ্ট্র শাস্তি দিবে। কিন্তু নীতি এভাবে কাহারও দ্বারা সমর্থিত নহে। নৈতিক নিয়ম লংঘন করিলে বিবেকের দংশন পাইতে হইতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র এই জন্য লংঘনকারীকে শাস্তি দেয় না। দ্বিতীয়ত, আইন এবং নীতির ক্ষেত্রও স্বতন্ত্র। মানুষের বাহিরের কার্য আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু লোকের চিন্তা কখনই আইন দ্বাবা নিয়ন্ত্রিত করা হয় না। কেহ হয়ত মনে মনে রাজদ্রোহমূলক চিন্তা কবিতে পারে। কিন্তু সে যতক্ষণ এই চিন্তা প্রকাশ না করে, কিংবা কার্যে পরিণত না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্র তাহাকে শাস্তি দিবে না। কিন্তু নীতিবোধ মানসিক চিন্তা এবং বাহিরের কাজ উভয়কেই নিয়ন্ত্রিত করে। অপরের অহিত চিন্তা করা নীতির দিক হইতে দোষণীয়। কিন্তু এই কারণে রাষ্ট্র কাহাকেও শাস্তি দেয় না। যদি কেহ অহিত চিন্তা কার্যে পরিণত করে, তবেই তাহা আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ, এবং তাহা শাস্তি পাইবার যোগ্য।

আর একটি বিষয়ে নীতি এবং আইনের ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। আইনে এমন অনেক বাধা আছে, যাহা নীতির দিক হইতে আদৌ নিন্দনীয় নহে। একজন যদি রাস্তার ডান দিক দিয়া তাহার গাড়ী চালায়, তাহা নীতির দিক হইতে হয়ত নিন্দনীয় হইবে না। কিন্তু তাহার এই কাজ আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ। বে-আইনি কাজ মাত্রই নীতি-বিগর্হিত নহে। আবার নীতিবিগর্হিত কাজ মাত্রেই বে-আইনী নহে। অন্য লোকের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হওয়া নীতি-বিগর্হিত। কিন্তু তাহা আইন বিরুদ্ধ নহে। সুতরাং আইন ও নীতির মধ্যে বহু পার্থক্যও রহিয়াছে।

স্বাধীনতা: স্বাধীনতা কথাটির অর্থ হইতেছে স্ব অর্থাৎ নিজের অধীনতা। নিজের স্বাধীনতা তখনই থাকিবে, যখন পরের অধীনতা সবপ্রকারে দূর হইবে। সাধারণ ভাষায় স্বাধীনতার অর্থ হইতেছে, খুশীমত চলিবার ও কাজ করিবার অধিকার। সেই স্বাধীন, যে আপনার খুশীমত কাজ করিতে পারে।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে এই ধারণা অতি মারাত্মক ভুল। এই অর্থে স্বাধীনতা কোন দেশে কাহারও নাই, থাকিতেও পারে না। নিজের খুশীমত যাহা ইচ্ছা করাকে উচ্ছৃংখলতা বলে। স্বাধীনতা অর্থ উচ্ছৃংখলতা নয়। বিনা বাধায় যাহা খুশী করিতে পারার ক্ষমতাকে স্বাধীনতা বলে না। কেন না, তাহা হইলে

একজন আর একজনকে খুন করিতে, অথবা তাহার সর্বস্ব কাড়িয়া লইতে পারিবে। এইরূপ কাজ করিতে দেওয়া উচিত নয়। বাস্তবক্ষেত্রে কেহই সর্বদা খুশীমত কাজ করিতে পারে না। তাহা হইলে শক্তিমান লোক দুর্বলের উপর অত্যাচার করিবে। ফলে দুর্বলের কোন স্বাধীনতা থাকিবে না। সকলেই যাহাতে সমানভাবে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে সকলের কার্যের উপরে কতকগুলি প্রয়োজনীয় বাধা আরোপ করা হয়। কোন ব্যক্তি অপরের ধনসম্পত্তি হরণ করিতে, অথবা তাহার প্রাণহানি করিতে পারিবে না। কেহ ইহা করিতে গেলে রাষ্ট্র তাহাতে বাধা দিবে। এইরূপ বাধা না থাকিলে, প্রকৃত স্বাধীনতা উপভোগ সকলের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিবে না। সকলের উপরে বাধা-নিষেধ আরোপ করিবার অর্থ ইহা নহে যে, তাহাদের স্বাধীনতা সংকুচিত হইল। অবশ্য এইরূপ বাধা-নিষেধ যদি অন্যায় ভাবে আরোপিত হয়, তবে স্বাধীনতা ব্যাহত হইতে পারে। কিন্তু সকলের সুবিধার জন্য যে সমস্ত বাধা আরোপ করা হয়, তাহাতে স্বাধীনতার কোন হানি হয় না। অতএব বাধা-নিষেধের অভাবকেই, কিংবা খুশীমত কাজ করার অধিকারকে স্বাধীনতা বলে না। বাধা-নিষেধ থাকিলেই স্বাধীনতা নষ্ট হয় না।

স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হইতেছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য পূর্ণ বিকাশ করিবার অধিকার ও সুযোগ থাকিবে। রাষ্ট্র যখন এই পূর্ণ বিকাশের সর্বপ্রকার সুযোগ দেয়, তখনই প্রকৃত স্বাধীনতা আছে বুঝিতে হইবে। "দেশের আইন যখন নাগরিকের ব্যক্তিত্বের পূর্ণতম বিকাশ করিতে সহায়তা করে, তখন প্রকৃত স্বাধীনতা আছে বলা যায়।"

স্বাধীনতা ও আইন (Law and Liberty) : সাধারণ লোকে মনে করে যে স্বাধীনতার অর্থ নিজের খুশীমত কাজ করিবার ক্ষমতা। রাষ্ট্র সর্বদাই নানা আইনের বন্ধনে নাগরিককে বাঁধিয়া রাখিতেছে। প্রতি পদে আইন মানিয়া চলিতে গেলে খুশীমত কিছুই করিবার উপায় থাকে না। কাজেই রাষ্ট্র এবং তাহার আইন স্বাধীনতা ব্যাহত করে। আইন থাকিলে ব্যক্তিস্বাধীনতা ব্যাহত হয়।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আইন এবং স্বাধীনতার মধ্যে কোন বিরোধ নাই। আইন প্রত্যেকের কার্যের উপর নানাবিধ বাধা-নিষেধ আরোপ করে, জনসাধারণকে বহু কার্য হইতে বিরত থাকিতে বলে, ইহা অবশ্য সত্য। কারখানা আইনে

আছে যে, শ্রমিককে দিনে আট ঘণ্টার বেশী কাজে লাগানো যাইবে না; সপ্তাহের সাতদিনই তাহাকে কাজে লাগানো চলিবে না। তাহাকে অন্তত একদিন ছুটি দিতে হইবে। বার বছরের ছোট শিশুদের কারখানার কাজে লওয়া যাইবে না, ইত্যাদি। এই সব আইন কারখানা-মালিকের এবং শ্রমিকের খুশীমত কাজ করাতে বাধা দেয়। কিন্তু ইহা কি শ্রমিক অথবা মালিকের স্বাধীনতার হ্রাস করিয়াছে? বরঞ্চ এই আইনের ফলে শ্রমিকদের স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাষ্ট্র বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় অল্প সংখ্যক লোকের কার্যে প্রয়োজনমত বাধা দিতে পারে। এই বাধা অধিকাংশের স্বাধীনতা ব্যাহত করে না, স্বাধীনতার সীমা নির্দেশ করে।

আইনের দ্বারা ব্যক্তিস্বাধীনতা হ্রাস পায় না, বরং আইনদ্বারাই ব্যক্তি-স্বাধীনতার সৃষ্টি এবং রক্ষা হয়। নিঃস্ব শ্রমিককে অবাধ শোষণের অধিকার কখনই স্বাধীনতা নহে। কারখানা আইনেই মালিকের শোষণ ক্ষমতা ব্যাহত করিয়া প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকের স্বাধীনতা সৃষ্টি করে। রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করিয়া নাগরিকের অধিকার এবং কর্তব্য কি কি, তাহা বলিয়া দেয়। আইনের উদ্দেশ্য প্রত্যেক নাগরিককে সমান অধিকার এবং সুযোগ দেওয়া। নিজের অধিকার কি ভাবে, কাহার বিরুদ্ধে, অথবা কতখানি দাবী করা চলিবে, অপরের অনুরূপ অধিকারের সাহত কি ভাবে সামঞ্জস্য রাখিতে হইবে, তাহাই আইন দ্বারা বিধিবিদ্ধ করা হয়। আইনের উদ্দেশ্য মানুষের ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেওয়া। তাই বলা হয় যে, আইনই স্বাধীনতা সৃষ্টি করে।

স্বাধীনতা ও কর্তৃপক্ষ (Liberty and Authority or Sovereignty): স্বাধীনতার অর্থ যদি নিজের খুশীমত কাজ করিবার ক্ষমতা ধরা যায় তবে কোনরূপ কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব স্বাধীনতার পরিপন্থী। কর্তৃপক্ষকে মানিয়া চলিতে হইলে স্বাধীনতা কোথায় থাকিল? নাগরিককে যদি প্রতি পদে রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষকে মানিতে হয় তবে সে খুশীমত কাজ করিতে পারে না।

এই মত স্বাধীনতা সম্বন্ধে ভুল ধারণা হইতে উদ্ভূত। স্বাধীনতার অর্থ বাধা-নিষেধের অভাব নহে। সকলের খুশীমত কাজ করিবার অধিকার থাকিলে দেশে অরাজকতা উপস্থিত হইবে। ধনী ও শক্তিমান লোক দুর্বলের উপর অত্যাচার করিবে। ফলে অধিকাংশ লোকেরই কোন স্বাধীনতা বা অধিকার থাকিবে না। কারণ অধিকাংশ লোকই গরীব। কর্তৃপক্ষ না থাকিলে খুনী বা ডাকাতকে

কেহ শাস্তি দিতে পারিবে না। এইরূপ অবস্থায় প্রকৃত স্বাধীনতার কোন অস্তিত্বই থাকে না। দেশে এমন কেহ বা কোন প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন যে বা যাহা দুর্বলকে রক্ষা করিবে ও ধনীর স্বেচ্ছাচারিতায় বাধা দিবে। রাষ্ট্রই সেই প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের প্রধান কাজ হইতেছে ইহা দেখা যে দেশে দুর্বল অথবা ধনী সকলেই সমান স্বাধীনতা উপভোগ করে। প্রত্যেকের কাজে কিছু কিছু বাধা-নিষেধ আরোপ করিলে তবে সকলের পক্ষে সমান স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব। ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা এই সব বাধা-নিষেধের উদ্দেশ্য নহে, বরং সকলকে সমান স্বাধীনতা ভোগ করিবার সুবিধা দেওয়াই ইহার লক্ষ্য। এক দল লোক একটি সংঘ গঠন করিলে, কাজের সুবিধার জন্য কয়েকটি নিয়ম প্রণয়ন করে। সভ্যদের সেই নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। ইহাতে কি সভ্যদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হইল বলা যায়? যাহাতে সভ্যদের প্রত্যেকের সুবিধা হয় ও সংঘের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তাহার জন্যই নিয়মগুলি করা হয়। রাষ্ট্রের সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। রাষ্ট্র সর্বসাধারণের কল্যাণ সাধনের জন্য একটি মিলিত সংঘ। রাষ্ট্র যে নিয়মকানুন তৈয়ারী করে তাহার নাম আইন। এই আইনগুলির দ্বারা রাষ্ট্র ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করে।

স্বাধীনতা বজায় রাখিতে হইলে কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্র বা কোন কর্তৃপক্ষ না থাকিলে দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হইবে। একে অপরের হানি করিবে। দুষ্ট লোকের কার্যে বাধা দিবার কেহ থাকিবে না। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের মধ্যেই স্বাধীনতা থাকা সম্ভব। রাষ্ট্র দুর্বলকে রক্ষা করিয়া সবলকে বাধা দেয়। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকাতেই প্রত্যেকের পক্ষে সমান সমান অধিকার ও সুযোগ লাভ করা সম্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্রই স্বাধীনতার সৃষ্টি করে ও তাহা রক্ষা করে।

স্বাধীনতার রক্ষাকবচ (Safeguards of liberty) : পৃথিবীর সর্বদেশে সকল লোক স্বাধীনতাকে অমূল্য সম্পদ বলিয়া মনে করে। যদি স্বাধীনতা না থাকে, তবে লোকের ক্ষমতা বিকাশ লাভ করে না। যদি প্রতি পদে পদে নাগরিকের কাজ, গতিবিধি অথবা কথাবার্তার উপরে স্বৈরাচারী সরকার বাধা দান করে, তবে জীবনে আকর্ষণীয় কিছু থাকে না। এই জন্য অনেক দেশেই ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা হইয়া থাকে।

একনায়কত্ব যে দেশে আছে সেখানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকিতে পারে না।

মতামত প্রকাশ করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিলে, একনায়কের কাজ সমালোচনা করিবার এবং তাহার বিরোধিতা হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য একনায়কেরা নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখিতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা নানাভাবে খর্ব করিয়া থাকে। নাৎসী জার্মানীতে কোন ব্যক্তি-স্বাধীনতা ছিল না। একমাত্র গণতান্ত্রিক দেশেই ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকা সম্ভব, কারণ গণতন্ত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা সাধারণের হাতে।

গণতন্ত্রেও যে পূর্ণ স্বাধীনতা সর্বদা বজায় থাকে, একথা বলা যায় না। ক্ষমতা অনেক সময়েই লোকের মন দূষিত করে। ক্ষমতায় গর্বিত হইয়া মন্ত্রী এবং কর্মচারীরা অনেক সময়ে এমন কাজ করে, যাহাতে ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব হয়। এই জন্য রাষ্ট্রের সংবিধানে এমন ব্যবস্থা থাকে, যাহা দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষিত হইতে পারে।

এই রক্ষাকবচের একটি হইতেছে সরকারের তিনটি বিভাগের পৃথকীকরণ। রাষ্ট্রের ক্ষমতা আইনপ্রণয়ন, শাসনপরিচালনা এবং বিচার এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়। কোনও ব্যক্তিবিশেষকে এই তিনটি বিষয়ে ক্ষমতা একত্রে না দিয়া, পৃথক পৃথক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতাগুলি দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি বিভাগের পরিচালক একে অপর হইতে স্বাধীন থাকিবে। তাহা হইলে সরকারের কোন একটি প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিলে অপর বিভাগীয় পরিচালকের দ্বারা ইহার প্রতিকার হইবার সম্ভাবনা থাকে। যদি পরিচালন-বিভাগের কর্তৃপক্ষ ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে, তাহা হইলে বিচারবিভাগে অথবা আইনপরিষদে আবেদন করিয়া প্রতিবিধান করা যাইতে পারে। কিন্তু এই তিনটি বিভাগের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ সম্ভবও নহে, কাম্যও নহে। কাজেই ক্ষমতা স্বতন্ত্র অংশে বিভক্ত করা সম্ভব নহে। ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ ক্ষমতা বিভাগ যে একান্ত প্রয়োজন, তাহাও বলা যায় না। ইংলণ্ডে শাসন, আইন এবং বিচার একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হস্তে ন্যস্ত আছে। কিন্তু তাহাতে সে দেশে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ব্যাহত হয় নাই।

প্রকৃতপক্ষে যে বিষয়টি নিতান্তই প্রয়োজন, তাহা হইতেছে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা। বিচারক কতদিন কাজ করিতে পারিবে, তাহা আইনপরিষদ অথবা শাসকমণ্ডলীর ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিবে না। তাহা হইলে বিচারকেরা শাসকের স্বেচ্ছাচার হইতে নাগরিককে রক্ষা করিতে পারিবে না। বিচারক

যদি সৎ এবং নির্ভীক হয়, তাহা হইলেই তাহার দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব।

অনেক দেশে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে কয়েকটি মৌলিক অধিকার (Fundamental rights) সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে, প্রত্যেক নাগরিকেরই মতামত প্রকাশের এবং সংঘ গঠনের স্বাধীনতা থাকিবে। তাহার কাজ পাইবার অধিকার এবং শিক্ষা লাভ করিবার অধিকার আছে। আমেরিকা, আয়ার এবং রাসিয়ার সংবিধানে এইরূপ বিধান আছে। ভারতবর্ষের সংবিধানেও কতকগুলি মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

সংবিধানে এইরূপ কয়েকটি বিধান থাকিলেই যে ব্যক্তিস্বাধীনতা অব্যাহত থাকিবে, তাহা বলা যায় না। প্রত্যেক বিধানের আবার ব্যতিক্রম রাখা হয়। যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি জরুরী অবস্থায় এই সব অধিকার বহাল থাকিবে না, এইরূপ নির্দেশও সংবিধানে থাকে। এই ব্যতিক্রমের অপব্যবহার অনেক সময়েই হইয়া থাকে। হিটলার ক্ষমতা লাভ করিবার পরে জার্মানীতে এই অধিকার উঠাইয়া দেওয়া হয়। অনেক ইংরাজ লেখক দাবী করেন যে, তাঁহাদের দেশে যে "আইনের শাসন" (Rule of Law) প্রচলিত আছে, তাহা স্বাধীনতার রক্ষক। আইনের শাসন কথাটির অর্থ এই যে, নিঃস্ব অথবা ধনী সকলেই আইনের দৃষ্টিতে সমান। প্রধান মন্ত্রী অথবা একজন সাধারণ লোক, যেই হউক না কেন, আইন সকলের উপরেই সমানভাবে প্রযোজ্য। তাই দেশে সকলেই সমান স্বাধীনতা উপভোগ করে। ব্রিটিশ আইনে আরও একটি বিধান আছে, যাহার ফলে কোনও ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করা যায় না। কোন ব্যক্তিকে যদি অন্যায়ভাবে জেলে বন্দী রাখা হয়, তবে সে "হেবিয়াস কার্পাস" আইন অনুযায়ী আদালতে দরখাস্ত করিতে পারে। তখন আদালত তাহাকে বন্দী করিবার কারণ অনুসন্ধান করিবে। যদি দেখা যায় যে, আইন অনুযায়ী তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই, তাহা হইলে আদালত তাহাকে মুক্তি দিবার আদেশ দিবে।

স্বাধীনতার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ হইতেছে দেশবাসীর স্বাধীনতা-স্পৃহা। ইংলণ্ডের সংবিধানে নাগরিক অধিকার কিছু নির্দিষ্ট হয় নাই, সরকারের বিভাগত্রয়ও সে দেশে বিভক্ত নহে। তথাপি ইংলণ্ডে ব্যক্তি-স্বাধীনতা

পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। কারণ সে দেশের জনসাধারণ ব্যক্তি-স্বাধীনতায় সামান্যতম হস্তক্ষেপও সহ্য করিবে না। সদা জাগরূক থাকিলেই স্বাধীনতা রক্ষিত হয়। স্বাধীনতায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ কখনই সহ্য করা উচিত নহে, এবং সকলকেই নিজের অধিকার বজায় রাখিতে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

স্বাধীনতার শ্রেণীবিভাগ : সাধারণত, স্বাধীনতার পাঁচটি শ্রেণীবিভাগ করা হয়। যথা : প্রাকৃতিক স্বাধীনতা, নাগরিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, জাতীয় স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা।

সমাজের জন্ম হইবার পূবে প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ যে স্বাধীনতা ভোগ করিত, তাহাকে প্রাকৃতিক স্বাধীনতা (Natural liberty) বলা হইত। রুসো তাঁহার সামাজিক-চুক্তি-মতবাদে বলিয়াছেন, প্রাকৃতিক অবস্থায় একমাত্র খাঁটি স্বাধীনতার অস্তিত্ব সম্ভব; রাষ্ট্র গঠিত হইবার পরে এই স্বাধীনতা লোপ পাইয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতা সম্পর্কে এই ধারণা যে ভ্রান্ত, তাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। রাষ্ট্রই প্রকৃত স্বাধীনতা সৃষ্টি করে।

নাগরিক স্বাধীনতার (Civil liberty) অর্থ, নাগরিকের অধিকার উপভোগ করার ক্ষমতা। রাষ্ট্র নাগরিককে কয়েকটি অধিকার দেয়—যথা, প্রাণরক্ষা করিবার অধিকার, স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার, ধনসম্পত্তি ও চুক্তিবদ্ধ হইবার অধিকার, ইত্যাদি। এই সকল অধিকারে অপর কেহ যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে না পারে, রাষ্ট্র সেদিকে দৃষ্টি রাখে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতার (Political liberty) অর্থ দেশের লোকের নিজেদের গভর্ণমেণ্ট নিজেরাই গঠন করিবার অধিকার থাকিবে। প্রত্যেক নাগরিকের ভোটাধিকার এবং সরকারী পদে নিযুক্ত হইবার অধিকার থাকিলেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা আছে বলা যায়। একমাত্র গণতন্ত্রেই রাজনৈতিক স্বাধীনতার অস্তিত্ব আছে।

জাতীয় স্বাধীনতার (National liberty) অর্থ পরাধীনতা হইতে দেশের মুক্তি। বিদেশী শাসন হইতে যে দেশ মুক্ত সেখানেই জাতীয় স্বাধীনতা আছে। ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন। রাজনৈতিক স্বাধীনতা জাতীয় স্বাধীনতা ব্যতীত সম্ভব নহে। যদি জাতীয় স্বাধীনতা না থাকে, তবে কাহারই কোনও নাগরিক স্বাধীনতা ভোগ সম্ভব নয়। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, জাতীয় স্বাধীনতাই আর সকল প্রকার স্বাধীনতার ভিত্তি।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (Economic liberty) বলিতে অভাব ও ভয় হইতে মুক্তি বুঝিতে হইবে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট যে চতুর্বর্ণ স্বাধীনতার কথা বলিয়াছেন, ইহা তাহারই দুইটি। কাজ পাওয়া, কাজের সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া, বেকার অবস্থায় সাহায্য, উপযুক্ত মজুরী লাভ, ইত্যাদির ব্যবস্থা রাষ্ট্র করিবে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত অন্য স্বাধীনতা অর্থহীন। যে ক্ষুধায় কাতর, সর্বদা বেকার হইবার ভয়ে শংকিত, তাহার কাছে অন্য স্বাধীনতার কোন মূল্য নাই। জীবিকা-অর্জন এবং জীবনযাত্রানির্বাহ নিয়োগ-কর্তার খুশীর উপর নিভর করিলে স্বাধীনতা অর্থহীন হইয়া পড়ে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সাম্য

সাম্য ও স্বাধীনতা গণতন্ত্রের ভিত্তি। স্বাধীনতার স্বরূপ ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদে সাম্যের অর্থ কি, তাহাই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে এবং সাম্য ও স্বাধীনতার মধ্যে সম্বন্ধ নির্দিষ্ট হইবে।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে, সাম্যের অর্থ এই যে প্রত্যেক ব্যক্তি সমান, প্রত্যেকের সমান সমান আয় থাকিবে এবং প্রত্যেকে সমান ব্যবহার পাইবে। কিন্তু সাম্যের এইরূপ অর্থ করা ঠিক নহে। প্রত্যেক মানুষ কখনই সমান নহে। প্রকৃতি এক একজন লোককে এক এক রকম ক্ষমতা দিয়া থাকে। কেহ কবি প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করে, কেহ হয় শিল্পী, কেহ বা বড় বাস্তুকার। আবার অধিকাংশ লোকেরই বিশেষ কিছু ক্ষমতা থাকে না। কাজেই সব মানুষ সমান ক্ষমতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহা বলা যায় না। সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, সবপ্রকার বিশেষ সুবিধাভোগ বন্ধ করিতে হইবে। রাষ্ট্রের কর্তব্য জাতিধর্ম অথবা আর্থিক সঙ্গতি নির্বিশেষে সকলকে সমান নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া ও আইনের দৃষ্টিতে সকলকে সমান করিয়া দেখা।

সাম্যেরও আর একটি দিক আছে। কেবলমাত্র বিশেষ সুবিধা বন্ধ করিলেই সাম্যের প্রতিষ্ঠা হয় না, প্রত্যেকের নিজ নিজ বিশেষ ক্ষমতা বিকাশ করিবার যথেষ্ট সুযোগ দিতে হইবে। তাই বলিয়া, প্রত্যেককে একই রকম সুযোগ দিতে হইবে, এমন কথা নাই। রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশ বসু, দুইজনকেই কবি হিসাবে, অথবা বৈজ্ঞানিক হিসাবে শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ দিতে হইবে, এমন কথা বলা হাস্যকর। তাহাকে সাম্য বলে না। সাম্যের অর্থ এই যে, দেশের প্রত্যেককে যথেষ্ট এবং যথোপযুক্ত সুযোগ দিতে হইবে, যাহাতে প্রত্যেকে নিজ নিজ বিশেষ ক্ষমতা বিকাশ করিতে পারে। কাহারও যদি বাস্তুকার হইবার স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকে, তবে তাহার বাস্তুকার হইবার পথে কোন বাধা সৃষ্টি করা চলিবে না। রাষ্ট্রের সহায়তায় কোনও বাস্তুকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়া সে যাহাতে তাহার ক্ষমতার সম্যক্ বিকাশ করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

প্রত্যেকের নিজ নিজ ক্ষমতা বিকাশের সুযোগ পাইলে, সাম্যের নীতি স্বীকৃত হইল বলা যায়।

সাম্যের এইরূপ অর্থ করিলে স্বাধীনতার সহিত উহার কোন পার্থক্য অথবা বিবোধ থাকে না। সাম্য ছাড়া স্বাধীনতা সম্ভব নহে। তেমনি আবার সাম্য বাদ দিয়া স্বাধীনতা সম্ভব নহে। স্বৈরাচারী রাষ্ট্রে হয়ত সকলকে সমান ব্যবহার করা হইতে পারে, (যদিও তাহা অসভব বলিয়া মনে হয়)—তথাপি মানুষের পূর্ণতম বিকাশের সুযোগ সে দেশে নিতান্তই কম। স্বাধীনতা ব্যতীত ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় না।

বিভিন্ন শ্রেণীর সাম্য ঃ স্বাধীনতার মত সাম্যকেও পাঁচভাগে ভাগ করা হয়। যথা—প্রাকৃতিক, নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক। প্রাকৃতিক সাম্য কথাটি হইতে মনে হয় যেন, ভগবানের ইহাই অভিপ্রায় যে প্রত্যেকেই জন্মকালে সমান গুণাবলী লইয়া জন্মিবে। কিন্তু এইরূপ ধারণা পোষণ করিয়া কোন লাভ নাই। প্রকৃতি সকলকে সমান গুণাবলী দিয়া পৃথিবীতে পাঠায় না। দেখা যায় যে, জন্মকাল হইতেই প্রত্যেকের ক্ষমতা ভিন্নরূপ।

যে দেশে প্রত্যেক নাগরিক সমান সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করে, সেখানেই নাগরিক সাম্য আছে।

রাজনৈতিক সাম্যের অর্থ এই যে, প্রত্যেক নাগরিককে সমান রাজনৈতিক অধিকার দিতে হইবে। জাতি, ধর্ম, স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে সকলের ভোটাধিকার প্রভৃতি ক্ষমতা থাকিবে।

জাতি, ধর্ম, অথবা বিত্ত দিয়া সমাজে যদি পরিচয় না হয়, তাহা হইলে সামাজিক সাম্যের অস্তিত্ব আছে বলা যায়। সমাজে ধনী, নির্ধন, কালা, ধলা, সকলে সমান। সমাজ যদি শ্রেণীতে অথবা জাতিতে বিভক্ত থাকে, তবে সামাজিক সাম্য ব্যাহত হয়।

অর্থনৈতিক সাম্য কথাটি হইতে বুঝা যায় যে, প্রত্যেকের আয় ও বিত্ত সমান সমান হইবে। এই আদর্শ কোন দেশেই গ্রাহ্য হয় নাই। এমন কি রাসিয়াতেও না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগ ও ক্ষমতা বিভাজন

গভর্ণমেণ্টের কাজ সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়—যথা আইন প্রণয়ন, শাসন ও বিচার। আইনবিভাগের কাজ প্রধানত আইন প্রণয়ন করা; শাসনবিভাগ এই সব আইন বহাল রাখিবার ব্যবস্থা করে; বিচারবিভাগের কাজ আইনের ব্যাখ্যা করা এবং আইনভঙ্গকারীদের অপরাধ বিচার করা। এই তিনটি কাজের জন্য আইনপরিষদ, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ এই তিনটি বিশেষ বিভাগ আছে।

আইনপরিষদে আইন প্রণয়ন করা হয়। শাসনবিভাগ এই আইন প্রচলিত করিবার সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করে এবং কেহ আইন অমান্য করিলে তাহাকে বিচারবিভাগের সম্মুখে উপস্থিত করে। বিচারবিভাগ তখন সমস্ত শুনিয়া সে অপরাধী কিনা তাহা স্থির করে এবং অপরাধীকে যথোপযুক্ত শাস্তি দেয়।

ক্ষমতা বিভাজন (Separation of Powers): নীতি, আইন, শাসন এবং বিচার, গভর্ণমেণ্টের এই তিনটি কাজ ইহা আমরা জানি। এই তিনটি বিভাগের পরস্পরের সহিত কি সম্বন্ধ থাকিবে? ক্ষমতাবিভাজন নামে একটি মতবাদে এই সমস্যার আলোচনা করা হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী লেখক মণ্টেস্কু (Montesquieu) এবং ইংরেজ লেখক ব্ল্যাকস্টোন এই মতের প্রবর্তন করেন।

মণ্টেস্কু বলেন যে, গভর্ণমেণ্টের ত্রিবিধ কাজ তিনটি বিভিন্ন বিভাগের বা ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করা উচিত। প্রত্যেকটি বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিবে। তাহা হইলে জনসাধারণের উপরে কোন অত্যাচার সম্ভব হইবে না। এক অথবা একাধিক লোক সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হইলে, স্বেচ্ছাচারিতা প্রশ্রয় পাইবে। প্রাচীন কালে রাজা সকল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তখনকার দিনে স্বেচ্ছাচারী রাজার উৎপীড়ন কাহিনী সকল দেশের ইতিহাসেই পাওয়া যায়। রাজারাই নিজের সুবিধা অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করিত। যাহাকে ইচ্ছা অপরাধী বলিয়া ধরিয়া আনিতেন, আবার বিচারও করিতেন তিনি নিজে। ব্যাপার যেখানে এইরূপ, সেখানে লোক উৎপীড়িত হইবে তাহাতে আশ্চর্য কি?

শাসনকর্তারাই যদি বিচারক হয়, তবে তাহারা বিনা অপরাধে বে-আইনি ভাবে লোক গ্রেপ্তার করিতে পারে এবং তাহাদের পক্ষে বিচারের প্রহসন করিয়া লোককে শাস্তি দেওয়াও অসম্ভব নহে। এই জন্য ব্যক্তিস্বাধীনতা বজায় রাখিতে হইলে গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা সুস্পষ্টরূপে ভাগ করিয়া দেওয়া উচিত। শাসনকর্তা বে-আইনি ভাবে কোন লোককে আটক করিলে, বিচারবিভাগ তাহাকে মুক্তি দিবে। প্রত্যেক বিভাগ অপর বিভাগের অনাচার প্রতিরোধ করিতে পারিবে। এইভাবে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা পাইবে।

সমালোচনা: এই মতের সমর্থনযোগ্য যুক্তি যথেষ্ট আছে। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিভাগ করা সম্ভব নহে, কাম্যও নহে।

বাস্তবক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ক্ষমতাবিভাগ অনেক সময়েই অসম্ভব হইয়া পড়ে। গভর্ণমেণ্টের কাজ এমনভাবে মিশ্রিত যে, একটি স্বতন্ত্র বিভাগের উপরে এক-শ্রেণীর কাজ আলাদা করিয়া ভার দেওয়া যায় না। সর্বদেশেই শাসনবিভাগের হাতে কিছু কিছু আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকে। বিচারবিভাগ আইনের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অনেক সময়ে নূতন আইন সৃষ্টি করে। আইনপরিষদ শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। এই তিনটি বিভাগের কাজ যদি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইবার সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে।

কার্যত, এইরূপ ক্ষমতাবিভাগ কাম্যও নহে। প্রত্যেকটি বিভাগ অপর বিভাগ হইতে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র হইলে অনেক অসুবিধা দেখা দিতে পারে। মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া কাজ করে, গভর্ণমেণ্টের প্রত্যেক বিভাগের মধ্যে তেমনি সামঞ্জস্য ও সহযোগিতা থাকা বাঞ্ছনীয়। তাহা না হইলে সরকারী কাজ অচল হইয়া পড়িবে। হাত যদি মুখের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ ঘোষণা করে, তবে হাত-মুখ এবং সব অঙ্গই আহার্যের অভাবে মরিয়া যাইবে। গভর্ণমেণ্টের তিনটি বিভাগের মধ্যে পূর্ণতর সহযোগিতা না থাকিলে, মাঝে মাঝে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইবে। তাহার ফলে শাসন-পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিবে।

তৃতীয়ত, গভর্ণমেণ্টের প্রত্যেক বিভাগকে সমান সমান ক্ষমতা দেওয়া যায় না। তাহাতে অচল অবস্থা সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। যদি প্রত্যেক

বিভাগেরই সমান ক্ষমতা থাকে, তবে তাহাদের বিরোধের মীমাংসা করিবে কে? এইজন্য আইনপরিষদকে সাধারণত সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা দেওয়া থাকে।

ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্যই যে ক্ষমতাবিভাগ প্রয়োজন, তাহা সব সময়ে বলা যায় না। ইহা ছাড়াও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষিত হইতে পারে। ইংলণ্ডে এইরূপ ক্ষমতাবিভাগ করা হয় নাই। কিন্তু সে দেশে ব্যক্তিস্বাধীনতা কিছুমাত্র কম নয়। নাগরিকদের সদা জাগ্রত থাকিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হয়।

বর্তমানকালে এই মত আর একান্ত সত্য বলিয়া গৃহীত হয় না। তবে ইহার যে কিছুটা যথার্থতা আছে, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সমস্ত ক্ষমতা একটি বিভাগে কেন্দ্রীভূত হওয়া কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে আইনপরিষদ এবং শাসনবিভাগ হইতে বিচারবিভাগের স্বাধীন থাকা উচিত। তাহা হইলে জনসাধারণের অধিকার রক্ষিত হইবে।

ব্রিটিশ এবং আমেরিকার সংবিধানে এই মত কতটা স্বীকৃত? কোন দেশের সংবিধানে এই মত সম্পূর্ণ স্বীকৃত নহে। ব্রিটিশ সংবিধান অনুযায়ী শাসনক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের (Cabinet) হাতে। তাহারা আইনপরিষদের সভ্য এবং উহার নিকট নিজেদের কাজকর্মের জন্য জবাবদিহি করিতে বাধ্য। সুতরাং মন্ত্রিপরিষদ আইন এবং শাসন উভয় বিভাগেরই কাজ করিয়া থাকে। লর্ড চ্যান্সেলার মন্ত্রিপরিষদের সদস্য। তিনি হাউস অফ লর্ডসের সভাপতি, আবার বিচারবিভাগের কর্তা। এইভাবে বিচার এবং শাসনবিভাগের কাজও মিশ্রিত। হাউস অফ লর্ডস্ আইনপরিষদের অন্যতম সভা। আবার ইংলণ্ডের সর্বোচ্চ বিচারালয় হইতেছে হাউস অফ লর্ডস্। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, ইংলণ্ডে আইন এবং বিচারের কাজ অনেক স্থানেই বিভক্ত নহে।

আমেরিকার সংবিধানে এই মত অনেকাংশে কার্যত প্রয়োগ করা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের তিন শ্রেণীর কাজ তিনটি বিভাগের উপর ন্যস্ত এবং বিভাগগুলি মোটামুটি স্বাধীন। শাসনবিভাগের কর্তা রাষ্ট্রপতি। জনসাধারণের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তিনি আইনপরিষদের সভায় যোগ দিতে পারেন না। তথাপি আমেরিকাতেও ক্ষমতাবিভাগ খুব স্পষ্ট নহে। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের বিচারকগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত। আমেরিকার আইন-পরিষদের নাম কংগ্রেস। কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত নাকচ করিবার অধিকার রাষ্ট্রপতির

আছে। কাজেই শাসনবিভাগ আইনপরিষদের কাজে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। সেনেট আইনপরিষদের অন্যতম সভা। পররাষ্ট্রের সহিত চুক্তি এবং উচ্চতর পদগুলিতে কর্মচারী নিয়োগ অনুমোদন অথবা বাতিল করিবার ক্ষমতা সেনেটের আছে। অর্থাৎ সেনেট শাসন ও আইন উভয় বিভাগের কাজ করে।

ভারতবর্ষে ক্ষমতা-বিভাগ : ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতবর্ষে গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা-বিভাগ মোটেই ছিল না। অন্যান্য দেশে আইনপরিষদের ক্ষমতা কত বেশী, তাহা আমরা দেখিয়াছি। ভারতবর্ষে শাসনবিভাগই সর্বেসর্বা ছিল। শাসনবিভাগের আইন প্রণয়ন করিবার প্রভূত ক্ষমতা ছিল। গভর্ণর-জেনারেল এবং গভর্ণর আইনপরিষদের সর্বপ্রকার বিরোধিতা উপেক্ষা করিয়া আইন পাস করিতে পারিতেন। আইন ও শাসনের কাজ এইভাবে একই হস্তে ন্যস্ত ছিল। শাসনবিভাগের কর্মচারীরা আবার বিচারকের আসনও অধিকার করিত। শাসনবিভাগের অভিরুচি অনুযায়ী, যে কোন ব্যক্তিকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইত।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জেলার প্রধান শাসনকর্তা। পুলিশ বাহিনী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ মানিতে বাধ্য। পুলিশকে দিয়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যে কোন লোক গ্রেপ্তার করিতে পারে এবং বিচারার্থ চালান দিতে পারে। আবার সেই ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থ উপস্থিত করা হয়। তাহাকে খুশীমত শাস্তি দিতে কোন বাধা নাই। ম্যাজিস্ট্রেটের বিচার ও শাসনক্ষমতা দুইই আছে। গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতাবিভাগ খুব বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু ভারতবর্ষের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের যেমন উভয়বিধ ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় আছে, তাহা আরও অবাঞ্ছনীয়।

ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্রেও এই ব্যবস্থা মানিয়া লওয়া হয় নাই। শাসনকার্য পরিচালনা করে মন্ত্রিপরিষদ। কিন্তু মন্ত্রীরা আইনসভার নিকট দায়ী। বিচারকদের নিয়োগকর্তা রাষ্ট্রপতি। তিনি শাসনবিভাগের সর্বাধ্যক্ষ।

আইনপরিষদ

আইনপরিষদের কাজ (Functions) : আধুনিক রাষ্ট্রে আইনপরিষদের প্রধান কাজ হইতেছে, দেশের সকলের জন্য হিতকর আইন প্রণয়ন করা। গভর্ণমেণ্ট সুপরিচালিত করিবার জন্য প্রস্তাব আইনপরিষদে

বিলের আকারে উপস্থাপিত হয়। এইভাবে নূতন আইন প্রণীত হয়, অথবা পুরাতন আইন বাতিল কিংবা সংস্কার করা হয়।

আইন প্রণয়ন আইনপরিষদের একমাত্র কাজ নহে। আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ উহাকে করিতে হয়। উহা সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব পুংখানুপুংখ আলোচনা করিয়া তাহা মঞ্জুর করে। সরকারী আয়-ব্যয় সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা আইনপরিষদের কাছে। কি ভাবে এবং কোন খাতে কর আদায় করিতে হইবে, তাহা আইনপরিষদ ঠিক করিয়া দেয়।

যে দেশে মন্ত্রিপরিষদের শাসন প্রচলিত, সেখানে শাসনবিভাগ সম্পূর্ণভাবে আইপরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন। মন্ত্রীদের কার্যকলাপের উপরে আইনপরিষদ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে এবং আইনপরিষদ অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব পাস করিলে মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিতে বাধ্য। আইনপরিষদ এই ভাবে মন্ত্রীনিয়োগ অথবা বদল করে।

আইনপরিষদের কিছু কিছু শাসন এবং বিচারক্ষমতাও থাকে। এই পরিষদ মন্ত্রী অথবা উচ্চ কর্মচারীদের কাজ সম্বন্ধে অভিযোগ আনিতে পারে এবং এই অভিযোগের বিচার করিতে পারে। উচ্চ আদালতের বিচারক যদি কোনও অন্যায় কাজ করে, তবে আইনপরিষদ প্রস্তাব পাস করিয়া তাহাকে বিচারকের আসন হইতে সরাইতে পারে। আমেরিকাতে যাহারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উচ্চ সরকারী পদে নিযুক্ত হয়, তাহাদের নিয়োগ সেনেট বা উচ্চপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইবার নিয়ম আছে।

আইনপরিষদের গঠন (Organisation) : আধুনিক রাষ্ট্রে সাধারণত আইনপরিষদের উচ্চপরিষদ অথবা দ্বিতীয় সভা এবং নিম্নপরিষদ অথবা সাধারণ সভা,—এই দুইটি সভা থাকে।

উচ্চপরিষদের ক্ষমতা কম। ব্রিটেনের হাউস্ অফ্ লর্ডস্ "লর্ড" উপাধিধারী ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত। কোন লর্ডের মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র এই সভার সভ্য হয়। আবার কোনও কোনও দেশে উচ্চ সভার সভ্য গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত হয়। কানাডায় এই নিয়ম প্রচলিত আছে। কিন্তু অধিকাংশ দেশেই উচ্চসভার সভ্য নিবাচিত হইয়া থাকে। নিম্ন পরিষদ অপেক্ষা ইহার মেয়াদও দীর্ঘ দিনের। ভারতবর্ষে নূতন শাসনতন্ত্রে এইরূপ বিধান আছে।

নিম্ন পরিষদের সভ্যরা সাধারণ নির্বাচক-মণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হয়। এই

পরিষদে নির্বাচনের ভোটাধিকার অত্যন্ত ব্যাপক। এই পরিষদের ক্ষমতা উচ্চপরিষদ অপেক্ষা অনেক বেশী। সাধারণত, সরকারী ব্যয় মঞ্জুর করিবার অধিকার একমাত্র এই সভারই থাকে। কর ধার্য করিবার অধিকারও এই সভার হাতে। যে দেশের শাসন মন্ত্রিপরিষদ দ্বারা পরিচালিত হয়, সেই দেশে এই সভাই মন্ত্রিপরিষদের কাজ নিয়ন্ত্রিত করে।

আইনপরিষদে দুইটি সভা থাকার গুণাগুণ (Merits and demerits of Bi-cameralism). আজকাল অধিকাংশ দেশেই আইনসভার দুইটি পরিষদ থাকে। কি কি কারণে আইনপরিষদের দুইটি সভা রাখা হয়, তাহা আলোচনা করা কর্তব্য।

নিম্ন পরিষদের সভ্যেরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়। জনসাধারণের সাময়িক দাবীর তাগিদে হয়ত তাহারা এমন কোন আইন পাস করিয়া ফেলিতে পারে, যাহা একটু ধীরভাবে বিবেচনা করিলে তাহারা কখনই পাস করিত না। উচ্চসভা নিম্ন পরিষদের কাজের রাশ টানিতে পারে। উচ্চপরিষদে কোন আইনের খসড়া প্রেরিত হইলে, কিছুটা সময় আলোচনায় ব্যয়িত হইবে। ইতিমধ্যে জনসাধারণও ধীরভাবে তাহাদের দাবী পুনর্বিবেচনা করিতে পারে।

উচ্চপরিষদে সকল আইনই পুনরায় বিবেচিত হয়। নিম্নপরিষদের এত বেশী কাজ যে, সকল আইনের খসড়া সব সময়ে যথোপযুক্ত মনোযোগ দিয়া বিচার করা সম্ভব নহে। উচ্চ পরিষদের কাজ কম। কাজেই আইনের খসড়া সেখানে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচিত হইতে পারে। ইহা একটি মস্ত সুবিধা।

উচ্চ পরিষদে বিশেষ শ্রেণী ও স্বার্থের প্রতিনিধি প্রেরিত হইতে পারে। কয়েকটি অঞ্চল একত্রিত হইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিলে, তাহাদের প্রতিনিধি লইয়া উচ্চ পরিষদ গঠিত হয়। এই সভায় প্রত্যেক অঞ্চলেরই সমানসংখ্যক প্রতিনিধি থাকে। সমগ্র দেশের ও জনসাধারণের প্রতিনিধি থাকে নিম্ন পরিষদে।

বহুদিন পূর্বে মিল বলিয়াছেন যে, ক্ষমতার অধিকারী যে তাহার প্রতিরোধক কেহ যদি না থাকে, তবে সে কালক্রমে অত্যাচারী হইয়া পড়ে। নিম্ন পরিষদের কার্যকলাপে কোনরূপ বাধা দিবার কেহ না থাকিলে, তাহাও ক্রমে ক্রমে অত্যাচারী হইয়া উঠিতে পারে। উচ্চ পরিষদ এই স্বেচ্ছাচারিতার পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। একটা প্রবাদ আছে যে বহুলোকের কাছে পরামর্শ

লইলে সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। প্রবাদটির যথার্থতা অস্বীকার করা যায় না। সেই দিক দিয়া দেখিলে একটির স্থলে দুইটি সভা থাকাই ভাল।

কিন্তু লাস্কি প্রমুখ আধুনিক পণ্ডিতেরা অনেকেই দুইটি পরিষদ গঠনের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা বলেন যে, উচ্চ পরিষদ আসলে নিম্ন পরিষদের কাজে কোনরূপ বাধা দিতে পারে না। নিম্ন পরিষদ জনসাধারণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। গণতন্ত্রে জনসাধারণের ইচ্ছা প্রতিরোধ করা যায় না। দ্বিতীয়ত, উচ্চ পরিষদ যদি নিম্ন পরিষদের কার্য সমর্থন করে, তবে তাহার অস্তিত্ব বাহুল্যমাত্র। আবার নিম্ন পরিষদের কাজ সমর্থন না করিলে উহা একটি দুষ্টগ্রহ বলিয়া গণ্য হইবে। কারণ জনসাধারণের প্রতিনিধিদের জনগণের ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করিতে উহা বাধা জন্মায়। তৃতীয়ত, উচ্চপরিষদে ধনবান এবং কায়েমী-স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়। কাজেই তাহারা সব-প্রকার প্রগতিশীল কার্যে বাধা সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আমলে কাউন্সিল-অব্-স্টেট নামে উচ্চ পরিষদ ছিল। জনসাধারণের মতামত উপেক্ষা করিয়া এই পরিষদ সবদাই গভর্ণমেণ্টকে সমর্থন করিত। চতুর্থত, উচ্চপরিষদের সৃষ্টিতে শাসনের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। কারণ আর একটি পরিষদ চালানর ব্যয় বাড়ে। ব্যয় বৃদ্ধি ছাড়াও উচ্চ পরিষদ থাকার ফলে আইন প্রণয়নে অকারণ জটিলতার সৃষ্টি হয়।

শাসনবিভাগ

শাসনবিভাগের কাজ (Functions): এই বিভাগের কাজ হইতেছে, দেশের আইন কার্যকরী করা এবং শাসন পরিচালনা করা। আধুনিক রাষ্ট্রে শাসনবিভাগের নানারূপ কাজ থাকে। শাসন পরিচালনা করা যে প্রধানতম কাজ, তাহা বলাই বাহুল্য। দেশে আইন ও শৃংখলা বজায় রাখা এবং লোকে যাহাতে দেশের আইন অমান্য না করে, সেদিকে এই বিভাগের দৃষ্টি রাখিতে হয়। দেশের সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীও এই বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। সশস্ত্রবাহিনী সংগঠিত করা এবং বহিরাক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার ব্যবস্থা করাও এই বিভাগের কাজ। এই বিভাগকেই অপরাপর বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়। পররাষ্ট্র দূত নিয়োগ করা এবং পররাষ্ট্রের দূত গ্রহণ করা উভয়ই এই বিভাগের কাজ। প্রয়োজন মত বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত নানাবিধ

সন্ধি স্থাপনের ভার এই বিভাগের উপর। শাসনবিভাগকে কিছু কিছু আইনবিভাগের কাজও করিতে হয়। আইনপরিষদের সভা আহ্বান করা, সাময়িকভাবে বন্ধ করা, অথবা ভঙ্গ করিবার অধিকার অনেক সময়েই এই বিভাগের থাকে। জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে শাসনবিভাগ হইতে অর্ডিন্যান্স বা জরুরী আইন জারি করিবার ক্ষমতা অনেক সময়েই শাসনবিভাগকে দেওয়া থাকে। ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে শাসনবিভাগের হাতে আইন পাস করিবার অবাধ ক্ষমতা ছিল। শাসনবিভাগের কিছু কিছু বিচার-ক্ষমতাও থাকে। শাসনবিভাগই বিচারকদের নিযুক্ত করে এবং অপরাধীকে মার্জনা করিবার ক্ষমতা শাসনবিভাগের হাতে থাকে।

শাসনবিভাগের গঠন (Organisation): শাসনবিভাগ নানাভাবে গঠিত হয়। পার্লামেণ্টারী পদ্ধতিতে যে দেশের শাসন পরিচালিত হয়, সেই সব দেশে হয় ই'লণ্ডের মত একজন বংশানুক্রমিক রাজা থাকে, অথবা ভারতবর্ষের মত একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়া থাকে। যদিও আইনত তিনিই প্রধান শাসনকর্তা, কিন্তু কার্যত তাঁহার কোন ক্ষমতা থাকে না। আসল শাসনক্ষমতা থাকে মন্ত্রিপরিষদের হাতে। মন্ত্রীরা আইনসভার সভ্য। আইনসভার অধিকাংশ সভ্য যতদিন মন্ত্রীদিগকে সমর্থন কবিবে, ততদিনই তাঁহারা মন্ত্রী থাকিতে পাবেন। মন্ত্রিপবিষদে একজন প্রধান মন্ত্রী থাকেন।

বাষ্ট্রপতিব শাসনপদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতিই প্রধান শাসনকর্তা। জনসাধারণের ভোটে কয়েক বৎসরেব জন্য একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়। সকল শাসন ক্ষমতা তাঁহার হাতে। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য মন্ত্রী নিযুক্ত হয় বটে, কিন্তু তাহারা পরামর্শদাতা মাত্র।

মন্ত্রীদেব নীচে অসংখ্য সরকারী কর্মচারী থাকে। তাহারাই দৈনন্দিন শাসনকার্য পরিচালনা কবে। মন্ত্রিপবিষদ বা রাষ্ট্রপতির আদেশ অনুযায়ী তাহারা চলে। এইসব কর্মচারীদের লইয়া দেশের সিভিল সার্ভিস বা কৃত্যক গঠিত হয়। সাধারণত, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা তাহাদের নিযুক্ত করা হয়। তাহারা স্থায়ী কর্মচারী।

শাসনবিভাগের মধ্যে আবার নানারূপ বিভাগ আছে। যথা—স্বরাষ্ট্র, দেশরক্ষা, বৈদেশিক, অর্থ, বিচার, শিক্ষা, শিল্পবাণিজ্য, স্বাস্থ্য প্রভৃতি।

বিচারবিভাগ

বিচারবিভাগের কাজ (Functions) : দেশের বিভিন্ন আদালতের বিচারকদের লইয়াই বিচারবিভাগ গঠিত। আইন অনুযায়ী মকদ্দমার বিচার করা এই বিভাগের কাজ। কেহ কোন আইন অমান্য করিলে তাহাকে কোন আদালতে উপস্থিত করা হয়। বিচারকেরা দুই পক্ষের বক্তব্য এবং সাক্ষী সাবুদ শুনিয়া স্থির করেন সে দোষী কিনা। বিচারবিভাগের আর একটি কাজ, আইন-পরিষদ যে আইন পাস করে তাহার ব্যাখ্যা করা। অনেক সময়ে আইন ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বিচারকেরা নূতন আইন সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কোনও একটি বিষয় মীমাংসার্থে বিচারকদের সামনে উপস্থিত হইলে, প্রথমত আইন অনুযায়ী বিচার করা হয়। কিন্তু কোনও আইনের আমলে যদি বিষয়টি না পড়ে, তাহা হইলে ন্যায় এবং ধর্মের নীতি অনুযায়ী বিচারকেরা রায় দিয়া থাকেন। এই রায়গুলি পরবর্তী মকদ্দমায় গ্রাহ্য হয় এবং তাহাই বিচারক-সৃ আইন নামে পরিচিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে বিচারবিভাগকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিতে হয়। দেশের লিখিত সংবিধানের ব্যাখ্যা বিচারবিভাগকেই করিতে হয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গভর্ণমেণ্টে যাহাতে সংবিধানসম্মত যথানির্দিষ্ট কাজ করে, কেহ অপরের কার্যে হস্তক্ষেপ না করে, তাহা দেখিবার ভার বিচারবিভাগের। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট যদি এমন কোন বিষয়ে আইন পাস করে, যাহা রাজ্য সরকারের শাসনাধীন, তাহা হইলে আদালত সেই আইন নাকচ করিয়া দিতে পারে।

গঠন (Organisation) : সাধারণত, শাসনবিভাগ বিচারকদের নিযুক্ত করে। আমেরিকায় কখনও কখনও বিচারক সাধারণ নির্বাচনে নিযুক্ত হন। ইহা কাম্য নহে। সাধারণ লোক প্রার্থীদের গুণাগুণ বুঝিতে সক্ষম নহে। শাসনবিভাগ যে সব বিচারক নিযুক্ত করে, তাঁহাদের কার্যকাল নির্দিষ্ট থাকে। এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শাসনবিভাগের খুশীমত তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করা যায় না। অতএব তাঁহারা কার্যত স্বাধীন।

ক্ষমতাবিভাগ সম্বন্ধে যত মতামত আছে, তাহার একটি সম্বন্ধে কোনও তর্ক নাই। বিচারবিভাগ স্বাধীন হওয়া উচিত। বিচারকেরা স্বাধীন না হইলে, নির্ভীক নিরপেক্ষ বিচার করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। রাজার যদি যে কোন

মুহূর্তে বিচারককে বরখাস্ত করিবার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে বিচারক রাজার পক্ষে অপ্রীতিকর এমন কোন রায় দিতে স্বভাবতই ইতস্তত করিবে। ফলে জন-সাধারণের স্বাধীনতা লোপ পাইবে। অত্যাচাবী রাজা লোকের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনিবে এবং বিচারকেরা রাজার অসন্তোষের ভয়ে রাজার পক্ষেই রায় দিবেন। বিচারকদের নিরপেক্ষতা এমন ভাবে বজায় বাখিতে হইবে, যেন তাঁহাদের বিবেকেব বিরুদ্ধে কখনও রায় না দিতে হয়। প্রত্যেক প্রগতিশীল দেশেই ব্যবস্থা আছে যে, সামান্য অজুহাতে শাসনকর্তারা বিচারকদের বরখাস্ত কবিতে না পাবে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

নির্বাচক-মণ্ডলী

দেশের নিবাচক-মণ্ডলীর কাজ হইতেছে, প্রতিনিধি নির্বাচন করা ও গভর্ণমেণ্টের নীতি নিয়ন্ত্রণ করা। একজন প্রার্থীকে নির্বাচিত না করিয়া, অপর একজনকে নিবাচন করিবার সময় তাহারা গভর্ণমেণ্টের নীতি নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। একজন প্রার্থী পাকিস্থান ও ভারতবর্ষের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা সমর্থন করে। অপর একজন তাহা করে না। ভোটদাতারা যদি প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে ভোট দেয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, দুইটি দেশের মধ্যে সহযোগিতা তাহারা সমর্থন করে এবং গভর্ণমেণ্টের নীতিও তাহাই হওয়া উচিত। কাজেই নির্বাচকমণ্ডলীর কাজ হইতেছে, প্রতিনিধি নিবাচিত করিয়া গভর্ণমেণ্টের নীতি নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, কাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে? সাবালক লোক মাত্রেরই ভোটাধিকার থাকা উচিত, না বিশেষ শ্রেণীর লোকের এই অধিকার থাকিবে? ভোটাধিকার শুধু পুরুষদের দেওয়া হইবে, না স্ত্রীলোকদের দেওয়া হইবে? নিবাচন কি ভাবে হইবে, সোজাসুজি না পরোক্ষভাবে? ভোট দেওয়া গোপনে হইবে, না প্রকাশ্যে? এই সকল প্রশ্নের সহিত জড়িত আরও অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা এখানে করা হইবে। এই প্রশ্নগুলির যথাযথ মীমাংসার উপরেই গণতন্ত্রের সুষ্ঠু পরিচালনা নিভর করে।

সার্বজনিক ভোটাধিকারের ভিত্তি (The basis of franchise): নাগরিকের অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, ভোটাধিকার রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে প্রধানতম। এই অধিকারের বলে নাগরিকেরা আইনপরিষদের গঠন স্থির করে এবং সরকারী নীতি নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, সকল নাগরিকেরই ভোটাধিকার থাকিবে, না যাহারা এই অধিকার সন্তোষজনক ভাবে ব্যবহার করিতে পারিবে, শুধুমাত্র তাহাদেরই এই অধিকার থাকিবে? জাতিধর্ম অথবা স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে

প্রত্যেক নাগরিকের ভোটাধিকার থাকিলে, সেই ব্যবস্থাকে সার্বজনিক ভোটাধিকার বা Universal Suffrage বলা হয়।

এই ব্যবস্থার পক্ষপাতীরা বলেন, ভোটাধিকার প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার। জনসাধারণ সাবভৌম-ক্ষমতার মালিক, কাজেই এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকার সকলেরই থাকা উচিত। রাষ্ট্র সর্বসাধারণের প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রের বিধান প্রত্যেকের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। কাজেই গভর্ণমেণ্টের নীতি স্থির করিবার অধিকার প্রত্যেককেই দেওয়া উচিত। কাহাকেও ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা অন্যায় এবং তাহা কখনই কাম্য নহে। যদি তাহাদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয় তবে তাহারা হয় অসন্তুষ্ট কিংবা উদাসীন হইয়া পড়িবে। তাহারা ভাবিবে যে, সাধারণ ব্যাপারে তাহাদের কিছু করণীয় নাই। ফলে নাগরিক কর্তব্য সম্পাদন করিতে তাহারা ক্রমেই পরান্মুখ হইয়া উঠিবে। ইহা কিছুতেই কাম্য নহে। যখনই একদল লোক ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, শাসকশ্রেণী কিছুদিনের মধ্যেই তাহাদের কথা বিস্মৃত হইয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক। যাহারা গভর্ণমেণ্ট রদবদল করিবার ক্ষমতা রাখে, তাহাদের দিকেই শাসনকর্তার দৃষ্টি থাকিবে। যাহাদের ভোট নাই, কোনও ক্ষমতা নাই, তাহাদের কথা কেহ ভাবিবে না এবং তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি থাকিবে না। প্রত্যেকের ভোট থাকিলে গভর্ণমেণ্টও প্রত্যেকের সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি দিবে, প্রত্যেকের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার চেষ্টা করিবে। সকলের সুখ-সুবিধা বিধান গভর্ণমেণ্টের কাজ ইহা স্বীকার করিলে, সকলকেই সমানভাবে ভোটাধিকার দেওয়া উচিত।

অবশ্য এই মত সকলে গ্রাহ্য করেন না। ইংরাজ পণ্ডিত লেকী, মেইন প্রমুখ বহু লেখক বলেন যে, ভোট দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যাহারা এই অধিকার সন্তোষজনকভাবে প্রয়োগ করিতে পারে, কেবল তাহাদেরই ভোট দিবার অধিকার দেওয়া যাইতে পারে। জনসাধারণ অশিক্ষিত এবং অজ্ঞ। যোগ্যতম প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার মত বুদ্ধি অথবা শিক্ষা তাহাদের নাই। সুতরাং সাধারণকে ভোটাধিকার দেওয়া উচিত নহে। ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ থাকাই ভাল। তাঁহারা বলেন যে, ভোটাধিকার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রবর্তিত হওয়া উচিত :—

প্রথমত, অশিক্ষিতদের ভোটাধিকার দেওয়া হইবে না। যাহাদের যথেষ্ট শিক্ষা নাই, তাহারা দেশের সাধারণ ব্যাপার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। যে লিখিতে বা পড়িতে জানে না, তাহাকে ভোটাধিকার কিছুতেই দেওয়া যাইতে পারে না। দার্শনিক মিল এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। যাহারা অন্তত কিছুটা শিক্ষিত, তাহাদেরই ভোটাধিকার থাকিবে। মিল বলেন, "সাধারণ ভোটাধিকার দানের পূর্বে প্রত্যেককে শিক্ষিত করিতে হইবে।"

ভোটাধিকার এইভাবে সীমাবদ্ধ করিবার বিরুদ্ধে দুইটি যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে। কেবলমাত্র লিখিতে এবং পড়িতে শিখিলেই সাধারণ বিষয় বুঝিবার শক্তি জন্মায় না। লেখাপড়া কিছুমাত্র না জানিয়াও, লোকে যথেষ্ট বুদ্ধিমান হইতে পারে। আবার পণ্ডিতমূর্খের অভাব নাই। অশিক্ষা এক জিনিষ, অজ্ঞতা বা মূর্খতা আর এক জিনিষ। অশিক্ষিত লোক অজ্ঞ বা মূর্খ নাও হইতে পারে। বুদ্ধি থাকিলে অশিক্ষিত লোকের পক্ষে সাধারণ বিষয় বুঝিতে পারা কষ্টসাধ্য নহে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষা যদি ভোটাধিকারদানের মাপকাঠি হয়, তবে রাষ্ট্রের কর্তব্য প্রত্যেককে শিক্ষিত করিয়া তোলা। শিক্ষিত নহে বলিয়া একজনকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা অন্যায়। দেশে কেহ অশিক্ষিত থাকিলে তাহার জন্য দায়ী রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের এই অকর্তব্যের জন্য জনসাধারণকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা উচিত নয়।

দ্বিতীয়ত, অনেকে বলেন যে, যাহাদের অন্তত কিছু সম্পত্তি বা আয় আছে, কেবল তাহাদেরই ভোটাধিকার দেওয়া উচিত। যাহার কোন সম্পত্তি নাই, তাহাকে ভোটাধিকার দেওয়া ঠিক হইবে না। যাহার সম্পত্তি নাই তাহাকে কোন কর দিতে হয় না। যে কোন কর দেয় না তাহাকে ভোটাধিকার দিলে, সে কর বৃদ্ধির প্রস্তাব সমর্থন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিবে না। তাহার তাহাতে কিছু আসে যায় না। পরের ধনে পোদ্দারী করিতে অনেকেই রাজী হইবে। বর্তমান কালে এই মাপ কাঠিতে ভোটাধিকার নির্ণয় করা কেহ ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করে না। ভোটাধিকারের মত একটি মৌলিক অধিকার কেবল মাত্র দারিদ্রের অপরাধে কাড়িয়া লওয়া উচিত নহে। সম্পত্তি থাক আর নাই থাক, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোককেই ভোটাধিকার দেওয়াই বর্তমান যুগের লেখকদের মত।

বর্তমান কালে সাধারণ ভোটাধিকারব্যবস্থার প্রচলন করা ছাড়া অন্য পথ

নাই। রাসিয়া, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে আজকাল ইহা স্বীকৃত। কিন্তু যদিও সার্বজনিক ভোটাধিকার এই সব দেশে স্বীকৃত, তথাপি প্রত্যেক নাগরিককেই এই অধিকার দেওয়া হয় না। কোন কোন লোককে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। যেমন নাবালকদের কোন ভোট নাই; যাহারা পাগল তাহাদেরও ভোট নাই, কারণ উভয়েই বিচারশক্তিবর্জিত। দেউলিয়া অথবা গুরুতর ও জঘন্য অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিদের ভোটাধিকার দেওয়া হয় না। কোন কোন দেশে মেয়েদের ভোটাধিকার নাই। মেয়েদের ভোটাধিকার সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা হইল।

মেয়েদের ভোটাধিকার (Female Suffrage): বহু গণতান্ত্রিক দেশে মেয়েদের ভোটাধিকার দেওয়া হয় নাই। ফরাসী দেশে মেয়েদের ভোট ছিল না। ইংলণ্ডে মেয়েদের পূর্ণ ভোটাধিকার দেওয়া হইয়াছে মাত্র ১৯২৮ সাল হইতে।

মেয়েদের ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে অনেকেরই সমর্থন আছে। তাঁহাদের মতে মেয়েদের স্থান গৃহে। যে কাজ তাহাদের নহে, তাহাতে মেয়েদের মাথা ঘামানো উচিত নহে। মেয়েদের ভোটাধিকার দিলে তাহারা গৃহকর্মে অমনোযোগী হইয়া উঠিবে। তাহার ফলে সমস্ত সমাজেরই ক্ষতি হইবে। তাঁহারা বলেন যে, মেয়েদের ভোটাধিকার দিলে ঘরের শান্তি নষ্ট হইবে। স্বামীর সহিত একমত হইলে স্ত্রীর আর পৃথক ভোট দিয়া প্রয়োজন কি? আর দ্বিমত হইলে ঘরের শান্তি ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে।

কিন্তু সার্বভৌম-ক্ষমতা পুরুষের থাকিলে মেয়েদেরও আছে, পুরুষদের ইহা একচেটিয়া নহে। মেয়েরা পুরুষদের মতই সুশাসন কামনা করে। মেয়েরা দুর্বল বলিয়া রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণ উহাদেরই বেশী প্রয়োজন। অতএব গভর্ণমেণ্টের নীতি প্রভাবান্বিত করিবার জন্য তাহাদের ভোটাধিকার থাকা উচিত। জীবনের সর্বক্ষেত্রে মেয়েরা প্রমাণিত করিয়াছে যে, পুরুষের মতই তাহাদের বুদ্ধি আছে। মাদামকুরি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। স্ত্রীকবি ও লেখিকার ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত আছে। রাসিয়া এবং অন্য দেশের মেয়েরা প্রমাণ করিয়াছে যে, সুযোগ দিলে দেশরক্ষার কাজেও তাহারা যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইতে পারে। অতএব এখন মেয়েদের পুরুষের সমান ভোটাধিকার না দিবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না। স্ত্রী স্বামীর মতেই মত দিলেও, তাহাকে ভোটাধিকার দিবার প্রয়োজনীয়তা আছে। দার্শনিক মিল বলিয়াছেন যে "যদি মানুষ হাঁটিতে নাও চাও তবুও শৃংখলমুক্তি

তাহার মঙ্গল সাধন করিবে।" ভোটাধিকার থাকিলে ঘরে মেয়েদের গুরুত্ব বাড়িবে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন দলের কার্যপদ্ধতি আলোচনা করিবে। এই আলোচনায় সুফল পাইবার সম্ভাবনা খুব বেশী। মেয়েদের প্রভাবে দেশের রজেনৈতিক আবহাওয়া যথেষ্ট উন্নত হইবার সম্ভাবনা।

ভারতবর্ষে ভোটাধিকার (Suffrage in India): ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট ছিল না। আইনপরিষদ অবশ্য ছিল এবং আইনপরিষদে সভ্যও নির্বাচিত হইত। কিন্তু দেশের সামান্য একাংশের লোকেরই ভোটাধিকার ছিল। সাধারণত, সম্পত্তির মালিকের এবং শিক্ষিত লোকদের ভোটাধিকার ছিল। মেয়েদেরও কিছু কিছু ভোটাধিকার ছিল।

ভারতের বর্তমান সংবিধানে স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক সকলেরই ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার প্রবর্তনের বিরুদ্ধে বলা হইত যে, এ দেশের শতকরা প্রায় নব্বুই জন লোকই নিরক্ষর। অধিকাংশ লোক গ্রামে থাকে। গ্রামে বসিয়া তাহাদের পক্ষে দেশের সাধারণ বিষয় সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারা সম্ভব নহে। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দিলে যে বিরাট নির্বাচক-মণ্ডলী সৃষ্টি হইবে, তাহা নিয়ন্ত্রিত করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দান ভারতবর্ষের সকল রাজনৈতিক দলেরই সমর্থিত। নিরক্ষরতার অজুহাতে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা ঠিক নহে। গ্রামে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন করা উচিত। ভারতবর্ষে বিভিন্ন উপজাতি ও সম্প্রদায় আছে। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দিলেই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের যথাসংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত করা সম্ভব।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষনির্বাচন (Direct and Indirect election): প্রতিনিধি নির্বাচন দুই প্রকারের ব্যবস্থানুযায়ী হইতে পারে। যখন ভোট-দাতাগণ সরাসরি ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করে, তখন তাহাকে প্রত্যক্ষনির্বাচন বলে। গণতন্ত্রের সমর্থকেরা এই পদ্ধতির পক্ষপাতী। জন-সাধারণ নিজেরাই প্রতিনিধি নির্বাচন করে বলিয়া, তাহারা বিভিন্ন প্রার্থীদের ঘোষিত নীতি বিচার করিয়া দেখে। প্রার্থীরা ভোটদাতাদের কাছে উপস্থিত হইয়া, তাহাদের ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করে। তাহার ফলে ভোটদাতারা

রাজনৈতিক সমস্যাগুলির বিভিন্ন দিক জানিতে পারে এবং এইভাবে তাহাদের রাজনৈতিক শিক্ষালাভ হয়।

বিরোধীরা বলেন যে, প্রত্যক্ষনিবাচনে নানা আপদের সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ লোক নিরক্ষর এবং অজ্ঞ। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কার্যপদ্ধতি বুঝিবার মত ক্ষমতা তাহাদের নাই। বক্তৃতার তোড়ে ভাসিয়া গিয়া তাহারা হয়ত অবাঞ্ছিত লোককে ভোট দিতে পারে। ইহার ফল কি হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাই তাহারা পরোক্ষনির্বাচনের পক্ষপাতী।

পরোক্ষনিবাচনে ভোটদাতারা সোজাসুজি প্রতিনিধি নিবাচন করে না। তাহারা ভোট দিয়া কয়েকজন নিবাচক (electors) বাছিয়া দেয়। এই নিবাচকরা আইন-পরিষদের সভ্য নিবাচন করে। অর্থাৎ আইন-পরিষদের সভ্য ঠিক করিতে, দুইটি নিবাচনের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই উপায়ে প্রত্যক্ষনিবাচনের ক্রটি দূরীভূত হয়। জনসাধারণের বদ্ধি অথবা শিক্ষা নাই বলিয়া তাহাদিগকে আইন-পরিষদের সভ্য নিবাচন করিতে দেওয়া হয় না। তাহারা নিবাচক বাছিয়া দেয়। নিবাচকেরা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত। তাহারা যাঁহাকে প্রতিনিধি নিবাচন করিবে, তাঁহার যোগ্য হইবার সম্ভাবনা বেশী। ভোটদাতারা প্রতিনিধি নির্বাচন করে না বলিয়া, প্রাথমিক নিবাচনে দলগত বিবাদ ও কোলাহল সৃষ্টি হয় না।

এই পদ্ধতির অনেক ক্রটি আছে। প্রথমত, প্রতিনিধি নির্বাচন নিজেদের হাতে নাই বলিয়া, সাধারণ লোকে রাজনৈতিক বিষয়ে উদাসীন হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়ত, এই পদ্ধতিতে নির্বাচনের সময় কলুষতা দেখা দিতে পারে। নির্বাচকদের সংখ্যা স্বভাবতই কম হয়। তখন সভ্যপদপ্রার্থীরা ঘুষ দিয়া, বা অন্যভাবে নির্বাচকদের প্রভাবান্বিত করিবার চেষ্টা করিতে পারে। এই ক্রটি অত্যন্ত মারাত্মক। তৃতীয়ত, রাজনৈতিক দল গড়িয়া উঠিলে দ্বিতীয় নির্বাচন একটা মামুলি ব্যাপারে পরিণত হইবে। যে দেশের রাজনৈতিক দলগুলি সুগঠিত, তাহাবা নিজেদের লোককে নির্বাচক হিসাবে দাঁড় করাইবে। ভোটদাতারাও নিজেদের দলের নির্বাচককে ভোট দিবে। ফলে যে উদ্দেশ্যে পরোক্ষনির্বাচন সমর্থন করা হয়, তাহাই বিফল হইবে। এই পদ্ধতির সমর্থনে যে যুক্তি দেওয়া হয়, তাহা ভিত্তিহীন। ভোটদাতাদের যদি নিবাচকের গুণাগুণ বুঝিবার মত বুদ্ধি থাকে, তবে তাহারা সভ্যপদপ্রার্থীর গুণাগুণ কেন বিচার করিতে পারিবে

না? আরও একটি যুক্তি এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে দেওয়া যায়। এই পদ্ধতি গণতন্ত্রবিরোধী। ভোটাধিকার দিয়া, তাহার পূর্ণ প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা না দেওয়া আদৌ গণতান্ত্রিক নহে।

আধুনিক মত প্রত্যক্ষনির্বাচন সমর্থন করে। স্বাধীন ভারতের আইন-পরিষদেব সভ্য প্রত্যক্ষনির্বাচনে ঠিক হয়।

গোপন এবং প্রকাশ্য ভোট (Secret or Open Voting) : ভোট গোপনে না প্রকাশ্যে দেওয়া উচিত? অনেকে বলেন যে, ভোট প্রকাশ্যে দেওয়া হইবে। ভোটদাতারা যাহাকে নির্বাচন করিতে চায়, প্রকাশ্যে তাহার নাম বলিবে। মিল প্রকাশ্য-ভোটদান-পদ্ধতি সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে, সব-সাধারণের সমক্ষে ভোট দিতে হইলে, ভোটদাতাগণ নিজেদের খেয়াল খুশীমত ভোট দিতে পারিবে না। সকলের সম্মুখে সমর্থন করা যায়, এইরূপ একজন প্রার্থীকে ভোট দিতে হইবে। "সাধারণেব প্রতি অপরাপর কর্তব্যের ন্যায় ভোট দেওয়াও সবজনসমক্ষে সকলের সমালোচনার মধ্যেই হওয়া উচিত।"

কিন্তু তাহা হইলে একটি বিপদ আছে। ভোটদাতাগণ জমিদার, মালিক অথবা ধমগুরুর প্রভাবে পড়িয়া, নিজের ইচ্ছামত ভোট দিতে পারিবে না। জমিদার অথবা মালিকের মনোনীত প্রার্থীকে ভোটদাতা হয়ত সমর্থন করিতে চায় না। কিন্তু তাহাদের সম্মুখে বিরোধী প্রাথার নাম উচ্চারণ করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। মালিক তাহা হইলে হয়ত তাহাকে বরখাস্ত করিবে, অথবা জমিদার উৎপীড়ন করিবে।

এইজন্য বর্তমানকালে সব দেশেই গোপনে ভোট লওয়া হয়। ভোটদাতা ভোট-গ্রহণ-কেন্দ্রে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে একটি ব্যালট বা কাগজ দেওয়া হয়। একটি স্বতন্ত্র কক্ষে প্রত্যেক প্রার্থীর চিহ্নাঙ্কিত একটি একটি বাক্স রাখা হয়। ভোটদাতা যে প্রার্থীকে সমর্থন করে, তাহার চিহ্নাঙ্কিত বাক্সে গোপনে এই কাগজটি ফেলিয়া দেয়। ভোটদাতা ছাড়া আর কেহ তাহার এই কাজ দেখিতে পারিবে না। দায়িত্বশীল কর্মচারী এবং প্রার্থীদের প্রতিনিধির সামনে খুলিয়া কাগজগুলি গোনা হয়। ইহাকে "ব্যালটদ্বারা ভোটগ্রহণ" বলা হয়। ইহার প্রধান গুণ, ভোটদাতারা সকলের প্রভাব এড়াইয়া প্রাথা নির্বাচন করিতে পারে।

সংখ্যালঘুসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিনির্বাচন

প্রত্যেক দেশে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু-বিবোধ ও তজ্জনিত সমস্যা আছে। সাধারণনির্বাচনব্যবস্থায় যে প্রার্থী বেশী সংখ্যায় ভোট লাভ করে, তিনিই সভ্যপদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ফলে সংখ্যালঘু দলের কোন সভ্য নির্বাচিত হইতে পারে না। সংখ্যালঘুরা হয়ত কয়েকটি আসন অধিকার করিতে পারে, তাহা হইলেও তাহাদের প্রতিনিধি সংখ্যানুপাতিক হইবে না। সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ২৫ ভাগ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হইলে, আইনপরিষদে তাহাদের প্রতিনিধিও শতকরা ২৫টি থাকা উচিত। গণতন্ত্রের অর্থ হইতেছে সবশ্রেণীর নিজস্বশাসন। তাহা হইলে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধি আইনপরিষদে থাকা উচিত। মিল বলিয়াছেন যে, "আইনপরিষদে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সংখ্যানুযায়ী প্রতিনিধি না থাকিলে প্রকৃত গণতন্ত্র আছে বলা চলে না। সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি সংখ্যানুযায়ী নিশ্চয়ই থাকিবে।"

আবার এমন বহুলোক আছেন, যাঁহারা এই ব্যবস্থার ঘোর বিরোধী। তাহাদের মতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে পৃথকভাবে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার দিলে, তাহারা শুধু নিজেদের স্বার্থের কথাই চিন্তা করিবে। জাতীয় স্বার্থ যে তাহাদের স্বার্থের বিরোধী নহে, তাহা ভুলিয়া যাইবে। অন্য শ্রেণীর লোকের স্বার্থের কথা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইয়া সংখ্যালঘুরা নিজেদের স্বার্থের মাপকাঠিতে সমস্ত বিষয়ের বিচার করিবে। ইহার ফলে জাতীয় স্বার্থের হানি ঘটিবে।

আমাদের দেশে কিছুদিন হইতে দেখা যাইতেছে যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এইভাবে নিজেদের স্বার্থের কথাই চিন্তা করিতেছে। এইরূপ ভাবধারা দেশের যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হইয়াছে। ব্যাপার এইরূপ দাঁড়াইলে, সমস্যা বড় জটিল এবং বিপজ্জনক হইয়া উঠে, তাহা আমরা ১৯৪৬।৪৭ সালে দেখিয়াছি। দ্বিতীয়ত, সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি-নির্বাচনের যে কয়টি বিশেষ ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি অত্যন্ত জটিল। অনেক সময়ে দেখা যায়, এই ব্যবস্থার ফলে দেশে বহুসংখ্যক দলের উদ্ভব হয়। ফলে আইনসভায় কোন দলেরই অধিকসংখ্যক সভ্য থাকে না। সুতরাং কোয়ালিশন বা কয়েকটি দল লইয়া যুক্তমন্ত্রিসভা গঠন করিতে হয়। কিন্তু তেমন মন্ত্রিসভা সাধারণত দুর্বল হইয়া থাকে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিনির্বাচনের উপায়ঃ সংখ্যালঘু

সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিনির্বাচনের জন্ম নানা উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন এবং সীমাবদ্ধ ও একত্রিতভোটপ্রথাই প্রধান।

সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনব্যবস্থায় (Proportional Representation) সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাহাদের ভোটসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচিত করিতে পারে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংখ্যা শতকরা ২০ হইলে তাহাদের প্রতিনিধির সংখ্যাও শতকরা ২০ হইবে। প্রত্যেক ভোটদাতাকে একটি প্রার্থীর তালিকা দেওয়া হয়। ভোটদাতা সেই তালিকায় ১,২,৩,৪ প্রভৃতি ক্রমিক নম্বর দিয়া কয়েকজন প্রার্থীকে ভোট দেয়। যতজন লোক ভোট দেয় সেই সংখ্যাকে, যতজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে সেই সংখ্যা দিয়া ভাগ করা হয়; ভাগফল যত হইবে, প্রার্থী তত সংখ্যা ভোট পাইলে তবে নির্বাচিত হইতে পারিবে। তালিকায় যাহার নামে প্রথম ভোট দেওয়া হইয়াছে, সে উপরোক্ত ভাগফলের সমান ভোট পাইলে নির্বাচিত হইল বলিয়া ঘোষণা করা হয়। অতিরিক্ত ভোট সে যাহা পায়, সেই ভোটের কাগজগুলিতে যে যে প্রার্থীদের দ্বিতীয় মনোনয়ন দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের হিসাবে জমা দেওয়া হয়। তাহার বা তাহাদের ভোটসংখ্যা ভাগফলের সমান হইলে, সে কিংবা তাহারা নির্বাচিত হয়। এইভাবে সংখ্যালঘুসম্প্রদায় তাহাদের যথাযথ সংখ্যক প্রার্থী নির্বাচিত করিতে পারে।

সীমাবদ্ধ ভোটব্যবস্থায় (Limited Vote System) প্রত্যেক ভোটদাতা একটি নির্বাচন কেন্দ্রে কয়টি ভোট দিতে পারিবে, তাহা নির্দিষ্ট থাকে। যদি পাঁচটি প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবার কথা থাকে, তবে কাহাকেও পাঁচটি ভোট দিতে দেওয়া হয় না। প্রত্যেক ভোটদাতা মাত্র তিনটি কি চারটি প্রার্থীকে ভোট দিতে পারে। তাহার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠেরা তিন কি চারিটির অধিক প্রতিনিধি নির্বাচিত করিতে পারে না। অপরগুলি সংখ্যালঘুদের ভোটের জোরেই নির্বাচিত হইবে।

আর একটি উপায় একত্রিত ভোটব্যবস্থা (Cumulative Vote System)। যদি কোথাও পাঁচজন প্রার্থী নির্বাচিত হইবার ব্যবস্থা থাকে, তবে প্রত্যেক ভোটদাতাকেই পাঁচটি করিয়া ভোট দিতে দেওয়া হয়। সে ইচ্ছা করিলে পাঁচটি ভোট পাঁচজনকে, অথবা সমস্তই একজন প্রার্থীকে দিতে পারে। যদি সংখ্যালঘুদের সংখ্যা এক-পঞ্চমাংশ হয়, তাহা হইলে সংখ্যালঘুরা অন্তত একজন

প্রার্থী নিবাচিত করিতে পারে, অবশ্য যদি তাহারা সকলে মিলিয়া একজন প্রার্থীকেই পাঁচটি করিয়া ভোট দেয়।

সাম্প্রদায়িক নির্বাচন

ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় আছে। সমগ্র দেশে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রত্যেক আইনপরিষদে এইসব সম্প্রদায়ের সংখ্যানুযায়ী প্রতিনিধি থাকা উচিত, অনেকেরই ইহা মত। এইরূপ নির্বাচনকে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন বলা হয়।

সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি নিবাচনেব বিরুদ্ধে বক্তব্য কি আছে, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই নির্বাচনের জন্য যে ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হউক না কেন, সংখ্যালঘুরা ক্রমে নিজেদের স্বার্থের অতিরিক্ত কিছু আর ভাবিবেন না। তাঁহারা নিজ সম্প্রদায়ের বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে শাসনব্যবস্থার সব কিছুই বিচার করেন। তাঁহারা তখন ভাবেন, ইহাতে আমাদের সাম্প্রদায়িক কি সুবিধা অথবা অসুবিধা হইবে। দেশেব প্রকৃত স্বার্থ ভুলিয়া সাম্প্রদায়িক স্বার্থই বড় হইয়া উঠে। প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান কোনরূপ নির্বাচন ব্যবস্থা দ্বারাই সম্ভব নহে। সংখ্যালঘুরা যতদিন পর্যন্ত নিজেদের স্বার্থ বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের সহিত এক ভাবিতে না পারিবেন, ততদিন সাম্প্রদায়িক সমস্যা থাকিয়াই যাইবে।

স্বতন্ত্রনির্বাচনব্যবস্থা (Separate Electorate): উপরোক্ত ত্রুটি সত্ত্বেও সংখ্যাগুরুসম্প্রদায় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি নিবাচনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা উচিত, ইহা স্বীকাব করে। কিন্তু কোন পদ্ধতিতে তাহা করা হইবে, ইহা লইয়া মতভেদ রহিযাছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজ নিজ ভোটদাতাগণ স্বতন্ত্রনির্বাচনে প্রতিনিধি নিবাচন করিবে, না যুক্তনির্বাচনের মারফতেই সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি নিবাচনের ব্যবস্থা করা হইবে?

মুসলমানদের মধ্যে অনেকে স্বতন্ত্রনিবাচনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহাদের যুক্তি এই:—স্বতন্ত্রনির্বাচনের দ্বারা প্রত্যেক সম্প্রদায় উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচিত করিতে পারিবে। যুক্তনিবাচনব্যবস্থা থাকিলে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় নিজেদের ভোটের জোরে তাহাদের মনোমত প্রার্থী নিবাচিত করিয়া লইতে পারে। তাহার উপরে সংখ্যালঘুসম্প্রদায়ের বিশ্বাস না থাকিতে পারে।

স্বতন্ত্রনির্বাচনব্যবস্থায় নানারূপ অমঙ্গল দেখা দেয়। স্বতন্ত্রনির্বাচন জাতীয়তা-বিরোধী। ইহার ফলে লোকেরা সর্বদাই জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কথা চিন্তা করে। হিন্দু, মুসলমান, শিখ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের সম্প্রদায়ের কথাই ভাবিতে শিখিবে, ভারতবাসী হিসাবে চিন্তা করিতে শিখিবে না। দেশ তখন কয়েকটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যাইবে। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ স্বার্থের জন্য ঝগড়া করিবে। গত ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালের ইতিহাস এই অন্যায় স্বার্থের দ্বন্দ্বের ইতিহাস। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সকল বিরোধের অবসান হইয়া প্রত্যেক সম্প্রদায় জাতীয় স্বার্থের কথা চিন্তা করিতে শিখুক, ইহাই কাম্য। কিন্তু স্বতন্ত্র নির্বাচন-ব্যবস্থা থাকিলে এই বিরোধ বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য।

স্বতন্ত্রনির্বাচন যে শুধু জাতীয়তা-বিরোধী তাহা নহে। উহা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থবিরোধীও বটে। এই নির্বাচন-ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কোনও দিনই গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে পারিবে না। নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষিত আছে মনে করিয়া, নিজেদের ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশের জন্য কোন চেষ্টা করিবে না।

আধুনিক কালে ধর্মের প্রেরণাশক্তি কমিয়া আসিয়াছে। কেহ মুসলমান বলিয়া তাহার স্বার্থ সর্বদাই জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হইবে, এমন কোন কথা নাই। সামাজিক ও অর্থনৈতিক যাবতীয় সমস্যা, দারিদ্র্যের সমস্যা, কি হিন্দু কি মুসলমান, উভয়কেই পীড়িত করে। আমাদের সম্মুখে যে সকল সমস্যা রহিয়াছে তাহা সাম্প্রদায়িক নহে, তাহা বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের সমস্যা নহে। সমস্যাগুলি অর্থনৈতিক এবং সামাজিক। কাজেই এই সমস্যা সমাধানের জন্য স্বতন্ত্রনির্বাচনের কোন প্রয়োজন নাই।

গভর্ণমেণ্টের উপরে নির্বাচক-মণ্ডলীর প্রভাব (The Control of the electorate over the Government): একজন বিখ্যাত লোক বলিয়াছেন যে, ব্রিটিশ জাতি কেবলমাত্র নির্বাচনের দিনেই স্বাধীন। নির্বাচন শেষ হইয়া গেলে নির্বাচক-মণ্ডলী গভর্ণমেণ্ট পরিবর্তন করিতে পারে না। তাহাদিগকে পরবর্তী নির্বাচনকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। কাজেই মনে হইতে পারে যে, নির্বাচক-মণ্ডলী প্রকৃতপক্ষে গভর্ণমেণ্টের উপরে কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কিন্তু নির্বাচক-মণ্ডলী নানাভাবেই

গভর্ণমেণ্টের নীতি প্রভাবান্বিত করিতে পারে। এই প্রভাব কখনও প্রত্যক্ষ, কখনও বা পরোক্ষ।

নির্বাচক-মণ্ডলীর প্রভাব জনমতের মারফতে পরোক্ষভাবে বুঝিতে পারা যায়। গণতন্ত্রে গভর্ণমেণ্ট জনমত উপেক্ষা করিতে, অথবা তাহার বিরুদ্ধে যাইতে সাহস করে না। নির্বাচক-মণ্ডলী সাধারণ সভা করিয়া বা অন্যভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিতে পারে। দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট রাজনৈতিক দল দ্বারাই গঠিত হয়। প্রত্যেক দলই জনসাধারণের মতামতের সহিত পরিচিত থাকিয়া, তদনুযায়ী সরকারী-নীতি পরিচালিত করিতে চেষ্টা করে।

কিন্তু সব সময়ে এই ভাবে গভর্ণমেণ্টকে প্রভাবান্বিত করা যায় না। এই কারণে কোনও কোন রাষ্ট্রে নির্বাচক-মণ্ডলীর প্রত্যক্ষ প্রভাব বজায় রাখিবার জন্য কয়েকটি উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। ঘন ঘন নির্বাচন-ব্যবস্থা রাখা হয়। অল্প সময়ের ব্যবধানে নির্বাচন হইলে, ভোটদাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইতে কোনও প্রতিনিধিই সাহস পাইবে না। কিন্তু খুব অল্পসময়ের ব্যবধানে নির্বাচন কাম্য নহে। আরও তিনটি উপায়ে নির্বাচক-মণ্ডলী গভর্ণমেণ্টের উপর প্রভাব বজায় রাখে। প্রথম দুইটিকে গণভোট ও গণউদ্যোগ বলা হয় এবং অপরটিকে পুনর্নির্বাচনের জন্য ডাকিয়া আনা বলে। গণতন্ত্রের অধ্যায়ে এইগুলি আলোচিত হইয়াছে।

সু-নির্বাচক-মণ্ডলীর উপাদান (Essentials of a good electorate) : কি কি গুণ থাকিলে সু-নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয় ? প্রত্যেক পূর্ণবয়স্কের ভোটাধিকার থাকিবে। মেয়েদেরও পুরুষের মতই ভোটাধিকার থাকিবে। সমস্ত নাগরিকদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পূর্ণবয়স্কদের ভোটাধিকারের পরিবর্তে অন্য কোন ব্যবস্থা আধুনিক রাষ্ট্রে সম্ভব নহে। গণতন্ত্রের মূলনীতির উপর ইহার ভিত্তি। কারণ ভোটাধিকার থাকিলে জনসাধারণের ব্যক্তিত্ব বিকাশ লাভ করে এবং সাধারণ ব্যাপারে তাহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। গোপন নির্বাচনব্যবস্থা বা ব্যালট-ব্যবস্থা থাকাই উচিত। জনসাধারণের পক্ষে ভোটাধিকার চিন্তা করিয়া সুবিবেচনার সহিত ব্যবহার করা উচিত। টাকার বিনিময়ে কখনই অবাঞ্ছিত প্রার্থীকে ভোট দেওয়া উচিত নহে। নির্বাচনের সময়ে কলুষতা ও অপকীর্তি দূর করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রাজনৈতিকদল ও জনমত

রাজনৈতিকদল (Political Parties) : গণতান্ত্রিক সরকার রাজনৈতিক দলদ্বারাই পরিচালিত হয়। দেশের মধ্যে যে সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার আবির্ভাব হয়, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন রকমের মত ও কার্যপন্থা থাকিতে পারে। যাহারা প্রধান প্রধান কয়েকটি বিষয়ে একমত, তাহারা একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে।

কতকগুলি কার্যতালিকা লইয়া একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। যাহারা ঐ কার্যতালিকা সমর্থন করে, তাহারা দলের সভ্য হয়। প্রত্যেক দল জনসাধারণের মধ্যে নিজেদের কার্যতালিকা ও উদ্দেশ্য প্রচার করিয়া, তাহাদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করে এবং গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে চেষ্টা করে। এই ভাবেই সর্বদেশে রাজনৈতিক দল গড়িয়া উঠিয়াছে।

রাজনৈতিক দলের কার্য (Functions of Political Parties) : দেশের ও জাতির উন্নতিকল্পে কি কি কার্যপ্রণালী অবলম্বন করা উচিত এই সম্বন্ধে একমতাবলম্বী লোকসমষ্টি লইয়া রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। কাজেই রাজনৈতিক দলের প্রথম কাজ, দেশের সমসাময়িক ও ভবিষ্যৎ সমস্যার সমাধানকল্পে একটি সুচিন্তিত কার্যতালিকা প্রণয়ন করা। দলের সকল সভ্যেরা মিলিত সভায় আলোচনা করিয়া, দলের নীতি সম্বন্ধে উপযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এক দলের সভ্যেরা বিশ্বাস করে যে, তাহাদের নির্দিষ্ট কার্যক্রমই দেশের প্রকৃত মঙ্গল বিধান করিতে পারে। তাই তাহারা আর সকলকে স্বমতে আনিতে চেষ্টা করে। ইহাই রাজনৈতিক দলের দ্বিতীয় কার্য—নিজেদের উদ্দেশ্য জনসাধারণের নিকট প্রচার করা ও তাহাদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করা। দলের প্রধান প্রধান সভ্যেরা সাধারণ সভায় বক্তৃতা দিয়া দলের উদ্দেশ্য প্রচার করে। সংবাদপত্র প্রকাশ করা হয়, অথবা সংবাদপত্রের সমর্থন লাভ করা হয়। সমগ্র বৎসর ধরিয়া সংবাদপত্রের মারফতে এবং বক্তৃতার দ্বারা দলের নীতি ও কার্য সম্বন্ধে প্রচার করা হয়, যাহাতে দেশের লোকের সমর্থন তাহারা পায়।

রাজনৈতিকদলের তৃতীয় কাজ আইনসভার নির্বাচনে জয়লাভের চেষ্টা করা। দলের নীতি এবং কর্মপন্থা কার্যকরী করিতে হইলে গভর্ণমেণ্ট গঠন করা প্রয়োজন। আইনসভার অধিকাংশ আসন দখল করিতে পারিলেই, তবে গভর্ণমেণ্ট গঠন করা সম্ভব। প্রত্যেক নির্বাচনের পূর্বে নিজেদের দলের কে কে প্রার্থী হইবে তাহা স্থির করা হয়। প্রার্থী স্থির করা হইলে নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। দলের নেতারা সভা করিয়া ও সংবাদপত্রের দ্বারা নানারূপ প্রচার চালাইয়া, ভোটদাতাদের মধ্যে নিজেদের মত প্রচার করে এবং অধিকাংশ নির্বাচক যাহাতে তাহাদের দলের প্রতিনিধির পক্ষে ভোট দেয় তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। নির্বাচনের শেষে যে দলের সভ্যেরা আইন-সভার অধিকাংশ আসন দখল করে, সেই দলকে গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে আহ্বান করা হয়। তখন মন্ত্রী কাহারা হইবে, তাহা স্থির করা হয়। এই মন্ত্রীরা দলের নীতি কার্যকরী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে।

যে দল আইনপরিষদে সংখ্যালঘু, তাহারা সরকারবিরোধীদল (Opposition) হিসাবে স্বীকৃত হয়। সংখ্যাগুরু দল অপেক্ষা এই দলের কাজও কিছুমাত্র কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। বিরোধীদল গভর্ণমেণ্টের কার্যের সমালোচনা করে, দোষত্রুটি প্রদর্শন করে এবং তাহা সাধারণের কাছে প্রচার করে। তাহাদের এই সমালোচনার ভয়ে গভর্ণমেণ্ট গঠনকারী দলকে বিশেষ সাবধানে চলিতে হয়। ফলে গভর্ণমেণ্ট স্বৈরাচারী হইতে পারে না। এইভাবে সাধারণলোক সমস্যাগুলির সম্পর্কে দুই দিকেরই মত জানিতে পারে, এবং দুই পক্ষের কথা শুনিয়া নিজেদের একটি সিদ্ধান্তে আসিতে পারে। বিরোধী দল গভর্ণমেণ্টের কার্যকলাপের উপরে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখে এবং তাহার দোষত্রুটি দূর করিতে সাহায্য করে।

রাজনৈতিক দলের দোষগুণ (Merits and demerits of the Party system): রাজনৈতিক দল না হইলে গণতন্ত্র চলে না। দল ছাড়া গণতন্ত্র কার্যে পরিণত হইতে পারে না বলিলে বিশেষ অন্যায় হয় না। যে দল আইনপরিষদে অধিকাংশের সমর্থন লাভ করিতে পারে, তাহারাই গভর্ণমেণ্ট গঠন করে। গভর্ণমেণ্টের পশ্চাতে যদি সুগঠিত দলের সমর্থন না থাকে এবং প্রত্যেক সভ্যই যদি নিজের খুশীমত ভোট দেয়, তবে শাসনকার্য পরিচালনা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টের সমস্ত শক্তি অধিকাংশ

সভ্যের সমর্থন লাভের চেষ্টাতেই নিযুক্ত থাকিবে। আসল কাজের দিকে মন যাইবে না। অধিকাংশ সভ্য সমর্থন করিবে কিনা না জানিলে, গভর্ণমেণ্ট কোন পন্থাই দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করিতে পারিবে না। ফলে গভর্ণমেণ্ট দুর্বল হইবে ও শাসনকার্যে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে।

রাজনৈতিক দলব্যবস্থার দ্বিতীয়গুণ এই যে, দলগুলি সাধারণ লোককে রাজনৈতিক বিষয়ে শিক্ষিত করে। দেশের রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন দল নানা দিক হইতে নানা মতের আলোচনা জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করে। জনসাধারণ বিভিন্ন দিকের আলোচনা শুনিয়া সমস্যাটি সম্বন্ধে সুচিন্তিত পন্থা অবলম্বন করিতে পারে। রাজনৈতিক দলব্যবস্থার তৃতীয় উপকারিতা হইতেছে যে, দলগুলিব প্রতিদ্বন্দ্বিতা লোককে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিয়া তোলে। বিভিন্ন দলের সংঘর্ষে সাধারণ লোকেরও কৌতুহল জাগ্রত হয় ও সে নানা বিষয় জানিবার সুযোগ পায়। এইরূপে রাজনৈতিক জীবনকে প্রাণবন্ত করিতে রাজনৈতিক দল সাহায্য করে।

এই ব্যবস্থার চতুর্থ উপকারিতা হইতেছে যে, রাজনৈতিক দল আর একভাবে গণতন্ত্রের সহায়ক হয়। সচেতন একটি দল হইতে বিরোধিতা করা হইলে যে দলের হাতে শাসনক্ষমতা আছে, তাহাদের অত্যন্ত সতর্ক হইয়া চলিতে হয়। তাহারা জানে, কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি হইলেই বিরোধী দল তাহা জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করিয়া দিবে, এবং তাহাদের দোষ-ত্রুটির সুযোগ গ্রহণ করিয়া পরবর্তী নিবাচনে সাফল্য লাভের চেষ্টা করিবে। গভর্ণমেণ্ট হাতছাড়া হইবার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া জনসাধারণের স্বার্থবিরোধী কোন কাজ তাহারা করিতে পারে না। বিরোধী দল থাকাতে স্বৈরাচার বন্ধ হয়। আধুনিক ডিক্টেটরেরা এই কারণেই প্রথমে সমস্ত বিরোধী দল লোপ করিয়া দিয়াছিল।

রাজনৈতিক দলের প্রধান ত্রুটি হইতেছে ইহা যে, অনেক সময়ে দলের সভ্যেরা দলকে জাতির উর্ধ্বে স্থান দিতে পারে। দলের লোকেরা গভর্ণমেণ্ট গঠন করিলে সরকারী চাকুরী ইত্যাদি ব্যাপারে যে সুবিধা পাওয়া যায়, সভ্যদের অনেক সময়ে দৃষ্টি থাকে সেই দিকে এবং লোভের বশবর্তী হইয়া তাহারা জাতির স্বার্থের কথা বিস্মৃত হয়। নির্বাচনে জয়লাভ করাটাই অনেক সময়ে বড় কথা হইয়া দাঁড়ায়। কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে দলের সুবিধা হইবে তাহাই চিন্তার বিষয় হয়, দেশের স্বার্থের জন্য কি করা উচিত সে কথা মনে থাকে না।

কোন ব্যবস্থা যদি দলের সমর্থন বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে, তাহা দেশের স্বার্থবিরোধী হইলেও গ্রহণ করা হয়।

দলের ত্রুটি এই যে, অনেক সময়ে ইহার ফলে সভ্যদের স্বাতন্ত্র্য লোপ পায়। দ্বিতীয় দলের মধ্যে বন্ধন দৃঢ় রাখিতে হইলে, সকল সভ্যকেই দলের নীতি সমর্থন করিতে হয়। যাহার কোন স্বাধীন মতামত আছে, দলে তাহার কোন স্থান নাই। দলের নীতি সমর্থন না করিলে সেই সভ্যকে দল হইতে বিতাড়িত করা হয়।

ইহার জন্য সৎ ও স্বাধীন মতাবলম্বী লোকেরা কোন দলে যাইতে চাহেন না। ফলে দলের সভ্যদের মধ্যে "জোহুকুমের" সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ইহাতে দেশের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। রাজনৈতিক দল হইতে আরও একটি আপদ সৃষ্টি হয়। দল দ্বারা গঠিত গভর্ণমেণ্ট যে সব সময়ে সরকারী কাজে সবাপেক্ষা উপযুক্ত লোককে নিযুক্ত করিবে, তাহা বলা যায় না। উপযুক্ত লোকের হয়ত স্বাধীন মতামত থাকিতে পারে। তাহারা হয়ত সমস্ত বিষয়ে দলের আদেশ মানিতে অস্বীকার করিতে পারে। কাজেই দলপতিগণ এমন লোককে সরকারী পদে নিযুক্ত করিবে, যে সব সময়ে দলকে সমর্থন করিবে। সেইরূপ লোকের হয়ত বিশেষ যোগ্যতা না থাকিতে পারে, কিন্তু সে দলের আদেশ চোখ বুজিয়া পালন করে। একদল গভর্ণমেণ্ট গঠন করিলে অপর দলের যোগ্য লোকদের সাহায্য আর পাওয়া যায় না। এইরূপে দেশের শাসনযন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

অনেক দেশে আবার এমনও দেখা গিয়াছে যে, ক্ষমতা হাতে রাখিবার জন্য দলের লোকেরা নানরূপ অন্যায় পথ অবলম্বন করে। সরকারী কাজ এবং উপাধি এমন লোকদের দেওয়া হয়, যাহারা দলের তহবিলে মোটা চাঁদা দেয়। এইরূপ দলাদলির ফলে দেশে দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়।

এই সব ত্রুটি অত্যন্ত গুরুতর। ইহা দুর করিতে হইলে জনসাধারণকে সদা জাগরূক থাকিতে হয়। যে দল লোকের চক্ষে দোষী প্রমাণিত হইবে, তাহাকে কিছুতেই সমর্থন করা চলিবে না। দলের নেতাদের উপরও অবশ্য অনেকটা নির্ভর করে। নেতাদের নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, এবং দৃঢ় মনবল থাকা উচিত। তাহারা যদি সব সময়ে দেশের এবং জাতির মঙ্গল করিবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হন, তবে উপরোক্ত কোনও ত্রুটিই দেখা দিবে না।

বহুদলপ্রথা (Multiple Vs. Two Party system) : দেশে দুইটি

অথবা বহু দল থাকা ভাল? দেশে দুইটি মাত্র দল থাকিলে অনেক ব্যাপারই সহজ হইয়া পড়ে। নির্বাচনদ্বন্দ্ব হয় তখন মাত্র দুই পক্ষে। একটি বিষয়ে দুইটি মাত্র দিক থাকিলে ভোটদাতারা সহজেই হাঁ কিম্বা না বলিতে পারে। নির্বাচন শেষ হইলে দুইটি দলের একটি আইনপরিষদের অধিকাংশ আসন লাভ করিয়া গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে পারে। ভোটদাতারা ভোট দিয়া স্থির করিতে পারে যে দুইটি দলের কোনটি গভর্ণমেণ্ট গঠন করিবে।

কিন্তু দেশে মাত্র দুইটি রাজনৈতিক দল থাকিলে একটি বিষয়ে অসুবিধা হয়। কোন সমস্যা সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে দুইটি মত না থাকিয়া বহু মত থাকিতে পারে। কিন্তু মাত্র দুইটি দল থাকার জন্য আইনপরিষদে এই দুইটি মতের প্রতিনিধি থাকিবে। অন্য মতবাদের লোকের প্রতিনিধি না থাকিলে আইনপরিষদে তাহার কথা কেহ শুনিবে না। বহুমত থাকিলে বহু দলও থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, মাত্র দুইটি দল থাকিলে নির্বাচকেরাও অনেক সময়ে বিপদগ্রস্ত হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক যে, ভারতবর্ষে কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট এই দুইটি মাত্র দল আছে এবং ইহাদের প্রার্থী নির্বাচনে দাঁড়াইয়াছে। একজন নির্বাচক হয়ত কংগ্রেস দলের বর্তমান নীতি সমর্থন করে না এবং হয়ত মনে করিতে পারে যে কমিউনিষ্ট দলকে ভোট দিলে দেশে ব্যক্তিস্বাধীনতা লোপ পাইবে। ফলে সে কাহাকে ভোট দিবে?

বহু দল থাকিলে এবিষয়ে সুবিধা হয়। নির্বাচক নিজের মতানুযায়ী দল পাইতে পারে ও তাহার প্রার্থীকে ভোট দিতে পারে। কংগ্রেসের কার্যে বিরক্ত হইয়া কমিউনিষ্ট দলের আলিঙ্গনে তাহাকে পড়িতে হয় না। জলে বাঘ ও ডাঙ্গায় কুমীরের অবস্থা হইতে সে রক্ষা পায়। বহু মত থাকিলে বহু দল থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে।

অনেকগুলি দল থাকিলে কতকগুলি অসুবিধা দেখা দেয়। প্রত্যেক দলই ভিন্ন ভিন্ন কার্যতালিকা দাখিল করিলে ভোটদাতারা বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। অনেক মত থাকিলে তাহার একটি গ্রহণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। এমন হওয়াও বিচিত্র নহে যে, কোন দলই আইনপরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না। ফলে যুক্তমন্ত্রিসভা (Coalition Cabinet) গঠন করিতে হয়। এরূপ গভর্ণমেণ্ট দুর্বল হইতে বাধ্য। এইরূপ বিভিন্ন দল লইয়া গঠিত মন্ত্রিসভা অনেক বিষয়েই একমত হইতে পারে না।

প্রত্যেক দলের দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্র। কার্যক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে বিরোধিতা উপস্থিত হয়। ফলে সেই গভর্ণমেণ্টের শীঘ্রই পতন হয়। এই ধরণের গভর্ণমেণ্ট স্থায়ী হইতে পারে না। এইরূপ যুক্ত গভর্ণমেণ্টের দলগুলির মধ্যে সবদাই নানা চক্রান্ত লাগিয়া থাকে। প্রত্যেক দলই অপর আব সব দলগুলির সমর্থনলাভ করিতে চেষ্টা করে। এহ কাবণে অধিকাংশ লেখকই দুইটি মাত্র দলের পক্ষপাতী।

জনমত

গণতন্ত্রের একটি সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যায়—যে শাসন জনমত (Public opinion) অনুযায়ী পবিচালিত, তাহাকে গণতন্ত্র বলা হয়। কিন্তু জনমত কাহাকে বলে? দেশের সমস্ত নাগরিক যে মত পোষণ করে তাহাই অবশ্য জনমত। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে দেশের সমস্ত লোক একই মত পোষণ করিবে, তাহা আশা করা যায় না। দেশে নানারকম মত প্রচলিত থাকে। একটি মত অপরটিকে প্রভাবিত করে, অথবা দুই মতের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। খুব কম সময়েই বা বিষয়েই সমগ্র জনসাধারণকে একমত হইতে দেখা যায়। অতএব জনমত গঠন করিতে হইলে সকলকেই একমত পোষণ করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। যদি সকলে একমত হয় তাহা হইলে খুবই ভাল। কিন্তু একমত না হইলেও জনমত গঠিত হওয়া সম্ভব। তবে কি অধিকাংশের মতকে জনমত বলে? অধিকাংশ লোক যদি সংখ্যালঘুদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়া নিজেদের সুখসুবিধার কথাই ভাবে, তবে সেইরূপ মতকে জনমত বলা যায় না। বরং সংখ্যালঘুরা যদি সর্বসাধারণেব হিতার্থে কোন সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করে, তবে তাহা অধিকাংশের মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। সকল শ্রেণীর ও জনসাধারণের স্বার্থ চিন্তা করিয়া যে মত প্রচলিত থাকে, তাহাই প্রকৃত জনমত।

জনমতপ্রকাশের বাহন (Agencies for forming Public opinion): জনমত যে ভাবে গঠিত ও প্রকাশিত হয় তাহার উপর দেশের শাসনব্যবস্থার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। সুতরাং জনমত কি ভাবে গঠিত হয় তাহা জানা দরকার। জনমত নানাভাবে প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্র, সভা-সমিতি, রাজনৈতিক দল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বেতারবার্তা, চলচ্চিত্র এবং আইনপরিষদের মারফতে জনমত প্রকাশ পায়।

সংবাদপত্র: জনমত গঠন করিতে এবং তাহা প্রকাশ করিতে সংবাদপত্রই

সর্বোৎকৃষ্ট বাহন। সংবাদ প্রকাশ করা এবং তাহা লইয়া আলোচনা করাই সংবাদপত্রের প্রধান কাজ। এইভাবে সংবাদপত্রের মারফতে লোকে সাধারণ তথ্য জানিতে পারে এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে একটি মতামত স্থির করিতে পারে। দেশের বিভিন্ন দল ও শ্রেণীর মতামত সংবাদপত্রের মারফতে প্রকাশিত হয়। তাহার ফলে দেশের জনসাধারণের ভাবধারা যেমন সংবাদপত্রে প্রতিফলিত হয়, তেমনি জনমতও তাহার সাহায্যে গড়িয়া উঠে। জনমত গঠন করিতে সংবাদপত্রের প্রভাব অনন্যসাধারণ। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রভাব আরও বৃদ্ধি পাইতেছে।

লোকে যাহাতে ঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে, তাহার জন্য সংবাদপত্রে প্রকৃত খবর প্রকাশিত হওয়া উচিত। কোনও সংবাদ অথবা মত গোপন করা উচিত নহে। অনেক সংবাদপত্র ক্রোড়পতি মালিকের প্রভাবে, অথবা শ্রেণীগত স্বার্থের খাতিরে এমন সংবাদ প্রকাশ করে, যাহা কেবলমাত্র মালিক অথবা শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করিতে সাহায্য করে। তাহারা কখনও বিপরীত মত প্রকাশ করে না। এইভাবে তাহারা জনসাধারণকে ভুলপথে চালিত করিতে চেষ্টা করে। ইহা দেশের স্বার্থবিরোধী। সংবাদপত্রে যে মত প্রকাশিত হয়, তাহা সত্য সত্যই জনসাধারণের মত না হইলে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যর্থতায় পরিণত হইবে। এই কারণে সংবাদপত্র যাহাতে গভর্ণমেণ্টের প্রভাব, দলগত স্বার্থ এবং মালিকের প্রভাবেণ উধ্বে থাকে তাহার ব্যবস্থা থাকা উচিত। নির্ভীকভাবে পক্ষপাতশূন্য সংবাদ এবং মত কাগজে প্রকাশিত হওয়া উচিত।

সভাসমিতি : বিভিন্ন দল সাধারণ সভায় যে বক্তৃতাদি দিয়া থাকে, তাহা হইতেও জনমত সৃষ্টি হয়। বক্তারা অপর দলের সমালোচনা করে। এইভাবে একটি বিষয়ের বিভিন্ন দিক লোকের সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং ইহা জনমত গঠনে সহায়তা করে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : জনমত গঠন করিতে স্কুল এবং কলেজগুলির প্রভাব নিতান্ত কম নহে। দেশের বালকবালিকারা এইখানেই শিক্ষা লাভ করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় শিক্ষার্থীরা দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ জ্ঞানলাভ করে। কৈশোর এবং প্রথম যৌবনে যে জ্ঞান সঞ্চারিত হয়, পরবর্তীকালে তাহা অনেকেই ভুলিয়া যায় না। স্কুলকলেজের শিক্ষা প্রত্যেককে সারাজীবন ধরিয়া প্রভাবান্বিত করে।

দল : প্রতিদিনকার শাসন ব্যাপারে এবং সমষ্টিগতভাবে জাতীয় জীবনের সমস্যা রাজনৈতিক দলগুলি হইতে সাধারণের নিকট প্রচারিত হয়। প্রত্যেক দল তাহাদেব অনুসৃত নীতি ব্যাখ্যা করে। কারণ তাহাদের জনসাধাবণের ভোট সংগ্রহ কবিতে হইবে। কাজেই সব কিছু সাধারণকে না বুঝাইযা উপায় নাই। সাধারণ লোকে তাই রাজনৈতিক দলেব মাবফতে দেশের নানা সমস্যা সম্বন্ধে মতামত গঠন কবিতে পারে। সমস্যার বিভিন্ন দিক রাজনৈতিক দলগুলিই দেখাইয়া দেয়। এইভাবে রাজনৈতিক দলের আলোচনার ফলে জনমত গড়িয়া উঠে।

বেতার ও চলচ্চিত্র : বেতারের সংবাদ বহু লোকেব মধ্যে অল্প সময়েই ছড়াইয়া পড়ে। বিখ্যাত বক্তারা বেতারে বক্তৃতা দেন। এই সংবাদ ও বক্তৃতার সাহায্যে সাধারণে অনেক কিছু জানিতে বা বুঝিতে পাবে। উপযুক্তরূপে ব্যবহার করিলে চলচ্চিত্রও জনমত গঠনের এবং শিক্ষার উৎকৃষ্ট বাহন হইতে পারে।

আইনসভা : আইনসভায় যে মতামত প্রকাশিত, তাহাই দেশের সাধারণের মত বলিলে অন্যায় হয় না। আইনপরিষদে দেশের সবশ্রেণীর প্রতিনিধি থাকেন। তাঁহাদের মন্তব্য হইতে সাধাবণ লোকে দেশের সমস্যার সমস্ত দিক ভাল করিয়া বুঝিতে পারে। তাহার ফলে জনমত গঠিত হয়।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

প্রত্যেক দেশেই আজকাল কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট ছাড়া স্থানীয় বিষয় পরিচালনা করিবার জন্য ছোট ছোট শাসনপ্রতিষ্ঠান থাকে। এই সব প্রতিষ্ঠান কি ভাবে গঠিত হয়, তাহার কাজই বা কি, তাহা এই পরিচ্ছেদে আলোচিত হইবে।

দেশস্থ ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় বিষয়গুলির সম্যক পরিচালনার জন্য পৃথক আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আধুনিক রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। একটি গভর্ণমেণ্টকে সব কাজ করিতে হইলে, তাহার পক্ষে কোন কাজই ঠিক মত করা সম্ভব হইবে না। কাজের চাপও তাহা হইলে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি যথোপযুক্ত দৃষ্টি রাখিয়া সর্ববিভাগের শাসন চালানো একটি মাত্র গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব নহে। তাই শাসনসংক্রান্ত কোন কোন কাজ স্থানীয় পরিষদ (Local bodies) গঠন করিয়া তাহার হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই স্থানীয় শাসনপরিষদগুলি কেবলমাত্র স্থানীয় ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টি দেয়। সমগ্র দেশের সহিত জড়িত যে সকল বিষয়, তাহার পরিচালনার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের হাতে থাকে। গভর্ণমেণ্টের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিতে হইলে এইরূপ কার্যবিভাগ না করিয়া উপায় নাই। আরও একটি কারণে এইরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রয়োজন। দেশের সকল অঞ্চলের সমস্যা এক নহে। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, বিভিন্ন শহরে অথবা জেলায় স্থানীয় অবস্থা ভিন্ন রকমের। অনেক গ্রাম অথবা শহরে নিজস্ব বিশেষ সমস্যা থাকিতে পারে। স্থানীয় লোকে যদি নিজেদের প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারাই ভালভাবে স্থানীয় সমস্যাগুলি সমাধান করিতে পারে। স্থানীয় অধিবাসী বলিয়া সেই স্থানের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে তাহারা অধিক সচেতন। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট দূরে থাকে। স্থানীয় সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ তাহার পক্ষে জানা শক্ত।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থার গুণ (Advantages of Local

Self-government) : এই ব্যবস্থার কতকগুলি গুণ আছে। খুব কম লোকেই কেন্দ্রীয় শাসনে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। দেশের শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে সাধারণ নাগরিকের কোনই ধারণা থাকে না। কিন্তু স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা থাকিলে তাহাদের সহিত বহুলোক জড়িত থাকিতে পারে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পদেও অনেক লোক নিযুক্ত থাকে। তাহার ফলে শাসন-কার্যপরিচালনা সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান জন্মে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনপ্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে যোগ দিয়া দেশের আইনপরিষদের নির্বাচন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসভার কাজ দেখিয়া আইন-পরিষদের কার্যরীতি সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিবে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মারফতে জনসাধারণের জন্য কাজ করিবার শিক্ষা লাভ অনেকে করিতে পারে এবং তাহাদের মধ্যে সকলের হিতসাধনের জন্য অপরের সহিত সহযোগিতা করিবার স্পৃহা জন্মে। তাহারা কিভাবে পরস্পরের সহিত আপোষ-মীমাংসা করিয়া কাজ করিতে হয় তাহাও শিক্ষা পায়। পরস্পরের মধ্যে লেনদেন করিতে না শিখিলে সাধারণের কাজ করা সম্ভব নহে। দেশের শাসন সম্বন্ধে জনসাধারণের ঔদাসীন্য দূর করিতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মত অন্য প্রতিষ্ঠান আর নাই। নিজ নিজ অঞ্চলের সমস্যা ও রাজনীতি সাধারণের উৎসাহ এবং প্রবৃত্তি উজ্জীবিত করে। নিজ আবাসের নিকটস্থিত স্থান এবং অতি পরিচিত ব্যক্তি সম্বন্ধে লোকে অধিক উৎসাহশীল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এইরূপে বহু লোক স্থানীয় শাসন হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া জাতীয় জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রের জ্ঞান লাভ করে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হইতে স্বায়ত্তশাসনের শিক্ষালাভ সত্যসত্যই সম্ভব। এই সমস্ত কারণে অধ্যাপক লাস্কি বলেন যে, কেহ কোন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানে অন্তত তিন বৎসর সভ্য না থাকিলে তাহাকে জাতীয় আইনপরিষদের প্রার্থী হইতে দেওয়া উচিত হইবে না।

স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কাজ (Functions of Local Bodies) : স্থানীয় প্রতিষ্ঠান কি কি কাজ করে? রাস্তাঘাট তৈয়ারী এবং মেরামত, পুল ও পার্ক তৈয়ারী, আলোকসরবরাহ প্রভৃতি এবং সাধারণস্বাস্থ্য উন্নত করিবার ব্যবস্থা এই প্রতিষ্ঠানকে করিতে হয়। প্রাথমিক শিক্ষা দিবার জন্য স্কুল চালানোও ইহার অন্যতম কাজ। উৎকৃষ্ট পানীয় জল সরবরাহ করিবার ব্যবস্থাও এই প্রতিষ্ঠানের অধীন। অনেক সময়ে নিজ নিজ অঞ্চলের শান্তিরক্ষার ভারও

ইহার অধীনে থাকে। বড় বড় শহরের পৌরপ্রতিষ্ঠান অগ্নিনির্বাপকবাহিনী স্থাপন ও পরিচালনা করে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য গ্রন্থাগার, যাদুঘর, চিত্রমন্দির, নাট্যশালা প্রভৃতি স্থাপন করে। শহরে ট্রাম ও বাস চালানো, গ্যাস এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ অনেক পৌর-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনপ্রতিষ্ঠানের গঠন (Organisation) ঃ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনপ্রতিষ্ঠানের গঠনপ্রণালী কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের মতই। সাধারণত ইহাদের একটি করিয়া প্রতিনিধিসভা ও পরিচালকসংঘ থাকে। করদাতা অথবা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ভোটে এই সভার প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। পরিচালকসংঘ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিনিধিসভার সভ্যদের মধ্য হইতে নিযুক্ত হয়। পরিচালকসংঘ প্রতিনিধি সভার নিকট দায়ী। কখন কখন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট হইতে পরিচালক নিযুক্ত হয়। প্রতিনিধিসভা এই কর্মকর্তাদের স্থানীয় শাসন ব্যাপারে সহায়তা করে। পরিচালকসংঘকে সাহায্য করিবার জন্য একদল বেতনভুক কর্মচারী নিযুক্ত থাকে।

স্থানীয় প্রতিষ্ঠান এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের মধ্যে সম্বন্ধ (Relation between the local bodies and the central government) ঃ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান নিজ কর্মক্ষেত্রে সব ব্যাপারে স্বাধীন হইবে, না প্রত্যেক ব্যাপারেই কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অধীনতা স্বীকার করিয়া উহার প্রতিভূ হিসাবেই কাজ করিবে ? এই দুইটির কোনটিকে সমর্থন করা যায় না। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে খুশীমত কাজ করিবার অধিকার দেওয়া চলে না। তাহাদের সার্বভৌম ক্ষমতা নাই। সমগ্র জাতির স্বার্থের কথা চিন্তা করিয়া স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের উপরে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকাই উচিত। কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান যদি স্কুল অথবা হাসপাতাল পরিচালনায় অবহেলা দেখায়, তবে তাহাতে দেশের ক্ষতি হইবে। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারী দেখা দিবা মাত্র যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে, দেশের অন্যত্র এই ব্যাধি ছড়াইয়া পড়িতে পারে এবং ফলে বহু লোকের মৃত্যু ঘটিতে পারে। এই সব কারণে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে এবং যে প্রতিষ্ঠান নিজের কাজে ঘোরতর অবহেলা দেখায় তাহাকে শাস্তি দিতে পারে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট দেশের সকলের হিতার্থে পরিচালিত।

কাজেই সাধারণের স্বার্থের খাতিরে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার তাহার আছে।

কিন্তু তাই বলিয়া সর্বব্যাপারে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবে, তাহাও সমর্থনযোগ্য নহে। তাহা হইলে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান নিজ হইতে কাজ করিবার ক্ষমতা হারাইবে এবং উহার দায়িত্ববোধ লোপ পাইবে। যতদূর সম্ভব স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনতা দেওয়াই উচিত। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে তাহাদের কাজে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। শাসন পরিচালনায় অযোগ্যতা বা অপর কোনরূপ গুরুতর ত্রুটিই একমাত্র হস্তক্ষেপের কারণ হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যের সমন্বয় সাধন করাও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কাজ হইবে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে সবপ্রকাব তথ্য সরবরাহ করিবে এবং স্থানীয় শাসন উন্নত করিবার পন্থা বলিয়া দিবে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বাচ্ছল্য বিধান করিবাব জন্য হিসাবপবীক্ষক নিয়োগ এবং কোন অতিরিক্ত ব্যয মঞ্জুর করা বা না করাব অধিকাব কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টেব থাকিবে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বিশ্বমানবতার পথে

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি রাষ্ট্রের পটভূমিতে নাগরিকের স্থান ও তাহার কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। নাগরিকের হিতসাধন করাই আধুনিক রাষ্ট্রের কাজ। কিন্তু রাষ্ট্রের অল্পপরিসর সীমার মধ্যে নাগরিকের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন করা সব সময়ে সম্ভব নহে। আধুনিক জগৎ বর্তমানযুগে অবিচ্ছিন্ন। দ্রুতগামী যানবাহন আবিষ্কারেব ফলে দূবত্ব কমিয়া গিয়াছে এবং সমগ্র পৃথিবী এক হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে। বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পরস্পরের সহিত এমনভাবে জড়িত যে, এক দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অপর দেশের উপরে প্রভাব বিস্তার করে। স্কটল্যাণ্ডের ডাণ্ডিতে শ্রমিকেরা ধর্মঘট করিলে বাংলা দেশের পাটচাষীরা বিপর্যস্ত হইতে পারে; কিংবা আমেরিকার তুলা উৎপাদন কেন্দ্রে কুয়াসা পড়িলে, আমেদাবাদের কাপড় কলের মালিকদের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া পড়ে। কাজেই অর্থনৈতিক দিক হইতে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সমর্থন না করিয়া উপায় নাই।

বাজনৈতিক প্রয়োজনেও আন্তর্জাতিকতা চাই। কোন একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত রাষ্ট্রগুলিব মধ্যে শান্তিরক্ষা সম্ভব নহে। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে আমবা দেখিতে পাই যে, তথাকথিত সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্র থাকিলে মাঝে মাঝে যুদ্ধ অনিবার্য। কোন একটি রাষ্ট্রেব ক্ষমতাপ্রিয়তার জন্য মাঝে মাঝে বিশ্বের শান্তি ব্যাহত হইতে দেওয়া যায় না। মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বজায় রাখিতে হইলে বর্তমান কালে নাগরিকদের একমাত্র নিজেদের রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য মানিলে চলিবে না।

এই সমস্ত কারণে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীতা সকলেই স্বীকার করেন। নাগরিকের আনুগত্য পরিবার হইতে আরম্ভ করিয়া গোষ্ঠী, গোষ্ঠী হইতে উপজাতি এবং তাহা হইতে রাষ্ট্রে আসিয়া পৌছাইয়াছে। ঠিক সেই ভাবেই তাহার আনুগত্য রাষ্ট্রের সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বরাষ্ট্রে গিয়া পৌছাইবে। আধুনিক কালের আদর্শ নাগরিক বিশ্বমানবতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবে এবং আন্তর্জাতিক সংঘের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিবে।

লীগ অফ্ নেশন্স্ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে লীগ অফ্ নেশন্স্ নামে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। ১৯১৯ সালের শান্তি সম্মেলনে উহার গঠনতন্ত্র গৃহীত হয় এবং ১৯২০ সালে তাহা বিধিমতে প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ইহাতে যোগ দেয়, ভারতবর্ষও যোগ দিয়াছিল। প্রথমে আমেবিকা এবং রাসিয়া উহাতে যোগ দেয় নাই এবং জার্মানীকে যোগ দিতে দেওয়া হয় নাই। পরে জার্মানী এবং রাসিয়া উভয়েই যোগ দেয়। কিন্তু আমেরিকা বরাবরই লীগের বাহিরে ছিল।

লীগের তিনটি অঙ্গ ছিলঃ—কাউন্সিল, সাধারণপরিষদ এবং কর্মচারিবৃন্দ। কাউন্সিলই ছিল কার্যকরী সমিতি, উহার সভ্য সংখ্যা ১৪। ঐ কাউন্সিলে পাচটি প্রধান শক্তির কায়েমী আসন ছিল। অবশিষ্ট নয়টি আসন সাধারণপরিষদ দ্বারা নির্বাচিত হইত। সাধারণপরিষদ প্রত্যেক সভ্য-রাষ্ট্রের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত। ইহা যেন লীগের আইনপরিষদ। বৎসরে একবার করিয়া এই পরিষদের অধিবেশন হইত এবং তাহাতে লীগের সবপ্রকার কাজ সম্বন্ধে আলোচনা হইত। একজন সাধারণ সম্পাদক ও তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য বহু কর্মচারীও নিযুক্ত ছিল। সমস্ত দেশ হইতেই কর্মচারী সংগৃহীত হইত। কাউন্সিল হইতেই সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হইত এবং এই নিয়োগ সাধারণপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইত। দৈনন্দিন সব কাজ এই সম্পাদকের দপ্তর হইতে করা হইত। সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা শহরে লীগের কেন্দ্র ছিল।

দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া লীগ গঠিত হয়—আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং বিশ্বের নিরপত্তা বজায় রাখা; যুদ্ধ প্রতিবোধ করা এবং শান্তি রক্ষা করাই লীগের উদ্দেশ্য ছিল বলা যায়। যুদ্ধ প্রতিরোধ করিতে লীগ দুইটি পন্থা অবলম্বন করিত। প্রথমত, অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ কমাইয়া ফেলিবার চেষ্টা। এই উদ্দেশ্যে অনেক অস্ত্রহ্রাস-সম্মেলন হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় নাই। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক সভ্য রাষ্ট্রকে অনুরোধ করা হইয়াছিল, যেন তাহারা কোন যুদ্ধে লিপ্ত না হয়; কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করিয়াই যেন তাহার মীমাংসা করে। যে সকল বিষয় হইতে যুদ্ধ বাধিতে পারে, তাহার জন্য সালিশী মানা, কিংবা আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া এবং কাউন্সিলের

আলোচনার অধীনে আনা হইত। হেগ শহরে চিরস্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আদালতে সর্বপ্রকার বিরোধ বিচারার্থ উপস্থিত করা হইত। কোনও সভ্য-রাষ্ট্র লীগের নিয়ম না মানিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, সে অবশিষ্ট রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে বলিয়া ধরা হইত। এইরূপ অবস্থায় উক্ত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকার কাউন্সিলকে দেওয়া হইয়াছিল। ইতালী আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে, তাহার বিরুদ্ধে এই নিয়মানুযায়ী অর্থনৈতিক বয়কট জারি করা হইয়াছিল।

লীগ অনেক অরাজনৈতিক কাজও করিত। প্রত্যেক সভ্য-রাষ্ট্রকে শ্রমিকের প্রতি মানুষের মত ব্যবহার করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছিল। শ্রমিকের অবস্থার উন্নতিকল্পে আন্তর্জাতিকশ্রমিকসংঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আফিংয়ের ব্যবসায় নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টাও লীগ করিয়াছিল। দাসত্বপ্রথা উচ্ছেদ লীগের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সাংস্কৃতিক সহযোগিতাব জন্য কমিটি প্রভৃতিও ছিল।

সামাজিক এবং মানবিক কার্যাবলীতে লীগের কাজ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিন্তু লীগ যুদ্ধ প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। ছোট ছোঠ রাষ্ট্রের যুদ্ধস্পৃহা লীগের প্রভাবে লোপ পাইয়াছিল সত্য ; কিন্তু বড় রাষ্ট্রের ব্যাপারে লীগ কিছুই করিতে পারে নাই। লীগের ব্যর্থতার কাবণ বড় বড় রাষ্ট্রগুলি কথনই আন্তরিকভাবে লীগের যুদ্ধবিরোধিতার আদর্শ সমর্থন করে নাই।

য়ুনো (UNO)ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে আবার একটি আন্তর্জাতিক সংঘ গঠনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত না হইলে মানব সভ্যতা নিশ্চিত ধ্বংস হইয়া যাইবে। জাতিসংঘকে প্রকৃত বিশ্বরাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া যায না। আন্তর্জাতিক সাম্য ও মৈত্রীর উপরে তাহার ভিত্তি ছিল না। লীগ অপেক্ষা আরও কার্যকরী প্রতিষ্ঠান হিসাবে য়ুনো গঠিত হইয়াছে। আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের শুধু আপনার রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করিলেই চলিবে না। নাগরিকেরা যদি আন্তর্জাতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত না হয়, তবে যুদ্ধ অনিবার্য। আধুনিক যুদ্ধে আণবিক বোমার মত মারাত্মক অস্ত্র সমগ্র মানব জাতিকেই নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ প্রতিরোধ করিতে লীগ অফ নেশন্স্ গঠিত হইয়াছিল।

কিন্তু তাহা একেবারেই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। বর্তমান বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতেই লীগ আপনা হইতেই উঠিয়া গিয়াছে। শান্তি রক্ষার জন্য নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই উদ্দেশ্যে আমেরিকার গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে একটি পরিকল্পনা মিত্রশক্তির প্রতিনিধিদের নিকট উপস্থিত করা হয়। আমেরিকার ডাম্বারটন ওক্‌স্‌ নামে একস্থানে প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন হয়। প্রতিনিধিরা একটি নূতন বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনা সানফ্রানসিস্‌কোতে অনুষ্ঠিত পরবর্তী এক সম্মেলনে সমর্থিত হয়। এই দুই সম্মেলনে আলোচনার ফলেই য়ুনো (UNO) এর জন্ম। য়ুনোর পুরা নাম সম্মিলিত জাতিসংগঠন (United Nations Organisation).

য়ুনো একটি সাধারণপরিষদ এবং নিরাপত্তাপরিষদ লইয়া গঠিত। যে সমস্ত দেশ ইহার সভ্য, তাহাদের এক একজন প্রতিনিধিকে লইয়া য়ুনোর সাধারণপরিষদ গঠিত। প্রত্যেক শান্তিকামী দেশের প্রতিনিধির সংখ্যা এবং ভোটাধিকার সমান। বৎসরে অন্যূন একবার সাধারণপরিষদের অধিবেশন হয় এবং অধিবেশনে পৃথিবীর নানা সমস্যা আলোচিত হয়। পরিষদে সাধারণ নীতিগুলি আলোচিত হয় এবং কার্যকরীসমিতির সিদ্ধান্ত সমর্থন করা হয়। কার্যকরীসমিতির নাম নিরাপত্তাপরিষদ (Security Council)। নিরাপত্তাপরিষদের সভ্য সংখ্যা এগার। তাহার মধ্যে আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাসিয়া এবং চীন স্থায়ী সভ্য। বাকী ছয়টি আসন দুই বৎসরের জন্য নির্বাচন হয় এবং উহার অর্ধেক প্রতি বৎসর পদত্যাগ করে। নিরাপত্তা-পরিষদে অধিকাংশের সমর্থন থাকিলে কোনও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অবশ্য সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিতে হইলে স্থায়ী সভ্যের প্রত্যেকেরই সমর্থন চাই। এই দিক হইতে য়ুনো লীগ অপেক্ষা শক্তিশালী এবং অধিকতর কার্যকরী।

উপরোক্ত দুইটি বিভাগ ছাড়া য়ুনোতে "তত্ত্বাবধায়ক পরিষদ" (Trusteeship Council), অর্থনৈতিক এবং সামাজিকপরিষদ আছে। যে সব দেশে এখনও স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত হয় নাই, সেখানকার শাসন সম্বন্ধে তদারক করিবার জন্য তত্ত্বাবধায়কপরিষদ গঠিত হইয়াছে। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক-পরিষদ তিন বৎসরের জন্য আঠারো জন সভ্য লইয়া গঠিত। পৃথিবীর নানাবিধ

আর্থিক এবং সামাজিক সমস্যা ইহাতে আলোচিত হয়। প্রতিদিনকার কাজ চালাইবার জন্য য়ুনোর স্থায়ী সম্পাদকীয় দপ্তর আছে। লেক সাক্‌সেসে য়ুনোর স্থান নির্বাচিত হইয়াছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

নাগরিকের আদর্শ

নাগরিকের অধিকার এবং কর্তব্য কি কি, তাহা মোটামুটি আলোচিত হইয়াছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কিছু কিছু পরিচয় দেওয়াও হইয়াছে। নাগরিকগণ কোন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবে, তাহার একটি বিবরণ ব্যতীত পৌরনীতির আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই জীবনে একটি আদর্শ থাকে। নাগরিকগণ কোন আদর্শ অনুসরণ করিবে? প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য হইবে, সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য চেষ্টা করা। সর্বশ্রেষ্ঠ নাগরিক যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়, তাহাই নাগরিক আদর্শ।

নাগরিক যে সমাজে বাস করে, তাহার উন্নতি করা তাহার প্রথম কর্তব্য। কি ভাবে পরিবার ও গোষ্ঠীর ভিতর দিয়া সমাজের বিকাশ হইয়াছে, জাতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। সমাজ এখন জাতি হইতে আন্তর্জাতিকতার দিকে বিকাশ লাভ করিবে। অন্যথায় মানব সভ্যতা ধ্বংস হইয়া যাইবে। নাগরিক প্রত্যেকটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি যথাযথ কর্তব্য সম্পাদন করিবে। পরিবার, গ্রাম, অথবা শহর, জাতি ও বিশ্বমানব—প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য আছে। নাগরিক আদর্শ ইহাই যে, উপরোক্ত প্রত্যেকটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করিতে এবং ত্যাগ স্বীকার করিতে পশ্চাদপদ হইলে চলিবে না। বিশেষ করিয়া দেশের জন্য এবং বিশ্বমানবের হিতার্থে সর্বপ্রকার ত্যাগ এবং দুঃখ বরণ করা তাহার কর্তব্য।

সম্প্রদায় অথবা জাতির সেবায় লাগিতে হইলে, প্রত্যেক নাগরিকের স্বাস্থ্য ভাল রাখিতে হইবে। যাহার স্বাস্থ্য খারাপ, সে অপরের কোন কাজে লাগিতে পারে না। কাজেই নাগরিক আদর্শ অনুসরণ করিতে হইলে তাহাকে স্বাস্থ্য ভাল রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, সাধারণের হিতার্থে নাগরিককে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করিতে হইবে। কাজেই নাগরিককে নিজ বিচারশক্তি উন্নত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে তাহাকে শিক্ষালাভ করিতে হইবে ; দেশের ঐতিহ্যের পূর্ণ পরিচয় তাহাকে রাখিতে হইবে ; দেশবিদেশের সাহিত্য, শিল্প, জ্ঞান-বিকাশের খবর তাহাকে জানিতে হইবে। এই জ্ঞান

থাকিলে তবেই জাতীয় জীবনে কি ভাল অথবা কি মন্দ, তাহা সে বুঝিতে পারিবে এবং যাহা উৎকৃষ্ট তাহা অনুসরণ করিতে পারিবে।

সমাজসেবাই নাগরিকের আদর্শ। সুনাগরিক হইতে হইলে যে সব গুণ থাকা দরকার সবই তাহার চাই। তাহাকে সমাজের প্রতি একান্তভাবে কর্তব্য-পরায়ন হইতে হইবে। সরকারী কাজে নিযুক্ত হইলে নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করিতে হইবে। দেশের ও দশের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া নিজের স্বার্থ প্রয়োজন মত ত্যাগ করিতে হইবে। যাহা দেশের সমষ্টিগত কল্যাণ করিতে সমর্থ নাগরিককে তাহাই করিতে হইবে।

দেশপ্রেম নাগরিকের অন্যতম আদর্শ। কিন্তু প্রকৃত দেশপ্রেম কি তাহা স্মরণ রাখা কর্তব্য। ভ্রান্ত দেশপ্রেম নিজের দেশকেই সকলের উপরে স্থান দেয়। "ভাল হউক মন্দ হউক—আমার দেশ", ইহা ভ্রান্ত দেশপ্রেমিকের আদর্শ। দেশ ও জাতিকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া অপর দেশের স্বাধীনতা হরণ করিতে উদ্যত হওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে। কিন্তু বর্তমান যুগে দীর্ঘ দিন ধরিয়া অপর কোন জাতিকে পদানত রাখা যায় না। ফলে ভ্রান্ত দেশপ্রেমিকের আদর্শের ত্রুটি ধরা পড়ে এবং দেশও কিছু গৌরব লাভ করে না। হিটলার জার্মানীকে গৌরব দান করিতে পারে নাই, মুসোলীনির রোমসাম্রাজ্য পুনঃস্থাপনের কল্পনা লীন হইয়া গিয়াছে। কোনও নাগরিকেরই এই ধরণের দেশপ্রেম আদর্শ হওয়া উচিত নহে। প্রকৃত দেশপ্রেমিক নিজ শক্তি এবং সামর্থ্য দিয়া দেশের সেবা করিবে। অন্য দেশ জয় করিয়া, অথবা অপর জাতিকে শোষণ করিয়া, দেশকে বড় করিয়া তুলিবার কল্পনা করা খুবই ভুল। দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়া কোন সুনাগরিক যেমন আপনার স্বার্থসিদ্ধি করে না, তেমনি সে মানবজাতির স্বার্থের কথা চিন্তা করিয়া অনেক সময়ে দেশের স্বার্থ ছোট করিতে শিখিবে। আদর্শ নাগরিক নিজের কর্মধারা দেশের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ রাখে না। সে সমগ্র মানবজাতির কথা চিন্তা করিয়া তদনুযায়ী কাজ করে। দেশের এক অংশ স্বাধীন অপরাংশ পরাধীন হইলে, দেশের স্বাধীনতা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তেমনি পৃথিবীর কয়েকটি দেশ স্বাধীন, কিন্তু আর সব দেশ পরাধীন হইলে পৃথিবীর শান্তি ব্যাহত হইতে বাধ্য। কোন দেশে দারিদ্র্য ও অশিক্ষা থাকিলে অন্য দেশে সম্পদ্‌ ও শিক্ষা যথোপযুক্ত বৃদ্ধি পাইতে পারে না। সমগ্র পৃথিবীকে অখণ্ড হিসাবে

দেখিয়া পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের অধিকতম সুখসাধনের চেষ্টা আদর্শ নাগরিককে করিতে হইবে।

নাগরিক আদর্শ প্রগতিশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়। সু-নাগরিক কখনও গোঁড়া সংরক্ষণশীল নহে। তাহাকে জীবনের সবদিকে প্রগতিশীল চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। যে সকল আচার-ব্যবহার লোকের হিতসাধনের পথে বাধা দেয়, তাহা কখনই সমর্থনযোগ্য নহে। বহুদিন হইতে আচরিত বলিয়াই কোনও রীতিনীতি সমর্থন করিতে হইবে, এমন কোন কারণ নাই। সব কিছুই পরিবর্তিত হইতেছে। কিন্তু নূতনমিত্যেব ন সাধু সর্বং। যদি কোন পরিবর্তন সাধারণের মঙ্গল করিবে বলিয়া বোঝা যায়, আদর্শ নাগরিককে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে।

নাগরিক-আদর্শ লাভের উপায়ঃ সব অবস্থাতেই এই সমস্ত আদর্শ অনুসরণ করা যায় না। স্বৈরাচারতন্ত্র সুনাগরিক সৃষ্টির পথে বাধা। স্বৈরাচারতন্ত্রে হয়ত নাগরিকেব স্বাস্থ্য এবং সামরিক শিক্ষা বৃদ্ধি হইতে পারে। এমন কি সাহিত্যবিজ্ঞানও কিছু কিছু উন্নত হইতে দেওয়া স্বৈবাচারীর পক্ষে অসম্ভব নহে। কিন্তু ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন স্বৈরাচারীর পক্ষে অসম্ভব নহে। কারণ তাহা হইলে নাগরিকগণ নিজেরা নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহিবে। স্বাধীনতা না থাকিলে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নহে। কাজেই গণতান্ত্রিক দেশ ছাড়া অন্যত্র নাগরিক আদর্শ অনুসরণ করা অসম্ভব। প্রত্যেক নাগরিকের উন্নতি, সুখ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ করিয়া দেওয়া একমাত্র গণতান্ত্রিক শাসনেই সম্ভব। দ্বিতীয়ত, নাগরিক আদর্শ অনুসরণ করিতে হইলে শিক্ষার প্রসার হওয়া একান্ত কর্তব্য। যে নিরক্ষর, অজ্ঞ, তাহার পক্ষে নাগরিক-আদর্শ অনুসরণ করা অসম্ভব। শিক্ষা ছাড়া কেহ নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হয় না। কাজেই রাষ্ট্রের উচিত অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন করা। নাগরিক আদর্শ অনুসরণ কবিতে হইলে দারিদ্র্য দূর করিতে হইবে। দারিদ্র্যের জন্য লোকের মহৎ গুণাবলী বিকাশ লাভ করে না। দারিদ্র্যের জন্য লোকে যথোপযুক্ত কাজে নিযুক্ত হইতে পারে না! ফলে অনেক শক্তিমান লোকের কাজ হইতে সমাজ বঞ্চিত হয়। সুতরাং প্রত্যেকের জীবিকা অর্জনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করা সকলের একান্ত কর্তব্য।

ভারতীয় শাসনতন্ত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

শাসনতন্ত্রের ক্রমবিকাশ

এ দেশে ইংরাজ রাজত্বের গোড়াপত্তন হইল পলাসী ও বক্সারের রণপ্রাঙ্গনে। পলাসীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয় হইলে মিরজাফর নবাব হইলেন বটে, কিন্তু আসল ক্ষমতা ইংবাজ-বণিকের হস্তে চলিয়া গেল। বক্সারের যুদ্ধের পর মুঘল সম্রাট কোম্পানীকে সুবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করিলেন! দেওয়ান হিসাবে কোম্পানী রাজস্ব আদায় করিত ও দেওয়ানী আদালতের কার্য পরিচালনা করিত। ফৌজদারী আদালতেব ভার ও দেশশাসনের দায়িত্ব নামে মাত্র নবাবের হস্তে রহিল। এই অবস্থাকে দ্বৈতশাসনব্যবস্থা বলা হয়।

দ্বৈতশাসনের কুফল ফলিতে দেরী হইল না। কোম্পানীর কর্মচারীগণ সুযোগ বুঝিয়া দেশ ও নবাবকে শোষণ করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জন করিতে লাগিল। দেশের মধ্যে অরাজকতা ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। অবশেষে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকে বাধ্য হইয়া এই অবস্থা দুর করিবার জন্য ১৭৭৩ সালে একটি আইন প্রণয়ন করিতে হয়। এই আইনটির নাম **লর্ড নর্থের রেগুলেটিং আইন**। এহ আইনে ভারত শাসনতন্ত্রের কাঠামো তৈয়ারী করা হইল। ব্রিটিশশাসিত প্রদেশগুলির জন্য একজন গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার কার্যে সাহায্য করিবার জন্য চারিজন সদস্য লইয়া একটি পরিচালকপরিষদ গঠন করা হইল। গভর্ণর-জেনারেল এই পরিষদের অধি-কাংশের মত অনুযায়ী কার্য করিতেন। বিচার কার্যের জন্য কলিকাতায় একটি সুপ্রীম কোর্ট বা উচ্চ আদালত স্থাপন করা হইল। এই আদালতকে গভর্ণর-জেনারেল প্রণীত আইন বাতিল করিয়া দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল।

কিছুদিনের মধ্যেই এই আইনের গলদ বাহির হয়। প্রথম গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেণ হেস্টিংসের সহিত পরিচালকপরিষদের অধিকাংশ সদস্য ও সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হইল। সুতরাং পার্লামেণ্টকে ১৭৮৩ সালে **পিটের ইণ্ডিয়া আইন**

নামে আর একটি আইন প্রণয়ন করিতে হয়। এই আইনে লণ্ডনে "বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোল" বা নিয়ন্ত্রণসংঘ স্থাপন করা হইল। এই সংঘকে ভারতশাসন সম্বন্ধীয় সমস্ত আইন ও কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। সংঘটি ছয়জন সভ্য লইয়া গঠিত হয়। কিন্তু কালক্রমে সমস্ত ক্ষমতা সংঘের সভাপতির হস্তে ন্যস্ত হয়। এই সভাপতি ভারত-সচিবের পূর্বপুরুষ। ১৮৫৮ সালে যখন রাণী ভিক্টোরিয়া নিজ হস্তে ভারতশাসনভার গ্রহণ করিলেন, তখন এই সভাপতির সমস্ত ক্ষমতা নবনিযুক্ত ভারত-সচিবের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। এই সময়ে আর একটি আইনে গভর্ণর-জেনারেলকে পরিচালকপরিষদের অধিকাংশ সদস্যদের মত নাকচ করিয়া নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত এই ক্ষমতা গভর্ণর-জেনারেলের হস্তে ন্যস্ত ছিল।

১৮৩৩ সালের **সনন্দ আইনে** দু'একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করা হয়। এই আইনে এদেশের শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রভূত করা হইল। অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারগুলি সম্পূর্ণভাবে ভারত সরকারের অধীনে আসিল। বাংলার গভর্ণর-জেনারেলকে ভারতের গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত করা হইল। ইহার কুড়ি বৎসর পরে ১৮৫৩ সালের সনন্দ আইনে বাংলা দেশ শাসনের জন্য একজন লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর নিযুক্ত হইলেন। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে যে, এই আইন দ্বারা সর্বপ্রথম একটি পৃথক আইনসভার সৃষ্টি করা হয়। ইহার পূর্বে স-পরিষদ গভর্ণর-জেনারেল আইন বা রেগুলেশন প্রণয়ন করিতেন। এই আইনসভা গভর্ণর-জেনারেল, জঙ্গীলাট, পরিচালক-পরিষদের চারিজন সদস্য ও প্রদেশগুলির ছয়জন সরকারী কর্মচারী, এই বারজন সভ্য লইয়া গঠিত হইয়াছিল।

১৮৫৭ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বিফল হইবার পর রাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। নিয়ন্ত্রণসংঘের সভাপতির পদ তুলিয়া দিয়া তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা ভারতসচিবের হস্তে ন্যস্ত করা হইল; এবং তাঁহার কার্যে সাহায্য করিবার জন্য একটি ভারতপরিষদ স্থাপন করা হইল। আপাতত ভারতবর্ষস্থিত শাসনতন্ত্রের বিশেষ পরিবর্তন করা হইল না। কিন্তু **১৮৬১ সালে ভারতআইনপরিষদ আইন** বলিয়া একটি আইন পাস করা হয়। এই আইনে ভারতীয় আইনসভার কলেবর বৃদ্ধি করা

হইল। গভর্ণর-জেনারেল পরিচালকপরিষদের চারিজন সদস্য ব্যতীত আরও ছয় হইতে বারজন সভ্য মনোনীত করিতে পারিতেন। ইঁহাদের মধ্যে অন্তত অর্ধেক বে-সরকারী সভ্য থাকিতেন ও কয়েকজন ভারতীয়কে সভ্য করা হইত। এই আইনসভার ক্ষমতা অবশ্য অতি সংকীর্ণ ছিল। গভর্ণমেণ্ট ইহার সম্মুখে যে যে বিষয় উপস্থাপিত করিত, কেবল তাহা লইয়াই বিতর্ক চলিত। এই আইনে প্রদেশগুলিতেও আইনসভা স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। বোম্বাই ও মাদ্রাজে ১৮৬১ সালে, বাংলায় ১৮৬২ সালে, যুক্ত প্রদেশে ১৮৮৬ সালে ও পাঞ্জাবে ১৮৯৭ সালে প্রাদেশিক আইনসভার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সভার সদস্যসংখ্যা চার হইতে আটজন ছিল। সকলেই মনোনীত সদস্য এবং তাহাদের অর্ধেক বে-সরকারী সদস্য ছিল। এই আইনে সর্বপ্রথম গভর্ণর-জেনারেলকে জরুরী আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়। জরুরী আইন ছয়মাসের জন্য বহাল থাকিত।

১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয়। ভারতের শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ফলে দেশের শিক্ষিত লোকের মধ্যে নবজাগরণ উপস্থিত হয়। তাহাদের দাবী কিছুটা মিটাইবার উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্ট ১৮৯২ সালে আর একটি আইন প্রণয়ন করে। এই আইন দ্বারা ভারতীয় আইনসভার সভ্যসংখ্যা বাড়ান হইল। গভর্ণর-জেনারেল ১২ জনের স্থলে ১৬ জন সভ্যকে মনোনীত করিতে পারিবেন। এই সভ্যদের— বণিকসংঘ, জেলা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির মত লইয়া মনোনীত করা হইত।

এই আইনে দেশের জনমত কিছুমাত্র তুষ্ট হইল না। সুতরাং ১৯০৯ সালে **মিণ্টো-মর্লে আইন** নামে আর একটি আইনের দ্বারা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করা হয়। ভারতীয় আইনসভার সভ্যসংখ্যা বাড়াইয়া ৬০ জন করা হইল। অধিকাংশ সভ্যদের সরকারী কর্মচারীদের মধ্য হইতে নিযুক্ত করা হইত। অন্যান্য সভ্যগণ পরোক্ষ প্রথায় তিন বৎসরের জন্য মনোনীত হইতেন। এই আইন দ্বারা সর্বপ্রথম মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনপ্রথার প্রবর্তন করা হয়। প্রাদেশিক আইনসভার সভ্যসংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয় এবং তাহাদের অধিকাংশ বেসরকারী সভ্য ছিল।

১৯১৪ সালের মহাসমরে ভারতবর্ষের লোক নানা প্রকারে ইংলণ্ডের সাহায্য করে। ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসনের আকাংখা মিটাইবার উদ্দেশ্যে ভারত-সচিব

মিঃ মণ্টেগ্ ১৯১৭ সালের ২০শে আগস্ট ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে একটি ঘোষণা করেন। ঘোষণাটিতে বলা হয় যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি অংশ হিসাবে ভারতবর্ষে দায়িত্বশীলশাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই সম্রাটের গভর্ণমেণ্টের নীতি। ভারতসরকারও এই নীতির সমর্থক। এই নীতি ধীরে ধীরে কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে শাসনযন্ত্রের প্রত্যেক বিভাগে অধিক সংখ্যায় ভারতীয়দের নিয়োগ ও স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই নীতি অনুযায়ী কি প্রকারের ব্যবস্থা করা উচিত, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য মিঃ মণ্টেগ্ ভারতবর্ষের নানাস্থানে সফর করিলেন ও বড়লাট লর্ড চেম্স্ফোর্ডের সহিত একযোগে একটি বিবরণী দাখিল করিলেন। এই বিবরণীর নাম মণ্ট-ফোর্ড রিপোর্ট। তাঁহাদের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯১৯ সালে ভারতশাসন আইন নামে একটি আইন প্রণয়ন করা হইল।

১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইন ঃ এই আইনে ভারতের শাসনতন্ত্রে কোন মৌলিক পরিবর্তন করা হয় নাই। আইনের ভূমিকাতে ভবিষ্যতে ধীরে ধীরে দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের আশা দেওয়া হইয়াছিল বটে; কিন্তু ইহাকে কার্যকরী করিবার জন্য বিশেষ কিছু করা হয় নাই। ভারত সরকার সর্বতোভাবে ভারতসচিবের অধীনে রহিয়া গেল। কেবল গভর্ণর-জেনারেলের পরিচালক সমিতিতে কয়েকজন ভারতীয়কে নিযুক্ত করা হইল। কেন্দ্রীয় আইনপরিষদের দুইটি সভা গঠনের ব্যবস্থা হইল। রাষ্ট্রপরিষদ বা উচ্চপরিষদ মোট ৬০ জন সভ্য লইয়া গঠিত ছিল। তাহার মধ্যে ৩৩ জন অর্থাৎ অধিকাংশ নির্বাচিত সভ্য। নিম্নপরিষদের ১৪৫ জন সভ্য ছিল। তাহার মধ্যে ১০৪ জন নির্বাচিত ও ৪১ জন গভর্ণর-জেনারেল কর্তৃক মনোনীত হইত। প্রত্যক্ষ নির্বাচনপ্রথার প্রবর্তন হইল। কিন্তু সাম্প্রদায়িক পৃথকনির্বাচনব্যবস্থা রহিয়া গেল। আইনপরিষদকে কিছু কিছু ক্ষমতা দেওয়া হইল। কিন্তু ক্ষমতাগুলি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সরকারী বিভাগগুলির আয়ব্যয়ের তালিকা আইনপরিষদে পেশ করা হইত এবং কয়েকটি বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বিভাগীয় ব্যয়ের দাবী আইনপরিষদ ইচ্ছা করিলে মঞ্জুর কিংবা নামঞ্জুর করিতে পারিত। কিন্তু পরিষদ কোন ব্যয়ের দাবী নামঞ্জুর করিলেও গভর্ণর-জেনারেল নিজের ক্ষমতায় তাহা মঞ্জুর করিতেন। অনেক বিষয়ের বিল আইনপরিষদে উপস্থিত করিবার পূর্বে গভর্ণর-জেনারেলের

অনুমতি লইতে হইত। আইনপরিষদে কোন বিল অথবা তাহার সংশোধনী প্রস্তাব লইয়া আলোচনা গভর্ণর-জেনারেল ইচ্ছা করিলে বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন। কোন সরকারী বিল আইনপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত না হইলেও গভর্ণর-জেনারেল তাহা আইনে পরিণত করিতে পারিতেন।

এইভাবে আসল ক্ষমতা গভর্ণর-জেনারেলের হাতেই রহিয়া গেল। তাঁহার পরিচালকপরিষদ আইনপরিষদের নিকট দায়ী ছিল না। আইনপরিষদ সমালোচনা করিত, অসন্তোষ জানাইত। কিন্তু তাহাতে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করিয়া জগন্নাথের রথের ন্যায় সপরিষদ-গভর্ণর-জেনারেল খুশীমত রাজ্য চালাইতেন।

দ্বৈতশাসন (Dyarchy): পুলিস, জেলখানা, বিচার-ব্যবস্থা, কৃষি, জমি, জলসেচ, বন প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ের শাসনভার প্রাদেশিক সরকারের হস্তে ন্যস্ত করা হইল। প্রদেশগুলিতে "দ্বৈতশাসনব্যবস্থা" বা "ডু-ইয়ার্কি ব্যবস্থা" প্রবর্তন করা হইল। প্রাদেশিক বিষয়গুলিকে সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত এই দুই শ্রেণীভুক্ত করা হইল। পুলিস, জেলখানা, বিচারব্যবস্থা, রাজস্ব, জলসেচ প্রভৃতি সংরক্ষিত বিষয়ের কার্য সপরিষদ-গভর্ণর পরিচালনা করিতেন। গভর্ণরের পরিচালক-পরিষদ দুই অথবা চারজন সভ্য লইয়া গঠিত হইত। সভ্যদের নিযুক্ত করিতেন ভারত সম্রাট এবং তাঁহারা নিজেদের কার্যের জন্য ভারতসচিব ও ভারত সরকারের নিকট দায়ী থাকিতেন। তাঁহারা প্রাদেশিক আইনসভার অধিবেশনে যোগ দিতেন, কিন্তু আইনসভার ভোটের উপর নির্ভর করিতেন না। কৃষি, জমি, সমবায়, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি হস্তান্তরিত বিষয়গুলির পরিচালনের জন্য গভর্ণর একটি মন্ত্রিসভা নিযুক্ত করিতেন। আইনসভার সভ্যদের মধ্য হইতে মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইত এবং সকল কার্যের জন্য আইনসভার নিকট তাঁহাদের জবাবদিহি করিতে হইত। আইনসভা অনাস্থাজ্ঞাপন করিলে তাঁহারা পদত্যাগ করিতেন। গভর্ণর সাধারণত মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী হস্তান্তরিত বিভাগের কার্য পরিচালনা করিতেন; কিন্তু প্রয়োজনবোধ করিলে তিনি মন্ত্রী কিংবা মন্ত্রীদের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া নিজের ইচ্ছামত কাজ করিতে পারিতেন। এইভাবে প্রদেশের এক অতি ক্ষুদ্র খণ্ডে আংশিকভাবে দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্রের বীজ রোপণ করা হইল। পরিচালকপরিষদ ও মন্ত্রীসভা এই দুইটি প্রতিষ্ঠান দ্বারা সরকার গঠন করা হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে দ্বৈতশাসনব্যবস্থা বলা হয়।

প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া একপরিষদবিশিষ্ট আইনসভা ছিল। আইনসভার অধিকাংশ সভ্য নির্বাচিত ও অবশিষ্ট গভর্ণর কর্তৃক মনোনীত হইত। পরিচালকপরিষদের সভ্যদের আইনসভার সদস্য মনোনীত করা হইত। আইনসভার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের ন্যায় সীমাবদ্ধ ছিল। গভর্ণর ইচ্ছা করিলে নামঞ্জুরী বিল অথবা ব্যয়ের দাবী মঞ্জুর করিতে পারিতেন।

এই দ্বৈতশাসনব্যবস্থা কোনরকমেই সফলতা লাভ করে নাই। সরকারকে মানবদেহের মত তুলনা করা যায়। মানবদেহ যেমন দুই খণ্ডে ভাগ করিলে সব কাজ পণ্ড হয়, সরকারের কাজ দুই ভাগ করার ফলও তাহাই হইল। দ্বৈতশাসনে সরকারী কাজ দুই খণ্ড করা হইল। ফল হইল কুফল। যদি দুইখণ্ড পরস্পরের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিত, তবে হয়ত কিছু সুফলের আশা ছিল। কিন্তু অধিকাংশক্ষেত্রেই মন্ত্রিসভা ও পরিচালকপরিষদের মধ্যে সহযোগিতা কিংবা যোগাযোগ ছিল না। এই দ্বৈতবিভাগের ফল অনেক সময়ে অদ্ভুত হয়। উদাহরণ স্বরূপ একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কৃষির উন্নতি মন্ত্রীর দায়িত্ব। কিন্তু জলসেচবিভাগ পরিচালকপরিষদের সভ্যের অধীনে। জলসেচের ভাল ব্যবস্থা না থাকিলে কৃষির উন্নতি করা দুরূহ বলিলেও চলে। আবার, কত রাজস্ব আদায় হইবে ও কিভাবে তাহা ব্যয় করা হইবে, তাহা নির্ণয় করিত পরিচালকপরিষদ। সরকারী কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণাধিকার পরিচালকপরিষদের। যে গৃহে সিন্দুকের চাবী অন্যের হস্তে, ভৃত্যেরা অন্যের হুকুম মানিয়া চলে, সে গৃহের গৃহিণী, মন্ত্রীদের অবস্থা ও ক্ষমতা সহজেই অনুমেয়। ইহার পর আবার গভর্ণর মন্ত্রীদের উপদেশ প্রায়ই অগ্রাহ্য করিতেন। মন্ত্রীদের মধ্যে যুগ্মদায়িত্বব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য গভর্ণর কোন চেষ্টাই করেন নাই। তাঁহারা অধিকাংশ সময়েই মন্ত্রীদের সহিত পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা ও পরামর্শ করিতেন। মন্ত্রীদের প্রায়ই সরকারী অনুরাগভাজন সভ্যদের মধ্য হইতে নিয়োগ করা হইত এবং অধিকাংশ সময়েই আইনসভার নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে তাঁহাদের বিশেষ সমর্থন থাকিত না। মনোনীত সদস্যদের ভোটের জোরে তাঁহাদের মন্ত্রিত্ব বজায় থাকিত। ইহার ফলে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার বীজ শুকাইয়া গেল।

দ্বৈতশাসনের বিফলতার আর একটি কারণ অর্থাভাব। মন্ত্রীরা যদি প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া নানারকম জনকল্যাণকর পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে পারিতেন,

তাহা হইলে হয়ত দ্বৈতশাসন জনপ্রিয় হইত। কিন্তু ১৯২১ সালের পর প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেরই বাজেটে ঘাটতি উপস্থিত হয়। অর্থের অনটনে দ্বৈতশাসনের কোন গুণ থাকিলেও তাহা নষ্ট হইল।

১৯২৯ হইতে ১৯৩৫ঃ দ্বৈতশাসনে কেহই সন্তুষ্ট নয় বুঝিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৯২৯ সালে সাইমন কমিসন নামে ৭ জন পার্লামেণ্টের সদস্য লইয়া গঠিত একটি কমিসন নিযুক্ত করে। ইংলণ্ডেব শ্রমিক মন্ত্রিসভার বর্তমান প্রধান মন্ত্রী মিঃ এট্‌লী এই কমিসনের সদস্য ছিলেন। ভারতীয় সব দলই এই কমিসন বর্জন করে। এই কমিসন তাহাদের বিবরণীতে দ্বৈতশাসনব্যবস্থা তুলিয়া প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য প্রবর্তনের সুপারিশ করে।

ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রনির্ধারণেব উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট লণ্ডন শহরে ১৯৩০ সালে একটি গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করে। এই গোলটেবিলে ব্রিটিশ ও ভারতীয় প্রতিনিধি ছিল। দ্বিতীয় গোলটেবিলে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। তিনটি গোলটেবিল বৈঠকে বিশেষ কোন কাজ হয় নাই। ইহার পর ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে তাহাদের মতামত ব্যক্ত করিয়া কতকগুলি প্রস্তাব একটি "হোয়াইট পেপার" প্রকাশ করে এই প্রস্তাবগুলির কিছু অদল বদল করিয়া ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন প্রণয়ন করা হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে তিনটি বিশিষ্ট পরিবর্তন করা হইল। প্রথমত, দেশীয় রাজ্যগুলি ও বিভিন্ন প্রদেশ লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা হয়। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রে দ্বৈতশাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইল। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিভাগগুলির মধ্যে দেশরক্ষা, বৈদেশিক বিভাগ, উপজাতি বিভাগ প্রভৃতি বিভাগের পরিচালনা স্বয়ং বড়লাট করিতেন। অন্যান্য বিষয়ের শাসনভার একটি মন্ত্রিপরিষদের উপর ন্যস্ত হইল। তৃতীয়ত, প্রদেশগুলিকে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হইল ও আংশিক ভাবে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইল। অবশ্য কেন্দ্রেও এইরূপ আংশিক দায়িত্বশীল শাসন প্রবর্তনের ব্যবস্থা ছিল।

গভর্ণর-জেনারেল ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়গুলির শাসনভার গভর্ণর-জেনারেল ও একটি মন্ত্রিপরিষদের উপর ন্যস্ত করা হইল। মন্ত্রিপরিষদ থাকিলেও গভর্ণর-জেনারেলের হস্তে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া ছিল। সাধারণত তাঁহার ক্ষমতা তিন ভাগে ভাগ করা হইত,—স্ব-ইচ্ছাধীন ক্ষমতা, বিশেষ দায়িত্বের ক্ষমতা ও অন্যান্য ক্ষমতা। **স্ব-ইচ্ছাধীন ক্ষমতা** (Discretionary powers) প্রয়োগ করিবার পূর্বে তিনি মন্ত্রীদের সহিত কোন পরামর্শ করিতে বাধ্য নহেন। এই বিষয়গুলির পরিচালনায় মন্ত্রীদের কোন অধিকার থাকিত না। দেশরক্ষা বিভাগ, উপজাতি বিভাগ, বৈদেশিক বিভাগ ও যাজক বিভাগ -এই বিভাগগুলিকে সংরক্ষিত বিভাগ বলা হইত। ইহাদের পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গভর্ণর-জেনারেলের। তিনি মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ না করিয়া স্ব-ইচ্ছাধীন ভাবে এই বিভাগগুলির পরিচালনা করিতেন। এই কার্যে সাহায্য করিবার জন্য তিনি তিন জন পর্যন্ত উপদেষ্টা নিযুক্ত করিতে পারিতেন। উপদেষ্টাগণের বেতন ও ভাতা তিনিই নির্ধারিত করিতেন এবং তাঁহারা গভর্ণর-জেনারেলের নিকট দায়ী থাকিতেন। ইহা ছাড়া তাঁহার আরও স্ব-ইচ্ছাধীন ক্ষমতা ছিল। মন্ত্রীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত, আইনপরিষদের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত ও ভঙ্গ করা, আইনপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত বিলে সম্মতি দান, অথবা নাকচ করা,

অথবা সম্রাটের মতামতের জন্ত পাঠাইয়া দেওয়া, গভর্ণর-জেনারেলের আইন নামে আইন পাস করা, জরুরী আইন প্রণয়ন, আইনপরিষদে কোন বিল সম্বন্ধে বিতর্ক বন্ধ করা, আইনপরিষদের মঞ্জুরীসাপেক্ষ নহে এমন সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা, আইনপরিষদ কর্তৃক নামঞ্জুরীকৃত ব্যয়ের দাবী মঞ্জুর করা প্রভৃতি স্ব-ইচ্ছাধীন ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। প্রয়োজন বোধ করিলে, তিনি শাসনতন্ত্র ভঙ্গের ঘোষণা করিয়া নিজের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা লইতে পারিতেন। ইহাও স্ব-ইচ্ছাধীন ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত।

এই বিষয়গুলি ব্যতীত অন্যান্য বিভাগের পরিচালনা তিনি সাধারণত মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী করিতেন। তবে প্রয়োজন বোধ করিলে তিনি মন্ত্রীদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া নিজের বিচারমত ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। ভারতে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার জন্ত; আর্থিক স্থিতি ও সুনাম রক্ষার জন্য; সংখ্যালঘিষ্ঠদের অধিকার রক্ষার জন্য; সরকারী কর্মচারীদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য; দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণের অধিকার রক্ষার জন্য; বাণিজ্য বিষয়ে বৈষম্যমূলকব্যবস্থা নিরোধ করিবার জন্য; ইংলণ্ড ও বর্মা হইতে আগত দ্রব্যাদির উপর বৈষম্যমূলক করধার্য নিবারণের জন্য ও তাঁহার নিজের স্ব-ইচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন হইলে তিনি মন্ত্রীদের উপদেশ বাতিল করিয়া নিজের ইচ্ছামত ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। এই বিষয়গুলিকে তাঁহার **বিশেষ দায়িত্বের বিষয়** (Special Responsibilities) বলা হইত। ইহা ছাড়াও আরও অন্যান্য বিষয়ে তিনি মন্ত্রীদের উপদেশ নাকচ করিতে পারিতেন।

এইভাবে গভর্ণর-জেনারেলকে মন্ত্রী ও আইনপরিষদ সম্বন্ধে প্রায় স্বৈরাচারীর ক্ষমতা দেওয়া হয়। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগের পূর্বে তাঁহাকে ইংলণ্ডস্থ ভারত-সচিবকে সব জানাইতে হইত ও তাঁহার সম্মতি লইতে হইত।

মন্ত্রিপরিষদ : গভর্ণর-জেনারেল নিজের কার্য পরিচালনার জন্ত একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠন করিতেন। মন্ত্রীদের সংখ্যা দশ জনের অধিক হইবে না এবং তিনিই তাঁহাদের নিয়োগ করিতেন। মন্ত্রীদের আইন-পরিষদের মধ্য হইতে নিযুক্ত করা হইত। সাধারণত আইন-পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দলপতির সহিত পরামর্শ করিয়া অন্ত মন্ত্রীদের নিয়োগ করা হইত। দলপতি হইতেন প্রধান মন্ত্রী বা মহামাত্য। মন্ত্রীদের কেহ আইনপরিষদের সভ্য না

থাকিলে তাঁহাকে ছয় মাসের মধ্যে সভ্য হইতে হইত। নচেৎ তাঁহাকে ইস্তফা দিতে হইত। বড়লাট ইচ্ছা করিলে মন্ত্রিপরিষদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে পারিতেন।

দেশরক্ষা প্রভৃতি সংরক্ষিত বিভাগগুলি ও গভর্ণর-জেনারেলের স্ব-ইচ্ছাধীন ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের শাসনকার্য মন্ত্রীরা পরিচালনা করিতেন। কি ভাবে ও কোন নীতি অনুযায়ী কাজ করিতে হইবে সে সম্বন্ধে মন্ত্রীরা যে উপদেশ দিতেন, গভর্ণর-জেনারেল সাধারণত সেই অনুযায়ী আদেশ দিতেন। কিন্তু তিনি তাঁহার বিশেষ দায়িত্বপালনের জন্য প্রয়োজন হইলে মন্ত্রীদের মত অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন। মন্ত্রীপরিষদ তাঁহাদের কার্যের জন্য আইনপরিষদের নিকট দায়ী থাকিতেন ও নিম্নপরিষদ অনাস্থাজ্ঞাপন করিলে পদত্যাগ করিতেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনপরিষদ: দুইটি সভা লইয়া এই পরিষদ গঠিত হইত। উচ্চ পরিষদের সভ্য সংখ্যা ছিল ২৬০ জন ও নিম্নপরিষদে ৩৭৫ জন সভ্য। তাহার মধ্যে দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধি ছিলেন ও নৃপতিগণ তাঁহাদের মনোনয়ন করিতেন। উচ্চপরিষদের অন্যান্য সভ্য প্রত্যক্ষভাবে ও নিম্নপরিষদের সভ্যগণ পরোক্ষভাবে প্রাদেশিক আইনসভার সভ্য কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন। নিম্নপরিষদের আয়ুষ্কাল পাঁচবৎসর, যদি না ইহার পূর্বেই গভর্ণর-জেনারেল পরিষদ ভঙ্গ করিতেন। উচ্চপরিষদ ছিল স্থায়ী সভা। ইহার এক-তৃতীয়াংশ সভ্য প্রতি তিনবৎসর অন্তর নির্বাচিত হইতেন। উভয় পরিষদের ক্ষমতা ছিল প্রায় সমানই। শুধু রাজস্ব সম্পর্কীয় বিল ও আয়ব্যয়ের তালিকা নিম্নপরিষদে প্রথম উত্থাপন করিতে হইত। কিন্তু উচ্চপরিষদকে ব্যয়ের দাবী মঞ্জুরীর অধিকার দেওয়া ছিল। অন্য কোন দেশে এইরূপ ব্যবস্থা নাই।

আইন পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রীয় ও যুগ্মবিষয়ে আইন প্রণয়ন করিত, আয়ব্যয় মঞ্জুর করিত, মন্ত্রীদের কার্যের তদারক করিত। কিন্তু ইহার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। অনেক বিষয়েই কোন বিল গভর্ণর-জেনারেলের পূর্বানুমোদন ব্যতীত পরিষদে উপস্থিত করা যাইত না। গভর্ণর-জেনারেল যে কোন বিল সম্পর্কে বিতর্ক বন্ধ করিতে পারিতেন। গভর্ণর-জেনারেল আইনপরিষদ কর্তৃক অননুমোদিত বিল আইনে পরিণত করিতে পারিতেন। পরিষদের নামঞ্জুরী

ব্যয়ের দাবী মঞ্জুর করিতে পারিতেন। ইচ্ছামত জরুরী আইন প্রণয়ন করিতে পারিতেন। সরকারী ব্যয়ের প্রায় তিনচতুর্থাংশই পরিষদের অনুমোদনসাপেক্ষ ছিল না। এই সম্বন্ধে ব্যয়ের দাবী পরিষদের ভোটের জন্য উপস্থিত করা হইত না। মন্ত্রিপরিষদ অবশ্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকিত। কিন্তু মন্ত্রি-পরিষদের হাতে ক্ষমতা খুব কম ছিল। ইহাদের প্রত্যেককে প্রতিপদক্ষেপে বড়লাটের অনুশাসন মানিয়া চলিতে হইত।

গভর্ণর: প্রাদেশিক সরকার গভর্ণর ও মন্ত্রিসভা লইয়া গঠিত হইত। গভর্ণরের ক্ষমতা গভর্ণর-জেনারেলের ক্ষমতার অনুরূপ ছিল। শুধু দুই একটি পার্থক্য ছিল। প্রদেশে কোন সংরক্ষিত বিভাগ ছিল না। সমস্ত প্রাদেশিক বিভাগের শাসনভার মন্ত্রিসভার হস্তে ন্যস্ত ছিল। মন্ত্রিসভা প্রাদেশিক আইন-সভার নিকট দায়ী ছিল। কিন্তু গভর্ণরকেও স্ব-ইচ্ছাধীন ক্ষমতা ও বিশেষ দায়িত্বের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। **স্ব-ইচ্ছাধীন ক্ষমতার** বিষয়গুলি (Discretionary Powers) মন্ত্রীদের অধিকার বহির্ভূত। এই বিষয়ে গভর্ণর মন্ত্রীদের পরামর্শ লইতে বাধ্য ছিলেন না। বিষয়গুলি গভর্ণর-জেনারেলের হস্তে ন্যস্ত বিষয়ের অনুরূপ। এইগুলি ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের শাসন গভর্ণর মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালনা করিতেন। কিন্তু তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য মন্ত্রীদের মত অগ্রাহ্য করিয়া নিজের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবস্থা করিতেন। আর্থিক স্থিতি ও সুনাম রক্ষার জন্য গভর্ণরের কোন বিশেষ দায়িত্ব ছিল না। শুধু এই একটি ছাড়া গভর্ণরের **বিশেষ দায়িত্বের বিষয়**গুলির সহিত (অর্থাৎ প্রদেশের শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা, সরকারী কর্মচারীদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষা, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষা, দেশীয় নৃপতিগণের অধিকার রক্ষা, বাণিজ্য-বৈষম্য-মূলক ব্যবস্থার প্রতিরোধ, ব্রিটেন ও বর্মা হইতে আনীত দ্রব্যের উপর বৈষম্যমূলক শুল্ক ধার্য নিবারণ, আংশিকভাবে বহির্ভূত অঞ্চলগুলির শাসন এবং গভর্ণর-জেনারেলের আদেশ পালন—এইগুলি গভর্ণরের বিশেষ দায়িত্বের বিষয়) গভর্ণর-জেনারেলের বিশেষ দায়িত্বের বিষয়ের কোন পার্থক্য ছিল না। গভর্ণর মন্ত্রীদের নিযুক্ত ও বরখাস্ত করিতেন। তাঁহার অন্যান্য ক্ষমতা গভর্ণর-জেনারেলের ক্ষমতার অনুরূপ। তিনি তাঁহার ইচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার পূর্বে গভর্ণর-জেনারেলের সম্মতি লইতেন।

মন্ত্রিসভা: প্রাদেশিক সমস্ত বিষয়গুলির শাসনকার্য পরিচালনার জন্য

একটি মন্ত্রিসভা গঠন করা হইত। গভর্ণর মন্ত্রিদের নিযুক্ত করিতেন। তিনি আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দলপতির সহিত পরামর্শ করিয়া মন্ত্রীদের নিযুক্ত করিতেন। দলপতিকে মহামন্ত্রী বলা হইত। মন্ত্রীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি থাকিত। মন্ত্রীরা সকলেই আইনসভার সভ্য। কেহ সভ্য না থাকিলে, তবে ছয় মাসের মধ্যে তাঁহাকে সভ্য হইতে হইত। নচেৎ পদত্যাগ করিতে হইত। মন্ত্রীদের চাকুরী গভর্ণরের খুশীর উপর নির্ভর করিত এবং তিনি যে কোন সময়ে তাঁহাদের বরখাস্ত করিতে পারিতেন। মন্ত্রীরা আইন-সভার নিকট তাঁহাদের কাযের জন্য দায়ী। আইনসভা অনাস্থা জ্ঞাপন করিলে তাঁহারা পদত্যাগ করিতেন।

প্রদেশে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইল। কিন্তু মন্ত্রীদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। প্রথমত কতকগুলি বিষয়ের পরিচালনার দায়িত্ব একমাত্র গভর্ণরের উপর ন্যস্ত ছিল। এগুলিকে স্ব-ইচ্ছাধীন ক্ষমতার বিষয় বলে। মন্ত্রীদের এই বিষয়ে কোন প্রকার পরামর্শ দিবার অধিকার ছিল না। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য বিষয়গুলি অবশ্য মন্ত্রীরা চালাইতেন এবং সাধারণত গভর্ণর তাঁহাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিতেন। কিন্তু তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য গভর্ণর যে কোন সময়ে মন্ত্রীদের মত অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন।

আইন সভা : বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বাংলা ও আসাম, এই ছয়টি প্রদেশে দুইটি করিয়া পরিষদ ছিল। অন্য প্রদেশে একটি পরিষদ লইয়া আইনসভা গঠিত ছিল। উচ্চ পরিষদের সভ্যের অধিকাংশ সাধারণ ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত ও কয়েকজন গভর্ণর কর্তৃক মনোনীত হইতেন। কোন কোন প্রদেশে কিছু সংখ্যক সভ্য নিম্ন পরিষদের সভ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত ছিল। এই পরিষদ স্থায়ী সভা। ইহার এক তৃতীয়াংশ সভ্য প্রতি তিন বৎসর পর পর নির্বাচিত হইত। নিম্ন পরিষদের সমস্ত সভ্যই পাচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইত। কিন্তু গভর্ণর ইচ্ছা করিলে পাচ বৎসরের পূর্বে পরিষদ ভঙ্গ করিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারিতেন।

প্রাদেশিক আইনসভার ক্ষমতা ছিল সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় আইনপরিষদের অনুরূপ। ইহাকে প্রতি পদক্ষেপে গভর্ণর ও গভর্ণর-জেনারেলের অনুশাসন মানিয়া চলিতে হইত। আইনসভার অনুমোদন না থাকিলেও গভর্ণর আইন প্রণয়ন

করিতে পারিতেন। তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন বোধ করিলে আইনসভা কর্তৃক নামঞ্জুরী ব্যয়ের দাবী মঞ্জুর করিতে পারিতেন।

এইভাবে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র গঠিত হইয়াছিল। কোন বিষয়ে অনুষ্ঠানের ত্রুটি ছিল না। সর্বত্রই মহামান্য অমাত্যবর্গ ছিল, আইনপরিষদ ছিল। কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকের ক্ষমতা নানা প্রকারে সীমাবদ্ধ ছিল। গভর্ণর-জেনারেল ও গভর্ণরের সুদীর্ঘ স্ব-ইচ্ছাধীন ক্ষমতা ও বিশেষ দায়িত্ব বিষয়ক ক্ষমতার তালিকা দেখিলে ইহা সহজেই অনুমেয়। ইহাদের সকলের উর্ধ্বে একটি অতি ক্ষমতাবান ব্যক্তি লণ্ডনে বসিয়া কলকাঠি নাড়াইতেন এবং এদেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেন। তিনি ইংলণ্ডেশ্বরের ভারতসচিব। তাঁহার কথা না বলিলে এই শাসন-বিবরণ শিরহীন বক্ষের ন্যায় হইবে।

ভারতসচিব (Secretary of State for India) **ও তাঁহার উপদেষ্টা-সংঘ** (Board of Advisers) : ভারতসচিব ইংলণ্ডের মন্ত্রিপরিষদের একজন সদস্য। ভারতশাসন সম্পর্কে তিনি ইংলণ্ডেশ্বরের উপদেষ্টা। গভর্ণর ও অন্যান্য উচ্চপদে কাহাদের নিযুক্ত করা হইবে, সে সম্বন্ধে এবং বিভিন্ন ভারতীয় আইন-পরিষদকৃত আইন নাকচ করা হইবে কিনা, সে বিষয়ে তিনি সম্রাটকে উপদেশ দিতেন।

ভারত-শাসন-আইন অনুসারে স-পরিষদ-গভর্ণর-জেনারেল ও গভর্ণর-জেনারেল নিজে সববিষয়ে ভারতসচিবের অধীন ছিলেন। গভর্ণর-জেনারেলের কাজ ছিল, ভারতসচিবকে শাসনসংক্রান্ত সমস্ত বিষয় পূর্বেই জানাইয়া দেওয়া এবং তাঁহার সম্মতিক্রমে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা। স্ব-ইচ্ছাধীন ও বিশেষ দায়িত্ব বিষয়ক ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ করিবার পূর্বে গভর্ণর-জেনারেলকে ভারতসচিবের সম্মতি লইতে হইত। প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর ভারতসচিবের সাক্ষাৎভাবে কোন ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু প্রাদেশিক গভর্ণরের উপর তাঁহার ক্ষমতা ছিল। গভর্ণরদের হস্তে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া ছিল এবং তাঁহাদের এই ক্ষমতা প্রয়োগ গভর্ণর-জেনারেলের পরামর্শ ও মত অনুযায়ী করিতে হইত। সুতরাং গভর্ণর-জেনারেলের মারফৎ ভারতসচিব গভর্ণরদের কাজ নিয়ন্ত্রিত করিতেন। শুধু তাহাই নহে। আই, সি, এস্, ; আই, পি, এস্, প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের তিনিই নিযুক্ত করিতেন এবং তাহাদের চাকুরীর নিয়ম তিনিই নির্দিষ্ট করিতেন। যদি কোন কর্মচারী মনে করিত যে, সরকার তাহার

চাকুরী সম্বন্ধে অন্যায় আদেশ দিয়াছে, তবে সে ভারতসচিবের নিকট এই আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিত। এইভাবে শাসনতন্ত্রের উপর তাঁহাকে সবময় ক্ষমতা দেওয়া ছিল।

ভারতসচিব ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য ও ভারতশাসনের জন্য তিনি পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী ছিলেন। পার্লামেণ্টে ভারতশাসনসংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্নের জবাব তাঁহাকে দিতে হইত। গভর্ণর-জেনারেল ও গভর্ণরদের নিয়োগকালে সম্রাট তাঁহাদের উপদেশপত্র দিতেন। তাহার খসড়া পূর্বেই তাঁহাকে পার্লামেণ্টের নিকট দাখিল করিতে হইত। ভারতশাসন আইন অনুযায়ী সম্রাট যে সমস্ত "অর্ডার-ইন-কাউন্সিল" জারী করিতেন, তাহাও ভারতসচিবকে পার্লামেণ্টে দাখিল করিতে হইত।

ভারতসচিবের একটি উপদেষ্টাসংঘ ছিল। ভারতসচিব আটজন হইতে বারজন পর্যন্ত উপদেষ্টা নিযুক্ত করিতেন। কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিলে কমপক্ষে মাত্র পাঁচজন উপদেষ্টা নিযুক্ত করিতে পারিতেন। উপদেষ্টাদের নিয়োগকাল পাঁচ বৎসর। তাঁহারা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য হইতে পারিতেন না। ভারত সরকারের অধীনে যাঁহারা অন্তত দশ বৎসর চাকুরী করিতেন এবং যাঁহাদের ভারত ত্যাগের পর দুই বৎসরের অধিক সময় অতিবাহিত হয় নাই, তাঁহাদের মধ্য হইতে অর্ধেক সংখ্যক উপদেষ্টা নিযুক্ত করা হইত। ভারতসচিব তাঁহাদের সহিত ভারতশাসন বিষয়ে পরামর্শ করিতেন। তবে তিনি উপদেষ্টাগণের পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য ছিলেন না। কিন্তু স-পরিষদ গভর্ণর-জেনারেলের রাজস্বসংক্রান্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে, ইংলণ্ডে স্টার্লিং ঋণ গ্রহণ বিষয়ে ও সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ বিষয়ক নিয়মাবলীর পরিবর্তন সম্বন্ধে সকল বিষয়ে তিনি উপদেষ্টাসংঘের সহিত পরামর্শ এবং সংঘের অধিকাংশ সদস্যের মতানুযায়ী কাজ করিতে বাধ্য ছিলেন।

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন পাস হইলেও তাহা সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী করা হয় নাই। ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের প্রবর্তন করা হইল। গত মহাযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বন্ধ করা হইল। ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যব্যবস্থা কার্যকরী ছিল। মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পরে নানা ঘটনাসংঘাতের মধ্য দিয়া ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এই উভয় দল কর্তৃক অনুমোদিত

একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করা হইল। এই পরিকল্পনা অনুসারে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ভারত ও পাকিস্তান দুইটি ডোমিনিয়নের পত্তন হইল। ইহা ভারতস্বাধীনতা আইনের দ্বারা পত্তন করা হইল। এই আইনে গভর্ণর-জেনারেলকে ১৯৪৮ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন প্রয়োজনমত পরিবর্তনের অধিকার দেওয়া ছিল। তদনুসারে গভর্ণর-জেনারেল ভারতশাসন আইনের সংশোধন করিয়া বহু ধারা তুলিয়া দিলেন ও পরিবর্তন করিলেন। ভারতসচিবের পদ ও তাঁহার উপদেষ্টাসংঘ তুলিয়া দেওয়া হইল। গভর্ণর-জেনারেল ও গভর্ণরের বিশেষ ক্ষমতাগুলি আর রহিল না। গণপরিষদ কর্তৃক শাসনতন্ত্র গঠন পর্যন্ত সংশোধিত '৩৫ সালের ভারতশাসন আইন অনুযায়ী ভারত-শাসন পরিচালিত হইতেছিল। পরের পরিচ্ছেদগুলিতে এই সংশোধিত শাসনব্যবস্থার বর্ণনা করা হইতেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রগঠনের পথে

মহাযুদ্ধের মধ্যে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা তাঁহাদের একজন সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সকে এদেশে পাঠান। কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের নেতাদের সহিত কথাবার্তা চালাইয়া একটা আপোষ-মীমাংসায উপস্থিত হওয়াই ক্রিপ্‌সের উদ্দেশ্য ছিল। ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রগঠনের পূর্বে অন্তর্বর্তী সরকার কি ভাবে গঠিত হইবে ও তাহাকে কি কি ক্ষমতা দেওয়া হইবে, তাহা লইয়া মতভেদ হওয়াতে কংগ্রেস এই প্রস্তাবগুলি প্রত্যাখ্যান করে। ক্রিপ্‌সের দৌত্য ব্যর্থ হইয়া যায়। ইহার পর অবশ্য ব্রিটিশ সরকার আরও কয়েকবার আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। যুদ্ধান্তে ইংলণ্ডে নূতন নির্বাচন হয় ও তাহাতে শ্রমিকদল জয়লাভ করে। শ্রমিক মন্ত্রিসভার তিনজন সদস্য ভারতের বিভিন্ন দলের নেতাদের সহিত কথাবার্তা চালাইবার জন্য এদেশে আগমন করেন। মন্ত্রিমিসন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সহিত আলোচনা করিয়া উভয়ের দাবীর কোন সামঞ্জস্য করিতে পারিল না। তখন ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে তারিখে মন্ত্রিমিসন ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রগঠন সম্বন্ধে নিজেদের কতকগুলি প্রস্তাব প্রকাশ করেন।

মন্ত্রিমিসন পরিকল্পনা (Cabinet Mission Plan): মন্ত্রিমিসন মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবী যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করেন নাই। তাঁহাদের মতে প্রদেশগুলি ও সামন্ত রাজ্য লইয়া একটি সম্মিলিত রাষ্ট্রের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র গঠন করা হইবে। এই সম্মিলিত রাষ্ট্রের সরকারের হস্তে বৈদেশিক বিভাগ, দেশরক্ষা বিভাগ ও যানবাহন বিভাগ,—এই তিনটি বিষয়ের শাসনভার দেওয়া হইবে। গণপরিষদের হিন্দু ও মুসলমান সভ্যদের অধিকাংশ রাজী হইলে অবশ্য অন্য বিষয়ের শাসনভার এই সরকারকে দেওয়া যাইতে পারে। এই সরকারের ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব কি ভাবে আদায় হইবে, তাহা গণপরিষদ ঠিক করিবে। কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনার জন্য একটি পরিচালকপরিষদ ও একটি আইনপরিষদ থাকিবে। সাধারণত, কোন প্রস্তাব অথবা বিলগ্রহণ

করা হইবে কিনা, তাহা আইনপরিষদের অধিকাংশের ভোটে স্থির হইবে। কিন্তু কোন বিষয়কে যদি গুরুতর সাম্প্রদায়িক বিষয় বলা হয়, তবে তাহা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের অধিকাংশের ভোটে ঠিক হইবে। অর্থাৎ অধিকাংশ মুসলমানসভ্য মত না দিলে তাহা পাস করা যাইবে না। পরিচালকপরিষদ ও আইনপরিষদের গঠন কি প্রকারে হইবে তাহা গণপরিষদ নির্ধারিত করিবে।

উপরোক্ত তিনটি বিষয় ব্যতীত অন্য সমস্ত বিভাগের শাসনভার প্রদেশগুলির হস্তে ন্যস্ত হইবে এবং তাহাদের এবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য থাকিবে। প্রদেশগুলি নিম্নলিখিত ভাবে গ্রুপ বা সম্মিলিত সরকার গঠন করিতে পারিবে। গণপরিষদে নির্বাচিত আসাম ও বাংলার প্রতিনিধি দল মিলিত হইয়া অধিকাংশের ভোটে এইরূপ একটি সম্মিলিত সরকার গঠন করিতে পারিবে। ইহা গঠন করা সাব্যস্ত হইলে প্রতিনিধিদল ইহার কিরূপ গঠনতন্ত্র হইবে ও কি কি বিষয় ইহার হস্তে ন্যস্ত করা হইবে, তাহা ঠিক করিবে। তাহারা বিভিন্ন প্রদেশের গঠনতন্ত্রও ঠিক করিবে। এইভাবে উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশ আর একটি গ্রুপ বা সম্মিলিত সরকার গঠন করিতে পারে। বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই কয়টি হিন্দুপ্রধান প্রদেশও পূর্বোক্ত ভাবে একটি সম্মিলিত সরকার গঠন করিতে পারিবে। এই প্রকারের সম্মিলিত সরকার গঠিত হইলেও যে কোন প্রদেশ তাহা গ্রহণ না করিয়া বাহিরে থাকিতে পারে। নূতন শাসনতন্ত্র গঠনের পর প্রথম নির্বাচন হইলে প্রাদেশিক আইনসভার অধিকাংশ সভ্য যদি সম্মিলিত সরকারে যোগদান করার বিরুদ্ধে ভোট দেয়, তবে সেই প্রদেশ সম্মিলিত সরকার হইতে বাহিরে থাকিতে পারিবে।

ইহাই নূতন শাসনতন্ত্রের খসড়া। এই শাসনতন্ত্র গঠন করিবার জন্য একটি গণপরিষদ নির্বাচন করা হইবে। গণপরিষদে সবশুদ্ধ ৩৮৯ জন প্রতিনিধি থাকিবে। তাহার মধ্যে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশগুলি হইতে ২৯৬ জন ও সামন্ত রাজ্য হইতে ৯৩ জন প্রতিনিধি থাকিবে। প্রতি একলক্ষ লোকের যাহাতে একজন করিয়া প্রতিনিধি থাকে, সে অনুপাতে প্রতিনিধি সংখ্যা ঠিক করা হইয়াছে। ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন প্রাদেশিক আইসভার নিম্ন-পরিষদের সভ্যগণকর্তৃক (যেখানে একটিমাত্র সভা সেখানে সেই সভার সভ্যগণ

দ্বারা) নির্বাচিত হইবে। সামন্ত রাজ্যের প্রতিনিধি নির্বাচন রাজাদের ইচ্ছানুসারে হইবে। প্রতিনিধি নির্বাচন শেষ হইলে তাহারা মিলিত হইয়া প্রথমে সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচন করিবে এবং পৌর অধিকার, সংখ্যালঘিষ্ঠদের অধিকার ও উপজাতি ও বহির্ভূত অঞ্চলের শাসনপ্রণালী নির্ধারণের জন্য একটি উপদেষ্টাসমিতি গঠন করিবে। এই সমিতি উক্ত বিষয়-গুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া একটি বিবরণী গণপরিষদে দাখিল করিবে।

তাহার পর প্রতিনিধিবৃন্দ তিনটি ভাগে বিভক্ত হইয়া অধিবেশন করিবে। বাংলা ও আসামের প্রতিনিধিবর্গ যুক্তভাবে সম্মিলিত সরকার গঠন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিবে ও প্রদেশগুলির গঠনতন্ত্র ঠিক করিবে। অন্যান্য বিভাগ কিভাবে হইবে, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সমস্ত বিষয় ঠিক করার পর, তিন বিভাগের প্রতিনিধিরা আবার সম্মিলিত হইবে ও কেন্দ্রীয় সরকারের গঠনতন্ত্র স্থির করিবে। এই গঠনতন্ত্র পূর্বোক্ত খসড়া অনুযায়ী করিতে হইবে। অবশ্য অন্যভাবেও করা যাইতে পারে, যদি উভয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশ প্রতিনিধি তাহাতে মত দেয়। কোন গুরুতর সাম্প্রদায়িক বিষয়ও এই পদ্ধতিতে নির্ধারিত করিতে হইবে। কোন বিষয় গুরুতর সাম্প্রদায়িক বিষয়, তাহা গণপরিষদের সভাপতি ঠিক করিবেন। যদি কোন সম্প্রদায়ের অধিকাংশ প্রতিনিধি দাবী করেন, তবে তিনি এ বিষয় ঠিক করিবার পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের মত লইবেন। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থ বা রাষ্ট্রসম্মেলনের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে কিনা তাহাও গণপরিষদ ঠিক করিবে। নূতন শাসনতন্ত্রে দশ বৎসর পর পর পরিবর্তনের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। নূতন শাসনতন্ত্র গঠনের পূর্ব পর্যন্ত একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই সরকার বিভিন্ন দলীয় প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইবে কথা ছিল।

এই প্রস্তাবগুলি প্রথমে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস উভয় দলই গ্রহণ করে। পরে লীগ ইহা প্রত্যাখ্যান করে। নির্বাচনের পর যখন প্রথম গণপরিষদের অধিবেশন হয় তাহাতে লীগের প্রতিনিধিরা যোগদান করিল না। ইহার ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল তাহার সমাধানকল্পে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী মাসে ঘোষণা করে যে, তাহারা ১৯৪৮ সালের জুন মাসের শেষে ভারত ত্যাগ করিয়া যাইবে। এই সময় লর্ড ওয়াভেল পদত্যাগ করিলেন ও তাঁহার স্থলে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন গভর্ণর-জেনারেল হইলেন। তিনি আবার

কংগ্রেস, লীগ ও শিখদের প্রতিনিধির সহিত আলাপ-আলোচনা করেন। এই আলোচনান্তে তিনি ১৯৪৭ সালের জুন মাসের ৩রা তারিখে একটি পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এই পরিকল্পনাটি তিনটি দলের নেতাগণই গ্রহণ করেন।

৩রা জুনের পরিকল্পনা (Mountbatten Plan): এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কংগ্রেস মুসলিমলীগের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবী মানিয়া লইল। ঠিক হইল যে, যে সমস্ত প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ (অর্থাৎ বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ), সেখানকার প্রাদেশিক সভার সভ্যগণ ভোট দিয়া একটি পৃথক রাষ্ট্রগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করা হইবে। তবে বাংলার যে সব অঞ্চলে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেই অঞ্চল হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যদি ভারতে যোগ দেওয়ার পক্ষে ভোট দেয় তবে বঙ্গ-বিভাগ করা হইবে এবং এক অংশ পাকিস্তানে যাইবে ও অন্য অংশ ভারতে থাকিবে। এইরূপ সিলেট জেলা আসামে থাকিবে, না পাকিস্তানে যোগদান করিবে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য এই জেলাতে গণভোট গ্রহণ করা হইবে। এইভাবে পাঞ্জাবের হিন্দু-শিখ অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রতিনিধিবৃন্দ ভোট দিলে এই প্রদেশকে দুইভাগ করা হইবে। উত্তরপশ্চিমসামান্ত প্রদেশেও গণভোট লওয়া হইবে। এই সম্বন্ধে বেলুচিস্তানের অধিবাসীদের মত জানিবার ব্যবস্থাও করা হইবে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করা ঠিক হইলে তাহার জন্য দ্বিতীয় একটি গণপরিষদ গঠন করা হইবে।

ইহার পর প্রাদেশিক আইনসভার সভ্যদের ভোট ও গণভোট লওয়া হইয়াছে। বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্ত হইয়াছে। সিলেট ও উত্তরপশ্চিমসীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানে যোগ দিয়াছে। সীমান্ত কমিসন বসাইয়া বাংলা ও পাঞ্জাবের দুই অংশের সীমানা নির্ধারণ করা হইয়াছে।

এই পরিকল্পনাটি কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট **ভারত স্বাধীনতা আইন** নামে একটি আইন প্রণয়ন করিয়াছে। এই আইনের সারাংশ নিম্নে দেওয়া হইল।

ভারত স্বাধীনতা আইন: এই আইনে ঠিক হইলে যে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট হইতে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি রাষ্ট্র গঠন করা হইবে। এই রাষ্ট্র দুইটি বর্তমানে ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থ্‌ অন্তর্ভুক্ত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল বলিয়া গণ্য হইবে। উভয় ডোমিনিয়নের গণপরিষদ ইচ্ছা করিলে অবশ্য

ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিতে পারিবে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ, বেলুচিস্তান ও সিলেট জেলার সহিত পূর্ব বাংলাকে লইয়া পাকিস্তান গঠিত হইবে। অবশিষ্ট অঞ্চলগুলি লইয়া ভারতীয় ডোমিনিয়ন গঠিত হইবে। ১৫ই আগস্টের পর এই দুইটি রাষ্ট্র সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকার ও পার্লামেণ্টের কোন ক্ষমতাই থাকিবে না। সমস্ত ক্ষমতা উভয় ডোমিনিয়নের গণপরিষদের হস্তে ন্যস্ত হইবে। গণপরিষদ ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র যে ভাবে ইচ্ছা গঠন করিবে। যতদিন পর্যন্ত নূতন শাসনতন্ত্র বহাল না হয়, ততদিন গণপরিষদ কেন্দ্রীয় আইনসভার কাজ করিবে এবং ততদিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির কার্য ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন অনুযায়ী চলিবে। তবে এই আইনের অনেক ধারা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিশেষত, গভর্ণর-জেনারেল ও গভর্ণদের যে বিশেষ দায়িত্বের ক্ষমতা ও স্ব-ইচ্ছাধীন ক্ষমতা দেওয়া ছিল তাহা সমস্তই বাতিল করা হইল। গভর্ণর-জেনারেলকে ভারতশাসন আইনের যে কোন পরিবর্তন করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই ক্ষমতা ১৯৪৮ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত বহাল থাকিবে। উভয় ডোমিনিয়ন সম্মত হইলে উভয়ের একই গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত করা হইবে।

এই আইনে সামন্তরাজ্যগুলির উপরও ব্রিটিশ কর্তৃত্বের অবসান করা হয়। সামন্তরাজ্যগুলির সঙ্গে ব্রিটিশরাজ্যের যে সমস্ত সন্ধিপত্র, সনন্দ ও চুক্তি ছিল, তাহা বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাজ্যগুলি ইচ্ছা করিলে উভয় ডোমিনিয়নের কোন একটিতে যোগদান করিতে পারে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র

১৯৪৬ সালের মে মাসের ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রস্তাবানুযায়ী একটি গণপরিষদের প্রতিষ্ঠা করা হয়। নানা অবস্থার মধ্য দিয়া এই গণপরিষদ একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে। এই শাসনতন্ত্র ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী হইতে বহাল করা হইয়াছ।

শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Indian constitution): এই শাসনতন্ত্রে ভারতকে সম্পূর্ণ স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। এই রাষ্ট্রটি যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় শাসনের বিষয়গুলি, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য, এই দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় বিষয়গুলির শাসনভার কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ও রাজ্য বিষয়গুলির শাসনভার বিভিন্ন রাজ্য সরকারের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। এইগুলি ছাড়া কতকগুলি বিষয়কে যুগ্ম বিষয় বলা হইয়াছে। এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে আইনপ্রণয়নের ভার কেন্দ্রীয় ও রাজ্যগুলির সরকারের উপর ন্যস্ত আছে। সাধারণত যুগ্ম বিষয় সম্বন্ধীয় কেন্দ্রায় আইন রাজ্য সরকারের আইনের উপর বলবৎ থাকিবে। কিন্তু রাজ্য সরকারের আইন যদি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয়, তবে তাহা কেন্দ্রীয় আইনের উপর বলবৎ হইবে। তালিকাভুক্ত ছাড়া নূতন কোন বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীনে থাকিবে।

কিন্তু বর্তমান শাসনতন্ত্রকে পূর্ণ যুক্তরাষ্ট্র বলা চলে না। সাধারণত, যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্য সরকারের কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের থাকে না। কিন্তু ভারতশাসনতন্ত্রে অন্তত দুইটি অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলির অধিকৃত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। প্রথমত, কেন্দ্রীয় রাজ্যপরিষদ যদি দুইতৃতীয়াংশ সভ্যের ভোটে, "দেশের স্বার্থরক্ষার্থে কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ কোন একটি বা কয়েকটি রাষ্ট্রীয় বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করুক,"—এই 'মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাহা হইলে আইনপরিষদ রাজ্য সরকারের বিষয়গুলি সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপতি

যদি জরুরী অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে এই মর্মে কোন ঘোষণা করেন, তবে কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ যে কোন রাষ্ট্রীয় বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয় আইনপরিষদকে এত ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কোন রাজ্যের শাসন সম্বন্ধে রাজ্যপাল অথবা রাজপ্রমুখের বিবরণী পাঠে রাষ্ট্রপতির যদি ধারণা হয় যে, সেই রাজ্যের শাসনকার্য শাসনতন্ত্রানুযায়ী পরিচালনা করা সম্ভব নহে, তবে তিনি অনুরূপ একটি ঘোষণা করিতে পারিবেন এবং সেই রাজ্যের শাসনভার স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারিবেন। অর্থাৎ এই ঘোষণার ফলে রাজ্য সরকার ও আইনসভাকে বরখাস্ত করা হইবে ও কেন্দ্রীয় সরকার সেই রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করিবে। কাজেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে পূর্ণভাবে যুক্তরাষ্ট্র বলা চলে না। ইহার মধ্যে বহু একক শাসনের বৈশিষ্ট্য বর্তমান আছে।

এই শাসনতন্ত্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে ইহাতে পূর্ণভাবে দায়িত্বশীল শাসনের প্রবর্তন করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলেও প্রতিপদে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিবেন। রাজ্যগুলিতেই পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসনের প্রবর্তন করা হইয়াছে। রাজ্যপাল সব বিষয়েই মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে বাধ্য নহেন। অবশ্য দুই একটি বিষয়ে তিনি মন্ত্রিসভার পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া নিজমত অনুসারে কাজ করিতে পারেন। সাধারণত, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে উভয় ক্ষেত্রেই একই ধরণের শাসনব্যবস্থা থাকে।

ইহার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে কেন্দ্রীয় আইনপরিষদের দ্বি উচ্চ কক্ষে অর্থাৎ রাজ্যপরিষদে রাজ্যগুলির সভ্যসংখ্যা সমান করা হয় নাই। সাধারণত, যুক্তরাষ্ট্রের আইনপরিষদের উচ্চকক্ষে রাজ্যগুলির সমানসংখ্যক প্রতিনিধি থাকে। কিন্তু ভারতের যুক্তরাষ্ট্রে তাহা থাকিবে না। রাজ্যপরিষদে উত্তর-প্রদেশ হইতে ৩১ জন সভ্য ও আসাম হইতে মাত্র ৬ জন সভ্য নির্বাচিত হইবে।

এই শাসনতন্ত্রের আরও দুইটি বিশেষত্ব আছে। ইহার একটি অধ্যায়ে নাগরিকদের কয়েকটি মৌলিক অধিকারের বর্ণনা ও রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইরূপ মৌলিক অধিকারের তালিকা অবশ্য অনেক শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা আছে। পঞ্চম বৈশিষ্ট্যটি হইতেছে ইহাতে বহু রাষ্ট্রপরিচালনা-নীতির সন্নিবেশ করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্রের এই অধ্যায়ে ভবিষ্যতে বিভিন্ন

সরকার কি কি নীতি অনুযায়ী কার্য পরিচালনা করিবেন তাহার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

আমাদের শাসনতন্ত্রের শেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, যদিও বর্তমান শাসনতন্ত্রটি লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের পর্যায়ে পড়ে, তাহা হইলেও সংশোধনেব ব্যবস্থা অন্যান্য শাসনতন্ত্রের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সহজ রাখা হইয়াছে। ইহার ফলে প্রয়োজন মত সংশোধন সহজেই কবা যাইবে।

শাসনতন্ত্রের গঠন (Organisation of the Indian Union): ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র চারশ্রেণীর রাজ্য লইয়া গঠিত। বর্তমানে নয়টি প্রথমশ্রেণীর (Part A) রাজ্য রহিয়াছে। ইহাদের নাম আসাম, বিহার, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিম বাংলা। ব্রিটিশ আমলে এই অঞ্চলগুলিকে প্রদেশ বলা হইত। অন্ধ্র রাজ্যের পত্তন ১লা অক্টোবর হইতে হইবার কথা আছে। তাহা হইলে প্রথম শ্রেণীর রাজ্যসংখ্যা দশ হইবে। বর্তমান মাদ্রাজ রাজ্যের তেলেগু ভাষাভাষী অঞ্চলকে লইয়া অন্ধ্র রাজ্য গঠিত হইবে।

আটটি দ্বিতীয় শ্রেণীর (Part B) রাজ্য আছে। ইহাদের নাম জম্মু ও কাশ্মীর, ত্রিবাংকুর-কোচিন, মধ্যভাবত, মহীশূব, পেপ্সু (পাতিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্যসম্মেলন), রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র ও হায়দ্রাবাদ। ইহার মধ্যে কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ ও মহীশূর ভূতপূর্ব দেশীয় রাজ্য। অন্যগুলি কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের সম্মেলনে গঠিত।

দশটি তৃতীয় শ্রেণীর (Part C) রাজ্য আছে,—আজমীর, ভূপাল, বিলাসপুর, কুর্গ, দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, কচ্ছ, মণিপুব, ত্রিপুরা ও বিন্ধ্যপ্রদেশ। ইহার মধ্যে কুর্গ, আজমীর ও দিল্লী ব্রিটিশ আমলে চিফ্ কমিসনারের প্রদেশ নামে খ্যাত ছিল। অন্যগুলি দেশীয় রাজ্য বা বাজ্যগুলি লইয়া গঠিত।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে চতুর্থ শ্রেণীর (Part D) রাজ্য বলা হয়।

শাসনব্যবস্থার প্রভেদের জন্যই এই শ্রেণী-বিভাগ করা হইয়াছে। যেমন, চতুর্থ শ্রেণীর রাজ্যের শাসনভার সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার ইহার শাসনকার্য পরিচালনা করে। তৃতীয় শ্রেণীর রাজ্যের শাসন দায়িত্বও অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত আছে। তবে কেন্দ্রীয়

সরকার সুবিধামত এই রাজ্যগুলিতে আইনসভা ও একটি মন্ত্রিসভা বা উপদেষ্টা সভা গঠন করিয়া তাহাদের হস্তে শাসনভার ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া দিতে পারে। ইহাদের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রপতি একজন লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর অথবা চিফ কমিসনার নিযুক্ত করিতে পারেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজ্যগুলির শাসনের দায়িত্ব রাজপ্রমুখ, মন্ত্রিসভা ও আইন-সভাব হস্তে ন্যস্ত। ভূতপূর্ব দেশীয় রাজ্যেব অধিপতিদের মধ্য হইতেই রাজপ্রমুখ নিযুক্ত আছেন। প্রথম দশ বৎসর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার ইহাদের কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার রাখে।

প্রথম শ্রেণীর রাজ্যেব ক্ষমতা সবচেয়ে অধিক। ইহাদেব শাসনের জন্য একজন রাজ্যপাল, মন্ত্রিসভা ও আইনসভা আছে।

পূবেই বলা হইয়াছে যে, বর্তমান শাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতে গঠিত। শাসনকার্য পরিচালনার জন্য দুই শ্রেণীর গভর্ণমেণ্ট আছে,—কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সবকার। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট একজন রাষ্ট্রপতি, একটি মন্ত্রিপরিষদ ও দুইটি সভাবিশিষ্ট আইনপরিষদ লইয়া গঠিত। রাষ্ট্রপতি প্রধান কর্মকর্তা হইলেও তিনি মন্ত্রিপবিষদের পরামর্শানুযায়ী শাসন করেন। রাজ্যগুলির শাসনের জন্য একজন রাজ্যপাল (প্রথম শ্রেণীর রাজ্য) অথবা বাজপ্রমুখ (দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজ্য) ও একটি মন্ত্রিসভা ও আইনসভা আছে। সবত্রই দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইয়াছে। মন্ত্রিসভাই আসল ক্ষমতার অধিকারী ও আইনসভার নিকট দায়ী।

শাসনের বিভাগগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে,-কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও যুগ্ম। কেন্দ্রীয় বিষয়গুলির শাসনভার সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টেব উপর ন্যস্ত। রাজ্যবিষয়গুলি সাধারণত রাজ্যসরকারের শাসনাধীনে। তবে কোন কোন সময়ে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টও ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পাবে। যুগ্ম বিষয়গুলি সম্বন্ধে আইন প্রণয়নের দায়িত্ব উভয় গভর্ণমেণ্টের উপর দেওয়া আছে। এই তিনটি তালিকাতে অনুল্লিখিত বিষয়ের (residuary powers) শাসন দায়িত্ব কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের।

উভয় শ্রেণীর গভর্ণমেণ্টের বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্য ও শাসনতন্ত্র ব্যাখ্যা করিবার জন্য একটি অধিধর্মাধিকরণ (Supreme Court) প্রতিষ্ঠিত আছে।

শাসনতন্ত্রের সংশোধন (Amendment of the Constitution) : বর্তমান শাসনতন্ত্র নিম্নলিখিত উপায়ে সংশোধন করা যাইবে। সংশোধনের প্রস্তাবটি বিলের আকারে কেন্দ্রীয় আইনপরিষদের যে কোন পরিষদে উত্থাপন করিতে হইবে। প্রত্যেক পরিষদের মোট সভ্যের অধিকাংশ এবং অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যদের মধ্যে অন্তত দুইতৃতীয়াংশ সভ্য যদি বিলটির পক্ষে ভোট দেয় তবে বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হইবে। রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিলে শাসনতন্ত্র তদনুযায়ী সংশোধিত হইবে। কিন্তু কেন্দ্রীয়, রাষ্ট্রীয় ও যুগ্মবিষয়ের তালিকা কিংবা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ক্ষমতা, কিম্বা রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ব্যবস্থা অথবা আইনপরিষদে রাজ্যগুলির নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা সম্বন্ধে যদি কোন সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়, তবে অন্তত অর্ধেক সংখ্যক রাজ্যের আইনসভা সম্মতি না দিলে প্রস্তাবটি কার্যকরী হইবে না।

মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) : গণতান্ত্রিকরাষ্ট্রমাত্রেই নাগরিকদের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। সেই উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রের বিশিষ্ট অধিকার সম্বন্ধে কতকগুলি ধারা নিবদ্ধ করা হয়। এই অধিকারগুলিকে মৌলিক অধিকার বলে। সাধারণ অবস্থায় এই অধিকার ব্যাহত করিয়া কিছু করিবার ক্ষমতা সরকার বা আইনপরিষদ কাহারও থাকে না। সরকারী কোন কার্য অথবা আইনে নিজের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়াছে মনে করিলে, যে কোন নাগরিক আদালতে উপস্থিত হইয়া নিজের অধিকার রক্ষার দাবী করিতে পারে। আবেদন যথার্থ হইলে আদালত হইতে সরকারী আদেশটি অথবা আইন বাতিল করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের তৃতীয় অংশে নাগরিকদের জন্য কতকগুলি মৌলিক অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। (ক) **সমব্যবহারের অধিকার** : জাতি, ধর্ম, ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে রাষ্ট্র সকল নাগরিকের সঙ্গে সমান ব্যবহার করিবে। আইনের চক্ষে সকলেরই সমান অধিকার থাকিবে ও কোন নাগরিকের বিরুদ্ধে তাহার জাতি বা ধর্ম বা সম্প্রদায় লইয়া কোন প্রভেদাত্মক ব্যবহার করা চলিবে না। প্রত্যেক নাগরিকেরই সরকারী কার্যে নিযুক্ত হইবার সমান অধিকার থাকিবে। অস্পৃশ্যতা বে-আইনি বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। রাষ্ট্র হইতে কোন নাগরিককে সরকারী উপাধি দেওয়া হইবে না। (খ) **ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার** : সকল নাগরিকেরই বাক্‌স্বাধীনতা, সভাসমিতি গঠনের স্বাধীনতা,

দেশের অভ্যন্তরে অবাধ ভ্রমণের ও বাস করিবার স্বাধীনতা থাকিবে। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজনে রাষ্ট্র এই সব স্বাধীনতা ব্যাহত রাখিতে পারিবে। কাহাকেও বে-আইনিভাবে আটক রাখা যাইবে না। ১৪ বৎসরের নীচের বয়স্ক বালক-বালিকাকে কোন খনি বা কারখানার কাজে লাগান চলিবে না। (গ) **ধর্মাচরণের অধিকার**ঃ সকলেরই ধর্মাচরণের স্বাধীনতা থাকিবে। (ঘ) **শিক্ষা ও সংস্কৃতিরক্ষার অধিকার**ঃ প্রত্যেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিজ নিজ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে ও তাহার উন্নতি করিতে পারিবে ও সেইজন্য রাষ্ট্র হইতে কোন বাধাও দেওয়া হইবে না। তাহারা ইচ্ছা করিলে নিজ সংস্কৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে এবং রাষ্ট্র হইতে এই সমস্ত শিক্ষায়তনকে ন্যায্যমত অর্থ সাহায্য করা হইবে। (ঙ) **সম্পত্তি-রক্ষার অধিকার**ঃ বে-আইনি করিয়া কাহারও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যাইবে না ও যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না দিয়া কাহারও কোন সম্পত্তি সরকারী কার্যের জন্য লওয়া যাইবে না। (চ) **মৌলিক অধিকার-রক্ষার অধিকার**ঃ যে কোন নাগরিক এই মৌলিক অধিকার রক্ষার দাবী করিয়া অধিধর্মাধিকরণে আবেদন করিতে পারিবে ও অধিধর্মাধিকরণ (Supreme Court) বিচার করিয়া যথোপযুক্ত আদেশ দিবেন।

যদি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করেন, তবে তিনি বাক্‌স্বাধীনতা, সভাসমিতি গঠনের স্বাধীনতা প্রভৃতি অধিকার ও অধিধর্মাধিকরণে আবেদনের অধিকার এই ঘোষণাটি বহাল থাকা পর্যন্ত স্থগিত রাখিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

রাষ্ট্রীয় কর্মপরিচালনার নীতি (Directive Principles of State Policy)ঃ ভারতীয় শাসনতন্ত্রে একটি নূতন বৈশিষ্ট্যের প্রবর্তন করা হইয়াছে। ইহার চতুর্থ অংশে ভবিষ্যতে কি কি নীতি অনুযায়ী সরকারী কার্য পরিচালনা করা উচিত, সে সম্বন্ধে কয়েকটি ধারা নিবদ্ধ করা আছে। এই অংশে বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র সর্ববিষয়ে জনগণমঙ্গল বিধায়ক কার্য করিবে। কর্মী, স্ত্রী কিংবা পুরুষই হউক, সমান কাজ করিবে, যাহাতে সমান মাহিনা পায় তাহার ব্যবস্থা করিবে। অত্যধিক আয়ের বৈষম্য যাহাতে না হয়, সেই অনুযায়ী আর্থিক ব্যবস্থা করিতে হইবে। গ্রাম পঞ্চায়েৎ গঠন করিতে হইবে। সকল নাগরিক যাহাতে উপযুক্ত শিক্ষা ও কর্ম লাভ করে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আগামী

দশ বৎসরের মধ্যে ১৪ বৎসর বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করিতে হইবে। প্রত্যেক শ্রমিক যাহাতে জীবিকা অর্জনের উপযোগী বেতন পায়, অসুস্থ হইলে চিকিৎসা ও ভরণপোষণের জন্য ভাতা পায়, বৃদ্ধ বয়সে অবসর ভাতা পায় ও স্ত্রী গর্ভাবস্থায় কর্ম হইতে ছুটি ও উপযুক্ত ভাতা পায় তাহার ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে করিতে হইবে। অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য ও তাহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। চাষের উন্নতি করিতে হইবে। বিচারবিভাগকে পরিচালনবিভাগ হইতে ভিন্ন করিতে হইবে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তিস্থাপনের সমস্ত কলহ বিনাযুদ্ধে সালিশীর দ্বারা মীমাংসা করিয়া লইবার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য রাষ্ট্রকে সচেষ্ট হইতে হইবে।

মৌলিক অধিকার হইতে এই নিয়মগুলির পার্থক্য আছে। মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে আদালতে ক্ষুণ্ণকারী ব্যক্তি বা সরকারের বিরুদ্ধে নালিশ করা যাইবে। কিন্তু কোন সরকার যদি এই নিয়মগুলি না মানিয়া চলে, তবে তাহার বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করা চলিবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কেন্দ্রীয় সরকার

বর্তমানে রাষ্ট্রপতি অর্থাৎ প্রেসিডেণ্ট ও তাঁহার মন্ত্রিপরিষদ লইয়া কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতি (President): রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান কর্তা। তাঁহাকে নির্বাচন করা হইবে। নির্বাচন করিবেন কেন্দ্রীয় আইনপরিষদের সদস্যগণ ও রাজ্যগুলির আইনসভার নির্বাচিত সভ্যদল। ইঁহারা মিলিত হইয়া ভোট দিয়া রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিবেন। যিনি রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হইতে চান, তাঁহাকে অন্তত ৩৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে ও তাঁহার কেন্দ্রীয় লোকসভার সভ্য হইবার গুণাবলী থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতির নিয়োগকাল পাঁচ বৎসর ও তাঁহাকে পুনর্নির্বাচন করা যাইবে। কোন ভারতীয় বিচারালয়ে তাঁহার বিরুদ্ধে মকদ্দমা করা যাইবে না। তবে কেন্দ্রীয় আইনপরিষদে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ (impeachment) আনা চলিবে। যে পরিষদে এই অভিযোগের প্রস্তাব আনা হইবে সেখানে প্রস্তাবটি অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য দ্বারা সমর্থিত হইলে অন্য পরিষদের সদস্যগণ এই অভিযোগের বিচার করিবেন। অনুসন্ধান ও বিচারের পর সেই পরিষদের অন্তত দুই তৃতীয়াংশ সদস্য অভিযোগের প্রস্তাব সমর্থন করিলে রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগ করিতে হইবে।

রাষ্ট্রপতিকে নিম্নলিখিত ক্ষমতা দেওয়া আছে—

পরিচালন বিভাগীয় ক্ষমতা (Executive Powers): রাষ্ট্রপতি পরিচালনবিভাগের সর্বাধিনায়ক ও তাঁহার নামে সমস্ত সরকারী কার্য পরিচালিত হয়। তিনি সৈন্যবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ। তিনি মন্ত্রিপরিষদের সভ্যগণকে নিযুক্ত করেন। প্রথমে প্রধানমন্ত্রী ও পরে তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী অন্য মন্ত্রীদের তিনি নিযুক্ত করেন। ইঁহাদের ছাড়া তিনি ভারতের মহাব্যবহারিক (Attorney-General of India), অধিনিরীক্ষক (Auditor-General), অধিধর্মাধিকরণ (Supreme Court) ও মহাধর্মাধিকরণের (High Court) বিচারপতিগণ ও কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভৃত্যনিয়োগপরিষদের সভ্যগণকে নিযুক্ত করেন। রাজ্যগুলির অধিনেতা রাজ্যপালের নিয়োগকর্তাও রাষ্ট্রপতি।

আইনবিভাগীয় ক্ষমতা (Legislative Powers): রাষ্ট্রপতি আইন পরিষদের একটি অঙ্গ। কারণ তাঁহার সম্মতি ব্যতীত কোন আইন পাস হইতে পারে না। তিনি আইনপরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন ও প্রয়োজনমত অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারেন কিংবা উভয়পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। দরকার হইলে লোকসভা ভঙ্গ করিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন। তিনি উচ্চপরিষদ বা রাজ্যপরিষদে ১৫ জন সদস্য মনোনীত করিবেন। ইহা ছাড়া তাঁহার অন্যান্য আইন বিষয়ক ক্ষমতা আছে। তিনি আইনপরিষদে বক্তৃতা দিতে পারেন কিংবা কোন বিল সম্বন্ধে নিজ মতামত জানাইয়া বাণী প্রেরণ করিতে পারেন। যে সমস্ত করধার্য বিষয়ে রাজ্যগুলির স্বার্থ জড়িত আছে (যেমন আয়কর-উৎপাদন কর ইত্যাদি) তাহাদের কোন পরিবর্তন সম্বন্ধীয় বিল রাষ্ট্রপতির পূর্বসম্মতি ব্যতীত আইনপরিষদে উত্থাপন করা যাইবে না। আইনপরিষদে কোন বিল পাস হইয়া গেলে তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরিত হয়। তিনি সম্মতি দিলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। তবে তিনি ইচ্ছা করিলে বিলটি নাকচ করিতে পারেন কিংবা বিলটি সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনার জন্য তাহা আইনপরিষদে প্রেরণ করিতে পারেন। প্রয়োজন মনে করিলে যে সময় আইনপরিষদের অধিবেশন থাকে না সেই সময় তিনি একটি জরুরী আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। এই জরুরী আইন (Ordinance) সাধারণ আইনের ন্যায় বলবৎ থাকিবে। তবে আইন-পরিষদের পরবর্তী অধিবেশন আরম্ভ হইলে ইহা পরিষদের নিকট পেশ করা হইবে। পরিষদ সম্মতি না দিলে এই জরুরী আইন অধিবেশন আরম্ভ হইবার পর হইতে মাত্র ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত বহাল থাকিবে।

রাজস্ববিভাগীয় ক্ষমতা (Financial Powers): সরকারী নূতন বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি আগামী বৎসরের আয়ব্যয়ের তালিকা (budget) আইনপরিষদে পেশ করেন। তিনি কিংবা তাঁহার অনুমোদিত লোক ছাড়া আর কেহই আইনপরিষদে ব্যয় মঞ্জুরী প্রস্তাব বা রাজস্ব ও ব্যয় সম্পর্কীয় বিল উপস্থিত করিতে পারিবে না।

জরুরী অবস্থার ক্ষমতা (Emergency Powers): রাষ্ট্রপতি যদি কখনও মনে করেন যে ভারতকে অচিরে যুদ্ধের সম্মুখীন হইতে হইবে, অথবা দেশের মধ্যে হিংসাত্মক আন্দোলনের আশংকা আছে, তবে তিনি তদনুরূপ

ঘোষণা করিতে পারিবেন। এইরূপ জরুরী অবস্থার ঘোষণা করা হইলে কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ যে কোন রাজ্য বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। এই সময়ে প্রয়োজন মনে করিলে রাষ্ট্রপতি নাগরিকদের বিশেষ বিশেষ মৌলিক অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা মুলতুবী রাখিতে পারিবেন।

রাজ্যবিষয়ক ক্ষমতা (Powers over States) : রাজ্যগুলির উপরেও রাষ্ট্রপতির কিছু বিশেষ ক্ষমতা আছে। প্রথমত, তিনি রাজ্যপালকে নিযুক্ত করেন। দ্বিতীয়ত, রাজ্যের আইনসভা যুগ্ম বিষয় সম্বন্ধে যদি কোন বিল পাস করে, তাহা রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ না করিলে কেন্দ্রীয় আইনের উপর বলবৎ হইবে না। তৃতীয়ত, কোন রাজ্যপালের বা রাজপ্রমুখের প্রেরিত বিবরণী পাঠে যদি রাষ্ট্রপতির ধারণা হয় যে, সেই রাজ্যের শাসন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালনা করা সম্ভব নহে, তবে তিনি তদনুরূপ একটি ঘোষণা করিয়া রাজ্যটির শাসনভার স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারেন।

রাষ্ট্রপতিকে রাজ্যগুলির আইনসভার কার্যের উপর কিছু ক্ষমতা দেওয়া আছে। যেমন, ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিবার উদ্দেশ্যে রচিত কোন বিল রাষ্ট্রপতির পূর্বসম্মতি ব্যতীত রাজ্যের আইনসভায় উপস্থিত করা যাইবে না। আইনসভা যে কোন বিল অনুমোদন করিবার পর তাহা রাজ্যপালের নিকট পাঠান হয়। রাজ্যপাল ইচ্ছা করিলে বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতিজ্ঞাপনের জন্য দিল্লী পাঠাইতে পারেন। যুগ্ম বিষয় সম্বন্ধে বিল কিংবা জমি বা সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্তকরণের বিল ও আরো দু'একটি বিষয় সম্বন্ধীয় বিল অবশ্যই রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠাইতে হইবে। রাষ্ট্রপতি সম্মতি না দিলে এই ধরণের কোন বিলই আইন বলিয়া গণ্য হইবে না।

তৃতীয় ও চতুর্থশ্রেণীর রাজ্যগুলির শাসনভার রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত। ইহাদের শাসনের জন্য তিনি প্রত্যেক রাজ্যে একজন করিয়া লেফ্‌টেনান্ট গভর্ণর (বা উপরাজ্যপাল) কিংবা চিফ্‌ কমিসনার (বা মহাভূক্তিপতি) নিযুক্ত করিতে পারেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপতিকে বহু ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাকে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ নিযুক্ত করিতে হয় ও এই পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী এই সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হয়। রাষ্ট্রপতি নামে মাত্র শাসনকর্তা। আসল ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের

হস্তে দেওয়া আছে। এ বিষয়ে তাঁহার সহিত ফরাসীদেশের রাষ্ট্রপতির তুলনা করা চলে। তিনিও গভর্ণমেণ্টের শীর্ষস্থানে থাকিয়াও রাজ্য শাসন করেন না। রাজ্য শাসন করে তাঁহার মন্ত্রিসভা। দেশের মধ্যে রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা সম্মানীত পদ আর নাই। তিনিই রাষ্ট্রের অধিনায়ক এবং সেই হিসাবে, অন্য দেশের রাজদূতগণ তাঁহার নিকটেই নিজেদের নিয়োগপত্র দাখিল করে।

উপরাষ্ট্রপতি (Vice-President) : রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের সময় একজন উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা হয়। তাঁহাকে কেন্দ্রীয় আইনপরিষদের দুইটি সভার সদস্যগণ মিলিত হইয়া নির্বাচিত করিবে। রাষ্ট্রপতির ন্যায় উপরাষ্ট্রপতিরও বয়স অন্তত ৩৫ হইয়া চাই ও তাঁহারও রাষ্ট্রপরিষদের সভ্য হইবার গুণাবলী থাকা চাই। তাঁহাকেও পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত করা হয়। উপরাষ্ট্রপতির প্রধান কাজ রাজ্যপরিষদের সভাপতিত্ব করা। তবে যদি কোন সময় রাষ্ট্রপতি অসুস্থ হইয়া বা অন্য কোন কারণে অক্ষম হইয়া পড়েন, কিংবা তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন উপরাষ্ট্রপতি তাঁহার স্থলে নূতন রাষ্ট্রপতিব নির্বাচন পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির পদাভিষিক্ত হইবেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ (Council of Ministers) : শাসনতন্ত্রে বলা আছে যে, রাষ্ট্রপতি শাসনকার্য পরিচালনার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠন করিবেন। মন্ত্রিপরিষদের সভ্যদের নিয়োগকর্তা রাষ্ট্রপতি স্বয়ং। তিনি প্রথমে প্রধানমন্ত্রীকে ও পরে তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন। মন্ত্রিপরিষদের সভ্যসংখ্যা কত হইবে সে সম্বন্ধে শাসনতন্ত্রে কোন নির্দেশ দেওয়া নাই। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী সভ্যসংখ্যা ঠিক করিবেন। আইনপরিষদে যে দলের বা দলসম্মেলনের সভ্যসংখ্যা সবচেয়ে অধিক তাহার নেতাকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করা হয় এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের সেই দলের সভ্যদের মধ্য হইতে বাছিয়া লওয়া হয়।

সাধারণত আইনপরিষদের সভ্যদের মধ্য হইতে মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয় এবং দুইটি পরিষদ হইতেই মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। নিয়োগকালে যদি কোন মন্ত্রী আইনপরিষদের সভ্য না থাকেন, তবে তাঁহাকে ছয়মাসের মধ্যে কোন পরিষদের সভ্য হইতে হইবে। নচেৎ তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে। অবশ্য আইনপরিষদের সভ্য না থাকিলেও মন্ত্রীরা যে কোন পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করিতে পারিবেন। কিন্তু সভ্য না হইলে তাঁহাদের ভোট

দিবার অধিকার থাকিবে না। মন্ত্রীদের বেতন আইনপরিষদ নির্ধারণ করিয়া দিবে। মন্ত্রিপরিষদে সভাপতিত্ব করিবেন প্রধানমন্ত্রী। প্রত্যেক মন্ত্রী এক বা একাধিক বিভাগের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এই বিভাগ সম্পর্কীয় ছোটখাট বিষয়গুলির মীমাংসা তিনি নিজেই করিবেন। বিশিষ্ট বিষয়গুলির মীমাংসা ও মন্ত্রিসভার নীতি মন্ত্রীদের সম্মিলিত অধিবেশনে নির্ধারিত হয়।

মন্ত্রিপরিষদে দুই শ্রেণীর সভ্য আছে;—ক্যাবিনেট মন্ত্রী ও রাষ্ট্রমন্ত্রী (Ministers of State)। প্রথম শ্রেণীর মন্ত্রীগণ প্রত্যেকে এক বা একাধিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং তাঁহারা মাঝে মাঝে একত্র হইয়া বিশেষ বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা ও নীতি স্থির করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্ত্রীকে কোন বিভাগের কার্যপরিচালনার ভার নাও দেওয়া হইতে পারে এবং তিনি নিজের ইচ্ছামত মন্ত্রিপরিষদের সম্মিলিত অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন না। প্রধানমন্ত্রী যদি তাঁহাকে যোগদান করিতে আহ্বান করেন তবেই তিনি অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে পারেন।

এই দুই শ্রেণীর মন্ত্রী ব্যতীত আরো কয়েকজনকে উপমন্ত্রী (Deputy Minister) পদে নিযুক্ত করা হয়। ইহাদের কাজ হইতেছে মন্ত্রীদের কার্যে সাহায্য করা। তাহাদের নিজেদের আলাদাভাবে কিছু করার ক্ষমতা নাই।

মন্ত্রিপরিষদের কার্য (Functions of the Council of Ministers): মন্ত্রিপরিষদের প্রধান কাজ হইতেছে সরকারী নীতি নির্ধারণ করা ও শাসন পরিচালনা করা। প্রত্যেক মন্ত্রী এক বা একাধিক বিভাগের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এই বিভাগে কখন কি করা হইবে তাহার নির্দেশ দেওয়ার দায়িত্ব মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত। বিভাগীয় সাধারণ বিষয়গুলি সম্বন্ধে কি করা হইবে তাহা মন্ত্রীরা নিজেই ঠিক করেন। কোন গুরুত্বপূর্ণ-বিষয়ের উদ্ভব হইলে তাহা মন্ত্রিপরিষদের যুক্তঅধিবেশনে পেশ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী। এই অধিবেশনে মিলিত হইয়া মন্ত্রীরা বিভিন্ন বিভাগীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্বন্ধে কি করা হইবে তাহা ঠিক করেন ও কি কি নীতি অনুযায়ী গভর্ণমেণ্টের কাজ চলিবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেন।

মন্ত্রিপরিষদের দ্বিতীয় কাজ হইতেছে সরকারী আয়-ব্যয় কত হইবে তাহা ঠিক করা। বৎসরের শেষের দিকে মন্ত্রিপরিষদের এক অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী ভবিষ্যৎ বৎসরের আয়-ব্যয়ের একটি বিবরণী বা বাজেট উপস্থিত করেন।

পরিষদে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বিভিন্ন বিভাগের ব্যয়ের পরিমাণ ও তদুপযুক্ত রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা অনুমোদন করেন।

তৃতীয়ত, আইনপরিষদের ইচ্ছামত শাসনকার্য পরিচালনা করা মন্ত্রিপরিষদের একটি প্রধান কাজ। মন্ত্রীরা আইনপরিষদের অধিবেশনে নিয়মিতভাবে যোগদান করেন। আইনপরিষদের সভ্যগণ কোন বিষয় জানিবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর দেন। নিজ নিজ বিভাগীয় বিল আইনপরিষদে উত্থাপন করিয়া তাহা যাহাতে অনুমোদিত হয় তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। মন্ত্রিপরিষদ যুক্ত-ভাবে ও প্রত্যেক মন্ত্রী নিজ নিজ কার্যের জন্য আইনপরিষদের নিম্ন সভা অর্থাৎ লোকসভার নিকট দায়ী। লোকসভা তাঁহাদের বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণ করিলে মন্ত্রিপরিষদ পদত্যাগ করিতে বাধ্য।

মন্ত্রিপরিষদই দেশের আসল শাসনকর্তা। অবশ্য আইনত শাসনকার্য রাষ্ট্র-পতির নামে পরিচালিত। কিন্তু তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কি ব্যবস্থা করিবেন, বা আদেশ দিবেন তাহা সমস্তই মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী ঠিক করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী (Prime Minister) : মন্ত্রিপরিষদের নেতা প্রধানমন্ত্রী। আইনপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বা সম্মিলিত দলের নেতাকেই রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেন। অন্য মন্ত্রীদের নিয়োগকর্তা রাষ্ট্রপতি হইলেও কাহাকে মন্ত্রীকরা হইবে তাহা ঠিক করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি যাহাকে যাগাকে মন্ত্রীপদে বরণ করিতে বলেন রাষ্ট্রপতি তাহাকেই নিযুক্ত করেন। সুতরাং অন্য মন্ত্রীদের আসল নিয়োগকর্তা প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী নিজে এক বা একাধিক বিভাগের কার্যপরিচালনা করেন। শ্রীনেহেরু বর্তমানে পররাষ্ট্র ও সহরাষ্ট্রমন্ত্রকের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য তিনি কোন বিশেষ বিভাগের ভার নাও লইতে পারেন। তাঁহার প্রধান কাজ হইল মন্ত্রিপরিষদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করা। তিনি ইচ্ছা করিলে অন্যান্য বিভাগের কার্য পরিদর্শন করিতে পারেন ও কোন বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে ঠিক করা হইবে তাহা বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সহিত আলোচনা করিয়া স্থির করিতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রীর দ্বিতীয় কাজ হইতেছে যে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি রাষ্ট্রপতির গোচর করা। কোন কোন বিভাগে সরকারী কাজ কি ভাবে চালান হইতেছে বা হইবে, কি কি নূতন বিল উত্থাপন করা হইবে এ সমস্ত বিষয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির নিকট গিয়া জানাইয়া দেন।

আইনপরিষদেও প্রধানমন্ত্রীর বিশিষ্ট স্থান আছে। তিনি যে পরিষদের সভ্য সেই পরিষদের নেতৃপদে তাঁহাকেই নিযুক্ত করা হয়। সরকারী নীতি সম্বন্ধে আইনপরিষদে শেষ কথা বলিবার মালিক প্রধানমন্ত্রী। অর্থাৎ তিনি যে বিবৃতি দিবেন তাহাই সরকারী নীতি বলিয়া ধরা হইবে।

রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিপরিষদের সম্বন্ধ (Relation between the President and the Council of Ministers): আইনের চক্ষে মন্ত্রিপরিষদের সভ্যগণ রাষ্ট্রপতির পরামর্শদাতা মাত্র। সরকারী কার্য রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হয় ও মন্ত্রিপরিষদ তাঁহাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য ও পরামর্শ দিবার জন্যই নিযুক্ত হয়। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন এবং তাঁহার খুশীর উপরই মন্ত্রীদের কাজ নির্ভর করে। অর্থাৎ আইনত তিনি যে কোন সময়ে মন্ত্রীদের বরখাস্ত করিতে পারেন।

কিন্তু আসলে রাষ্ট্রপতিকে সর্ববিষয়ে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শমত কাজ করিতে হয়। কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে কি করা হইবে তাহা মন্ত্রিপরিষদ ঠিক করে। এই সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতিকে জানান হয় ও তিনি তদনুযায়ী আদেশ দেন। লোকসভায় যদি একটিমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থাকে, তবে সেই দলের নেতাকেই রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেন এবং প্রধানমন্ত্রী যাহাকে যাহাকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিতে বলেন তাহাকে সেই পদে নিয়োগ করা হয়। এ সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির পক্ষে অন্য কিছু করার উপায় নাই। মন্ত্রীরা আইনত রাষ্ট্রপতির পরামর্শদাতা হইলেও তাহারা আইনপরিষদের নিকট দায়ী। যে মন্ত্রিপরিষদের উপর আইনপরিষদের আস্থা আছে, তাহাকে রাষ্ট্রপতি বরখাস্ত করিতে পারেন না। তাহা হইলে আইনপরিষদ ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে যাহার ফলে রাষ্ট্রপতিকে হয়ত অবশেষে পদত্যাগ করিতে হইতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্রপতিকে সর্ববিষয়ে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে হয়।

মন্ত্রিপরিষদ ও আইনপরিষদের সম্বন্ধ (Relation between the Council of Ministers and the Parliament): মন্ত্রিপরিষদের সভ্যগণকে আইনপরিষদের সভ্যদের মধ্য হইতেই নিযুক্ত করা হয়। আইনপরিষদের সভ্য নহেন এমন কোন ব্যক্তিকে যদি মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়, তবে তাহাকে ছয়মাসের মধ্যে আইনপরিষদের সভ্য হইতে হইবে। নচেৎ তাহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে।

আইনপরিষদের সভ্য না হইলেও মন্ত্রীরা আইনপরিষদের অধিবেশনে যোগদান করিতে পারেন। যে মন্ত্রী লোকসভার সভ্য তিনি প্রয়োজন মত রাজ্যপরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন এবং রাজ্যপরিষদস্থ মন্ত্রীও লোকসভার আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু সভ্য না হইলে কেহই ভোট দিতে পারেন না।

মন্ত্রীরা আইনপরিষদের দুইটি সভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া সভ্যদের প্রশ্নের জবাব দেন। নিজ নিজ বিভাগীয় বিল আইনপরিষদে উপস্থিত করিয়া তাহা যাহাতে গৃহীত হয় ইহার ব্যবস্থা করেন। তাহারা প্রত্যেকে ও যুক্তভাবে লোকসভার নিকট দায়ী। লোকসভা তাহাদের কোন কার্যে বা নীতিতে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিলে মন্ত্রিপরিষদ পদত্যাগ করে এবং রাষ্ট্রপতি নূতন মন্ত্রিপরিষদ গঠনের ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তরঃ (১) পররাষ্ট্র ও সহরাষ্ট্র-মন্ত্রক :—এই দপ্তরের কাজ হইতেছে, বিভিন্ন বৈদেশিক ও কমনওয়েল্‌থ্‌ দেশগুলির সহিত কূটরাজনৈতিক সম্বন্ধ পরিচালনা করা। বিভিন্ন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য রাজকর্মচারী নিয়োগ করা, বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করা ও সন্ধিপত্র লইয়া আলোচনা করা—এইগুলি এই দপ্তরে পরিচালিত হয়।

(২) স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রক। দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃংখলারক্ষা, সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ, চিফ্‌ কমিসনার-শাসিত প্রদেশ ও আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের শাসনকার্য পরিচালনা প্রভৃতি কার্যের দায়িত্ব এই দপ্তরের।

(৩) দেশরক্ষা-মন্ত্রক। দেশরক্ষার দায়িত্ব এই দপ্তরের। স্থলসেনা, নৌসেনা ও বিমানবাহিনী গঠন ও পরিচালনা এই দপ্তরে হইয়া থাকে। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে যুদ্ধপরিচালনার ভার এই দপ্তরের উপর।

(৪) রাজস্ব-মন্ত্রক। সরকারী আয়ব্যয় সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ই এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। আগামী বৎসরের আয়ব্যয় তালিকা প্রস্তুত করা, ও আইন পরিষদে উপস্থিত করা, কি কি কর বসান হইবে তাহা নির্ধারণ, ও আয়ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করা এই দপ্তরের কাজ।

(৫) বিধি-মন্ত্রক। এই দপ্তরের কাজ হইতেছে বিলের খসড়া তৈয়ার করা এবং গভর্ণমেণ্টকে সর্বব্যাপারে আইন সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া।

(৬) যানবাহন-মন্ত্রক। ডাক, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতি বিভাগ পরিচালন করিবার ভার এই দপ্তরের।

(৭) বাণিজ্য-মন্ত্রক। বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় এই দপ্তরের অধীনে। বহির্বাণিজ্য-নীতি নির্ধারণ, বাণিজ্যবিষয়ক সন্ধিপত্র সম্বন্ধে কথাবার্তা চালান প্রভৃতি কাজের ভার এই দপ্তরকে দেওয়া আছে।

(৮) রেলযান-মন্ত্রক। এই দপ্তরের কাজ হইতেছে ভারতীয় রেলগুলির পরিচালনা করা।

(৯) শ্রম-মন্ত্রক। শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা ও অবস্থার উন্নতিকল্পে সর্ববিধ আইন ও ব্যবস্থা করিবার ভার এই দপ্তরের।

(১০) শিল্প ও সরবরাহ-মন্ত্রক। দেশের শিল্প সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ই এই দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত।

(১১) খাদ্য ও কৃষি-মন্ত্রক। গত যুদ্ধের সময় এই দপ্তরের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্তমানে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও সরবরাহ হ্রাস পাইবার জন্য এই দপ্তরের গুরুত্ব অনেক বাড়িয়াছে।

(১২) প্রচার-মন্ত্রক। এই দপ্তর বেতার, খবরের কাগজ ও অন্যান্য সংবাদ প্রচার-কার্য পরিচালনা করে।

(১৩) শিক্ষা-মন্ত্রক। এই দপ্তরের কাজ হইতেছে দেশের শিক্ষানীতি নির্ধারণ করা ও তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা। এই সমস্ত কার্যাবলী রাজ্য সরকারের বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন রাজ্য সরকারের কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়ন করা, ও তাহাদের এই বিষয়ে যথোচিত পরামর্শ দেওয়া এই দপ্তরের কাজ।

(১৪) সামন্তরাজ্য-মন্ত্রক। দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় লইয়া আলোচনা ও বন্দোবস্ত এই দপ্তরে করা হয়।

(১৫) খনি-শক্তি-কর্মশালা-মন্ত্রক। বিভিন্ন ধাতুর খনিসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা ও বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা এই দপ্তরের কাজ।

(১৬) স্বাস্থ্য-মন্ত্রক। জনগণের স্বাস্থ্যোন্নতিমূলক কাজ এই দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত।

(১) সাহায্য ও পুনর্বসতি-মন্ত্রক। এই দপ্তরটির সৃষ্টি হইয়াছে ১৫ই আগস্টের পর হইতে। ভারত বিভাগের ফলে, বহু হিন্দু ও শিখ পাকিস্তান

ত্যাগ করিয়া ভারতে চলিয়া আসিয়াছে। তাহাদের অনেকেই সবস্ব হারাইয়াছে। এই বাস্তুহারাদের সাহায্য ও পুনর্বসতি এই দপ্তরের কাজ।

প্রত্যেক বিভাগে একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আছেন। তিনি মন্ত্রিপরিষদের নীতি অনুযায়ী বিভাগীয় কার্য পরিচালনা করেন। তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য প্রত্যেক বিভাগে একজন করিয়া সেক্রেটারী বা কর্মসচিব, ডেপুটি সেক্রেটারী বা সহকর্মসচিব ও অন্যান্য কর্মচারী নিযুক্ত আছে।

মন্ত্রীরা কে কোন বিভাগের ভার লইবে তাহা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শমত রাষ্ট্রপতি নির্দিষ্ট করিয়া দেন। কি কি নিয়মে বা পদ্ধতিতে সরকারী কাজ চালান হইবে তাহাও রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শমত ঠিক করেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ

রাষ্ট্রপতি ও দুইটি পরিষদ লইয়া কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ (Parliament) গঠিত হইবে। উচ্চপরিষদের নাম হইবে রাজ্যপরিষদ (Council of States) ও নিম্নপরিষদকে লোকসভা (House of the People) বলা হইবে।

রাজ্যপরিষদ*: অনধিক ২৫০ জন সভ্য লইয়া গঠিত হইবে। তাহার মধ্যে অনধিক ২৩৮ জন সভ্য রাজ্যগুলির আইনসভার নিম্নপরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবে। বাকী ১২ জন সভ্যকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করিবেন। যাঁহারা সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা, প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহাদের মধ্য হইতেই এই ১২ জনকে মনোনয়ন করা হইবে। এই পরিষদ স্থায়ী সভা। ইহাকে কখনও ভঙ্গ করা হইবে না। তবে ইহার এক-তৃতীয়াংশ সভ্য প্রতি দুই বৎসর অন্তর পুনর্নির্বাচিত হইবে। সুতরাং একজন সভ্য মোট ছয় বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবে। এই পরিষদের সভাপতিত্ব করিবেন উপরাষ্ট্রপতি। পরিষদ একজন করিয়া সহ-সভাপতি নির্বাচিত করিবে। উপরাষ্ট্রপতিকে যদি কোনও সময়ে রাষ্ট্রপতির কার্য করিতে হয়, কিংবা তিনি কোন কারণে অনুপস্থিত হন, তবে সহ-সভাপতি সভাপতিত্ব করিবেন।

লোকসভার* সভ্যসংখ্যা ৫২০ এর অধিক হইবে না। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরই ভোটাধিকার থাকিবে। এই পরিষদ পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবে। অবশ্য রাষ্ট্রপতি তাহার পূর্বেই ইহা ভঙ্গ করিতে পারিবেন। কিংবা জরুরী অবস্থা উপস্থিত হইলে আরও এক বৎসরের জন্য পরিষদের আয়ুষ্কাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন। পরিষদ একজন পরিষদপাল (Speaker) ও একজন উপপরিষদপাল নির্বাচিত করিবে।

আইনপরিষদের কার্য (Functions or Powers of the Parliament): আইনপরিষদের প্রধান কার্য হইতেছে কেন্দ্রীয় ও যুগ্মবিষয়গুলি সম্বন্ধে আইনপ্রণয়ন করা। সাধারণত, রাজ্য সরকারের বিষয় লইয়া আইন

* বিভিন্ন রাজ্য হইতে রাজ্যপরিষদে ও লোকসভায় কতজন সভ্য থাকিবে তাহার তালিকা এই পরিচ্ছেদের শেষে দেওয়া হইল।

প্রণয়নের ক্ষমতা এই পরিষদের থাকিবে না। কিন্তু রাষ্ট্রপতি যদি কোন জরুরী অবস্থার ঘোষণা করেন, তবে আইনপরিষদ এই বিষয়গুলি সম্বন্ধেও আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। কিংবা রাজ্যপরিষদ যদি দুই-তৃতীয়াংশ সভ্যের ভোটে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য কোন রাজ্য সরকারের বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করা আইনপরিষদের উচিত, তবে আইনপরিষদ সে বিষয়ে আইন করিতে পারিবে। তৃতীয়ত, দুই বা ততোধিক রাজ্য সম্মতি দিলে ও অনুরোধ করিলেও আইনপরিষদ রাজ্য সরকারের কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। যে কোন বিল আইনপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে তাহা রাষ্ট্রপতি সমীপে প্রেরণ করা হইবে। তিনি সম্মতি দিলে বিলটি আইনে পরিণত হইবে। তিনি বিল নাকচ করিতে পারিবেন। অথবা তিনি বিলটি পুনর্বিবেচনার জন্য পরিষদে প্রেরণ করিতে পারিবেন।

সরকারী আয়ব্যয় মঞ্জুর ও কর নির্ধারণের ক্ষমতাও একমাত্র আইন-পরিষদের থাকিবে। অবশ্য এই সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত অর্থাৎ তাঁহার নিযুক্ত সভ্য ব্যতীত অন্য কেহই পরিষদে উপস্থিত করিতে পারিবে না। রাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাতা, দুই পরিষদের সভাপতি ও উপসভাপতিগণের, অধিধর্মাধিকরণের বিচারপতিগণের এবং রাষ্ট্রভৃত্য-নিয়োগপরিষদের সভ্যদের বেতন ও ভাতা এবং সরকারী ঋণ বাবদ ব্যয় মঞ্জুরীর প্রস্তাব আইনপরিষদে উপস্থিত করা হইবে না। অন্যান্য বিষয়ের ব্যয়ের দাবীর প্রস্তাব লোকসভার অনুমোদনসাপেক্ষ। কতকগুলি কর আছে যাহার সহিত রাজ্যগুলির স্বার্থ জড়িত,—যেমন উত্তরাধিকার কর, আয়কর প্রভৃতি এই সমস্ত করধার্য সম্বন্ধীয় কোন বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনব্যতীত লোকসভায় উপস্থিত করা যাইবে না।

মন্ত্রিসংসদ লোকসভার নিকট যুক্তভাবে তাঁহাদের কার্যের জন্য দায়ী থাকিবে।

উভয়পরিষদের ক্ষমতার অনেক প্রভেদ আছে। প্রথমত, রাজস্ব সম্বন্ধীয় কোন বিল প্রথমে কেবলমাত্র লোকসভাতেই উপস্থিত করা যাইবে। এই শ্রেণীর বিলের উপর রাজ্যপরিষদের বিশেষ কোন ক্ষমতাই থাকিবে না। দ্বিতীয়ত, সরকারী আয়-ব্যয়-প্রস্তাব মঞ্জুরীর অধিকার একমাত্র লোকসভার আছে।

তৃতীয়ত, মন্ত্রিসংসদ লোকসভার নিকট দায়ী থাকিবে, রাজ্যপরিষদের ভোটের উপর তাহাদের ভাগ্য নির্ভর করিবে না।

অন্যান্য বিল উভয় পরিষদের সম্মতি লাভ না করিলে আইনে পরিণত হইবে না। যদি কোন বিল লইয়া উভয় পরিষদের মধ্যে মতভেদ হয়, তবে তাহার মীমাংসা করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি উভয় পরিষদের একটি যুগ্ম অধিবেশন আহ্বান করিবেন। এই যুগ্ম অধিবেশনে অধিকাংশ সভ্য বিলটি সমর্থন করিলে তাহা উভয় পরিষদকর্তৃক অনুমোদিত বলিয়া ধরা হইবে।

রাজ্যপরিষদ ও লোকসভার ক্ষমতা (Relations between two houses of Parliament): কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ দুইটি কক্ষ লইয়া গঠিত। উভয় পরিষদের ক্ষমতার অনেক পার্থক্য আছে। লোকসভা অপেক্ষা রাজ্য-পরিষদের ক্ষমতা অনেক কম। প্রথমত, মন্ত্রিসংসদ কেবলমাত্র লোকসভার নিকট দায়ী। রাজ্যপরিষদের ভ্রূকুটিতে তাহাদের ভাগ্যপরিবর্তনের কোন আশংকা নাই। দ্বিতীয়ত, সরকারী ব্যয়ের দাবীর প্রস্তাব রাজ্যপরিষদের অনুমোদনসাপেক্ষ নহে। কেবলমাত্র লোকসভাই এই প্রস্তাব মঞ্জুর করিবার অধিকারী। রাজ্যপরিষদ ইহা লইয়া আলোচনা করিতে পারে মাত্র, ভোট দিতে পারে না। তৃতীয়ত, রাজস্ব সম্পর্কীয় বিল প্রথমে লোকসভায় উপস্থিত করিতে হইবে। বিলটি লোকসভার সমর্থন লাভ করিলে তাহা রাজ্যপরিষদের নিকট প্রেরণ করা হইবে। রাজ্যপরিষদ যদি কোন পরিবর্তনেব প্রস্তাব করে তবে লোকসভা তাহা গ্রহণ করিতে পারে কিংবা নাও করিতে পারে। কিন্তু রাজ্য-পরিষদ যাহাই করুক না কেন, ঠিক ১৪ দিন পরে বিলটি উভয় পরিষদকর্তৃক অনুমোদিত বলিয়া ধরা হইবে ও রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের জন্য প্রেরণ করা হইবে। অর্থাৎ এই শ্রেণীর বিলের উপর রাজ্যপরিষদের কোন ক্ষমতা নাই।

অন্য বিষয়ের বিল প্রথমে যে কোন পরিষদে উপস্থিত করা চলিবে। বিলটি একটি পরিষদ্কর্তৃক অনুমোদিত হইলে দ্বিতীয় পরিষদে উপস্থিত করা হইবে। দ্বিতীয় পরিষদ যদি বিলটি নাকচ করে, কিংবা এমনভাবে বিলটির পরিবর্তন করে যাহা প্রথম পরিষদ গ্রহণ করিতে রাজী নহে, কিংবা দ্বিতীয় পরিষদ বিলটির আলোচনা করিতে ছয় মাসের বেশী সময় কাটাইয়া দেয়, তবে রাষ্ট্রপতি উভয়

পরিষদের যুগ্ম অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। এই যুগ্ম অধিবেশনে বিলটি যদি অধিকাংশ সভ্যের অনুমোদন লাভ করে, তবে তাহা উভয়পরিষদকর্তৃক অনুমোদিত বলিয়া ধরা হইবে।

রাজ্যপরিষদের বিশেষ একটি ক্ষমতা আছে, যাহা নিম্নপরিষদের নাই। রাজ্যপরিষদ প্রয়োজন মনে করিলে দুইতৃতীয়াংশ সভ্যের ভোটে যদি এমন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য আইনপরিষদ কোন একটি রাজ্য বিষয় সম্বন্ধে আইনপ্রণয়ন করুক তবে আইনপরিষদ এই বিষয় সম্বন্ধে আইন করিতে পারিবে।

আইনপ্রণয়নের ধারা (Procedure for passing Bills): আইনপরিষদের প্রধান কার্য হইল আইনপ্রণয়ন করা। আইন কি ভাবে প্রণয়ন করা হয়? প্রথমত, বিলটি আইনপরিষদে উত্থাপন করিতে হইবে। যদি কোন সাধারণ সভ্য কোন বিষয়ে একটি বিল উপস্থিত করিতে চাহে, তবে তাহাকে একমাস পূর্বে নোটিস দিতে হইবে ও নোটিসের সঙ্গে বিলের কপি পাঠাইয়া দিতে হইবে। পরে নির্দিষ্ট দিনে আইনপরিষদে বিলটি উত্থাপন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইবে। পরিষদ সম্মতি দিলে বিল সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হয়। কোন মন্ত্রী একটি বিল উত্থাপন করিতে চাহিলে তাহা শুধু সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিলেই চলিবে।

ইহার পর এক নির্দিষ্ট দিনে সভ্যটি বিল প্রথমবার পাঠ করা হউক, এই মর্মে এক প্রস্তাব করে। এই প্রস্তাবটি অনুমোদিত হইলে, বিল পেশকারী সভ্য বিলটি একটি নির্দিষ্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হউক এই মর্মে এক প্রস্তাব করে। এই কমিটির সভ্য কাহারা হইবেন, তাহাও এই প্রস্তাবে বলা হয়। প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে, কমিটি বিলটি লইয়া আলোচনা করে। আলোচনান্তর কমিটি পরিষদে একটি বিবরণী দাখিল করে। কমিটি ইচ্ছামত অধিকাংশের ভোটে বিল যে কোন ভাবে সংশোধন করিতে পারে। এই বিবরণী দাখিল হইবার পর, বিলটি কিংবা সংশোধিত বিলটি দ্বিতীয়বার পাঠ করা হউক বলিয়া প্রস্তাব আইনপরিষদে উপস্থিত করা হয়। সে সময় বিলের প্রত্যেকটি ধারা সম্বন্ধে পরিষদে ভোট লওয়া হয়। সভ্যেরা যে কোন ধারার সংশোধন প্রস্তাব আনিতে পারে। এইভাবে ভোট গ্রহণ শেষ হইলে, বিলটি তৃতীয়বার পাঠ করা হউক এই মর্মে আর একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। সেই সময় বিলের সাধারণ

বিষয় লইয়া আলোচনা চলে। অধিকাংশের মতে অনুমোদিত হইলে রাষ্ট্রপতির নিকট বিল প্রেরণ করা হয়।

এই হইল বিল পাস করার সাধারণ নিয়ম। বিলটি জরুরী মনে করিলে, প্রথমবার পাঠের পর নির্দিষ্ট কমিটি গঠন না করিয়াই সরাসরি পরিষদে দ্বিতীয়বার পাঠের প্রস্তাব করা যাইতে পারে। আবার সভ্যরা বিল সম্বন্ধে জনমত জানিবার জন্য, তাহার কপি সর্বত্র প্রেরণ করা হউক, এই প্রস্তাবও উপস্থিত করিতে পারে। এই শেষোক্ত প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে, বিল জনমত-জ্ঞাপনের জন্য সর্বত্র প্রেরণ করা হয় ও নির্দিষ্ট সময়ের পব, পরিষদে সিলেক্ট কমিটি গঠন করা হউক, এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করা হয়।

আইনপরিষদে অধিকাংশের অনুমোদনের পর বিল রাষ্ট্রপতিব নিকট প্রেরিত হয়। তিনি তাঁহার সম্মতি জানাইতে পারেন। তাহা হইলে বিল আইন বলিয়া গণ্য হইবে। কিংবা তিনি বিলটি পরিষদে পুনর্বিবেচনাব জন্য পাঠাইয়া দিতে পারেন। অথবা বিল একেবারে নাকচ করিয়া দিতে পারেন।

বাজেট পাসের নিয়ম (Procedure for approving the budget): নূতন বৎসর আবম্ভ হইবার পূর্বে অর্থসচিব নির্দিষ্ট দিনে আগামী বৎসরেব আয়ব্যয়েব তালিকা আইনপরিষদে উপস্থিত করেন। সেদিন কেবল অর্থসচিব বাজেট সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা কবিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া থাকেন। নূতন কর বসাইতে হইলে, কিংবা পুবাতন কবেব হাব পরিবর্তন কবা প্রয়োজন হইলে, সে সম্বন্ধে একটি বিল বা কয়েকটি বিল পবিষদে এই দিনে পেশ করা হয়।

কয়েকদিন পব এই আয়ব্যয়ের তালিকা লইয়া সাধাবণ আলোচনা চলে। সভ্যেবা সবকারী আয় ও ব্যয় সম্বন্ধে তাহাদেব মতামত ব্যক্ত কবেন ও সবকারের নীতির সমালোচনা করেন। কয়েক দিন ধরিয়া এই আলোচনা কবা হয়। শেষদিনে অর্থসচিব সরকারের পক্ষ হইতে সমালোচনার উত্তর দেন।

তখন প্রত্যেক বিভাগেব ব্যয়েব দাবী লইয়া পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা হয়। এই সময় সভ্যেরা ব্যয়ের দাবী নামঞ্জুর করিবার অথবা ব্যয়ের পরিমাণ কমাইয়া দিবার প্রস্তাব করিতে পারে। এক একটি ব্যয়ের দাবী লইয়া দুইদিনের বেশী আলোচনা চলিবে না এবং ১৫ দিনেব মধ্যে সমস্ত দাবীগুলি সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করিতে হইবে। প্রত্যেক দাবী সম্বন্ধে আলোচনান্তে

পরিষদে ভোট গ্রহণ করা হয়। এইভাবে পরিষদের অনুমোদনের পর সরকার বিভিন্ন বিভাগের দাবীর পরিমাণ অনুযায়ী অর্থব্যয় করিতে পারিবে।

সরকারের সমস্ত ব্যয়ই আইনপরিষদের অনুমোদনসাপেক্ষ নয়। রাষ্ট্রপতি ও তাঁহার মন্ত্রীদের, অধিধর্মাধিকরণের বিচারপতিগণের, অধিব্যবহারিক ও মুখ্যমহাধ্যক্ষ (চিফ্ কমিসনার)-গণের বেতন ও ভাতা বাবদ ও সরকারী ঋণ পরিশোধ বাবদ যে ব্যয় হয়, তাহা আইনপরিষদে অনুমোদনের জন্ত উপস্থিত করা হয় না।

করধার্যবিষয়ক বিল অন্যান্য বিলের ন্যায় আইনপরিষদে তিনবার পাঠ করা হয় ও রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর আইন বলিয়া গণ্য হয়।

রাজ্যপরিষদ

মোট সভ্য সংখ্যা--২১৬ জন।

আসাম	৬	মধ্যভারত	৬
বিহার	২১	বিন্ধ্যপ্রদেশ	৪
বোম্বাই	১৭	আজমীঢ়, কুর্গ	১
মাদ্রাজ	২৭	ভূপাল	১
মধ্যপ্রদেশ	১২	বিলাসপুর, হিমাচল প্রদেশ	১
উড়িষ্যা	৯	দিল্লী	১
পাঞ্জাব	৮	কচ্ছ	১
উত্তরপ্রদেশ	৩১	মণিপুর, ত্রিপুরা	১
পশ্চিমবঙ্গ	১৪		২০৪
হায়দ্রাবাদ	১১	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত	১২
জম্মু ও কাশ্মীর	৪		২১৬ জন
মহীশূর	৬		
সৌরাষ্ট্র	৪		
রাজস্থান	৯		
পেপ্সু	৩		
ত্রিবাংকুর-কোচিন	৬		

লোকসভা

মোট সভ্য সংখ্যা—৪৯৯ জন।

নিৰাচিত	
আসাম	১২
পশ্চিমবঙ্গ	৩৪
বিহাব	৫৫
উড়িষ্যা	২০
মধ্যপ্রদেশ	২৯
মাদ্রাজ	৭৫
বোম্বাই	৪৫
উত্তবপ্রদেশ	৮৬
পাঞ্জাব	১৮
হাযদ্রাবাদ	২৫
মহীশূব	১১
মধ্যভাবত	১১
পেপসু	৫
বাজস্থান	২০
সৌবাষ্ট্র	৬
ত্রিবাংকুর-কোচিন	১২
আজমীঢ	২
ভুপাল	২
বিলাসপুর	১
কুর্গ	১

নিৰাচিত	
দিল্লী	৪
হিমাচল প্রদেশ	৩
কচ্ছ	২
মণিপুব	২
ত্রিপুবা	২
বিন্ধ্যপ্রদেশ	৬
	৪৮৯ জন

বাষ্ট্রপতি কতৃক মনোনীত	
(ক) আন্দামান ও নিকোবব দ্বীপপুঞ্জ	১
(খ) এ্যাংলো ইণ্ডিযান সভ্য	২
(গ) আসাম উপজাতি অঞ্চলেব সভ্য	১
(ঘ) জম্মু ও কাশ্মীব	৬
	১০
মোট সভ্য	৪৯৯ জন

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিষয় বিভাগ

বর্তমান শাসনতন্ত্রে শাসনের বিষয়গুলি কেন্দ্রীয়, রাজ্য-সরকারের ও যুগ্ম—এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় বিষয় (Union List) : এই বিষয়গুলির সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিবার অধিকার একমাত্র কেন্দ্রীয় আইনপরিষদকে দেওয়া আছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়গুলির শাসনকার্য পরিচালনা করে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কেন্দ্রীয়। (ক) দেশরক্ষা (অর্থাৎ স্থল, নৌ ও বিমানবিহারী সৈন্যদল গঠন ও পরিচালন); (খ) বৈদেশিক বিভাগ; (গ) চলতি মুদ্রানির্মাণ ও মুদ্রানির্ণয়; (ঘ) ডাক, টেলিগ্রাফ; (ঙ) বেতার যন্ত্র ও বেতার বার্তা; (চ) রেল; (ছ) জাহাজ ও জলপথ; (জ) বিমান ঘাঁটি ও বিমান চলাচল; (ঝ) বড় বড় বন্দর (ঞ) অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ ও বিস্ফোরক দ্রব্য; (ট) আদম সুমারী; (ঠ) ব্যাংকিং, বীমা, চেক, হুণ্ডি প্রভৃতি; (ড) জরীপ; (ঢ) বেনারস, আলিগড় ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি।

রাজ্য-সরকারের বিষয় (State List) : এইগুলি সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিবার অধিকার রাজ্যের (State) আইনসভার হস্তে ন্যস্ত আছে এবং শাসন-পরিচালনার দায়িত্ব রাজ্য-সরকারের। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি রাজ্যসরকারের।

(ক) আইন ও শৃংখলা রক্ষা; (খ) পুলিস; (গ) জেলখানা; (ঘ) বিচার-ব্যবস্থা ও রাজ্য-সরকারের উচ্চ আদালত; (ঙ) শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়; (চ) জনস্বাস্থ্য, হাসপাতাল, ঔষধাগার ইত্যাদি; (ছ) কৃষি; (জ) জলসেচ ও ক্যানাল; (ঝ) জমি; (ঞ) মৎস্যবিভাগ; (ট) বনজঙ্গল; (ঠ) সমবায়-সমিতি; (ড) রাস্তা, সেতু, ফেরী, মিউনিসিপাল, রেল লাইন প্রভৃতি চলাচল ব্যবস্থা; (ঢ) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন; (ণ) শিল্প; (ত) সিনেমা ও থিয়েটার; (থ) ভূমিরাজস্ব ও কোর্ট অব ওয়ার্ডাস্; (দ) লাইব্রেরী ও যাদুঘর; (ধ) টাকা লেনদেন ও সুদজীবী; (ন) জুয়াখেলা; (প) মদ-গাঁজা ইত্যাদি; (ফ) বেকার ও দরিদ্রের সাহায্য ইত্যাদি।

এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ তিনটি অবস্থায় আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। প্রথমত, দুই বা ততোধিক রাজ্যের আইনসভা এই মর্মে যদি কেন্দ্রীয় পরিষদকে অনুরোধ করে, তবে পরিষদ সেই অনুরোধ অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপতি যদি কোন সময় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ রাজ্য-সরকারের বিষয়গুলি সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। তৃতীয়ত, রাজ্যপরিষদ যদি দুই-তৃতীয়াংশ সভ্যের অনুমোদনে এমন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে দেশের স্বার্থ-রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ কোন রাজ্যাধীন বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করুক তবে আইনপরিষদ এই বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে।

যুগ্মবিষয় (Concurrent Legislative List) : এবিষয়গুলি সম্বন্ধে আইন প্রণয়নের অধিকার কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের দুই শ্রেণীর আইনপরিষদকে দেওয়া আছে। কেন্দ্রীয় পরিষদ এবিষয়ে যদি কোন আইন প্রণয়ন করে, তাহা রাজ্যের আইনসভাকৃত আইনের উপর বলবৎ হইবে। কিন্তু রাজ্যপাল যদি রাজ্যের আইনসভাকৃত আইনটি রাষ্ট্রপতির মত প্রকাশের জন্য প্রেরণ করেন এবং তিনি যদি তাহাতে সম্মতি দিয়া থাকেন, তবে সেই আইন কেন্দ্রীয় আইনপরিষদকৃত আইনের উপর বলবৎ হইবে। নিম্নলিখিতগুলি যুগ্মবিষয় :—

(ক) ফৌজদারী আইন ও বিচার প্রণালী; (খ) দেওয়ানী বিচার প্রণালী; (গ) সাক্ষী গ্রহণের নিয়ম; (ঘ) বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ; (ঙ) উইল; (চ) চুক্তি; (ছ) সালিসী; (জ) দেউলিয়া; (ঝ) খবরের কাগজ, বই ও ছাপাখানা; (ঞ) বিষ ও বিষাক্ত ঔষধ; (ট) কারখানা; (ঠ) শ্রমিক; (ড) শ্রমিকসংঘ; (ঢ) বিদ্যুৎ; (ণ) বেকার, বীমা ইত্যাদি।

এই বিষয় সম্বন্ধে রাজ্যগুলি তাহাদের নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। কিন্তু এগুলি সম্বন্ধে সর্বত্রই কতকগুলি সাধারণ নিয়ম বা নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন হইলে, কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ তখন আইন প্রণয়ন করিবে।

ভারতশাসন আইনে এইরূপ শাসনের বিষয়গুলি ভাগ করা হইয়াছে। কালক্রমে যদি কোন নূতন বিষয়ের উদ্ভব হয়, যাহা এই তিনটি তালিকাভুক্ত নহে, তাহা কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত হইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য

প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য (Provincial Autonomy): প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের মূল কথা হইতেছে যে, প্রাদেশিক সরকার ও আইনসভার হস্তে যে যে বিভাগের শাসনভার দেওয়া হইবে, সে সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার অথবা আইন-পরিষদ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। প্রাদেশিক বিষয়গুলির শাসনকার্যে প্রদেশগুলিকে স্বাধীনতা দিতে হইবে। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের পূর্বে প্রাদেশিক সরকারের এইরূপ স্বাধীনতা ছিল না। তাহারা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে ও তাহার নির্দেশানুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করিত। প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের দাবী এদেশে বহুদিন পূর্বেই করা হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র পাল ও অন্যান্য নেতাগণ তাঁহাদের লেখায় এই দাবী উপস্থিত করেন। সরকারীভাবে এই দাবীর উল্লেখ করা হয় ১৯১১ সালে। তখনকার বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতসচিবের নিকট লিখিত বিবরণীতে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন। ১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইনে এই ব্যবস্থা আংশিকভাবে প্রবর্তন করা হয়। প্রাদেশিক বিষয়গুলির একটি অংশ প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার শাসনাধীনে দেওয়া হয়। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে সর্বপ্রথম প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য প্রবর্তন করা হয়।

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে প্রাদেশিক বিষয়গুলি নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন ও শাসনকার্যের দায়িত্ব প্রদেশের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। এবিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও আইনপরিষদ সাধারণত প্রদেশগুলির কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। প্রাদেশিক বিষয়ের শাসনভার প্রদেশপাল (গভর্ণর) ও একটি মন্ত্রিসভার উপর ন্যস্ত করা হয়। মন্ত্রীরা এই বিষয়গুলির শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন এবং তাঁহারা প্রাদেশিক আইনসভার নিকট তাঁহাদের কার্যের জন্য দায়ী থাকিবেন। এইভাবে প্রদেশগুলিকে কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে শাসনের স্বাধীনতা দেওয়া হইল ও দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইল।

কিন্তু পূর্ণ প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য বলিতে যাহা বুঝায়, এই আইনে তাহার

প্রবর্তন করা হয় নাই। প্রথমত, রাষ্ট্রপাল প্রদেশগুলির শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন। কতকগুলি বিষয়ে কোন বিল প্রাদেশিক আইনসভায় উপস্থিত করিবার পূবে রাষ্ট্রপালের নিকট তাহা প্রেরণ করিতে হইত এবং তাঁহার পূর্বানুমোদন ব্যতীত বিলগুলি আইনসভায় উপস্থিত করা যাইত না। অর্থাৎ রাষ্ট্রপাল অনুমোদন না করিলে এই বিষয়ে কোন বিল পাস করার ক্ষমতা প্রাদেশিক আইনসভার ছিল না। দ্বিতীয়ত, ভারতের শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনবোধ করিলে রাষ্ট্রপাল যে কোন সময়ে প্রাদেশিক সরকারের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন। তিনি প্রাদেশিক সরকারকৃত কোন ব্যবস্থা নাকচ করিয়া দিয়া তাঁহার নিজের ইচ্ছামত কাজ করিবার আদেশ প্রদেশপালকে দিতে পারিতেন। তৃতীয়ত, কোন সময়ে যদি রাষ্ট্রপাল জরুরী অবস্থার ঘোষণা করেন, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় আইনসভা প্রাদেশিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিতে পারিতেন। এইরূপ অবস্থায় কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ প্রাদেশিক আইনসভার অধিকৃতক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন। চতুর্থত, প্রদেশপালগণ রাষ্ট্রপালের অধীন এবং তাঁহাদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের পূবে রাষ্ট্রপালের অনুমোদন লইতে বাধ্য।

প্রদেশগুলিতে পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্রের প্রবর্তন করা হয় নাই। প্রদেশের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের শাসনভার মন্ত্রিসভাকে দেওয়া হয় নাই। প্রদেশপাল নিজে তাহার পরিচালনা করেন। এই অঞ্চলগুলিকে সাধারণশাসনবহির্ভূত অঞ্চল বলা হয়। অনেক বিষয়ে প্রদেশপালকে স্ব-ইচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ এই এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার দায়িত্ব একমাত্র প্রদেশপালের। তিনি ইচ্ছা করিলে মন্ত্রীদের পরামর্শ লইতে পারেন। আবার নাও লইতে পারেন। অন্যান্য প্রাদেশিক বিষয়গুলির সম্যক পরিচালনার দায়িত্ব মন্ত্রিসভার উপর ন্যস্ত আছে। কিন্তু এখানে প্রদেশপাল ইচ্ছা করিলে তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য মন্ত্রীদের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন। প্রদেশের শাসনভার সম্পূর্ণরূপে মন্ত্রিসভার হস্তে ন্যস্ত করার ব্যবস্থা আছে।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পর প্রদেশগুলিকে পূর্বাপেক্ষা অনেক অধিক স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হইয়াছে। তখন প্রাদেশিক আইনসভায় কোন বিল উপস্থিত করিবার পূর্বে রাষ্ট্রপতির অনুমতি লইতে হইত না। দ্বিতীয়ত,

প্রদেশপালগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইলেও তাঁহার অধীন ছিলেন না। তাঁহাদের কোন কার্যের জন্য রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন লইতে হইত না। ১৫ই আগস্টের পর হইতে প্রদেশে পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসন প্রবর্তন করা হইয়াছিল। প্রদেশপালের হস্তে আর কোন বিশেষ ক্ষমতা ছিল না এবং তিনি সর্ববিষয়ে মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে বাধ্য ছিলেন।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between the Centre and the States) : বর্তমান শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সম্বন্ধ ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে যেরূপ ছিল তাহাই রাখা হইয়াছে। বরঞ্চ কেন্দ্রীয় সরকারকে আরো বেশী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। উভয় সরকারেব সম্বন্ধ আইন-প্রণয়ন সম্পর্কীয়, পরিচালন-বিভাগ সম্পর্কীয়, রাজস্ব-বণ্টন সম্পর্কীয় এই তিন পর্যায়ে আলোচনা করা হইতেছে।

আইন-প্রণয়ন সম্পর্কীয় (Legislative relations) : সাধারণত, রাজ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে আইন প্রণয়নের ভার রাজ্যের আইনসভার হস্তে ন্যস্ত ও কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ তাহাতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। কিন্তু তিনটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ রাজ্যাধীন বিষয় সম্বন্ধে আইন পাস করিতে পারে। প্রথমত, দুই বা ততোধিক রাজ্যের আইনসভা যদি কেন্দ্রীয় আইনপরিষদকে এইরূপ অনুরোধ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করে। দ্বিতীয়ত, যদি কেন্দ্রীয় রাজ্যপরিষদ দুইতৃতীয়াংশ সভ্যের ভোটে এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে দেশের কল্যাণের জন্য কেন্দ্রীয় আইনপরিষদের কোন রাজ্যাধীন বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করা উচিত। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রপতি যদি কোন সময়ে জরুরী অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করেন। এই তিনটি অবস্থায় কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ রাজ্যাধীন বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে।

পরিচালন বিভাগীয় সম্বন্ধ (Administrative relations) : এইরূপ সাধারণত কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য-সরকারের কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে না। এবং প্রয়োজন বোধ করিলে কোন কেন্দ্রীয় বিষয়ের শাসন দায়িত্ব রাজ্যগুলির হস্তে ছাড়িয়া দিতে পারে। রেলওয়ে লাইন ও সামরিক কারণে প্রয়োজনীয় যানবাহন নির্মাণ ও রক্ষার জন্য দরকার মনে করিলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারকে উপযুক্ত নির্দেশ দিতে পারে। তাহা হইলে

রাজ্যসরকারকে সেই নির্দেশ মত কাজ করিতে হইবে। রাজ্য সরকারের কাজ এমনভাবে চালাইতে হইবে যাহার ফলে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা ব্যাহত না হয় ও কেন্দ্রীয় আইন বহাল রাখিতে অসুবিধা না হয়। যদি কোন রাজ্যপাল বা রাজপ্রমুখের বিবরণী পাঠে রাষ্ট্রপতির মনে হয় যে, সেই রাজ্যের শাসনতন্ত্র পরিচালনা আইন অনুযায়ী করা সম্ভব নহে তবে রাষ্ট্রপতি একটা ঘোষণা দ্বারা রাজ্যটির শাসনভার স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারেন। তাহার ফলে রাজ্য-সরকার ও আইনসভার ক্ষমতা লুপ্ত হইবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার সেই রাজ্যের শাসন-কার্য পরিচালনা করিবে।

রাজস্ববিষয়ক সম্পর্ক (Financial relations) : কতকগুলি করলব্ধ অর্থ সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের তহবিলে জমা হইবে। যেমন আগম-নিগম শুল্ক (Custom), রেলপথের আয়, ডাকবিভাগের আয়; মুদ্রাশালা ও রিজার্ভ ব্যাংক হইতে লব্ধ অর্থ, উৎপাদন শুল্ক প্রভৃতি। ভূমিরাজস্ব, আবগারীকর, স্ট্যাম্প শুল্ক, সেচন কর, নিবন্ধন শুল্ক, বন বিভাগের আয়, বিক্রয় কর প্রভৃতি কর ধার্য করিবার ক্ষমতা একমাত্র রাজ্যসরকারের।

কি হারে স্ট্যাম্প শুল্ক বসান হইবে তাহা কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ ঠিক করে। কিন্তু শুল্ক লব্ধ অর্থ রাজ্যসরকার আদায় করে ও ভোগ করে। রেলভাড়ার উপর ধার্য শুল্ক কেন্দ্রীয় সরকার আদায় করিয়া রাজ্যসরকারদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেয়।

আয়কর লব্ধ অর্থের শতকরা ৪৫ ভাগ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট রাখিয়া দেয়। বাকী ৫৫ ভাগ রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। আয়কর কি হারে বসান হইবে তাহা ঠিক করার ও তাহার আদায়ের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার আয়ের উপর যদি কোন অতিরিক্ত কর (Surcharge) ধার্য করে তাহা হইতে লব্ধ রাজস্ব কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের তহবিলে যাইবে।

উৎপাদন করের রাজস্বের সম্পূর্ণ পরিমাণ বা কিয়দংশ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে পারে। গত বৎসর হইতে তামাক, দেয়াশলাই ও বনস্পতির উপর ধার্য উৎপাদন শুল্কলব্ধ রাজস্বের শতকরা ৪০ ভাগ রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইতেছে।

মৃতের সম্পত্তির উপর কর ধার্যের অধিকার কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে দেওয়া

আছে। তবে এই করলব্ধ অর্থ খরচ-খরচা বাদে সমস্তই রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট রাজ্যগুলিকে কোন কোন বিষয়ে বা সাধারণভাবে সাহায্য করিবার জন্য কিছু কিছু অর্থ সাহায্য (Grants-in-aid) দিতে পারে।

রাষ্ট্রপতি প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর একটি ফিনান্স কমিসন বা রাজস্ব বিতরণ পরিষদ নিযুক্ত করিবেন। এই পরিষদের কার্য হইবে আয়কর ও অন্য করলব্ধ রাজস্ব কত অংশ এবং কিভাবে রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করা হইবে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেওয়া। রাষ্ট্রপতি সেই পরামর্শমত ভাগের ব্যবস্থা করিবেন। প্রথম কমিসনের সুপারিশ কার্যকরী করা হইয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ

রাজ্যসরকার

রাজ্যপাল ও একটি মন্ত্রিসভা লইয়া প্রথম শ্রেণীর রাজ্যে সরকার গঠিত হইয়াছে। রাজ্যসরকারের কাজ হইতেছে রাজ্যাধীন ও যুগ্ম বিষয়গুলির সম্যক পরিচালনা করা।

৬ **রাজ্যপাল (গভর্ণর):** বর্তমানে রাজ্যপালগণের নিয়োগকর্তা রাষ্ট্রপতি। তাঁহাদের নিয়োগকাল পাঁচ বৎসর। তাঁহারা কোন ভারতীয় আদালতের বিচারাধীন নহেন। তিনি আইনপরিষদ বা কোন আইনসভার সভ্য হইতে পারেন না।

পরিচালন বিভাগীয় ক্ষমতা (Executive Powers): রাজ্যপাল রাজ্যসরকারের অধিনেতা। রাজ্যের শাসনকার্য সমস্তই তাঁহার নামে পরিচালিত হয়। রাজ্যপাল মন্ত্রীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করিতে পারিবেন। তিনি রাজ্যস্থ মহাব্যবহারিক (Advocate-General) ও রাজ্যভৃত্যনিয়োগকমিসনের সভ্যদের নিযুক্ত করেন। শাসন-বহির্ভূত অঞ্চলগুলির শাসনভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত আছে।

আইনবিষয়ক ক্ষমতা (Legislative Powers): তিনি রাজ্যের আইনসভার একটি অংশ। তিনি আইনসভার অধিবেশন আহ্বান ও অধিবেশন বন্ধ করিবেন এবং আইনসভার নিম্নপরিষদ ভঙ্গ করিয়া দিতে পারিবেন। প্রয়োজন মত আইনসভার অধিবেশনে বক্তৃতা দিতে পারিবেন এবং আইনসভায় উপস্থিত কোন বিল সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জানাইয়া বাণী প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং আইনসভা বিল অনুমোদন করিলে তাহা রাজ্যপালের নিকট প্রেরিত হয়। তিনি তাঁহার সম্মতিজ্ঞাপন করিলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। তিনি বিলটি নাকচ করিতে পারেন। কিংবা রাষ্ট্রপতির মতপ্রকাশের জন্য বিলটি প্রেরণ করিতে পারেন। অথবা আইনসভায় তাঁহার মতামত জানাইয়া, বিলটি পুনর্বিবেচনার জন্য পাঠাইয়া দিতে পারেন। আইনসভার অধিবেশন বন্ধ থাকিবার সময় প্রয়োজন বোধ করিলে, তিনি জরুরী আইন বা অর্ডিনান্স প্রণয়ন করিতে পারিবেন। আইনসভার অধিবেশন সুরু হইতে ছয় সপ্তাহ

পর্যন্ত এই আইন বলবৎ থাকিবে এবং আইনসভা প্রস্তাব করিলে বেশী সময়ও বলবৎ রাখা যাইতে পারে।

রাজস্ববিষয়ক ক্ষমতা (Financial Powers): রাজস্ব সম্বন্ধেও তাঁহার ক্ষমতা রহিয়াছে। নূতন বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্বে আগামী বৎসরের আয় ও ব্যয়ের তালিকা, আইনসভায় উপস্থিত করিবার ব্যবস্থা তাঁহাকে করিতে হয়। সাধারণত, কোন বিভাগে কত ব্যয় হইবে, তাহা আইনসভার অনুমোদনের উপর নির্ভর করে। কিন্তু রাজ্যপালের বেতন ও ভাতা, মন্ত্রীগণের, উচ্চ আদালতের বিচারপতিগণের ও মহাব্যবহারিকের বেতন ও ভাতা বাবদ ব্যয়, শাসনবহির্ভূত অঞ্চলগুলি সম্বন্ধে ব্যয় ও সরকারী ঋণপরিশোধ দেয় অর্থ, আইনসভার অনুমোদনসাপেক্ষ নহে। ইহাদের পরিমাণ রাজ্যপাল নির্দিষ্ট করেন। তাঁহার নিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেহ সরকারী ব্যয় ও রাজস্ব সম্বন্ধে প্রস্তাব অথবা বিল আইনসভায় উপস্থিত করিতে পারে না।

বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা (Judicial Powers): রাজ্যপাল ইচ্ছা করিলে রাজ্যের আইনসভাকৃত আইনভঙ্গকারীদের দণ্ড মাপ করিতে পারেন।

বলা বাহুল্য এ সমস্ত বিষয়েই রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার মতানুযায়ী নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে কাজ করেন। রাজ্যপাল যদি কোন সময়ে মনে করেন যে রাজ্যের শাসনকার্য শাসনতন্ত্রীয় ব্যবস্থা অনুযায়ী করা যাইবে না তবে তিনি সেই মর্মে রাষ্ট্রপতির নিকট বিবরণী প্রেরণ করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতিরও তাহাই মত হইলে তিনি একটি ঘোষণা করিয়া রাজ্যের শাসনভার স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারেন।

মন্ত্রিসভা (Council of Ministers): রাজ্যপালের কার্যে সাহায্য করিবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যেই একটি মন্ত্রিসভা আছে। রাজ্যের আইনসভায় যে দলের সবাপেক্ষা অধিক সদস্য থাকে, তাহার নেতাকে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন। কতজন মন্ত্রী নিযুক্ত হইবে, তাহা মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি নির্দিষ্ট করেন। মন্ত্রীদের কেহ যদি নিয়োগকালে, আইনসভার সদস্য না থাকেন, তবে তাঁহাকে ছয় মাসের মধ্যে সদস্য হইতে হইবে। নচেৎ পদত্যাগ করিতে হইবে। আইনের চক্ষে মন্ত্রীদের নিয়োগকাল রাজ্যপালের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, এবং তিনি যে কোন সময় তাঁহাদের

বরখাস্ত করিতে পারেন। কিন্তু মন্ত্রিসভা যতদিন আইনসভার আস্থাভাজন থাকে ততদিন তাঁহাদের কার্যে বহাল রাখা হয়।

মন্ত্রিসভার কার্য: মন্ত্রীরা প্রত্যেকে এক বা একাধিক বিভাগের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সম্মিলিতভাবে তাঁহারা সরকারী নীতি নির্ধারণ করেন। কি কি পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা হইবে, কি ভাবে রাজস্ব আদায় করা হইবে, কি কি কর ধার্য করা হইবে, রাজস্ব কি ভাবে ব্যয় করা হইবে, কোন কোন বিষয়ে বিল উত্থাপন করা হইবে,—এ সমস্ত বিষয় মন্ত্রীরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া ঠিক করেন। তাঁহারা যাহা করিতে পরামর্শ দেন, রাজ্যপাল তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে আদেশ দেন। নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তার ন্যায় রাজ্যপাল মন্ত্রীদের মতানুযায়ী কাজ করেন।

আইনসভা ও রাজ্যপালের সম্বন্ধে (Relation between the Council of Ministers and the Governors): রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার নিয়োগকর্তা। তিনি প্রথমে মুখ্যমন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন ও পরে তাঁহার পরামর্শমত অন্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন। আইনের চক্ষে মন্ত্রীরা রাজ্যপালের পরামর্শদাতা মাত্র। শাসনকার্যে রাজ্যপালকে সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়াই মন্ত্রিসভার কাজ। মন্ত্রিগণ রাজ্যপালের খুশীমত নিজ পদে বহাল থাকেন এবং তিনি যে কোন সময়ে মন্ত্রীদের বরখাস্ত করিতে পারেন।

কিন্তু আসলে মন্ত্রিসভাই প্রকৃত ক্ষমতার মালিক। শাসনতন্ত্রে বলা হইয়াছে যে যেখানে রাজ্যপালকে নিজ ইচ্ছামত (Discretion) ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দেওয়া হইয়াছে সে বিষয়গুলি ব্যতীত অন্য সমস্ত সময়ে তাঁহার কার্যে সহায়তা করিবার জন্য ও পরামর্শ দিবার জন্য একটি মন্ত্রিসভা রাখিতে হইবে। একমাত্র আসামে উপজাতি অঞ্চলের শাসন পরিচালনা সম্বন্ধে রাজ্যপালকে দুইটি বিষয়ে নিজ ইচ্ছামত ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া আর সমস্ত বিষয়ে রাজ্যপালকে একটি মন্ত্রিসভা রাখিতেই হইবে এবং মন্ত্রিসভা আইনসভার নিকট দায়ী। রাজ্যপাল যদি মন্ত্রিসভার পরামর্শমত কাজ করিতে অস্বীকার করেন তবে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিবে। আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সভ্যেরাই মন্ত্রিসভা গঠন করে। সুতরাং মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিলে রাজ্যপালের পক্ষে ভিন্ন মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব হইবে না। কারণ সে মন্ত্রীগণ আইনসভার অধিকাংশ সভ্যের সমর্থন পাইবে না। রাজ্যপাল অবশ্য আইনসভা

ভঙ্গ করিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন। কিন্তু নূতন নির্বাচনে যদি পূর্বোক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রাধান্যই বজায় থাকে তবে রাজ্যপালকে আবার পুরাতন মন্ত্রিসভাই গঠন করিতে হইবে ও তাহার পরামর্শমত কার্য করিতে হইবে। সুতরাং রাজ্যপালকে নিয়মতান্ত্রিক রাজার ন্যায় মন্ত্রিসভার পরামর্শমত চলিতে হয়। বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে কিভাবে কাজ চলিতেছে ও কি কি বিষয়ে বিল আনা হইবে—এ সমস্ত বিষয় ঠিকমত রাজ্যপালকে জানান মুখ্যমন্ত্রীর একটি কর্তব্য।

শাসনতন্ত্রে রাজ্যপালকে একটি বিশেষ অধিকার দেওয়া আছে। তিনি যদি কোন সময়ে মনে করেন যে সেই রাজ্যের শাসন শাসনতন্ত্রানুযায়ী পরিচালনা করা সম্ভব নয় তবে তিনি এ বিষয়ে একটি বিবরণী রাষ্ট্রপতির নিকট দাখিল করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতিরও যদি একই মত হয় তবে তিনি একটি ঘোষণা করিয়া রাজ্যটির শাসনভার স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারেন। তাহা হইলে রাজ্যের মন্ত্রিসভা ও আইনসভা বাতিল হইয়া যাইবে এবং সাধারণত কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যপালই শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন।

মন্ত্রিসভা ও আইনসভা (Relation between the Council of Ministers and the State Legislature) : মন্ত্রীদের সহিত আইনসভার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আইনসভার সভ্যদের মধ্য হইতেই মন্ত্রীদের নিযুক্ত করা হয়। ছয় মাসের অধিক সময় আইনসভার সদস্য না থাকিলে সেই মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে হয়। মন্ত্রীরা প্রত্যেকেই আইনসভার অধিবেশনে যোগদান করেন ও দুইটি পরিষদ থাকিলে দুইটির অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা যে পরিষদের সদস্য নহেন, সেখানে ভোট দিতে পারেন না। তাঁহারা আইনসভায় সরকারী কাজ সম্বন্ধে সদস্যদের প্রশ্নের উত্তর দেন ; বিভিন্ন বিষয়ের বিল ও আয়ব্যয়ের তালিকা আইনসভায় উপস্থিত করেন ; সদস্যদের সমালোচনার উত্তরে সরকারী নীতি সমর্থন করেন। তাঁহাদের নিয়োগকাল আইনসভার খুসীর উপর নির্ভর করে। আইনসভা কোন বিষয়ে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণ করিলে, তাঁহারা পদত্যাগ করেন।

দশম পরিচ্ছেদ

রাজ্যের আইনসভা

রাজ্যের আইনসভা রাজ্যপাল ও এক অথবা দুইটি কক্ষ লইয়া গঠিত। পশ্চিম বঙ্গ, মাদ্রাজ, বোম্বাই, উত্তর প্রদেশ, বিহার ও পাঞ্জাব—এই ছয়টি রাষ্ট্রের আইনসভার দুইটি কক্ষ থাকিবে। উচ্চকক্ষের নাম বিধানপরিষদ (Legislative Council) ও নিম্নকক্ষের নাম বিধানসভা (Legislative Assembly)। অন্য তিনটি রাষ্ট্রে একটি পরিষদ লইয়া আইনসভা গঠিত হইবে।

বিধানসভা (Legislative Assembly) ৬০ হইতে ৫০০ জন সভ্য লইয়া গঠিত হইবে। সভ্যসংখ্যা রাজ্যের জনসংখ্যার উপর নির্ভর করিবে এবং প্রতি ৭৫ হাজার লোক পিছু একজন করিয়া সভ্য থাকিবে। সকল সভ্যই নির্বাচিত হইবে এবং প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক লোকেরই (স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে) ভোট দিবার অধিকার থাকিবে। এই সভার আয়ুষ্কাল পাঁচ বৎসর। তবে রাজ্যপাল ইচ্ছা করিলে ইহার পূর্বে সভা ভঙ্গ করিতে পারেন, কিংবা জরুরী অবস্থা উপস্থিত হইলে আরও একবৎসর আয়ু বাড়াইতে পারিবেন। সভ্যগণ একজন পরিষদপাল ও উপপরিষদপাল নির্বাচন করিবেন।

বিধানপরিষদের (Legislative Council) সভ্যসংখ্যা নিম্নপরিষদের সভ্য সংখ্যার একচতুর্থাংশের বেশী হইবে না। অর্থাৎ নিম্নপরিষদে ৪০০ সভ্য থাকিলে উচ্চ পরিষদে ১০০ জন সভ্য হইবে। তবে কোন অবস্থাতেই উচ্চ-পরিষদের সভ্যসংখ্যা ৪০ এর কম হইবে না। ইহার এক-তৃতীয়াংশ সভ্য পৌরসভা প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সভ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত। আর এক-তৃতীয়াংশ নিম্নপরিষদের সভ্য কর্তৃক নির্বাচিত হইবে। যাঁহারা অন্তত তিন বৎসর হইল বি, এ, পাস করিয়াছেন, তাঁহারা একের বার অংশ সভ্য, এবং যাঁহারা অন্তত তিন বৎসর হইল কোন কলেজ বা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেছেন তাঁহারা আর একের বার অংশ সভ্য নির্বাচন করিবেন; বাকী সভ্যদের রাজ্যপাল সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান, সমাজসেবা ও সমবায় আন্দোলনে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে মনোনীত করিবেন। এই পরিষদ স্থায়ীসভা।

তবে ইহার একতৃতীয়াংশ সভ্য প্রতি দুই বৎসর অন্তর পদত্যাগ করিবেন ও তাঁহাদের স্থলে নূতন নির্বাচন হইবে। একজন সভ্য মোট ছয় বৎসর সদস্য থাকিবে। সভ্যগণ একজন সভাপতি ও সহসভাপতি নির্বাচন করিবেন। মন্ত্রীরা ও মহাব্যবহারিক সদস্য না হইলেও উভয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করিতে পারেন।

আইনসভার ক্ষমতা বা কার্য (Functions or power of the State legislature) : আইনসভার প্রধান কাজ হইল পুলিস, জেলখানা, জনস্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা, সমবায়, কৃষি, বন, শিল্পপ্রতিষ্ঠা, ভূমি-রাজস্ব প্রভৃতি রাজ্যের বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করা। ফৌজদারী আইন ও বিচার ব্যবস্থা, বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ, শ্রমিকসংঘ, কারখানা, বয়লার, বিদ্যুৎ প্রভৃতি যুগ্ম বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আইনসভার আছে। তবে যুগ্ম বিষয় সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় আইনপরিষদও আইন করিতে পারে ও সাধারণত সেই আইন রাজ্যের আইনসভাকৃত আইনেব উপর বলবৎ থাকিবে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি যদি আইনসভাকৃত আইনে সম্মতি দিয়া থাকেন, তবে তাহা কেন্দ্রীয় আইনের উপব বলবৎ থাকিবে।

আইনসভাব দ্বিতীয় কাজ সরকাবী আয়ব্যয়ের মঞ্জুর করা। প্রত্যেক বৎসরের প্রথমে আইনসভায় সরকাবী আয়ব্যয়ের তালিকা পেশ করা হইবে। আইনসভায বাজেট লইয়া আলোচনা হয়। কয়েকটি ব্যতীত বিভিন্ন সরকারী বিভাগের ব্যয়েব দাবীর প্রস্তাব নিম্নপরিষদে উত্থাপন করা হয়। নিম্নপরিষদের অনুমোদন ব্যতীত সবকারী অর্থ ব্যয় কবা যায় না। কেবল রাজ্যপালের বেতন, মহাধর্মাধিকরণের বিচাবপতিগণ এবং পরিষদপাল, উপপরিষদপাল, উচ্চপরিষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতি,—ইঁহাদের বেতন বাবদ ব্যয়ের প্রস্তাব আইনসভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয় না। অন্য সমস্ত বিভাগীয় ব্যয়ের প্রস্তাব বিধানসভার অনুমোদন সাপেক্ষ। যে কোন করধার্যের প্রস্তাবও আইনসভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করা হয়।

মন্ত্রিসভা নিজেদের কার্যের জন্য বিধানসভার নিকট দায়ী। নিম্নপরিষদে অনাস্থাজ্ঞাপন করিলে মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিতে বাধ্য।

দুইটি পরিষদের মধ্যে নিম্নটিকে বেশী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সরকারী ব্যয়ের দাবীর প্রস্তাব নিম্নপরিষদই মঞ্জুর করিতে পারে। উচ্চ পরিষদের

এবিষয়ে কোন ক্ষমতা নাই। রাজস্ববিষয়ক বিল প্রথমে নিম্নপরিষদে উত্থাপন করিতে হইবে। নিম্নপরিষদ বিলটি পাস করিলে তাহা উচ্চপরিষদে পাঠান হইবে ও উচ্চপরিষদ যাহাই করুক না কেন, ১৪ দিন পরে রাজ্যপালের সম্মতির জন্য প্রেরিত হইবে। অন্য বিল যে কোন পরিষদে উত্থাপন করা যাইবে বটে, কিন্তু উচ্চপরিষদ আপত্তি করিলে বড় জোর বিলটি পাস করিতে চার মাস সময় লাগিবে।

উভয় পরিষদের সম্বন্ধ (Relation between two houses of State legislature) : ছয়টি রাজ্যের আইনসভা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত। ইহাদের মধ্যে নিম্নপরিষদকেই সবচেয়ে বেশী ক্ষমতা দেওয়া আছে। প্রথমত, মন্ত্রিসভা কেবলমাত্র নিম্নপরিষদের নিকট দায়ী থাকিবে। উচ্চপরিষদ অনাস্থা জ্ঞাপন করিলে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিতে বাধ্য নহে। দ্বিতীয়, বিভিন্ন সরকারী বিভাগীয় ব্যয়ের প্রস্তাব অনুমোদনের ক্ষমতা একমাত্র নিম্নপরিষদের আছে। উচ্চপরিষদ এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারে। কিন্তু সেখানে এইরূপ কোন প্রস্তাব লইয়া ভোট গ্রহণ করা যাইবে না। তৃতীয়, রাজস্ববিষয়ক বিল প্রথমে নিম্নপরিষদে উপস্থিত করিতে হইবে। নিম্নপরিষদে বিলটি অনুমোদিত হইলে তাহা উচ্চপরিষদে পাঠান হইবে। উচ্চপরিষদ যদি বিলটির কোন পরিবর্তন করিতে চাহে, তবে ১৪ দিনের মধ্যে নিম্নপরিষদকে জানাইতে হইবে। নিম্নপরিষদ যদি এইরূপ পরিবর্তনে রাজী না হয়, তবে বিলটি ঠিক ১৪ দিন পরে উভয় পরিষদের অনুমোদিত বলিয়া ধরা হইবে। অর্থাৎ উচ্চপরিষদের রাজস্ববিষয়ক বিলের সম্বন্ধে কোন ক্ষমতাই নাই। অন্যান্য বিল যে কোন পরিষদে উপস্থিত করা চলিবে। নিম্নপরিষদের অনুমোদন ব্যতীত কোন বিলই আইনে পরিণত হইবে না। কিন্তু উচ্চপরিষদের অনুমোদন ব্যতীতও বিল পাস করা যাইবে। নিম্নপরিষদ কোন বিল অনুমোদন করিলে তাহা উচ্চপরিষদে পাঠান হইবে। উচ্চপরিষদ যদি বিলটি অনুমোদন না করে, কিংবা বিলটির এমন পরিবর্তন করে যাহা নিম্নপরিষদ গ্রহণ করিতে রাজী না হয়, অথবা উচ্চপরিষদ বিল সম্বন্ধে কিছুই না করিয়া তিনমাসের বেশী সময় কাটাইয়া দেয় তবে নিম্নপরিষদ ইচ্ছা করিলে বিলটি আবার পাস করিতে পারে। ইহার পর উচ্চপরিষদ যাহাই করুক না কেন, ঠিক একমাস পরে বিলটি উভয় পরিষদের অনুমোদিত বলিয়া ধরা হইবে। সুতরাং নিম্নপরিষদের অনুমোদিত বিল

উচ্চপরিষদ পছন্দ না করিলে বড় জোর চার মাস পর্যন্ত বাধা দিতে পারে। তাহার পর উচ্চপরিষদের অনুমোদন সত্ত্বেও বিল আইনে পরিণত হইবে।

রাজ্যের আইনসভার আইন প্রণয়নের ধারা ও বাজেট পাশের নিয়মের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। ইহা পূর্বের নিয়মেই চলিবে।

আইন প্রণয়নের ধারা (Procedure for passing lagisla-tion) : রাজ্যের আইনসভায় কেন্দ্রীয় আইনপরিষদের ন্যায় একই নিয়মে প্রণয়ন করা হয়।

প্রথমে, বিল আইনসভায় উত্থাপন করিতে হইবে। বিলটি যদি সরকারী বিল হয়, অর্থাৎ মন্ত্রীরা কেহ বিল উত্থাপন করিতে চাহেন, তবে শুধু সরকারী গেজেটে বিল প্রকাশ করা হয়। যদি কোন সাধারণ সভ্য উত্থাপন করিতে চাহেন, তবে তাহাকে একমাসের নোটিস দিতে হইবে, নির্দিষ্ট দিনে আইন সভার সম্মতি প্রার্থনা করিতে হইবে। সভা সম্মতি দিলে বিল উত্থাপন করা হইবে। রাজস্ববিষয়ক বিল কেবলমাত্র নিম্নপরিষদে উপস্থিত করা যাইবে।

ইহার পর বিল উত্থাপনকারী সভ্যকে বিলটি প্রথমবার পাঠ করা হউক, এই মর্মে এক প্রস্তাব করিতে হইবে। এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে সাধারণত, কয়েকজন নির্দিষ্ট সভ্যকে লইয়া গঠিত একটি সিলেক্ট কমিটির নিকট প্রেরণ করা হউক, এইরূপ আব একটি প্রস্তাব পেশ করা হয়। এই সময়ে বিলটির মূল নীতি লইয়া আলোচনা চলে। আইনসভাব মত হইলে সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি বিলটিকে পুংখানুপুংখভাবে পরীক্ষা করে, ও তাহার মতামত জানাইয়া এই সম্বন্ধে একটি বিবরণ পেশ করে। কমিটি ইচ্ছামত বিল সংশোধন করিতে পারে। এই বিবরণী আইন সভায় পেশ হইলে, প্রস্তাব করা হয় যে, বিল দ্বিতীয়বার পাঠ করা হউক। তখন আইন সভায় বিলটি লইয়া বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং ইহার প্রত্যেকটি ধারার উপর ভোট গ্রহণ করা হয়। সভ্যেরা যে কোন সংশোধন প্রস্তাব করিতে পারে। বিলের সমস্ত ধারাগুলি অনুমোদিত হইলে পর বিলটি শেষ ধাপে পৌছায়। তখন আইনসভায়, বিল তৃতীয়বার পাঠ করা হউক এই মর্মে, আর একটি প্রস্তাব করা হয়। এই প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে, বিলটি দ্বিতীয় পরিষদ থাকিলে সেখানে, নচেৎ রাজ্যপালের নিকট প্রেরণ করা হয়।

ইহাই সাধারণ নিয়ম। বিলটি জরুরী হইলে, সিলেক্ট কমিটি গঠন না করিয়া,

আইনসভায় দ্বিতীয়বার পাঠ করিবার প্রস্তাব করা যায়। ফলে একটি ধাপ কমিয়া যায়। অনেক সময় বিলটিকে জনমত জ্ঞাপনের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করার প্রস্তাবও করা যাইতে পারে। এই প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে, বিলের একটি ধাপ বেশী পার হইতে হইবে। অর্থাৎ জনমত জানিবার পর, বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হয়।

দ্বিতীয় পরিষদ থাকিলে, সেখানেও একই নিয়মে বিল অনুমোদন করা হয়। বিল কিংবা কোন সংশোধন প্রস্তাব লইয়া মতভেদ হইলে, দুইটি পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করা হয় ও সেখানে অধিকাংশের ভোটে বিলটির ভাগ্য নির্ণয় করা হয়। প্রত্যেক বিলই রাজ্যপালের নিকট প্রেরণ করা হয়। তিনি সম্মতি দিলে, বিল আইনে পরিণত হয়। তিনি সম্মতি না দিলে বিলটি শেষ হইয়া গেল। কিংবা তিনি বিল পুনর্বিবেচনার জন্য আইনসভায় ফেরৎ দিতে পারেন। অথবা রাষ্ট্রপতির মতামত জানিবার জন্য রাখিয়া দিতে পারেন। রাজ্যপাল শেষপন্থা অবলম্বন করিলে, বিল রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করা হয়। তিনি সম্মতি দিলে তবেই বিল আইন বলিয়া গণ্য হয়।

বাজেট পাশের নিয়ম (Procedure for passing the budget) : সরকারী আয়ব্যয়ের তালিকাকে বাজেট বলে। পুরাতন বৎসর শেষ হইবার পূর্বে এক নির্দিষ্ট দিনে, রাজ্যের অর্থসচিব নূতন বৎসরের আয়ব্যয়ের তালিকা আইন-সভায় উপস্থিত করেন। এইদিনে অর্থসচিব একটি বিস্তৃত বক্তৃতা দিয়া, আয়ব্যয়ের হিসাব বুঝাইয়া দেন।

কয়েকদিন পরে আইনসভায় এই তালিকা লইয়া সাধারণ আলোচনা সুরু হয়। সভ্যেরা সরকারী আয়ব্যয় ও সরকারী নীতি সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করেন। বিপক্ষীয় দলের সভ্যেরা নানাপ্রকার সমালোচনা করেন। চারদিন ধরিয়া এই আলোচনা হইবার শেষ দিনে অর্থসচিব সমালোচনার উত্তর দিয়া আর একটি বক্তৃতা দেন।

তাহার পর বিভিন্ন বিভাগের ব্যয়ের দাবীর প্রস্তাব আইনসভায় পৃথক পৃথক ভাবে উপস্থিত করা হয়। মন্ত্রীরা তাঁহাদের কার্য ও নীতি সমর্থন করিয়া বক্তৃতা দেন। অন্যান্য সভ্যেরা ব্যয়ের দাবী নামঞ্জুর করিবার প্রস্তাব কিংবা ব্যয়ের পরিমাণ কমাইয়া দিবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবগুলি অনুমোদিত হইলে মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেন। কারণ তাহার অর্থ এই ধরা হয়,

যে, আইনসভা মন্ত্রীদের কার্যে আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছে। প্রত্যেক বিভাগের ব্যয়ের দাবী লইয়া দুই দিনের বেশী আলোচনা করা চলে না। দ্বিতীয় দিনের শেষে দাবীর প্রস্তাবের উপর ভোট গ্রহণ করা হয়। ১৫ দিনের মধ্যে সমস্ত বিভাগীয় ব্যয়ের দাবী সম্বন্ধে আলোচনা ও ভোট গ্রহণ শেষ করিতে হইবে।

যে যে রাজ্যে দুইটি পরিষদ আছে, সেখানে কেবলমাত্র নিম্নপরিষদেই ব্যয়ের প্রস্তাব লইয়া ভোট গ্রহণ করা হয়। ব্যয় মঞ্জুরীর ক্ষমতা উচ্চপরিষদের নাই।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রাজ্যপাল ও মন্ত্রীদের বেতন ও ভাতা ইত্যাদি বাবদ যে অর্থ ব্যয় হয়, তাহা আইনসভার মঞ্জুরী সাপেক্ষ নহে।

যেদিন আইনসভায় আয়ব্যয়ের তালিকা পেশ করা হয়, সেই দিনই নূতন অথবা পুরাতন কর সম্বন্ধে বিল উত্থাপন করা হয়। এই বিল পাসের নিয়ম অন্যান্য বিলের ন্যায়। অর্থাৎ তিনবার পাঠ করিবার পর রাজ্যপালের নিকট প্রেরণ করা হয়।

সদস্যের অধিকার (Privileges of the Members): আইনসভার সদস্যেরা প্রত্যেকে কতকগুলি অধিকার ভোগ করে। সভায় উপস্থিত কোন প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে সভ্যগণ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজেদের মত ব্যক্ত করিতে পারেন। সভায় উক্ত কোন কথার জন্য কোন সভ্যের বিরুদ্ধে কেহ আদালতে মকদ্দমা আনিতে পারিবে না। দ্বিতীয়ত, আইনসভার নির্দেশে প্রকাশিত কোন বিবরণীতে লিখিত বিষয়ের জন্য সভ্যদের দায়ী করা যাইবে না। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্যদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার আছে। পার্লামেণ্টের অধিবেশনের মধ্যে ও ৪০ দিন পূর্বে ও পরে কোন সদস্যকে খুব গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ ব্যতীত অন্য কারণে গ্রেপ্তার করা যাইবে না। আমাদের রাজ্যের আইসসভার সভ্যদের সে অধিকার দেওয়া হয় নাই।

সভ্যদের নির্দিষ্ট বেতন ও ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অন্যান্য অধিকার আইনসভা আইন প্রণয়ন করিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিবে।

পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা: পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত। বিধানপরিষদে (Legislative Council) মোট ৫১ জন সভ্য আছে। তাহার মধ্যে ১৭ জন সভ্য নিম্ন পরিষদের সভ্যগণ কর্তৃক

নির্বাচিত। ১৭ জন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সভ্য কর্তৃক নির্বাচিত। যাঁহারা অন্তত তিন বৎসর পূর্বে বি-এ পাস করিয়াছেন তাঁহারা ৪ জন এবং যাঁহারা অন্তত তিন বৎসর শিক্ষকতা করিতেছেন তাঁহারা ৪ জন সভ্য নির্বাচন করিবেন। রাজ্যপাল সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে ৯ জনকে মনোনীত করিবেন। এই সভা স্থায়ী সভা এবং ইহার অধিবেশন কখনও ভঙ্গ করা যাইবে না। কিন্তু প্রতি দুই বৎসর অন্তর অন্তর ইহার এক-তৃতীয়াংশ সভ্য পদত্যাগ করিবে ও তাহাদের স্থলে নূতন নির্বাচন হইবে। প্রত্যেক সভ্য ছয় বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবে। সভ্যগণ একজন সভাপতি ও সহসভাপতি নির্বাচিত করিবেন।

নিম্ন পরিষদের নাম বিধান সভা (Legislative Assembly)। ইহার সভ্যসংখ্যা ২৩৮ জন। সমস্ত সভ্যই নির্বাচিত এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ২১ বৎসর বয়স্ক সকলেরই ভোট দিয়া এই সভ্যদের নির্বাচনের অধিকার আছে। এই সভার আয়ুষ্কাল ৫ বৎসর। তবে রাজ্যপাল তাহার পূর্বেই এই পরিষদ ভঙ্গ করিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন। সভ্যগণ একজন পরিষদপাল (Speaker) ও উপ-পরিষদপাল নির্বাচিত করিবেন।

আসামের আইনসভাঃ আসামের আইনসভার একটি পরিষদ। এই পরিষদ ১০৮ জন সভ্য লইয়া গঠিত। প্রত্যেক সভ্যই নির্বাচিত ও এই নির্বাচনে পূর্ণ বয়স্ক সকলেরই ভোট দিবার অধিকার আছে। সভ্যগণ একজন পরিষদপাল (Speaker) ও উপ-পরিষদপাল নির্বাচিত করিবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অন্যান্য রাজ্যের শাসনব্যবস্থা

দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজ্যের শাসনব্যবস্থা (Government and legislature of Part B States): ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আটটি দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজ্য আছে,—হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, মধ্যভারত, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র, পেপ্‌সু, ত্রিবাংকুর-কোচিন ও জম্মু-কাশ্মীর। হায়দ্রাবাদ, মহীশূর ও জম্মু-কাশ্মীর ভূতপূর্ব দেশীয় রাজ্য। অন্যান্য রাজ্য কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের মিলনে গঠিত।

ইহাদের মধ্যে জম্মু-কাশ্মীরকে শাসনতন্ত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে রাজ্যটি বৈদেশিক বিভাগ, দেশরক্ষা বিভাগ ও যানবাহন বিভাগ মাত্র এই তিনটি বিভাগের শাসনভার ভারত গভর্ণমেণ্টের উপর ছাড়িয়া দিয়াছে। অন্য বিষয়ে রাজ্যসরকারের পূর্ণ স্বাধীনতা রহিয়াছে। রাজ্যের শাসনকর্তাকে সদার-ই-রিয়াসত আখ্যা দেওয়া হয় ও তিনি কাশ্মীরের গণপরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত। এই গণপরিষদের সভ্যদের মধ্য হইতে একটি মন্ত্রিসভা গঠিত আছে। এই মন্ত্রিসভাই সরকারী কার্য পরিচালনা করে। এই রাজ্য বর্তমানে ভারতে যোগদান করিলেও ইহার নাগরিকগণ ভবিষ্যতে গণভোট দিয়া অন্য ব্যবস্থাও অবলম্বন করিতে পারে। অর্থাৎ তাহারা ভারতের সহিত যোগসূত্র ছিন্ন করিয়া পাকিস্তানে যোগদান করিতে পারে। নচেৎ স্বাধীন থাকিতে পারে।

অবশিষ্ট রাজ্যগুলির গভর্ণমেণ্ট প্রথমশ্রেণীর রাজ্যগুলির ন্যায় পরিচালিত হয়। মাত্র দুইএকটি বিষয়ে সামান্য প্রভেদ রহিয়াছে। যেমন এই রাজ্যগুলির শাসনকর্তা রাজ্যপাল নহেন রাজপ্রমুখ। রাজ্যপালের নিয়োগকর্তা রাষ্ট্রপতি তাহা আমরা জানি। কিন্তু এই রাজ্যগুলির রাজপ্রমুখ রাজ্যগুলির গঠনের সময়কার চুক্তি অনুযায়ী নিযুক্ত আছেন। যেমন হায়দ্রাবাদের রাজপ্রমুখ নিজাম ও মহীশূরের রাজপ্রমুখ সে দেশের মহারাজা। ত্রিবাংকুর-কোচিনের রাজপ্রমুখ ত্রিবাংকুরের মহারাজা। পেপ্‌সুর রাজপ্রমুখ পাতিয়ালার মহারাজা। অবশ্য রাজপ্রমুখও শাসনকার্য পরিচালনার জন্য একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন ও তাঁহাকেও সর্ববিষয়ে মন্ত্রিসভার পরামর্শ মত কাজ করিতে হয়। এ বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর ও দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

একমাত্র মহীশূরের আইনসভা দুইটি কক্ষ লইয়া গঠিত। অন্যত্র আইনসভার একটি মাত্র কক্ষ আছে। বিধানসভার সভ্যগণ সকলেই নির্বাচিত। মহীশূরের বিধান পরিষদের গঠনও প্রথম শ্রেণীর রাজ্যগুলির যাহাদের বিধানপরিষদ আছে তাহাদেরই মত। আইনসভার গঠন ও ক্ষমতা উভয় শ্রেণীর রাজ্যে একই ধরণের।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হইতেছে এই যে শাসনতন্ত্র বহাল হইবার পর হইতে দশ বৎসর পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজ্য সরকার রাষ্ট্রপতির নির্দেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ইচ্ছা করিলে এই সময় কমাইতে কিংবা বাড়াইয়া দিতে পারে, কিংবা কোন রাজ্যকে এই ধারা হইতে অব্যাহতি দিতে পারে। প্রথম শ্রেণীর রাজ্যগুলি এই বাধা-নিষেধ হইতে মুক্ত।

তৃতীয় শ্রেণীর রাজ্য (Government of Part C States) : তৃতীয় শ্রেণীর রাজ্য অর্থাৎ আজমীর, ভূপাল, কুর্গ, দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, বিন্ধ্য প্রদেশ, কচ্ছ, মণিপুর, ত্রিপুরা ও বিলাসপুর এই রাজ্যের শাসনভার রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত আছে। ইহাদের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রপতি একজন উপরাজ্যপাল (Lieutenant Governor) বা মহাভুক্তিপতি (Chief Commissioner) নিয়োগ করিতে পারেন। কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ ইচ্ছা করিলে এই রাজ্যগুলিতে একটি করিয়া মন্ত্রিসভা বা উপদেষ্টাসভা গঠনের এবং একটি আইনসভা স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে পারে। মন্ত্রিসভা উপদেষ্টাসভা ও আইনসভার গঠন ও ক্ষমতাও এই আইনে নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইবে। বর্তমান আজমীর, দিল্লী, ভূপাল, কুর্গ, হিমাচলপ্রদেশ ও বিন্ধ্য প্রদেশে মন্ত্রিসভা বা উপদেষ্টা সভা ও আইনসভা গঠন করা হইয়াছে। এইরূপ আইনসভা গঠন না করা হইলে রাজ্যগুলির প্রয়োজনমত আইন প্রণয়নের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের উপর ন্যস্ত।

চতুর্থ শ্রেণীর রাজ্য (Government of Part D States) : আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ চতুর্থ শ্রেণীর রাজ্য। ইহার শাসনভার রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট ইহার শাসনকার্য পরিচালনা করে। রাষ্ট্রপতি একজন মহাভুক্তিপতি (Chief Commissioner) নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি এই রাজ্যের সুশাসনের জন্য প্রয়োজন হইলে আইন প্রণয়নও করিতে পারেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বিচার ব্যবস্থা

ভারতবর্ষে, দেওয়ানী ও ফৌজদারি, এই দুই শ্রেণীর আদালত আছে। তাহাদের উপরে প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া উচ্চ বিচারালয়, ও সমগ্র ভারতের জন্য একটি উচ্চ বিচারালয় আছে। নিম্নে একে একে ইহাদের বর্ণনা দেওয়া হইল।

দেওয়ানী আদালত: গ্রামের পঞ্চায়েতী আদালতই সর্বনিম্ন দেওয়ানী আদালত। এই আদালতে গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সদস্যেরা ছোট ছোট মামলার বিচার করে। একটু বড় মামলার বিচার সর্বপ্রথম মুন্সেফ আদালতে হয়। প্রত্যেক মহকুমা ও চৌকিতে এক বা ততোধিক মুন্সেফের আদালত আছে। তদপেক্ষা বড় মামলা প্রথম সাবজজের আদালতে দায়ের করিতে হয়। কলিকাতার মত বড় শহরে এই প্রকারের মামলা বিচারের জন্য ছোট আদালত আছে। মুন্সেফের রায়ের বিরুদ্ধে জেলাজজের আদালতে আপীল করা হয়। প্রত্যেক জেলায় একজন কি দুইজন করিয়া জেলাজজ আছে। খুব বড় মামলা প্রথম জেলাজজের আদালতে পেশ করা যায়। জজের আদালতে আপীলের শুনানী হয়। জেলাজজ নিম্ন আদালতগুলির কার্য পরিদর্শন করেন। জেলাজজের রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের উচ্চ বিচারালয়ে আপীল করা যায়। কলিকাতার ন্যায় বড় শহরে ছোট আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চবিচাবালয়ে আপীল করা যায়। হাইকোর্ট বাজ্যের সবোচ্চ বিচারালয়। পূর্বে দেওয়ানী মামলার দাবীর পরিমাণ কুড়ি হাজার টাকার বেশী হইলে মহাধর্মাধিকরণ বা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে অধিধর্মাধিকরণে (Supreme Court) আপীল করা চলিবে। যদি দেওয়ানী মামলার নিষ্পত্তি করিতে '৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের কোন ধারা অথবা কোন আইনের ধারা অথবা কোন নিয়মাবলীর অর্থ লইয়া মতভেদ হয়, তবে সেই মামলায় হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে অধিধর্মাধিকরণে আপীল করা চলিবে। এই বিচালয়ের রায়ের বিরুদ্ধে আর কোথায়ও আপীল করা চলে না।

ফৌজদারী আদালত: গ্রাম্য পঞ্চায়েতী আদালতই হইল সর্বনিম্ন ফৌজদারী আদালত। পঞ্চায়েতের সদস্যরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধের বিচার করিয়া

সামান্য জরিমানা করিতে পারেন। শহরে এই ধরণের মামলার জন্য কয়েকজন করিয়া বেতনভোগী বিচারক আছেন। একটু গুরু অপরাধের বিচার করিবার জন্য প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা শাসক নিযুক্ত আছেন। খুন প্রভৃতি গুরুতর অপরাধের শুনানী প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত শাসকের নিকট হয়। আপাতদৃষ্টিতে অপরাধের প্রমাণ আছে মনে করিলে, তিনি আসামীকে দায়রায় সোপর্দ করিতে পারেন। দায়রায় জেলাজজ একদল জুরীর সাহায্যে এই সব অপরাধের বিচার করেন। ইহা ছাড়া জেলাজজ অন্য ম্যাজিস্ট্রেট বা শাসকের রায়ের বিরুদ্ধে আপীলের বিচার করেন। জেলাজজের রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্যের হাইকোর্ট বা মহাধর্মাধিকরণে আপীল করা যায়। জেলাজজ আসামীকে প্রাণদণ্ড দিলে, হাইকোর্টের সম্মতি ব্যতীত এই দণ্ড দেওয়া হয় না। সাধারণত, হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল হয় না। তবে এইরূপ মামলার সূত্রে যদি ভারতশাসন আইনের কোন ধারার অর্থ লইয়া মতভেদ থাকে, তবে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে অধিধর্মাধিকরণে আপীল করা চলিবে।

হাইকোর্ট বা মহাধর্মাধিকরণঃ প্রায় সমস্ত রাজ্যেই একটি করিয়া মহাধর্মাধিকরণ (হাইকোর্ট) আছে। ইহাই রাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ বিচারালয়। এই উচ্চ বিচারালয়গুলি একজন মহাবিচারক ও কয়েকজন বিচারক লইয়া গঠিত। রাষ্ট্রপতি বিচারকদের নিযুক্ত করেন। কাহাকেও এইপদে নিযুক্ত করিবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি অধিধর্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতি এবং রাজ্যপাল বা রাজপ্রমুখের সহিত পরামর্শ করিবেন। হাইকোর্টের অন্য বিচারকদের নিয়োগের পূর্বে সেই হাইকোর্টের মহাবিচারকের সহিত পরামর্শ করিতে হইবে। তাঁহারা বাট বৎসর বয়স পর্যন্ত কাজ করেন। এই বিচারালয়ে দেওয়ানী ও ফৌজদারী দুই প্রকারের মকদ্দমার বিচার হয়। এই দুই প্রকারের মকদ্দমায় নিম্ন আদালতগুলির রায়ের বিরুদ্ধে আপীলের শুনানী এই সমস্ত মহাধর্মাধিকরণে হইয়া থাকে। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের মহাধর্মাধিকরণে আপীলের শুনানী ছাড়াও প্রথম মকদ্দমা দাখিল করা যায়। হাইকোর্টের তৃতীয় কাজ রাজ্যস্থ নিম্ন আদালতগুলির কার্য পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ করা। অধিকাংশক্ষেত্রেই হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে অধিধর্মাধিকরণে আপীল করা যায়।

অধিধর্মাধিকরণ (Supreme Court of India): অন্যান্য যুক্ত-রাষ্ট্রের ন্যায় ভারতেও একটি অধিধর্মাধিকরণ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ভারতীয় অধিধর্মাধিকরণ একজন প্রধান বিচারপতি ও অনধিক সাতজন বিচারপতি লইয়া গঠিত। রাষ্ট্রপতি বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করিবেন। তিনি এই নিয়োগ করিবার পূর্বে অধিধর্মাধিকরণের প্রধান ও অন্যান্য বিচারপতি ও মহাধর্মাধি-করণের বিচারপতিগণের পরামর্শ লইবেন। যাঁহারা অন্তত পাঁচ বৎসরের জন্য মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতিত্ব করিয়াছেন, কিংবা অন্তত দশ বৎসর পর্যন্ত কোন মহাধর্মাধিকরণে ওকালতি করিয়াছেন, কিংবা যাহারা বিশিষ্ট আইনজ্ঞ—কেবলমাত্র তাঁহাদের মধ্য হইতেই বিচারপতি নিযুক্ত হইবেন। বিচারপতিগণ ৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত নিজপদে বহাল থাকিবেন।

অধিধর্মাধিকরণের কার্য (Functions of the Supreme Court): অধিধর্মাধিকরণের চার প্রকারের কাজ করিতে হয়। প্রথম, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারের মধ্যে অথবা বিভিন্ন রাজ্য-সরকারের মধ্যে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহার বিচার এই ধর্মাধিকরণে হয়। দ্বিতীয়, রাজ্যস্থ মহাধর্মাধিকরণের রায়ের বিরুদ্ধে এইখানে আপীল করা চলিবে। যদি এই মোকদ্দমায় বর্তমান শাসনতন্ত্রের কোন ধারার ব্যাখ্যা লইয়া প্রশ্ন উঠে তবে এই আদালতে আপীল করা চলে। আর কোন দেওয়ানী মামলায় যদি অন্তত বিশ হাজার টাকার দাবীদাওয়া থাকে, কিংবা ফৌজদারী মামলায় কোন গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রশ্ন জড়িত থাকে, তবে মহাধর্মাধিকরণের রায়ের বিরুদ্ধে অধিধর্মাধিকরণে আপীল করা যায়। তৃতীয়, যদি কোন নাগরিক মনে করে যে তাহার মৌলিক অধিকার ব্যাহত করা হইয়াছে, তবে সে সরাসরি অধিধর্মাধিকরণে আবেদন করিয়া নিজ অধিকার রক্ষার দাবী করিতে পারে। চতুর্থ, রাষ্ট্রপতি যে কোন বিষয়ে অধিধর্মাধিকরণের মত জানিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারেন। অধি-ধর্মাধিকরণ যে রায় দিবে, তাহা অন্য সমস্ত ধর্মাধিকরণ মানিয়া লইতে বাধ্য। ইহা ভারতের সর্বোচ্চ বিচারালয়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সামন্ত রাজ্য

ইংরাজী আমলে ভারতবর্ষকে দুই ভাগে ভাগ করা হইত, ব্রিটিশ ভারত ও সামন্ত রাজ্য। এই সামন্ত রাজ্যগুলির নৃপতিগণ হয়ত কোনদিন স্বাধীন ছিলেন। কিন্তু পরে তাঁহারা সকলেই ব্রিটিশ সরকারের আনুগত্য মানিয়া চলিতেন। এদেশে প্রায় ৬৩১টি সামন্ত রাজ্য ছিল। ইহাদের সম্মিলিত প্রজাসংখ্যা সমগ্র ভারতের জনসংখ্যার ২৪ ভাগ ছিল এবং প্রায় ৪০ ভাগ ভূমি ইঁহাদের অধীনে ছিল। ছোট বড় নানা শ্রেণীর রাজ্য ইহাদের মধ্যে ছিল। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ রাজ্য হইতেছে হায়দ্রাবাদ। হায়দ্রাবাদের আয়তন অবিভক্ত বঙ্গদেশ হইতেও বৃহৎ এবং ইহার রাজস্ব প্রায় আট কোটি টাকা। অন্যদিকে কাথিয়াওয়াড়ের ওয়াডি রাজ্যের আয়তন মাত্র ১২ বর্গ মাইল এবং প্রজাসংখ্যা মাত্র ২০০০ ছিল। হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর, বরোদা, মহীশূর, ত্রিপুরা, ত্রিবাংকুর, কোচিন, গোয়ালিয়র প্রভৃতি বড় রাজ্যগুলিতে শাসনতন্ত্র অনেক প্রগতিশীল ছিল। ত্রিবাংকুর, কোচিন ও বরোদায় ব্রিটিশ ভারত অপেক্ষা শিক্ষার বিস্তার অধিক পরিমাণে হইয়াছে। কোচিন ও ত্রিবাংকুরে শিক্ষিত স্ত্রীলোকের সংখ্যা ভারতবর্ষের যে কোন প্রদেশ অপেক্ষা চারিগুণ বেশী।

ব্রিটিশ রাজত্বের আমলে এই সমস্ত সামন্ত রাজ্যের কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল। আইনের চক্ষে সামন্ত রাজারা ব্রিটিশরাজ্যের আনুগত্য স্বীকার করিলেও, এই রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল বলিয়া গণ্য করা হইত না। ইহাদের প্রজাদের ব্রিটিশ নাগরিক বলিয়া ধরা হইত না। ইংরাজকৃত আইন ইহাদের উপর প্রযোজ্য ছিল না, এবং কোন ভারতীয় বিচারালয়ে ইহাদের বিরুদ্ধে মামলা করা যাইত না। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে ইহাদের "ব্রিটিশসংরক্ষিত" বলিয়া গণ্য করা হইত। রাষ্ট্র বিদেশে কেবল নিজের নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষা করে। কিন্তু এই সমস্ত সামন্ত রাজ্যের প্রজারা ব্রিটিশ নাগরিক না হইলেও, ব্রিটিশ সরকার বিদেশে ইহাদের স্বার্থ রক্ষার ভার গ্রহণ করিত।

সামন্ত রাজ্যগুলির কেহই রাষ্ট্রপদবাচ্য ছিল না। তাহাদের কাহারও

সার্বভৌম ক্ষমতা ছিল না। প্রত্যেক রাজাই ব্রিটিশ সরকারের সহিত সন্ধি ও সনন্দসূত্রে আবদ্ধ ছিল এবং তাহাদের ক্ষমতা সন্ধিপত্র ও সনন্দদ্বারা নানা প্রকারে সীমাবদ্ধ ছিল। সমস্ত নৃপতিরা প্রত্যেকেই ব্রিটিশ রাজ্যের অনুগত্য স্বীকার করিতেন ও রাজভক্তি প্রদর্শন করিতে বাধ্য ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে ইঁহাদের সিংহাসনচ্যুত করিতে পারিতেন। রাজাধিরাজ হিসাবে, ইংলণ্ডেশ্বরের হস্তে সামন্ত রাজ্য সম্বন্ধে বহু ক্ষমতা ছিল। এই ক্ষমতাসমষ্টিকে বলা হইত সার্বভৌমক্ষমতা (Paramount Power)। সার্বভৌমক্ষমতার কোন সীমা নির্দেশ করা ছিল না এবং কতদূর পর্যন্ত এই ক্ষমতার গতি, তাহাও নির্ধারণ করিতেন রাজা স্বয়ং। সাধারণত নিম্নলিখিত ক্ষমতাগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হইত।

কোন সামন্ত রাজা অপুত্রক অবস্থায় মৃত হইলে, তাহার উত্তরাধিকারী কে হইবে তাহা নির্ধারণ করিত ব্রিটিশ সরকার। কোন রাজা যদি দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে চাহিতেন, তবে তাঁহাকে পূর্বে ব্রিটিশ সরকারের সম্মতি লইতে হইত। দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্যে কোন বিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, তাহার মীমাংসা রাজপ্রতিনিধি হিসাবে গভর্ণর-জেনারেল করিতেন। রাজাদের পদমর্যাদাও তিনি ঠিক করিতেন। ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত কোন ব্যক্তি এই রাজ্যগুলিতে পলায়ন করিলে, তাহাকে ধরিয়া গভর্ণর-জেনারেলের হস্তে সমর্পণ করিতে হইত। প্রয়োজন হইলে নিজরাজ্যের মধ্য দিয়া রেল লাইন কিংবা খাল কাটার অনুমতি দিতে হইত। রাজ্যশাসনের অক্ষমতার জন্য রাজ্যের অভ্যন্তরে বিশৃংখলার সৃষ্টি হইলে, তাঁহাদের রাজ্যশাসনে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা গভর্ণর-জেনারেলের ছিল। এমন কি দরকার হইলে, তিনি রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারিতেন। কোন সামন্ত রাজা বৈদেশিক কোন শক্তির সহিত সন্ধি বা অন্য কোনও প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিতেন না। পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিতেন না। বড় বড় রাজ্যের প্রত্যেকটিতে এবং ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির কয়েকটি মিলিয়া একজন করিয়া গভর্ণর-জেনারেলের প্রতিনিধি (Resident) নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি ইঁহাদের শাসনকার্যের উপর কড়া পাহারা রাখিতেন এবং প্রয়োজন মনে করিলে, গভর্ণর-জেনারেলের নির্দেশানুযায়ী হস্তক্ষেপ করিতেন।

সামন্ত নৃপতিগণ ব্রিটিশ সরকারের নিকট হইতে কতকগুলি অধিকার দাবী

করিতে পারিতেন। যেমন বৈদেশিক আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা হইতে নৃপতিদের সর্বপ্রকারে রক্ষা করিতে হইত। প্রত্যেক রাজ্যের সীমানা অটুট রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইত। নৃপতিদের অধিকার, পদমর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করিতে হইত এবং সমুদ্রসমীপবর্তী রাজ্যগুলির আগম-নিগম শুল্ক (Customs) বসাইবার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইত।

১৯২১ সালে নরেন্দ্রমণ্ডল নামে সামন্ত নৃপতিদের লইয়া গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। রাষ্ট্রপাল ইহার সভাপতিত্ব করিতেন। ইহাতে সামন্ত রাজ্যগুলির সার্বজনীন স্বার্থঘটিত বিষয় লইয়া আলোচনা করা হইত। অবশ্য নরেন্দ্রমণ্ডলের নির্দেশ মানিয়া লইতে কোন নৃপতিই বাধ্য ছিলেন না।

১৯৪৭ সালের ভারত-স্বাধীনতা-আইনের পর সামন্ত রাজ্যগুলির অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই আইনের ফলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সামন্ত রাজ্যগুলির উপর ব্রিটিশ প্রভুত্ব চলিয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ সরকারের সহিত সামন্ত নৃপতিগণের যে সন্ধি ও সনন্দপত্র ছিল, তাহা সমস্তই বাতিল হইয়া গিয়াছে। যাইবার সময় ব্রিটিশ সরকার এই আশা প্রকাশ করেন যে, নৃপতিগণ নিজ নিজ স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া হয় ভারত না হয় পাকিস্তান রাষ্ট্রে যোগদান করিবেন। এইরূপ অকস্মাৎ পরিবর্তনে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে এবং নৃপতিগণকে ডোমিনিয়নে যোগদান করা সম্বন্ধে মন স্থির করিবার সময় দেওয়া উচিত। এইজন্য পূর্ববর্তী ভারত সরকার ও সামন্ত রাজ্যগুলির মধ্যে যে যে ব্যবস্থা ছিল, তাহাই আরও কিছুদিনের জন্য বহাল রাখার চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। এই চুক্তিকে "স্থিতাবস্থা চুক্তি' বলে। ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র গঠনের জন্য যে গণপরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে সামন্ত রাজ্যগুলিই প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন। বর্তমানে সমস্ত রাজ্যগুলিই হয় ভারত না হয় পাকিস্তানে যোগদান করিয়াছে। কাশ্মীর ভারতে যোগদান করিয়াছে। কিন্তু ইহা লইয়া পাকিস্তানের সঙ্গে মতভেদ হওয়াতে কাশ্মীর ভারতে না পাকিস্তানে থাকিবে এ সম্বন্ধে শীঘ্রই গণভোট লওয়া হইবে।

গত কয়েক বৎসরে সমস্ত রাজ্যগুলির অবস্থার গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছে। বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যকে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের সহিত মিলিত করা হইয়াছে। আথগড়,

কিরণগড়, নয়াগড়, পাটনা, শোনপুর প্রভৃতি ২৫টি রাজ্য উড়িষ্যার সহিত; বাস্তার, জনিপুর, খয়রাগড়, নন্দগাঁও, সুরগুজা প্রভৃতি ১৪টি রাজ্য মধ্যপ্রদেশের সহিত; পুডুকোটাই, বঙ্গনপল্লী রাজ্য মাদ্রাজের সহিত; আউন্ধ, মিরাজ, মালঞ্চী প্রভৃতি ১৬টি রাজ্য; আরও ২৮৯টি রাজ্য এবং ববোদা বোম্বাই-এর সহিত ও কুচবিহারকে পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই রাজ্যগুলির শাসনকার্য পরিচালনার ভার রাজ্যগুলির সরকারের উপর ন্যস্ত হইল। হিমালয়ের পাদদেশস্থ রাজ্যগুলি লইয়া হিমাচল প্রদেশ বলিয়া একটি নূতন প্রদেশ গঠন করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কয়েকটি রাজ্যসম্মেলন গঠিত হইয়াছে। নবনগর, ভবনগর, পোরবন্দর প্রভৃতি ৪৪৯টি রাজ্য লইয়া সৌরাষ্ট্র নামে রাষ্ট্র; উদয়পুর, জয়পুব প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য লইয়া রাজস্থান যুক্তরাষ্ট্র; রেওয়া, পান্না প্রভৃতি ৩৫টি রাজ্য লইয়া বিন্ধ্যপ্রদেশ নামে যুক্তরাজ্য গঠিত হইয়াছে। সর্বসমেত ছয়টি রাজ্যসম্মেলন গঠন করা হইয়াছে। পূর্বেকার সামন্ত রাজ্যগুলির মধ্যে হায়দ্রাবাদ. মহীশূর, কাশ্মীরই অটুট রাখা হইয়াছে। শাসনতন্ত্রে এই সমস্ত রাজ্যগুলিকে খ শ্রেণীর রাজ্য বলা হয়। এই শ্রেণীর রাজ্যগুলিতে একজন রাজপ্রমুখ ও একজন উপরাজপ্রমুখ নিযুক্ত আছেন, এবং দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন কবা হয়য়াছে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

রাজ্যের শাসন ও সরকারী কর্মচারী

রাজ্যগুলির শাসন কিভাবে চলে? পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রাজ্যপালের নামে রাজ্যের সমস্ত শাসনকার্য পরিচালিত হয়। রাজ্যপালের একটি মন্ত্রিসভা আছে। মন্ত্রীরা এক বা একাধিক বিভাগের কার্য পরিচালনা করেন। প্রত্যেক বিভাগে একজন করিয়া কর্মসচিব (Secretary), উপ-কর্মসচিব, অথবা সহ-সচিব এবং বহুসংখ্যক করণিক বা কেরানী আছেন। কর্মসচিবদের প্রায় সকলেই ভারতীয় সিভিল সার্ভিস (বা ভারতীয় জন-পালন কৃত্যক) এর সভ্য। ইঁহাদের লইয়া মহাকরণ বা সেক্রেটারিয়েট গঠিত আছে।

প্রত্যেক রাজ্য কয়েকটি ভুক্তিতে (Division) বিভক্ত। প্রত্যেক ভুক্তিতে একজন করিয়া ভুক্তিপতি বা কমিসনার আছেন। তিনিও ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্য। তাঁহার প্রধান কাজ হইল, ভুক্তির রাজস্বসংক্রান্ত বিষয় পরিদর্শন করা। রাজস্ব আদায় ও প্রপন্নাধিকারের (Court of Wards) কার্য, জেলা শাসকদের কার্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য পরিদর্শনের ভার তাঁহার উপর। প্রত্যেক ভুক্তি আবার কয়েকটি জেলাতে বিভক্ত।

জেলাশাসক বা জেলাম্যাজিস্ট্রেট: প্রত্যেক জেলার শাসনকার্য পরিচালনা করেন জেলাশাসক। রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তাঁহার উপরে থাকে বলিয়া তিনি সমাহর্তা (Collector) নামেও পরিচিত। আবার কোন কোন রাজ্যে তাঁহাকে উপভুক্তিপতি (Deputy Commissioner) বলা হয়। তাঁহাদের অধিকাংশই ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্য। অল্প সংখ্যককে রাজ্য-সরকারের সিভিল সার্ভিস হইতে নিযুক্ত করা হয়।

জেলাশাসককে বহুপ্রকারের কাজ করিতে হয়। সমাহর্তা হিসাবে তিনি জেলার ভূমিরাজস্ব আদায় করেন। তিনি খাসমহল সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করেন এবং প্রপন্নাধিকার-এর (Court of Wards) কার্য পরিচালনা করেন। জেলাস্থ কোষাগার পরিচালনার দায়িত্বও তাঁহার। শাসক হিসাবে জেলার শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব তাঁহার উপরে। তিনি জেলার পুলিশের কার্য নিয়ন্ত্রণ করেন। অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের ব্যবস্থা করেন। নিম্ন

ফৌজদারী আদালতের কার্য পরিদর্শন করেন এবং নিজেও ফৌজদারী অপরাধের বিচার করেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে আনীত আপীলের শুনানী তাঁহার নিকট হয়।

তাঁহাকে জেলাস্থিত সমস্ত সরকারী বিভাগগুলির কার্য পরিদর্শন করিতে হয়। যেমন তাঁহাকে মাঝে মাঝে জেলখানা পরিদর্শন করিতে হয়। পৌর-চিকিৎসক (Civil Surgeon), নির্বাহী বাস্তুকার (Executive Engineer), জেলাস্কুলপরিদর্শক প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন বিভাগীয় অধিকারিক (Officer)-দের কার্যের তত্ত্বাবধান তাঁহাকে করিতে হয়। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তাহা নিরাকরণের সমস্ত ব্যবস্থা তাঁহাকে করিতে হয়। স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যের উপর তাঁহাকে নজর রাখিতে হয়। এইভাবে জেলার সকল সরকারী কার্যের মধ্যে তিনি পরিব্যাপ্ত থাকেন।

তাঁহাকে সরকারের "চক্ষু, কর্ণ, মুখ ও হস্ত" বলা হয়। জেলার সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া তিনি জনসাধারণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন এবং সেই অনুসারে সরকারের নিকট বিবরণী দাখিল করেন। জনসাধারণের নিকট সরকারীনীতি ও কার্যের তিনি ব্যাখ্যা করেন এবং তাহাদের অভাব-অভিযোগের সংবাদ উপরস্থ সরকারের নিকট পৌঁছাইয়া দেন। কতখানি বৃষ্টিপাত হইল, ফসলের অবস্থা কিরূপ, ব্যবসায়ের অবস্থা কিরূপ, চোর-ডাকাতির উপদ্রব প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের সংবাদ তাঁহাকে রাখিতে হয়। তাঁহাকে বহু সভায় সভাপতিত্ব করিতে হয় ও বহু বক্তৃতা দিতে হয়। সর্বপ্রকারে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন তাঁহার কর্তব্য। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া জেলার সমস্ত সরকারীচক্র ঘুরিতেছে।

জেলাশাসকের কার্য পর্যালোচনা করিলেই দেখা যায়, তিনি একাধারে শাসক ও বিচারক। পুলিশের কর্তা হিসাবে তিনি অপরাধীকে গ্রেফতার করেন ও বিচারের আদেশ দেন। আবার বিচারক হিসাবে অনেক সময়েই তিনি ফৌজদারী অপরাধের বিচার করেন। শাসকের হস্তে যদি বিচারের ক্ষমতা থাকে, তাহার ফলে অবিচারের সম্ভাবনাই অধিক এবং তাহাতে স্বৈরাচারের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। অবিলম্বে জেলাশাসকের হস্ত হইতে ফৌজদারী বিচারের ভার সরাইয়া লওয়া প্রয়োজন।

মহকুমা বা উপবিষয়ঃ প্রত্যেক জেলা কয়েকটি মহকুমাতে বিভক্ত। প্রত্যেক মহকুমায় একজন মহকুমা-শাসক আছেন ও তাঁহার অধীনে কয়েকজন

অবরশাসক (Sub-Deputy Magistrate) আছেন। জেলাতে যেমন জেলাশাসক সকল সরকারী কার্যের পাণ্ডা, মহকুমাতেও তেমনি মহকুমা-শাসক সকল প্রকার সরকারী বিভাগের কার্য পরিদর্শন করেন।

রাজস্বপরিষদ (Board of Revenue): সমগ্র রাজ্যের ভূমি রাজস্ব ও অন্যান্য রাজস্ব আদায়ের ভার রহিয়াছে রাজস্বপরিষদের উপর। এই পরিষদ একজন মাত্র সদস্য লইয়া গঠিত। তাঁহার একজন কর্মসচিব আছে। ভূমিরাজস্ব আদায় করা, ভূমিলেখ্য (Record of Rights) প্রস্তুত ও রক্ষা করা, ভূ-বাসন (Settlement) করা, প্রপন্নাধিকারের কার্য পরিচালনা প্রভৃতি এই পরিষদের কার্য। রাজস্ব সম্পর্কিত সমস্ত মামলার শেষবিচার হয় এই পরিষদে।

সরকারী কর্মচারী: মন্ত্রীদের নীচে বহুসংখ্যক সরকারী কর্মচারী আছে। কোন নীতি অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগের কাজ চলিবে মন্ত্রীরা তাহা নির্ধারণ করেন। সেই নীতিকে কার্যকরী করে সরকারী কর্মচারীবৃন্দ। মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব আইনসভার আস্থার উপর নির্ভর করে। আইনসভাও পাঁচ বৎসর পর পর নির্বাচিত হয়। কিন্তু এই সমস্ত সরকারী কর্মচারিগণের পদ স্থায়ী, এবং তাহারা ৫৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত নিজ পদে বহাল থাকে। নিয়োগকালে উপযুক্ত বেতন ও অবসর গ্রহণের পর পেন্সন বা অবসরভাতা তাহাদের দেওয়া হয়।

আমাদের দেশে তিন শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী আছে। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে ভারতীয় কৃত্যকের (Service) কর্মচারী। পূর্বে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ও ভারতীয় পুলিস সার্ভিস প্রভৃতি কর্মচারীদের নিয়োগকর্তা ছিলেন ভারতসচিব স্বয়ং। কিন্তু বর্তমানে এই সমস্ত কর্মচারীদের ভারতসরকার নিয়োগ করে। সাধারণত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফলে যাহারা কৃতকার্য হয়, তাহাদের এই সমস্ত পদে নিযুক্ত করা হয়। কখনও কখনও মনোনয়নের দ্বারা নিয়োগ করা হয়। এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা করিবার জন্য কেন্দ্রে একটি রাষ্ট্র-ভৃত্য-নিয়োগ-পরিষদ (Public Service Commission) আছে। ইহাদের মধ্যে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস বা ভারতীয় এড্‌মিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিসের (I. A. S.) পদমর্যাদা অত্যন্ত বেশী। এই সার্ভিসের কর্মচারীদের লইয়া শাসনব্যবস্থার কাঠামো গড়িয়া উঠিয়াছে। অধিকাংশ বিভাগীয় কর্মসচিব, উপ-সচিব, সহ-সচিব, জেলাজজ, জেলাশাসক, এমন কি উচ্চবিচারালয়ের বিচারপতি ইহাদের মধ্য হইতে নিয়োগ করা হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছে রাজ্যের কর্মচারীবৃন্দ। ইহাদের মধ্যে আবার দুইটি উপশ্রেণী আছে:—কৃত্যক ও অবর কৃত্যক। বিভিন্ন বিভাগের জন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। ইহাদের নিয়োগকর্তা রাজ্য-সরকার এবং এইজন্য এক বা একাধিক রাজ্যে একটি করিয়া রাষ্ট্রভৃত্যনিয়োগ-পরিষদ আছে।

তৃতীয় শ্রেণীতে আছে কৃত্যকের কর্মচারীবৃন্দ।

রাষ্ট্রভৃত্যনিয়োগপরিষদ (Public Service Commission): কেন্দ্রে এবং এক বা একাধিক রাজ্যে একটি করিয়া রাষ্ট্রভৃত্যনিয়োগপরিষদ আছে।

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভৃত্যনিয়োগপরিষদ, একজন পরিষদপতি ও কয়েকজন সদস্য লইয়া গঠিত। তাঁহাদের নিয়োগকর্তা রাষ্ট্রপতি। তিনি তাঁহাদের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর অন্যান্য নিয়ম নির্ধারণ করেন।

কোন রাজ্যের সরকার পৃথক পরিষদ গঠন না করিয়া কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভৃত্য-নিয়োগপরিষদের হস্তে কার্যভার অর্পণ করিতে পারে। কিংবা পৃথক পরিষদ গঠন করিতে পারে। পশ্চিম বাঙ্গালা ও আসামের পৃথক পরিষদ আছে। দুই বা কয়েকটি রাজ্য মিলিত হইয়া একটি পরিষদ গঠন করিতে পারে। বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের একটি মিলিত পরিষদ আছে। এই পরিষদগুলি একজন পরিষদপতি ও দুইজন সদস্য লইয়া গঠিত। তাঁহাদের নিয়োগকর্তা রাজ্যপাল। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য, উভয়বিধ পরিষদের অন্তত অর্ধেক সভ্য সরকারী কর্মচারীদের মধ্য হইতে নিযুক্ত হয়। ইহাদের অন্তত দশবৎসর সরকারী কাজে নিযুক্ত থাকিতে হইবে।

এই পরিষদগুলির প্রধান কার্য হইল সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ, উন্নতি ও শাস্তির ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা বিভিন্ন প্রকারের প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষাদ্বারা প্রার্থীদের নির্বাচন করেন। সরকারী কর্মচারীদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার দায়িত্বও তাঁহাদের উপরে ন্যস্ত। এই পরিষদের সহিত আলোচনা না করিয়া কোন কর্মচারীকে শাস্তি দেওয়া যাইবে না। সরকারের কোন আদেশের বিরুদ্ধে কোন কর্মচারীর আপত্তি থাকিলে এই পরিষদের নিকট সে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারে।

গণতন্ত্রে মন্ত্রীরা যাহাতে রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রভাবের বশবর্তী হইয়া

সরকারী কর্মচারী নিয়োগ না করেন, সেইজন্য এই পরিষদের পত্তন করা হয়। অভিজ্ঞ ও নিরপেক্ষ লোক লইয়া এই সমস্ত পরিষদ গঠিত। সর্বপ্রকার অন্যায় প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া নিরপেক্ষভাবে সরকারী কর্মচারী নিয়োগ এই পরিষদ দ্বারা সম্ভব। এই পরিষদের হস্তে নিয়োগের ভার থাকায় মন্ত্রীদেরও সুবিধা হয়। তাহা না হইলে চাকুরী দাও বলিয়া বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন তাঁহাদের জীবন দুর্বহ করিয়া তুলিত।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন

প্রত্যেক দেশেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলগুলির বিশেষ বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য একটি করিয়া আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান আছে। অতি আদিমকাল হইতে ভারতবর্ষে বহু উন্নতধরণের স্থানীয়প্রতিষ্ঠান ছিল। কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছেন যে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালে অনেকগুলি উত্তম শ্রেণীর পৌরসংঘ ছিল। গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই পঞ্চায়েৎগুলি গ্রামবাসীদের প্রয়োজনীয় বিষয় বন্দোবস্ত করিত, বিবাদের মীমাংসা করিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় ব্রিটিশ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানগুলির অবসান ঘটে।

ইংরাজেরা তাহাদের দেশের ধরণে সবপ্রথম ১৬৮৭ সালে স্থানীয় শাসন-সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করে। এই বৎসর ব্রিটিশ অধিকৃত মাদ্রাজ শহরে একটি পৌরসংঘ স্থাপন করা হয়। এই সংঘটি অবশ্য কেবলমাত্র মনোনীত সদস্য লইয়া গঠিত ছিল। ১৭২৬ সালের সনন্দ অনুসারে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলিকাতায় একটি করিয়া মহানাগরিকের আদালত (Mayor's court) প্রতিষ্ঠা হয়। ইহাদের কিছু বিচারক্ষমতা দেওয়া হয়। পরে ১৮৪২ ও ১৮৫০ সালে যে কোন শহরে বা শহরতলীতে পৌরসংঘ স্থাপনের জন্য আইন প্রণয়ন করা হইল। এই সমস্ত পৌরসংঘ মনোনীত সদস্য লইয়া গঠিত ছিল। ১৮৭০ সালে গভর্ণর-জেনারেল লর্ড মেয়ো প্রস্তাব করেন যে, এই সমস্ত স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের নিবাচন করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক। তদনুসারে ১৮৭২-৭৪ সালে, কোন কোন পৌরসংঘে কয়েকজন করিয়া সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইল। কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের দুইতৃতীয়াংশ সভ্য ও বোম্বাই ও মাদ্রাজ পৌরপ্রতিষ্ঠানের অর্ধেকসংখ্যক সভ্য নির্বাচিত হইত। বোম্বাই-এ পৌরপ্রতিষ্ঠানের সভ্যেরা নিজেদের প্রতিষ্ঠানপতি নির্বাচিত করিত। মাদ্রাজ ও কলিকাতার প্রতিষ্ঠানপতি সরকার কর্তৃক মনোনীত হইতেন।

১৮৮২ সালে রাষ্ট্রপাল লর্ড রিপন প্রস্তাব করেন যে, আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলি

স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে আরও অধিক সংখ্যায় স্থাপন করা হউক। তাঁহার মতে ইহার ফলে দেশের জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাধারণ শিক্ষার বিস্তার হইবে। পর পর আইন প্রণয়ন করিয়া আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল ও বে-সরকারী সভাপতি নির্বাচিত করিবার অধিকার তাহাদের দেওয়া হইল।

১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইনে এই প্রতিষ্ঠানগুলির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব প্রাদেশিক মন্ত্রীদের হস্তে ন্যস্ত করা হইল। বিভিন্ন প্রদেশে এই বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা হয়। ভোটাধিকার অনেক বিস্তৃত করা হইল এবং প্রায় সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজেদের সভাপতি নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হইল। কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করা হইল। ১৯৪২ সালে বোম্বাই শহরের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদেরই পৌরপ্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে ভোট দিবার অধিকার দেওয়া হইল।

আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের সংগঠন (Organisation of Local Bodies): এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে গ্রাম্য ও পৌর, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানগুলি (যেমন পঞ্চায়েৎ, জেলাসংঘ প্রভৃতি) গ্রামাঞ্চল ও জেলার কার্য পরিচালনা করে। পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি (যেমন পৌরসভা, সেনানিবাসসংঘ প্রভৃতি) শহরে প্রতিষ্ঠিত। পৌরসভা দুই শ্রেণীর আছে। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বড় শহরের সভাকে পৌরপ্রতিষ্ঠান ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র শহরের প্রতিষ্ঠানকে পৌরসভা বা মিউনিসিপালিটি বলে। যে সমস্ত অঞ্চলে সেনানিবাস আছে, তাহাদের কার্য পরিচালনার জন্য সেনানিবাসসংঘ আছে। গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানগুলিও তিন শ্রেণীর, জেলাসংঘ, লোকাল বোর্ড ও পঞ্চায়েৎ। জেলাসংঘ সমস্ত জেলার কার্য পরিদর্শন করে। লোকাল বোর্ড বা তালুক বোর্ড মহকুমায় বা তালুকে প্রতিষ্ঠিত। কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি করিয়া গ্রামপঞ্চায়েৎ আছে।

কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠান (Calcutta Corporation): বর্তমানে পৌরপ্রতিষ্ঠান মোট ৮১ জন সভ্য লইয়া গঠিত; তাহার মধ্যে ৭৬ জন কাউন্সিলার ও ৫ জন অলডারম্যান। ৭৫ জন কাউন্সিলার বিভিন্ন সাধারণ কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত। কলিকাতা নগরোন্নতি বিধায়ক প্রতিষ্ঠানের (Calcutta Improvement Trust) সভাপতিও একজন কাউন্সিলার। সাধারণত

পৌরপ্রতিষ্ঠানের করদাতাগণ ও যাহারা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করিয়াছে তাহারাই নির্বাচনে ভোট দিবার অধিকারী। ৭৬ জন কাউন্সিলার নির্বাচনের পর প্রথম সভায় ৫ জন অল্ডারম্যান নির্বাচিত করেন। তিনবৎসর পর পর এই সভার নির্বাচন হইত। সকল সভ্যেরা নিজেদের মধ্য হইতে প্রত্যেক বৎসর একজন মহানাগরিক (Mayor) ও উপমহানাগরিক নির্বাচন করেন। মহানাগরিক সভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন, ও তাঁহার অবর্তমানে উপ-মহানাগরিক সভাপতি হন। মহানাগরিককে তাঁহার কার্যের জন্য বেতন দেওয়া হয় না বটে, কিন্তু শহরের প্রথম নাগরিক হিসাবে তাঁহাকে প্রচুর সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

পৌরপ্রতিষ্ঠানের সভ্যগণ সভার সাধারণ নীতি নির্ধারণ করে। এই নীতি কার্যে পরিণত করিবার দায়িত্ব পৌরপ্রতিষ্ঠানের মুখ্যনির্বাহকের (Chief Commissioner)। তাঁহার নীচে দুইজন উপ-মুখ্যনির্বাহক, একজন মুখ্য বাস্তুকার (Chief Engineer), একজন স্বাস্থ্যাধিকারক (Health Officer), কর্মসচিব ও অন্যান্য কর্মচারী আছেন। মুখ্যনিবাহককে রাজ্যের গভর্ণমেণ্ট রাষ্ট্রভৃত্যনিয়োগপরিষদের সুপারিশমত নিয়োগ করেন। তাঁহার কার্যকাল পাঁচবৎসর। তিনি পৌর-প্রতিষ্ঠানের মতানুযায়ী কার্য পরিচালনা করেন। অন্যান্য কর্মচারীদের সকলকেই পৌরপ্রতিষ্ঠান নিয়োগ করে। অবশ্য উচ্চপদস্থ কমচারীদের নিয়োগ সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষ।

কাজের সুবিধার জন্য প্রতিষ্ঠানের সাতটি স্ট্যাণ্ডিং কমিটি বা স্থায়ী-সমিতি আছে। প্রত্যেক কমিটি ৯ হইতে ১২ জন সভ্য লইয়া গঠিত এবং বৎসরের প্রারম্ভে এই সভ্যদের নির্বাচন করা হয়। কমিটিগুলি এক বা একাধিক বিভাগের কার্য পরিদর্শন করেন। বিভাগীয় সববিষয় প্রথমে কমিটিতে পেশ করা হয় ও কমিটি কর্তৃক আলোচনান্তে পৌরপ্রতিষ্ঠানের অধিবেশনে উপস্থিত করা হয়।

কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের কাজঃ পৌরপ্রতিষ্ঠানকে অনেক প্রকারের কাজ করিতে হয়। শহরের রাস্তা, উদ্যান প্রভৃতি নির্মাণ ও সংরক্ষণ করা, রাস্তায় আলো দেওয়া ও পরিষ্কার রাখিবার ব্যবস্থা করা পৌরপ্রতিষ্ঠানের কাজ। পানীয় জল ও অপরিষ্কার জল সরবরাহের কাজও এই সভা করিয়া থাকে। শহর হইতে জল ও ময়লা নিষ্কাষণের ব্যবস্থা ইহাকেই করিতে হয়।

শহরে কিভাবে গৃহ নির্মাণ করা হইবে, সে সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠান নিয়মকানুন প্রবর্তন করে। ইহার অনুমোদন ব্যতীত কোন গৃহই নির্মাণ করা যায় না। ইহা ছাড়া শহরের মধ্যে নাগরিকদের সুবিধার জন্য পৌরপ্রতিষ্ঠান বড় বড় বাজার প্রতিষ্ঠা করে; পশুহত্যাশালা স্থাপন করে; শহরবাসীদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য হাসপাতাল ও চিকিৎসালয় স্থাপন করে ও তাহাদের অর্থ সাহায্য করে। শহরে যাহাতে সংক্রামক ব্যাধি না ছড়াইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা করে। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি ব্যাধির বিরুদ্ধে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থাও ইহাকে করিতে হয়। বাজারে যাহাতে পচা খাবার বিক্রয় না হয়, সেদিকে পৌরপ্রতিষ্ঠান তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। আগুন নিভাইবার জন্য সভার একটি অগ্নিনির্বাণবাহিনী আছে। ইহাকে শহরস্থিত লোকের জন্ম ও মৃত্যুর নিবদ্ধ রাখিতে হয়, শ্মশান ও গোরস্থান স্থাপন ও সংরক্ষণ করিতে হয়। প্রতিষ্ঠানের একটি বিশিষ্ট কাজ হইতেছে, নাগরিকদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করা। এই উদ্দেশ্যে বহু পৌর-প্রতিষ্ঠান অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছে ও বিভিন্ন গ্রন্থাগারকে অর্থ সাহায্য করে। দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে সাহায্যের জন্য সম্পূর্ণ দেশী জিনিষপত্র লইয়া ইহা একটি বাণিজ্যিক মিউজিয়ামও স্থাপন করিয়াছে।

পৌরপ্রতিষ্ঠানের আয় ও ব্যয়ঃ এই সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে করিতে অনেক অর্থের প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠান নিম্নলিখিত উপায়ে এই অর্থ সংগ্রহ করে। শহরস্থিত সমস্ত জমি ও গৃহের বাৎসরিক আয়ের উপর নির্দিষ্ট হারে কর ধার্য করা হয়। এই কর জমি, গৃহের মালিক ও দখলকারের নিকট হইতে সমান হারে আদায় করা হয়। দ্বিতীয়ত, যাহারা কোন বিশেষ বৃত্তি বা ব্যবসায় করে, প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে তাহাদের সনদ লইতে হয়। সনদ দিবার সময় প্রতিষ্ঠান ইহাদের নিকট হইতে নির্দিষ্ট হারে অর্থ আদায় করে। তৃতীয়ত, গরু, কুকুর, গরুর গাড়ি ও অন্যান্য যানবাহনের মালিকদের উপরও কর ধার্য করা আছে। মোটর গাড়ীর উপর যে কর ধার্য আছে তাহা রাজ্যসরকার আদায় করে ও ইহার একটি অংশ প্রতিষ্ঠানকে দেয়। ইহা ছাড়া পৌর-বাজার ও প্রতিষ্ঠান অন্যান্য সম্পত্তি হইতেও আয় করে। বিশেষ বিশেষ ব্যয় মিটাইতে প্রতিষ্ঠান রাজ্যসরকারের অনুমতি লইয়া ঋণ গ্রহণ করে। ইহার মোট আয় প্রতি বৎসর আড়াই কোটি টাকারও অধিক।

এই অর্থ বিভিন্ন বিভাগের কার্য সম্পাদনের জন্য ব্যয় হয়। প্রতিষ্ঠানের

অধিকারিক ও করনিকদের বেতন ও ভাতা দিতে হয়। রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণে ও আলো দিতে কিছু টাকা ব্যয় করিতে হয়। পানীয় জলের বন্দোবস্তের জন্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য ও হাসপাতাল, চিকিৎসালয়-গুলিকে অর্থ সাহায্য করিতে অনেক অর্থ ব্যয় হয়।

পৌরপ্রতিষ্ঠানের উপর রাজ্যসরকারের কিছু কিছু ক্ষমতা আছে।

পৌরসংঘ বা মিউনিসিপালিটিঃ প্রত্যেক শহরে একটি করিয়া পৌর-সংঘ আছে। কোন সংঘে কত সভ্য থাকিবে, তাহা রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট হয়। তবে নয় জনের কম ও তিরিশ জনের অধিক সভ্য থাকিবে না। সভ্যদের সকলেই করদাতাগণের ভোটে নির্বাচিত। যুক্ত নির্বাচনের প্রথানুযায়ী সবসম্প্রদায়ের ভোটে সভ্যদের নির্বাচিত করা হয়। অবশ্য পৌরসংঘে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকে। প্রত্যেক সংঘের আয়ুষ্কাল সাধারণত চারি বৎসর। তবে সরকার ইচ্ছা করিলে ইহা আর এক বৎসব বাড়াইতে পারে। সভ্যগণ একজন পৌরসংঘপাল (Chairman) ও এক বা দুই জন উপপৌর-সংঘপাল (Vice-Chairman) নির্বাচন করেন। পৌরসংঘপালের কাজ হইতেছে সভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করা, এবং সভ্যদের অধিকাংশের মতানুযায়ী পৌরশাসনকার্য পরিচালনা করা। যে সমস্ত পৌরসংঘের বাৎসরিক আয় ১ লক্ষ টাকার অধিক, সরকার তাহাদিগকে একজন মহানির্বাহী আধিকারিক বা চিফ এক্‌জিকিউটিভ্‌ অফিসার নিয়োগ করার নির্দেশ দিতে পারে। পৌরসংঘ একজন কর্মসচিব (Secretary), স্বাস্থ্যতত্ত্বকারিক (Health Officer), বাস্তুকার (Engineer), স্বাস্থ্যপরিদর্শক (Sanitary Inspector) ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করে। কোন কোন বিষয়ের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য স্থায়ী সমিতি (Standing Committee) গঠন করিতে পারে।

পৌরসংঘের কার্য (Functions of Municipalities) : পৌরসংঘকে নানা প্রকারের কাজ করিতে হয়। সর্বসাধারণের জন্য রাস্তাঘাট ও উদ্যান নির্মাণ, এবং সংরক্ষণ তাহাদের করিতে হয়। ইহাবা রাস্তার আলো দিবার ব্যবস্থা করে। নলকূপ, পুষ্করিণী কিংবা জলের কল করিয়া শহরবাসীদের পানীয় জল সরবরাহ করে। কি প্রকারে গৃহ নির্মাণ করা হইবে, সে বিষয়ে পৌরসংঘ বিধান নির্দেশ করে। শহর হইতে ময়লা নিষ্কাশনের ও

প্রতি গৃহ হইতে মল নিষ্কাশনের যথোচিত ব্যবস্থা করাও ইহাদের কর্তব্য। শহরে আগুন নিভাইবার ব্যবস্থা রাখা, জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার জন্য টিকা দেওয়ার ও সংক্রামক ব্যাধির সংক্রামণ বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করা, হাসপাতাল, ডাক্তারখানা স্থাপন, ধাত্রী ও দাই নিয়োগ করা প্রভৃতি পৌরসংঘের অবশ্য করণীয় কার্য। ইহারা খাদ্য ও ঔষধ বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করে, খারাপ খাদ্যের বিক্রয় বন্ধ করে। ইহাদের আর একটি কাজ হইতেছে জন্ম মৃত্যুর হিসাব রাখা, শ্মশান ও গোরস্থান স্থাপন ও সংরক্ষণ করা। শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা, গ্রন্থাগার ও যাদুঘর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান-গুলিকে অর্থ সাহায্য করাও পৌরসংঘের কাজ।

পৌরসংঘের আয় (Sources of Revenue of Municipalities) : পৌরসংঘের কার্যের জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে ইহারা শহরবাসী ও জমির মালিকের উপর কর ধার্য করে। জমি ও বাড়ী হইতে প্রাপ্ত, বা আনুমানিক বাৎসরিক আয়ের উপর এই কর বসান হয়। ইহা ছাড়া জলের জন্য, রাস্তার আলোর জন্য ও ময়লা নিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য বাড়ী ও জমির উপর কর ধার্য করা হয়। ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী ও অন্যান্য যানবাহনের উপর শুল্ক বসাইয়াও পৌরসংঘ অর্থ সংগ্রহ করে। গৃহপালিত কুকুর ও অন্যান্য পশুর জন্য মালিকদের পৌরসংঘের নিকট হইতে লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র লইতে হয় এবং সেজন্য কিছু অর্থ দিতে হয়। ব্যবসায়ীদের, উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি বৃত্তিধারীদের নিকট হইতে অনুমতিপত্র বাবদ পৌরসংঘ টাকা আদায় করে। ফেরী পারাপারের ব্যবস্থা করিয়া, সেতু নির্মাণ করিয়া, তাহার উপর দিয়া গমনাগমনকারী লোক ও যানবাহনের উপর কর ধার্য করিয়াও পৌরসংঘের অর্থাগম হয়। পৌরবাজার ও পশুহত্যাশালা প্রভৃতি পৌরসম্পত্তি হইতে তাহাদের কিছু আয় হয়। উত্তরপ্রদেশ ও অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে শহরে আনীত ও বহির্গত দ্রব্যের উপর 'অক্‌ট্রয়' বা পুরশুল্ক ধার্য করা হয়। বাংলা দেশের কোন শহরে এইরূপ ব্যবস্থা নাই। অনেক সময়ে রাজ্য সরকার বিশেষ বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য পৌরসংঘকে অর্থ সাহায্য করেন এবং সরকার অনুমতি দিলে পৌরসংঘ সাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া ব্যয় নির্বাহ করে।

ব্যয় (Expenditure of Municipalities) : এইরূপ নানাপ্রকার কর

ধার্য করিয়া যে অর্থাগম হয়, পৌরসংঘের বিভিন্ন বিভাগের কার্য পরিচালনার জন্য তাহা ব্যয় করা হয়। রাস্তাঘাট নির্মাণ ও জল সরবরাহ, ময়লা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, স্কুল, গ্রন্থাগার ও যাদুঘর, হাসপাতাল, ডাক্তারখানা ও অন্যান্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া, শ্মশান ও গোরস্থান সংরক্ষণ প্রভৃতি কার্যবাবদ পৌরসংঘ অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে।

সেনানিবাসসংঘ (Cantonment Board): যে সমস্ত অঞ্চলে সেনানিবাস আছে সেখানে একটি করিয়া সেনানিবাসসংঘ আছে। সরকারী ও দেশরক্ষা বিভাগের কয়েকজন কর্মচারী লইয়া এই সংঘগুলি গঠিত হয়। ইহারা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন।

গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান (Rural Self-Government): গ্রামাঞ্চলের জন্য তিন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান আছে। সমগ্র জেলার জন্য একটি জেলাবোর্ড গঠন করা হয়। তাহাদের অধীনে মহকুমায় কিংবা তালুকে একটি করিয়া লোকাল বোর্ড বা তালুক বোর্ড আছে এবং সর্বনিম্নে কয়েকটি করিয়া গ্রাম লইয়া ইউনিয়ন বোর্ড বা পঞ্চায়েৎ সংঘ আছে। আসামে জেলাবোর্ড নাই। তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে লোকাল বোর্ডগুলি। বোম্বাই প্রদেশে তালুক বোর্ড তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাংলা দেশেও লোকাল বোর্ড তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

জেলাবোর্ড (District Board): আসাম ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশে প্রত্যেক জেলাতে একটি করিয়া জেলাবোর্ড আছে। প্রত্যেক বোর্ড কতজন সভ্য লইয়া গঠিত হইবে, তাহা সরকার নির্দিষ্ট করিয়া দেন। কিন্তু সভ্যসংখ্যা নয় জনের কম কখনও হইবে না। সভ্যগণ সকলেই নির্বাচিত হয়। বোর্ডের আয়ুষ্কাল চারি বৎসর। সভ্যেরা একজন সভাপতি ও এক কিংবা দুইজন সহ-সভাপতি নির্বাচিত করে। সভাপতির কাজ হইতেছে জেলাবোর্ডের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করা এবং বোর্ডের কার্য পরিচালনা করা। তিনি বোর্ডের কর্মকর্তা। প্রত্যেক বোর্ডের একজন করিয়া কর্মসচিব, বাস্তুকার ও অন্যান্য কর্মচারী থাকে। এই সমস্ত কর্মচারীদের সাহায্যে সভাপতি বোর্ডের কার্য পরিচালনা করেন।

বোর্ডের কার্য (Functions of District Board): জেলার ভিতরে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণ ও তাহাদের সংরক্ষণ

বোর্ডের প্রধান কার্য। দ্বিতীয় কার্য হইতেছে গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্যে বোর্ড গ্রামে গ্রামে নলকূপ ও পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করে, কিংবা যাহারা খনন করিতে চায় তাহাদের অর্থ সাহায্য করে। গ্রামের লোকের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বোর্ড হাসপাতাল, ডাক্তারখানা ইত্যাদি স্থাপন করে; টিকা দিবার ও অন্যান্য রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির সঞ্চারণের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থাবলম্বন, ম্যালেরিয়া নিবারণ, দাই ও ধাত্রী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা, প্রভৃতি জনস্বাস্থ্যোন্নতির কার্য বোর্ডের অবশ্য কর্তব্য। তাহারা পশুচিকিৎসার ব্যবস্থা করে ও সেইজন্য পশুচিকিৎসালয় স্থাপন করে। জেলাতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে বোর্ড হইতে সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষাবিস্তার বোর্ডের একটি প্রধান কার্য। বোর্ড প্রাথমিক ও মধ্য বিদ্যালয় ও শিল্পবিদ্যালয়-গুলিকে অর্থ সাহায্য করে, টোল ও মক্তবস্থাপনে সহায়তা করে। ইহা ছাড়া বোর্ড নানাপ্রকারের কাজ করে। যথা, ডাকবাংলো ও অন্যান্য সাধারণের ব্যবহার্য গৃহ-নির্মাণ ও সংরক্ষণ করে; নদী পারাপারের জন্য খেয়া ও গরুর জন্য খোয়াড়ের ব্যবস্থা করে। জেলাবোর্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেলপথ নির্মাণের জন্য রেল কোম্পানীকে অর্থ সাহায্য করে।

বোর্ডের আয় (Sources of Revenue of District Boards): বোর্ডের আয়ের প্রধান উপায় হইতেছে রোড সেস্ বা কর। প্রত্যেককে জমির খাজনার উপরে টাকা প্রতি কয়েক পয়সা হিসাবে এই কর দিতে হয়। দ্বিতীয়ত, গরুর খোয়াড় হইতে কিছু আয় হয়। আয়ের তৃতীয় পন্থা হইতেছে ফেরী চলাচল ব্যবস্থা, রাস্তা এবং সেতুবাবদ ধার্য শুল্ক। ইহা ছাড়া হাসপাতাল ও ডাক্তারখানা প্রভৃতি হইতেও কিছু অর্থাগম হয়। সরকার বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে বোর্ডগুলিকে অর্থ সাহায্য করে এবং বোর্ড ইচ্ছা করিলে সরকারের অনুমতি লইয়া ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। হাওড়া জেলাবোর্ড রেল হইতে লাভের অংশবাবদ কিছু অর্থ লাভ করে।

ব্যয় (Expenditure of District Boards): উপরিউক্ত পন্থাগুলি হইতে যে আয় হয় তাহা বোর্ডের কার্য পরিচালনায় ব্যয় হয়। বোর্ডের কার্য কি, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বাংলা দেশে বোর্ডের আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য, ১৭ ভাগ রাস্তাঘাট নির্মাণ ও

সংরক্ষণের জন্য, ১৪ ভাগ শিক্ষা বিস্তারের জন্য, ৫ ভাগ পানীয় জলের বন্দোবস্তের জন্য এবং ৪-৬ ভাগ বোর্ডের অফিস বা করণ চালাইতে খরচ হয়। বাকী সমস্ত টাকা খোয়াড়, জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা, দুর্ভিক্ষের সময় সাহায্য, পশু চিকিৎসা প্রভৃতি কার্যে ব্যয় হয়।

লোকাল বোর্ড: প্রায় প্রত্যেক মহকুমার একটি লোকাল বোর্ড আছে বা ছিল। অন্তত ছয়জনের অধিক সভ্য লইয়া এই বোর্ড গঠিত এবং তাহাদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত ও অবশিষ্ট মনোনীত সদস্য হইত। সদস্যেরা একজন সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচন করে। বোর্ডের নিজের কোন ক্ষমতা নাই। জেলাবোর্ড তাহাদের যে কার্যের ভার দেয়, সেই কার্য তাহারা করে; এবং ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জেলাবোর্ড দেয়। বর্তমানে বিভিন্ন জেলায় লোকাল বোর্ড তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আসামে লোকাল বোর্ডগুলি জেলাবোর্ডের স্থান অধিকার করে।

ইউনিয়ন বোর্ড বা পঞ্চায়েৎ সভা: কয়েকটি গ্রাম হইতে নির্বাচিত সভ্য লইয়া এই পঞ্চায়েৎ সভা গঠিত হয়। ইহাদের সভ্যসংখ্যা ছয়জনের কম নহে ও নয়জনের অধিক নহে। সমস্ত সভ্যেরাই নির্বাচিত হয়। প্রত্যেক সভা একজন করিয়া "সরপঞ্চ" অথবা সভাপতি নির্বাচন করে। তিনি পঞ্চায়েতের কর্মকর্তা এবং এক বা একাধিক কর্মচারীর সাহায্যে গ্রামের বিভিন্ন কার্য পরিচালনা করেন। এই সমস্ত পঞ্চায়েৎসভার কার্য পরিদর্শন করিবার জন্য মণ্ডলঅধিকারিক (Circle Officer) নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সভাগুলির আয়ব্যয় পরীক্ষা করেন।

পঞ্চায়েতের কার্য (Functions of Union Boards): জেলাবোর্ড সমস্ত জেলাতে যে যে কাজ করে, পঞ্চায়েৎ সভা গ্রামগুলির জন্য সেই কাজ করে। গ্রামের মধ্যে রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণ এবং সংরক্ষণ, নলকূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করিয়া পানীয় জলের বন্দোবস্ত, ডাক্তারখানা প্রভৃতি স্থাপন করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতি করা পঞ্চায়েতের কার্য। গ্রামে শান্তিরক্ষার জন্য চৌকিদার ও দফাদারদের মাহিনা পঞ্চায়েতকে দিতে হয়। গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা পঞ্চায়েতের কর্তব্য। জন্মমৃত্যুর হিসাব রক্ষা এবং পশুচিকিৎসার ব্যবস্থাও পঞ্চায়েৎ করিয়া থাকে। কুটির শিল্পগুলির উন্নতিকল্পে যথোচিত

ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং জেলাবোর্ড যে যে কাজের ভার দেয়, তাহার সম্যক পরিচালনা করা পঞ্চায়েতের কর্তব্য। ইহা ছাড়া অনেক পঞ্চায়েৎসভা ছোট ছোট ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচার করে।

আয় (Sources of Revenue and Expenditure of Union Boards): চৌকিদারী ট্যাক্স নামে পরিচিত যে কর ধার্য আছে তাহাই পঞ্চায়েৎসভার আয়ের প্রধান উপায়। এই কর গ্রামবাসীদের গৃহ ও জমির উপর ধার্য করা হয়। কোন করদাতার নিকট হইতে বৎসরে ৮৪ টাকার অধিক কর লওয়া যাইবে না। সভার আয়ের তিনচতুর্থাংশ এই কর হইতে লভ্য। গ্রামস্থ খোয়াড় ও ফেরী হইতেই সভার কিছু অর্থাগম হয়। মামলার ফিস্ ও আসামীদের জরিমানা বাবদও কিছু টাকা সভার হস্তে আসে। ইহা ছাড়া জেলাবোর্ড ও সরকার পঞ্চায়েৎসভাগুলিকে অর্থ সাহায্য করে।

আয়ের বেশী অংশ চৌকিদার ও দফাদারকে মাহিনা দিতেই খরচ হইয়া যায়। শতকরা ৫০ ভাগ এই কার্যে ব্যয় হয়। ২৬ ভাগ অর্থ ব্যয় হয় রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণের জন্য এবং স্কুল, ডাক্তারখানা, পানীয়জল সরবরাহ ইত্যাদির জন্য। খোয়াড় ও খেয়া পারাপারের ব্যবস্থার জন্য, এবং পঞ্চায়েতী আদালতের ব্যয় নির্বাহের জন্য বাকী টাকা খরচ হয়।

আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত সরকারের সম্বন্ধ (Relation between the local bodies and the state government): সাধারণত, আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। ইহাদের অধিকাংশ সদস্যই নির্বাচিত, এবং সদস্যদের মতানুযায়ী কার্যপরিচালনা করা হয়। ইহারাই নিজেদের প্রধান কর্মকর্তা নির্বাচিত করে। রাজ্য সরকার এই সমস্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না।

কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে রাজ্য সরকার নিজহস্তে নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা রাখিয়াছে। যেমন, প্রতিষ্ঠানগুলির মোট সভ্যসংখ্যা কত হইবে, এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য কত আসন সংরক্ষিত থাকিবে, তাহা সরকার নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে কিয়দংশ সভ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হইত। অত্যন্ত জরুরী কারণ উপস্থিত হইলে, সরকার কোন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি (বা প্রধান কর্মকর্তা) নিযুক্ত করেন। ভুক্তিপতি অর্থাৎ কমিসনার, এবং জেলাশাসক, কিংবা তাঁহাদের মনোনীত কোন কর্মচারী, ইহাদের স্থাবর

সম্পত্তি থাকিলে তাহা পরিদর্শন করিতে পারেন। যদি কোন প্রতিষ্ঠান এমন কোন আদেশ বা প্রস্তাব করে, যাহা ইহার ক্ষমতার বহির্ভূত, কিংবা যাহার ফলে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে, তবে ভুক্তিপতি বা জেলাশাসক তাহা নাকচ করিয়া দিতে পারেন। রাজ্য সরকার যদি কোন সময়ে দেখিতে পায় যে, কোন প্রতিষ্ঠান বহুদিন ধরিয়া তাহার কর্তব্যকার্যে অবহেলা করিতেছে, কিংবা ইহার কার্যে গুরুতর বিশৃংখলা উপস্থিত হইয়াছে, তবে সেই প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করিয়া দিবার ক্ষমতা সরকারের হস্তে রহিয়াছে।

অবশ্য কলিকাতা প্রভৃতি বড় শহরের পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা অধিক। ইহারা অনেক বেশী পরিমাণে স্বায়ত্তশাসনক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

অন্যান্য আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান: উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যতীত বিশেষ বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য অন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে। নীচে তাহাদের বর্ণনা দেওয়া হইতেছে।

কলিকাতা নগরোন্নতিবিধায়ক প্রতিষ্ঠান (Calcutta Improvement Trust): এই প্রতিষ্ঠানটির কার্য হইতেছে কলিকাতা শহর ও শহরতলীর বিভিন্নপ্রকারের উন্নতি করা। একজন সভাপতি ও ১০ জন সদস্য লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত। সভাপতি ও ৪ জন সদস্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়। চারিজন কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত ও বাকী দুইজন বিভিন্ন বণিকসমিতি কর্তৃক মনোনীত হয়। শহরস্থিত বস্তি অঞ্চলগুলি ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া স্বাস্থ্যকর গৃহনির্মাণ, নূতন বিস্তৃত রাস্তা, নগরোদ্যান ও খেলার মাঠ প্রভৃতি নির্মাণ ও শহরতলীর অঞ্চলের উন্নতি করা এই প্রতিষ্ঠানের কার্য। ইহাকে কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠান অর্থ সাহায্য করে। এই প্রতিষ্ঠান জমিবিক্রয় করিয়া কিছু আয় করে এবং প্রয়োজন হইলে জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে।

কলিকাতা-বন্দর-রক্ষক-প্রতিষ্ঠান (Calcutta Port Trust): কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিশখাপত্তম প্রভৃতি বড় বড় বন্দরগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি করিয়া বন্দর-রক্ষক-প্রতিষ্ঠান আছে। কলিকাতায় ২৪ জন বন্দরপাল লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত। তাহাদের মধ্যে ১১ জন বিভিন্ন বণিকসভা কর্তৃক নির্বাচিত হয়। কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠান ও হাওড়া পৌরসংঘ

প্রত্যেকে একজন করিয়া বন্দরপাল নির্বাচিত করে। রাজ্য সরকার একজনকে নিযুক্ত করে ও অবশিষ্ট সভ্যগণ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়। বন্দর রক্ষণাবেক্ষণ করা, জেটি, ডক, মালগুদাম প্রভৃতি নির্মাণ ও সংরক্ষণ করা, সমুদ্র হইতে বন্দরাভিমুখী জাহাজগুলিকে পথ প্রদর্শন করা, প্রয়োজন মত ফেরী স্টীমার দ্বারা নদী পারাপারের ব্যবস্থা করা এই প্রতিষ্ঠানের কার্য। ব্যয়নির্বাহের জন্য এই প্রতিষ্ঠান বন্দরাগত জাহাজগুলির নিকট হইতে অল্প হারে শুল্ক আদায় করে, এবং গুদাম ভাড়া দিয়াও কিছু আয় করে।

আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলির গুণাগুণ বিচার (Merits and defects of Local bodies) : পৌরসংঘ, জেলাবোর্ড, গ্রাম্যপঞ্চায়েৎ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এদেশে বহু দিন ধরিয়া আছে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান বিশেষ সফলতার সহিত কাজ করিতেছে। বহু অঞ্চলে ইহারা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন, চিকিৎসার সুব্যবস্থা, এবং পানীয় জল-সরবরাহ উন্নতি করিয়াছে। জনকল্যাণের আদর্শদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া অনেক প্রতিষ্ঠানই নিজেদের গ্রাম অথবা শহরের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, এই প্রতিষ্ঠানগুলির সাফল্য আশানুরূপ হয় নাই। সব সময়ে উপযুক্ত লোককে সদস্য হিসাবে নির্বাচন করা হয় নাই। তাহার ফলে বহু ত্রুটি দেখা দিয়াছে। সদস্যেরা নিজেদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্য হইতে এই প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মচারী নিয়োগ করিয়াছে। তাহারা যে সব সময়ে এই সকল কর্মের উপযোগী গুণসম্পন্ন তাহা নহে। কর্মচারীদের বিচক্ষণতার অভাব থাকিলে শাসনকার্যের ব্যর্থতা সুনিশ্চিত। নিজেদের দলের বা সমর্থকদের সুবিধার জন্য সদস্যেরা প্রায়ই প্রতিষ্ঠানের কার্যে হস্তক্ষেপ করে; অন্যায় অথবা বেআইনি কার্যের প্রশ্রয় দেয়। প্রায়ই দেখা যায় যে, সদস্যেরা নিজেরাই নিয়মিত সময়ে কর দেয় না, বেআইনিভাবে গৃহ-নির্মাণ করে। এই বিষয়ে কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের দুর্নাম সর্বজনবিদিত।

ইহা ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যান্য অনেক গলদ রহিয়াছে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই তাহাদের আয়ের সামান্য অংশই গ্রামাঞ্চলের চিকিৎসার উন্নতির জন্য, অথবা শিক্ষা-বিস্তারের জন্য ব্যয় করে। গ্রামগুলির পানীয় জলের অভাব আজও ঘুচিল না। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি রোগের প্রকোপ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। বাংলা দেশে আজ প্রায় তিরিশ বৎসর হইল ইউনিয়ন

বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের অবস্থার উন্নতি বিশেষ কিছুই হয় নাই।

এই বিফলতার কারণ কি? অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যর্থতার মূলে রহিয়াছে দুইটি কারণ। প্রথমত, ইহাদের অর্থের অনটন। "দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী"। এই প্রতিষ্ঠানগুলির হস্তে যে সমস্ত কার্যের ভার দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। শিক্ষাবিস্তারই বল, অথবা স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে সুচিকিৎসার ব্যবস্থাই বল, অথবা পানীয় জলের জন্য নলকূপ ও পুষ্করিণী খননই বল, প্রত্যেকটি ব্যয়সাপেক্ষ। অথচ ব্যয়ের অনুপাতে আয়ের সম্যক ব্যবস্থা করা হয় নাই। ইহাদের যে সামান্য অর্থসংগ্রহ হয়, তাহা প্রয়োজনের তুলনায় সমুদ্রে শিশিরবিন্দুবৎ। এই সামান্য অর্থের অধিকাংশ অফিস চালাইবার জন্য, অথবা চৌকিদার, দফাদারের বেতন দিতেই খরচ হইয়া যায়। অনেকের মতে, এই দারিদ্র্যের জন্য মূলত দায়ী আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেরাই। ইহাদের সদস্যেরা নূতন নূতন কর ধার্য করিয়া আয় বাড়াইবার চেষ্টায় পরাঙ্মুখ। তাঁহারা মনে করেন যে, নূতন কর বসাইলে করদাতাগণ অসন্তুষ্ট হইবে, নির্বাচনের সময় তাঁহাদিগকে ভোট দিবে না।

দ্বিতীয় কারণ, নাগরিকের কর্তব্য সম্পাদনে জনসাধারণের উদাসীনতা। করদাতাগণ সব সময়ে উপযুক্ত প্রার্থীকে ভোট দেন না। দলগত স্বার্থের খাতিরে, অথবা অর্থের লোভে অসাধু লোককে সদস্য নির্বাচিত করিতে দ্বিধা করে না। দলাদলিপ্রিয়তা আমাদের চরিত্রের মহৎ দোষ।

দেশের মঙ্গলের জন্য এই ত্রুটিগুলির সংশোধন করা বিশেষ প্রয়োজন। আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলির সফলতার উপর দেশের উন্নতি অনেকটা নির্ভর করে। এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। প্রথমত, এই প্রতিষ্ঠানগুলির আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে। রাজ্য সরকারের কর্তব্য ইহাদের অধিক পরিমাণ অর্থ সাহায্য করা। প্রতিষ্ঠানগুলিরও কর্তব্য আয়ের নূতন পন্থা খুঁজিয়া বাহির করা। প্রয়োজন হইলে নূতন কর ধার্য করিতে হইবে। নাগরিকেরা প্রয়োজন মত কর দিতে রাজী না থাকিলে গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না। আমাদের উচিত অধিক পরিমাণে কর দেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে করলব্ধ অর্থের সদ্ব্যয়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা। পৌরপ্রতিষ্ঠান

ও বড় বড় পৌরসংঘগুলি গ্যাস কিম্বা বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া, অথবা বাস ও ট্রাম চলাচলের ভার লইয়া আয়বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে পারে। সবচেয়ে অধিক প্রয়োজন হইল, জনসাধারণের নাগরিক কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। এই উদ্দেশ্যে জনসাধারণকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। একমাত্র শিক্ষার দ্বারা এই অজ্ঞান অন্ধকার দূব করা যাইবে। নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলির সমস্যা

গ্রাম্যপ্রতিষ্ঠানের কর্তব্য (Civic Problems of Rural bodies) : ইংলণ্ড ও আমেরিকার অধিকাংশ লোকই শহরে বাস করে। কিন্তু ভারতবর্ষের শতকরা প্রায় ৮৮ জন লোক গ্রামে বাস করে। সুতরাং গ্রামবাসীদের সমস্যাকেই ভারতের সমস্যা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গ্রামগুলির উন্নতি না হইলে আমাদের দেশের প্রকৃত কোন উন্নতি হইবে না।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের গ্রামগুলি অতিশয় দুর্দশাগ্রস্ত। গ্রামবাসীদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই লেখাপড়া জানে না। তাহারা অত্যন্ত দরিদ্র। সুতরাং তাহাদের জীবনের মানও অতিনিম্ন। অনাহারে, অর্ধাসনে, বিবস্ত্র অবস্থায় অন্ধকার ভগ্ন গৃহে তাহাদের বাস। ফলে তাহাদের জীবনীশক্তি কমিয়া যায় ও তাহারা সহজেই রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। তাহাদের নিজেদেরও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান খুবই কম। বংশপরম্পরায় দারিদ্র্য তাহাদের নিষ্প্রাণ ও নিশ্চেষ্ট করিয়াছে। নিজেদের অবস্থার জন্য ভাগ্যকে দায়ী করিয়া তাহারা কোনরকমে পশুর ন্যায় জীবন যাপন করে।

ভারতের গ্রামবাসীরা না জাগিলে এ ভারত আর জাগিবে না। কিন্তু এই জাগরণ আনিতে হইলে সবপ্রথমে শিক্ষার জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা গ্রামবাসীদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিতে হইবে। সুতরাং গ্রাম্যপঞ্চায়েতের প্রথম কাজ হইবে, গ্রামে শিক্ষার বিস্তার করা। গ্রামে গ্রামে অন্তত অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করিতে হইবে। এই শিক্ষা বুনিয়াদী শিক্ষা বা নয়ী তালিম পদ্ধতি অনুসারে হইলে ভাল হয়। প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য রাত্রিতে স্কুল খুলিতে হইবে। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যা, কুটিরশিল্প সম্বন্ধীয় বিদ্যা ও যান্ত্রিক বিদ্যাদানের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। রাজ্য সরকার এবিষয়ে গ্রাম্যপঞ্চায়েৎগুলিকে প্রয়োজনমত অর্থসাহায্য করিবে।

ইহার পরবর্তী কর্তব্য হইতেছে গ্রামের লোকের স্বাস্থ্যোন্নতি করা। গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য মোটেই ভাল নয়। ইহার প্রমাণস্বরূপ কতকগুলি পরিসংখ্যান দেওয়া হইতেছে। গড়পড়তা মৃত্যুর হার আমাদের দেশে

সবচেয়ে বেশী। প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে হাজারজন পিছু ১২।১৩ জন, আমেরিকাতে ১৮ জন, আর ভারতে বৎসরে হাজার লোক পিছু ২২ জন লোক মারা যায়। প্রতি এক হাজার শিশুর মধ্যে অস্ট্রেলিয়াতে ৩৮ জন, আমেরিকাতে ৫৪ জন, ইংলণ্ডে ৫৮ জন ও আমাদের দেশে ১৬০ জন মারা যায়। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হইয়া গেল।

সুতরাং গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এইজন্য প্রথমে দরকার, গ্রামে উন্নতধরণের বাড়ী তৈয়ারী করা। গৃহসমস্যা অবশ্য শহরে অত্যন্ত প্রকট হইয়া দেখা দিয়াছে। কিন্তু গ্রামেও এ সমস্যা রহিয়াছে। সেখানকার বাড়ী অধিকাংশই মাটীর ঘর। আলো-হাওয়া যাহাতে কম ঢোকে সেইজন্য যেন ইচ্ছা করিয়াই এই বাড়ীঘর তৈয়ারী করা হইয়াছে। বাড়ীর আশে-পাশে সাধারণত অত্যন্ত অপরিষ্কার থাকে। বাড়ীর সমস্ত ময়লা নির্বিচারে রাস্তার উপর ফেলিয়া দেওয়া হয়। জল নিকাশের জন্য কোন ড্রেন বা নর্দমা নাই। ঘরের পাশেই ময়লাজল জমিতেছে, তাহা হইতে দুর্গন্ধ ছড়াইতেছে ও মশামাছির অবাধ জন্ম হইতেছে। ইহার ফলে স্বাস্থ্য খারাপ হইতে বাধ্য। গ্রামের রাস্তাগুলিও ভাল নয়; পাকা রাস্তা কমই আছে। প্রথমে, গ্রামোন্নতির একটি পরিকল্পনা তৈয়ারী করিতে হইবে। বড় বড় চওড়া রাস্তা এবং যথেষ্ট পরিমাণে আলো-হাওয়াযুক্ত বাড়ীঘর নির্মাণের জন্য গ্রামবাসীদের শিক্ষা দিতে হইবে। ময়লাজল নিকাশের জন্য উপযুক্ত নর্দমা তৈয়ারী করিতে হইবে এবং সেগুলি যাহাতে পরিষ্কার ও কার্যকরী থাকে, তাহার জন্য সচেষ্ট থাকিতে হইবে। ময়লা ডোবা অঞ্চলগুলি ভরাট করিয়া মশকজন্মের স্থান কমান দরকার। গ্রামবাসীরা যাহাতে বাড়ীঘর পরিষ্কার রাখে ও ঘরের ময়লা বাড়ী হইতে দূরে নির্দিষ্ট স্থানে নিক্ষেপ করে, সে বিষয়ে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে।

আজকাল অধিকাংশ গ্রামেই যথেষ্ট পরিমাণে ভাল পানীয় জল পাওয়া যায় না। গ্রামের অশিক্ষিত লোক সব সময়ে কোন জল ভাল ও কোন জল খারাপ, তাহা বিচার করিয়া ব্যবহার করে না। অনেক সময়েই তাহাদের ময়লাজল ব্যবহার করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। ইহার কারণ গ্রামের পুরাতন জলাশয়গুলি প্রায়ই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এবং তাহার স্থলে আজকাল আর নূতন পুষ্করিণী খনন করা হইতেছে না। নদী নালার

অধিকাংশই কচুরিপানাতে ভর্তি হইয়া গিয়াছে। গ্রামের পুরাতন জলাশয়গুলির উপযুক্ত সংস্কার অত্যন্ত প্রয়োজন। একাজ গ্রামবাসীরা নিজেরাই মিলিয়া মিশিয়া করিবে। গ্রামপঞ্চায়েৎ গ্রামে নূতন পুষ্করিণী বা নলকূপ খনন করিবে এবং অর্থাভাবে তাহা সম্ভব না হইলে জেলাবোর্ড বা রাজ্য সরকার তাহাদের উপযুক্ত অর্থসাহায্য করিবে। অজ্ঞ গ্রামবাসী যাহাতে পুকুরের জল নোংরা না করে, অথবা কলেরা ও অন্যান্য সংক্রামক রুগীর কাপড় পুকুরের জলে না ধোয়, সেইজন্য তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইবে। গ্রামবাসীরা যাহাতে স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান আহরণ করিতে পারে, তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। পঞ্চায়েৎ এই উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে গ্রামে স্বাস্থ্যপ্রদর্শণীর ব্যবস্থা করিবে। প্রদর্শনী দেখিয়া অজ্ঞ লোকেরা স্বাস্থ্যের নিয়ম জানিবার সুযোগ পাইবে। রোগের চিকিৎসার জন্য গ্রামে গ্রামে অধিক সংখ্যায় ঔষধালয় ও হাসপাতাল স্থাপন করিতে হইবে।

গ্রামের লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হইলে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইবে না। এই উদ্দেশ্যে যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, সেগুলি অবশ্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কর্তব্যকর্মের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু তাহারা পরোক্ষে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারে। গ্রামবাসীরা যাহাতে সমবায়সমিতি গঠন করিয়া তাহাদের অবস্থার উন্নতি করে, সে বিষয়ে উপযুক্ত প্রচারকার্য তাহারা চালাইতে পারে। গ্রামের লোকের জীবন অত্যন্ত একঘেয়ে, তাহাতে বৈচিত্র্য বিশেষ কিছু থাকে না। এজন্যও লোকে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। গ্রামবাসীদের জ্ঞান আহরণ করিবার সুযোগও খুব কম। পঞ্চায়েৎ ও জেলাবোর্ড গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার ও পাঠাগার খুলিতে পারে, সেখানে নানা বিষয়ের নূতন নূতন বই পড়ার সুযোগ গ্রামবাসীগণ পাইবে। সম্ভব হইলে ভাল ভাল যাত্রা ও নাটকের অনুষ্ঠান করিয়া গ্রামবাসীদের জীবনে বৈচিত্র্য আনিতে পারে। মোট কথা, আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করিলে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হইতে পারে।

শহরের পৌরসমস্যা (Civic Problems in Urban areas): গ্রাম ও শহরের সমস্যার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। কেবল শহরের সমস্যাগুলি গ্রাম্য সমস্যা হইতে বৃহৎ আকারে উপস্থিত হয়। আবার আর একদিক দিয়া

সুবিধা এই যে, শহরের লোকের অর্থসম্পদ্ অনেক বেশী ও শহরে অনেক বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোকের বাস। সুতরাং সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থাও সহজে করা যায়।

শহরের বড় সমস্যা হইতেছে গৃহের অভাব। আমাদের দেশের শহরগুলি আপনার খুশীতে আপনি গড়িয়া উঠিয়াছে। কোন বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী সেগুলি গঠন করা হয় নাই। ফলে রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী যেরূপ হওয়া উচিত, তাহা হয় নাই। লোকের তুলনায় ঘর বাড়ীর সংখ্যা কম। সেজন্য গরীব ও শ্রমিকদের বস্তিতে অন্ধকার ও অস্বাস্থ্যকর ঘরে বাস করিতে হয়। বস্তিগুলি সংক্রামক ব্যাধির আকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পৌরপ্রতিষ্ঠানের উচিত এই গৃহ সমস্যার সমাধান করা। আলো-হাওয়াযুক্ত ছোট ছোট বাড়া তৈয়ারী করিয়া অল্প টাকায় গরীব ও শ্রমিকদের ভাড়া দিতে হইবে। বস্তিগুলি ভাঙ্গিয়া তাহার স্থলে ভাল বাড়ী নির্মাণ করিতে হইবে। শহরের ঘনবসতি অপরিসর অঞ্চলগুলিতেও এই ব্যবস্থা করা উচিত। এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ অনুযায়ী একটি সুন্দর স্বাস্থ্যকর শহরের পরিকল্পনা ঠিক করিতে হইবে ও সেই অনুসারে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলগুলির উন্নতি বিধান করিতে হইবে। কলিকাতা, বোম্বাই ও অন্যান্য বড় বড় শহরে এ বিষয়ে কিছু কাজ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা প্রয়োজনের তুলনায় কম।

শহরের স্বাস্থ্যও ভাল নয়। কলিকাতায় বৎসরে হাজারে ২৭.৬ জন লোক ও বোম্বাইতে ২৫ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। অথচ অত বড় লণ্ডন শহরে হাজার করা মাত্র ১১.৪ জন লোক, নিউ ইয়র্কে হাজারে ১০ জন লোক মারা যায়। সুতরাং এই সব শহরের তুলনায় আমাদের দেশের শহরগুলির মৃত্যুর হার খুবই বেশী। পৌরপ্রতিষ্ঠানের এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। শহরের ঘন বসতি অঞ্চল ও বস্তিগুলি ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিলে এই সমস্যার অনেকটা সমাধান হইবে। রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখার দিকে নজর দিতে হইবে। কলিকাতার মত নোংরা শহরে রোগ হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করাও শহরের একটি অতি গুরুতর সমস্যা। বড় বড় শহরে অবশ্য জলের কল আছে। কিন্তু লোকসংখ্যা ও প্রয়োজনের তুলনায় জলের সরবরাহ কম করা হয়। আর এবিষয়ে আমাদেরও যথেষ্ট দোষ রহিয়াছে। আমরা জলের অপব্যবহার করি ও অপচয় করি।

জলের প্রয়োজন না থাকিলেও অনেক সময় কল খুলিয়া রাখি। জল পড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। ফলে অন্যেরা কম জল পায়।

শহরের আর একটি সমস্যা হইতেছে খাঁটি দুধের সরবরাহ। কলিকাতা শহরের সহিত যাহাদের পরিচয় আছে, তাহারা জানেন সেখানে ভাল খাঁটি দুধ মেলা দুষ্কর। দুধ স্বাস্থ্যের একটি মূল উপাদান। খাঁটি দুধের অভাবে শিশুদের পুষ্টি হইতেছে না, রুগী সুস্থ হইতে পারে না। পৌরপ্রতিষ্ঠানের এ বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সমবায়দুগ্ধসমিতি গঠন করিয়া শহরে ভাল দুধ সরবরাহের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। খাটালগুলির উপর কড়া নজর রাখা দরকার ও গোয়ালারা যাহাতে ভাল দুধ দেয়, সে সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে। শুধু দুধ নয়, অন্যান্য খাদ্যের বেলায়ও এইরূপ কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সরিষার তৈল ও ঘিএ ভেজাল দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে।

কিন্তু এ সমস্ত করিতে সততা ও অর্থের প্রয়োজন। অর্থের অভাবে অনেক সদিচ্ছা ও সংকল্প অচিরেই বিলীন হইয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় আমাদের বড় বড় শহরের পৌরসভাগুলি বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহের ভার লইতে পারে। ট্রাম বাসও চালাইবার ব্যবস্থা করিতে পারে। যে সমস্ত কোম্পানী এই কাজ-গুলি করিতেছে, তাহাদের নিকট হইতে ব্যবসায় কিনিয়া লইতে হইবে। তাহা হইলে এইগুলি লাভের অংশে পৌরপ্রতিষ্ঠানের ভাণ্ডার পূর্ণ হইবে ও বিভিন্ন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব হইবে। সাধু সৎলোক পৌরপ্রতিষ্ঠানে না আসিলে ইহাদের উন্নতি হইবে না। দৃঢ় সংকল্প লোক যখন দরিদ্র নারায়ণের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করিবে ও দেশের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবে, তখন অর্থাভাবের জন্য কিছুমাত্র আটকাইবে না।

শিক্ষাসমস্যা ঃ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নূতন কিছু বলা বাহুল্য। যে সুনাগরিক হইতে চায় তাহাকে সর্ব প্রথমে সুশিক্ষিত হইতে হইবে। নাগরিকেরা শিক্ষিত না হইলে গণতন্ত্র সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক শুধু অশিক্ষিত নহে, অক্ষর-জ্ঞানহীন। অথচ সার্বভৌম ক্ষমতা বর্তমানে তাহাদেরই হাতে। সুতরাং ভারতের জনসাধারণকে সুশিক্ষিত না করিতে পারিলে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ আশংকাজনক।

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ গত সেন্সাস বা আদম সুমারী অনুযায়ী বাংলা দেশে

শতকরা মাত্র ১৬ জন লোকের অক্ষর পরিচয় আছে। ইহা অত্যন্ত কম সংখ্যা। আবার ইহার মধ্যে কম লোককেই শিক্ষিত বলা যাইতে পারে। যাহাদের অক্ষর পরিচয় হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকেই কিছুদিনের মধ্যে যাহা কিছু শিক্ষা করে সমস্তই ভুলিয়া যায়। চাষীর ছেলেরা সাত আট বৎসর বয়স পর্যন্ত গ্রাম্য পাঠশালায় অক্ষর পরিচয় ও অতি সাধারণ শিক্ষা লাভ করে। তাহার পর তাহাদিগকে নানা ধরণের ক্ষেতের কাজে লাগাইয়া দেওয়া হয়। আর লেখাপড়ার সুযোগ না থাকায়, তাহারা পূর্ব-অর্জিত সামান্য বিদ্যা ভুলিয়া যায়। দেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত থাকায় আমাদের জাতীয় জীবনে অনেক অসুবিধা দেখা দিয়াছে। দেশের নেতারা বহুদিন হইতেই এই দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। মহামতি গোখেল ১৯১১ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিকশিক্ষার প্রবর্তনের ব্যবস্থা করিয়া একটি বিলের খসড়া তখনকার কেন্দ্রীয় আইনপরিষদে উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু অর্থাভাবের অজুহাতে ভারতসরকার ইহার বিরোধিতা করে ও ফলে বিলটি আইনে পরিণত হয় নাই। ১৯১৯ সালের পর প্রদেশগুলিতে যখন শিক্ষাবিভাগ মন্ত্রীদের অধীনে হস্তান্তর করা হয়, তখন অনেক প্রদেশেই প্রাথমিক শিক্ষা-প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। বাংলা দেশেও এই উদ্দেশ্যে দুইটি আইন প্রণয়ন করা হয়। প্রথম আইনে বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে নিজ নিজ অঞ্চলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের অধিকার দেওয়া হয়। কোন কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান এবিষয়ে কিছু কিছু কাজও করিয়াছে। চট্টগ্রাম পৌরসংঘ শহরের ভিতর অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিল। কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠান অনেকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলিয়াছে। কিন্তু অর্থাভাবের জন্য সকলেরই এবিষয়ে অসুবিধা হয়। ১৯৩০ সালে আর একটি আইন প্রণয়ন করা হয়। প্রাদেশিক সরকার ইচ্ছা করিলে বিভিন্ন জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে পারিবে, এবং সেই উদ্দেশ্যে সেই জেলার লোকেদের উপর শিক্ষাশুল্ক বসাইতে পারে। যাহারা জমির খাজনা দেয়, তাহাদের নিকট হইতে দেয় খাজনার উপর টাকাপ্রতি পাঁচ পয়সা হিসাবে এই শুল্ক বসান হইবে। ইহা জমিদার ও প্রজা উভয়ের নিকট হইতেই আদায় করা হইবে। শুল্কলব্ধ অর্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য ব্যয় হইবে। যে জেলাতে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইবে, সেখানে গভর্ণমেণ্ট একটি

জেলা স্কুলবোর্ড গঠন করিবে। এই বোর্ডের কাজ হইবে, বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা, শিক্ষকদের মাহিনা দেওয়া ও বিদ্যালয়ের কার্য পরিদর্শন করা। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের পথে প্রধান বাধা ছিল অর্থাভাব। এই আইনে অর্থাভাব দূর করিবার জন্য এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। এই আইন বিভিন্ন জেলাতে অবিলম্বে কার্যকরী করা প্রয়োজন।

প্রাথমিক শিক্ষা কোন পদ্ধতিতে দেওয়া হইবে? সাধারণ লেখাপড়া শিখাইলে অধিকাংশ লোকের বিশেষত গ্রামবাসীদের কোন লাভ হইবে না। অথচ শিক্ষার জন্য ব্যয় হইবে প্রচুর। এই ত্রুটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধী "বুনিয়াদী শিক্ষা" বা "নয়ী তালিম" নামে এক অভিনব শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তনের কথা বলিয়াছেন। এই শিক্ষাদ্বারা শিশুদের প্রথম হইতেই কোন না কোন বৃত্তি শিখান হইবে, যাহার দ্বারা তাহাদের শিক্ষায় মনোযোগ হইবে ও পরে তাহারা উপার্জন করিতে পারিবে। ইহার ফলে শিশুরা বিভিন্ন বৃত্তির ও শ্রমের মর্যাদা বুঝিতে পারিবে। বিদ্যালয়ে শিখিবার সময় তাহারা যে সমস্ত জিনিষ তৈয়ারী করিবে, তাহা বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যাইবে তাহা দিয়া বিদ্যালয়গুলির ব্যয়নির্বাহ হইবে। বর্তমানে এই শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

স্ত্রীশিক্ষাঃ পুরাকালে এদেশে স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার ছিল। কিন্তু মধ্যযুগে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন কমিয়া যায়। বর্তমানে এ সম্বন্ধে লোকের ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছে। স্ত্রীপুরুষ সকলের জন্যই শিক্ষার সমান প্রয়োজনীয়তা আছে। ভারতললনা না জাগিলে এদেশের উন্নতি সুদূরপরাহত। এই জাগরণ এক শিক্ষার মধ্য দিয়াই হইতে পারে। ইংরাজীতে একটি কথা আছে যে, যে দুইটি হাত শিশুর দোলনা নাড়া দেয়, সেই হাত জগৎ শাসন করে। শিশুকালে মাতাব নিকট হইতে যে শিক্ষালাভ হয়, তাহার দ্বারা শিশুর চরিত্র গঠিত হয় ও এই শিক্ষা ভবিষ্যৎ কার্য নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং মেয়েদের, যাহারা শিশুর ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবে, তাহাদের সুশিক্ষিত করার সামাজিক প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। শিক্ষা পাইলে মেয়েদের মধ্যে সুপ্ত গুণাবলীর বিকাশ হইবে। বিজ্ঞানজগতে মাদাম কুরী ও রাজনীতি ও কাব্যে সরোজিনী নাইডুর অবদান বিশ্ববিখ্যাত। অন্যান্য বিষয়েও মেয়েরা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। মায়েরা শিক্ষিত হইলে তাহারাই নিজেদের পুত্রকন্যাদের শিক্ষা দিবে।

সুতরাং ছেলেদের মত মেয়েদেরও শিক্ষা দেওয়া উচিত। অনেকে ইহাতে আপত্তি করেন না। কিন্তু তাঁহারা বলেন যে, ছেলেদের যে যে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে, মেয়েদের তাহা শিখাইয়া অনেক সময়েই কোন লাভ হয় না। স্ত্রী ও পুরুষদের কাজ ভিন্ন। সেইজন্য মেয়েদের শিক্ষা ভিন্ন রকমের হওয়া উচিত। ভবিষ্যৎ জীবনে মেয়েদের যে যে কাজ করিতে হইবে, তাহাদের তদুপযোগী করিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষা দেওয়া দরকার। তাহা হইলেই শিক্ষার সুফল পাওয়া যাইবে।

ধনবিজ্ঞান

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও আলোচ্য বিষয়

ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা (Definition of Economics) :—ধন অর্থাৎ অর্থকে কেন্দ্র করিয়া মানুষেব যে সমস্ত কাজ সে বিষয় যে শাস্ত্রে আলোচনা করা হয় তাহারই নাম ধনবিজ্ঞান। লোকে কাজ করে কেন? এমন লোক হয়ত আছে যে কাজ ভালবাসে বলিয়াই সারাদিন পরিশ্রম করে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই কাজ করে জীবিকা উপার্জনের জন্য। আমাদের জীবনযাত্রায় বহু সামগ্রীর প্রয়োজন হয়। আমাদের আহার্য চাই, বস্ত্র চাই, বাস করিবার জন্য গৃহ চাই। এই প্রয়োজনের আর অন্ত নাই, প্রতিদিনই নূতন নূতন প্রয়োজন দেখা দিতেছে। এই সব প্রয়োজন মিটাইবার জন্য নানা রকম সামগ্রী চাই। কিন্তু সামগ্রীর পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর। সকলের সমস্ত অভাব মিটাইবার মত সামগ্রী দেশে হয় না। কেবলমাত্র স্বচ্ছন্দ বন-জাত ফলমূল কিংবা প্রকৃতিদত্ত সামগ্রী দিয়া আমাদের অভাব মিটে না। সুতরাং অভাবের তাড়নায়, প্রয়োজনের তাগিদে আমাদের সকলকে নানা প্রকারের কাজ করিতে হয়। সাধারণত এই সমস্ত কাজ করিবার উদ্দেশ্য থাকে অর্থোপার্জন। যাহা দিয়া আমাদের প্রয়োজন মিটিতে পারে তাহা সবই অর্থের বিনিময়ে কেনা যায়। সেইজন্যই লোকে অর্থ চায়। অর্থের বিনিময়ে আমরা খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ পাইতে পারি, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি, নানা রকম আরামের ব্যবস্থা করিতে পারি। সুতরাং অর্থোপার্জনের জন্য আমাদিগকে বহু প্রকারের কাজ করিতে হয় এবং এই উপার্জিত অর্থ নানা ভাবে ব্যয় করা হয়। অর্থ উপার্জন ও ব্যয় সম্পর্কীয় যে সমস্ত কাজ তাহার আলোচনা করাই ধনবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। অবশ্য অর্থোপার্জন ছাড়াও লোকে অনেক রকম কাজ করে। কিন্তু তাহা ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ে পড়ে না। কেবলমাত্র অর্থোপার্জনের জন্য মানুষ যে সমস্ত কাজ করে, তাহাই ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। ছেলে মানুষ করিতে মার পরিশ্রমের অন্ত নাই। কিন্তু এই কাজ মা অর্থের বিনিময়ে করেন না বলিয়া ইহা ধনবৈজ্ঞানিক আলোচনা করে না। কিন্তু মা যদি নিজে কোন পরিশ্রম না করিয়া ধাত্রী অথবা আয়া রাখিয়া দেন

এবং তাহাদের উপর ছেলের ভার দেন, তাহা হইলে ধাত্রী এবং আয়ার কাজ ধনবিজ্ঞানে আলোচিত হইবে। কারণ ধাত্রী ও আয়াকে এই কাজের জন্য পারিশ্রমিক দিতে হয়। সুতরাং অর্থকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের যে সমস্ত কাজ তাহারই আলোচনা ধনবিজ্ঞানে করা হয়।

ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু (Scope of Economics): এই সমস্ত কাজের প্রকৃতি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে ইহাদের তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, এই সমস্ত কাজ আমরা করি, কারণ আমাদের সকলেরই বহু অভাববোধ আছে এবং এই অভাববোধের সীমা নাই। একটি অভাবের তৃপ্তি হইতে না হইতে নূতন জিনিষের অভাব আমাদের মনে জাগিয়া উঠে। উপভোগের দ্বারা কামনার শান্তি কোন দিন হয় না। অবশ্য শুধু অভাববোধ থাকিলেই যে সকলকে কাজ করিতে হইবে তাহা নহে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, আমাদের অভাবের তুলনায় প্রকৃতিদত্ত সম্পদের পরিমাণ কম। সকলের সমস্ত অভাব মিটাইবার মত উপযুক্ত সামগ্রী দেশে পাওয়া যায় না, উৎপন্নও হয় না। কাজেই অভাব মিটাইবার সামগ্রী লাভ করিবার উদ্দেশ্যে আমাদিগকে নানা কাজে ব্যস্ত থাকিতে হয়। এই সমস্ত কাজের উদ্দেশ্য অর্থোপার্জন—কারণ অর্থের বিনিময়ে আমরা নানা দ্রব্য কিনিতে পারি ও তাহার দ্বারা অভাব মিটাইতে পারি।

বহু অভাব ও অপ্রচুর প্রকৃতিদত্ত সম্পদ থাকাতে আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার আছে। এই সমস্ত প্রকৃতিদত্ত সম্পদ আমরা নানা প্রকারের অভাব মিটাইবার কাজে লাগাইতে পারি। যেমন, একবিঘা জমিতে আমরা ধান অথবা পাট অথবা ডালের চাষ করিতে পারি। আমাদের এমন জমি নাই যাহা চাষ করিয়া আমরা আমাদের সমস্ত অভাব মিটাইতে পারি। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে—এই জমিতে আমরা কি চাষ করিব—ধান না পাট না ডাল? ধান লাগাইলে পাট বা ডাল পাইব না। ইহার মধ্যে যে কোন একটিকে আমাদের বাছিয়া লইতে হইবে। পরিমিত সম্পদ দিয়া বহু অভাব মিটান সম্ভব নহে। এই অবস্থায় সব অভাব মিটাইবার ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া আমরা যে বা যে সমস্ত অভাব পূরণ সবচেয়ে বাঞ্ছনীয় মনে করি তাহার জন্যই আমাদের পরিমিত সম্পদ ব্যবহার করি। অর্থাৎ চালের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী মনে করিলে আমরা জমিতে ধান লাগাইব। পাটের চাষ করিব না। কারণ

একমাত্র ইহা করিলেই আমরা একবিঘা জমির সদ্ব্যবহার করিতে পারিব। কাজেই অভাবের তুলনায় সম্পদের পরিমাণ কম বলিয়া নানাভাবে বাছাই করিবার প্রশ্ন আসে। কোন কোন অভাবগুলি আমরা কতটুকু কি ভাবে পূরণ করিতে চাই? পরিমিত সম্পদ নানাভাবে ব্যবহার করা চলে। সুতরাং তাহা কি কি ভাবে ব্যবহার করিলে এই সমস্ত অভাব ঠিকমত পূরণ করা যায়? এই সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য মানুষকে নানা কাজে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। এই কাজগুলি সম্বন্ধে আলোচনাই ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

ধনবিজ্ঞানকে কি ধনের বিজ্ঞান বলে? (Is Economics a science of wealth?): অর্থ অনর্থের মূল। সুতরাং অর্থ লইয়া যে বিজ্ঞান তাহাকেও অনেক অনর্থ ভোগ করিতে হইয়াছে। সাধারণ লোকে ধন বা অর্থ বলিতে টাকাকড়িকে বুঝে। যাহার প্রচুর টাকা আছে সেই ধনী। কাজেই তাহারা ধনবিজ্ঞানকে নিছক টাকাকড়ির শাস্ত্র বলিয়া মনে করে। সেইজন্য মহামতি কার্লাইল, রাসকিন ও অন্যান্য ইংরাজ লেখকেরা এই শাস্ত্রের নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, এই শাস্ত্র পাঠের ফলে মানুষ স্বার্থপর ও অর্থলোলুপ হইয়া পড়িবে। অবশ্য তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ মনে করিবার যে বিশেষ কারণ ছিল না তাহা নয়। ধনবিজ্ঞানের প্রথম যুগের অনেক লেখক এইভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে ইহা একটি ভ্রান্ত ধারণা। সাধারণলোকে ধন বলিতে যাহাই বুঝুক না কেন, ধনবিজ্ঞানে ধন শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ধন মানে টাকাকড়ি নহে। যে সমস্ত সামগ্রী আমাদের অভাব মোচন করিতে পারে ও যাহার সরবরাহ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর, ধনবিজ্ঞানে তাহাদিগকে ধন আখ্যা দেওয়া হয়। এই শ্রেণীর সামগ্রীর উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। ধনবিজ্ঞানে কখনও একথা বলে না যে, মানুষ টাকা উপার্জন ছাড়া আর কোন কাজ করে না। মানুষ অর্থোপার্জনের যন্ত্র নহে। ধনবিজ্ঞানে অর্থ লইয়া আলোচনা করা হয়, কারণ, অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আমরা আমাদের অভাব দূর করিতে পারি। অর্থোপার্জন একটি উপায় মাত্র; উহাই লক্ষ্য নহে। আসল উদ্দেশ্য মানুষের অভাবমোচন। অর্থকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের যে সমস্ত কাজ, তাহারই আলোচনা ধনবিজ্ঞানে করা হয়। যে ভালভাবে ফুটবল খেলা দেখিতে চায়, সে মাঠের

১৬

যেদিকে বল নাই সেদিকে দৃষ্টি দেয় না। কেননা, তাহা হইলে সে খেলা দেখিতে পাইবে না। বল যেখানে যেখানে থাকে, সে তাহার কাছাকাছি নজর রাখে। তাহা হইলে সে খেলোয়াড়দের কৃতিত্ব দেখিতে পারিবে। তেমনি ধনবিজ্ঞানে আমাদের দৃষ্টি ধনের দিকে থাকে। কারণ ধনের উপার্জন, বণ্টন ও বিনিময় লইয়া মানুষের যে কার্যাবলী তাহার আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। কেম্ব্রিজের বিখ্যাত ধনবৈজ্ঞানিক মার্সাল বলিয়াছেন যে, ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হইল মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কাজগুলি; ইহা একদিকে ধন ও অন্যদিকে মানুষের কার্যক্রমের একটি বিশিষ্ট অংশ লইয়া আলোচনা করে। শেষোক্ত দিকের আলোচনাতেই বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয়।

অতএব ধনবিজ্ঞানে মানুষের কাজ লইয়া আলোচনা করা হয়। কিন্তু মানুষকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হিসাবে দেখা হয় না। যে সব লোক সমাজে বাস করে তাহাদের প্রয়োজন এবং কার্যাবলীই এই শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়। সন্ন্যাসী অথবা ফকিরের কাজ ধনবিজ্ঞানের বহির্ভূত বিষয়। সন্ন্যাসী অথবা ফকিরের বহু প্রয়োজন থাকিতে পারে, সেই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তাহাদেরও নানা রূপ কাজ করিতে হয়। কিন্তু তাহারা সমাজে বাস করে না বলিয়া তাহাদের কাজের সহিত ধনবিজ্ঞানের কোনও সংস্রব নাই। যাহারা সমাজে বাস করে, সামাজিক অবস্থার দ্বারা যাহাদের কার্যাবলী নানা ভাবে প্রভাবিত হয়, তাহাদের কাজ ধনবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। এই কারণে ধনবিজ্ঞানকে সমাজ-বিজ্ঞানের অন্যতম অংশ বলা হয়।

ধনবিজ্ঞানের বিভাগ (Divisions of Economics): ধনবিজ্ঞানের অধীতব্য বিষয় মানুষের অভাব। কাজেই ইহার প্রথম অংশে মানুষের অভাব বা প্রয়োজন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। এই অংশের নাম "ভোগব্যবহার" (Consumption)। আমরা এই অধ্যায়ে মানুষের অভাবের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করি; কোন দ্রব্যের কেন চাহিদা বাড়ে কমে তাহা আলোচনা করি।

অভাব মিটাইতে হইলে দ্রব্য চাই। কাজেই অর্থনীতির দ্বিতীয় বিভাগের নাম উৎপাদন (Production)। এই বিভাগে দেশের প্রকৃতিদত্ত সম্পদ, ও ঐ সম্পদ হইতে কি উপায়ে দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইতে পারে, কি উপায়ে মানুষের উৎপাদিকাশক্তি সর্বাপেক্ষা কার্যকরী উপায়ে প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং ঐ শক্তি কোন্ নিয়মের অধীন, তাহাই আলোচনা করা হয়।

তৃতীয় বিভাগের নাম বিনিময় (Exchange)। আমাদের যত দ্রব্যের প্রয়োজন তাহার একাংশ মাত্র নিজে উৎপাদন করিতে পারি। চাষী কেবল ধান কি গম উৎপাদন করে, তাঁতী কাপড় বোনে, কুমোর বাসন তৈয়ারী করে। নিজের উৎপন্ন দ্রব্য অপরের দ্রব্যের সহিত বিনিময় করিতে পারিলেই তবে নিজের সব প্রয়োজন মিটান যায়। এই বিভাগে কোন্ কোন্ অবস্থায় দ্রব্য বিনিময় সম্ভব, দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ, দ্রব্যের বাজার প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।

আজকাল কেহ একা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কোন দ্রব্য তৈয়ারী করে না। বহু লোকের সহযোগিতা দ্বারাই দ্রব্য উৎপাদিত হয়। আধুনিক ধনবিজ্ঞানে এই লোকদের চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা,—জমির মালিক, শ্রমিক, মূলধনের মালিক, এবং উদ্যোক্তা (Organiser)। জমির মালিক জমি দেয়, শ্রমিক পরিশ্রম করে, মূলধন দেয় যন্ত্রপাতি আর উদ্যোক্তারা সমস্ত বিষয়টি সংগঠন করিয়া উৎপাদন করে। সকলের সমবেত চেষ্টায় উৎপাদন হয় বলিয়া দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ সকলের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। জমির মালিক পায় খাজনা, শ্রমিককে মজুরী দেওয়া হয়, মূলধনের মালিক সুদ পায় এবং উদ্যোক্তারা লাভের অধিকারী হয়। ধনবিজ্ঞানের চতুর্থ বিভাগে আমরা এই 'বণ্টন' (Distribution) আলোচনা করিব। কাহাকে কোন্ নীতি অনুযায়ী কত দিতে হইবে, তাহাই এই বিভাগের আলোচ্য বিষয়। কাজেই এই বিভাগে খাজনা, মজুরী, সুদ এবং মুনাফা কি ভাবে স্থির করা হয় তাহা আলোচিত হইবে।

শেষ বিভাগে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ আলোচিত হয়। কোন্ নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র আপনার ব্যয় নির্বাহ করিবে, কি ভাবে রাজস্ব আদায় করিবে, এই বিভাগে তাহার আলোচনা হয়। ইহাকে করনীতি (Public Finance) বলা হয়।

প্রত্যেকটি বিভাগ পরস্পরের সহিত জড়িত। অভাব মেটানই সকল উৎপাদন কার্যের ভিত্তি। অভাব বা প্রয়োজনের স্বরূপ অনুযায়ী দ্রব্য উৎপন্ন হয়। বাংলা ও মাদ্রাজের অধিবাসীরা ভাত খায়। কাজেই এই দুই রাজ্যের অধিকাংশ জমিতেই ধান উৎপন্ন হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদন হয় ইহা যেমন সত্য, তেমনি উৎপাদন হইতেও প্রয়োজনের জন্ম হয়। সাইকেল এবং

বেতার যন্ত্র আবিষ্কারের পর তাহাদের ব্যবহার ও চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রয়োজন এবং উৎপাদনের সহিত বিনিময়ের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। আমরা যে সব সামগ্রী অধিক উৎপাদন কবি তাহা অন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সহিত বিনিময় কবিতে না পারিলে আমাদের অপরাপর অভাব মেটে না। বণ্টননীতি দ্বারা প্রত্যেকের আয় নির্ধারিত হয়। লোকে তাহাদের আয় হইতে নিজ নিজ অভাব মিটায়। আমরা প্রত্যেকে জাতীয় আয়ের যে অংশ পাই তাহা হইতে আমাদের অভাব মিটাইতে হয়। কাজেই লোকের প্রয়োজন তাহার আয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়। অতএব ইহা হইতে উৎপাদনও প্রভাবিত হইবে। আধুনিক সমাজে সকলের সমান সমান আয় নাই। সামান্য কয়েকজন ধনী ব্যক্তি জাতীয় আয়ের বেশীর ভাগের মালিক, আর অধিকাংশ লোক কোনও রকমে দিন কাটায়। ধনীব্যক্তিদের খুশী চরিতার্থ করিতে বহু লোক বিলাসের সামগ্রী উৎপাদনে নিযুক্ত থাকে। কিন্তু জাতীয় আয় সমান ভাগে ভাগ হইলে বিলাস-সামগ্রী কম উৎপাদিত হইয়া সাধারণ প্রয়োজনীয় সামগ্রী অধিক উৎপন্ন হইবে। বণ্টনের সহিত করনীতির সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ। রাষ্ট্র ধনীর উপরে গুরুভার কর চাপাইতে পারে। তাহা হইলে তাহাদের আয় কমিবে। এই করলব্ধ অর্থ আবার গরীবদের হিতার্থে ব্যয় করা হইলে তাহা হইতে গরীবদের আয় বৃদ্ধি পাইবে। রাষ্ট্র কোন দ্রব্যের উপরে উচ্চহারে কর ধার্য করিলে তাহার উৎপাদন কমিয়া যায়। বিদেশী দ্রব্যের উপরে আমদানীশুল্ক বেশী হারে ধরা হইলে দেশের শিল্প প্রসার লাভ করে। এইভাবে ধনবিজ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগ পরস্পরের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত।

ধনবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান? (Is Economics a science ?) ধনবিজ্ঞানকে সাধারণত বিজ্ঞান বলা হয়। বিজ্ঞান কাহাকে বলে? বহু পর্যবেক্ষণ দ্বাবা কার্যকারণ সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই বিজ্ঞান। এই জ্ঞান কখনও গবেষণা দ্বারা পরীক্ষিত, আবার কখনও বা অনুমিত। ধনবিজ্ঞান মানুষের কাজের একটি বিশেষ দিক বিধিবদ্ধ ভাবে আলোচনা কবে। ধনবিজ্ঞানে কয়েকটি মূল সূত্র স্থির করা হইয়াছে এবং তাহা মানুষের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিয়াই স্থিরীকৃত হয়। কাজেই ধনবিজ্ঞানকে নিশ্চয়ই বিজ্ঞান বলা যায়। কিন্তু রসায়ন অথবা পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য আছে। পদার্থবিজ্ঞানে মাধ্যাকর্ষণের মত কয়েকটি সূত্র অনুমিত হইয়াছে।

এই সূত্রগুলি সকল অবস্থাতে সত্য। কিন্তু ধনবিজ্ঞানের সূত্রগুলি ততটা সত্য নহে, অনেক ক্ষেত্রে এই সূত্র অনুসারে কাজ হয় না। রাসায়নিক গবেষণাগারে অণুপরমাণু লইয়া সব সময় পরীক্ষা হয় এবং বিভিন্ন অবস্থায় উহাদের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা হয়। বিভিন্ন পরিবেশে বা প্রভাবে কি প্রতিক্রিয়া হইবে তাহা রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া বলিয়া দিতে পারে। কিন্তু একই অবস্থায় মানুষ বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন রকমের কার্য করিয়া থাকে। মানুষের মত অণুপরমাণুর স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নাই। মানুষ চিন্তা করে ও নিজের কার্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। চিন্তা ও অনুভূতি অনুযায়ী তাহার কার্য পরিবর্তিত হয়। কাজেই জড়বস্তুর মত মানুষের কাজ সব সময় স্থির থাকে না। এইজন্য ধনবিজ্ঞানের সূত্র পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রের ন্যায় সব সময়ে ঠিক থাকে না

ধনবিজ্ঞানের সূত্র (Economic Law): মানুষের কাজ আলোচনা করিয়া ধনবৈজ্ঞানিক যে মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তাহাই ধনবিজ্ঞানের সূত্র। এই সূত্রগুলিতে বলে যে, একটি বিশেষ অবস্থা বা কারণ উপস্থিত থাকিলে কোন একটি বিশিষ্ট ফল ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। যেমন কমলালেবুর দাম বাড়িলে লোকে কম লেবু কিনিবে। দাম বাড়িলে চাহিদা কমে। ইহাকে চাহিদার নিয়ম বা সূত্র বলা হয়। ধনবৈজ্ঞানিক এমনি আরও অনেক সূত্রে উপনীত হইয়াছে।

প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই সূত্র আছে। পদার্থবিজ্ঞানে বহু সূত্র আছে। মাধ্যাকর্ষণের সূত্রে বলে যে, দুইটি বস্তু একটি বিশেষ নিয়ম অনুসারে পরস্পরকে আকর্ষণ করে। রসায়ন শাস্ত্রেও অনুরূপ সূত্র আছে। বয়েল সূত্রে বলে যে, তাপ একই থাকিলে চাপের পরিমাণ অনুযায়ী বায়বীয় পদার্থের আয়তন কম বা বেশী হয়। প্রত্যেক শাস্ত্রের সূত্রে ইহাই বলে যে, একটি বিশেষ কারণ বা অবস্থা হইতে একটি বিশেষ ফল পাওয়া যায়। এই ফল পূর্ব হইতেই হিসাব করিয়া বাহির করা যায়। ধনবিজ্ঞানের নিয়মগুলিকেও এই হিসাবে সূত্র বলা যায়। দাম যদি বাড়ে, তাহা হইলে কেবলমাত্র মূল্য বৃদ্ধির ফলে সেই দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি পাইবে। ইহা "যোগানের সূত্র" নামে পরিচিত।

কিন্তু ধনবিজ্ঞানের নিয়মের সহিত অন্যান্য বিজ্ঞানের নিয়মের একটু পার্থক্য আছে। মাধ্যাকর্ষণের সূত্র সব সময়েই সত্য। জ্যোতিষেরা এই নিয়ম অনুযায়ী অঙ্ক কষিয়া বলিয়া দিতে পারেন কবে ও কোন সময়ে গ্রহণ

লাগিবে। কিন্তু ধনবিজ্ঞানের কোন নিয়মের এইরূপ নিশ্চয়তা নাই। পদার্থ বিজ্ঞানের হিসাবে ভুল না হইলে ফল সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। কিন্তু ধনবিজ্ঞানের এইরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার মত কোন নিয়ম নাই। চাহিদার নিয়ম অনুযায়ী দাম বাড়িলে চাহিদা কমে; কিন্তু বাস্তব জীবনে তাহাব বিপরীত ঘটাও আশ্চর্য নহে। অনেক সময়ে দেখা যায় যে কোন সামগ্রীর দাম বাড়িয়াছে ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার চাহিদাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। মানুষ জড় বস্তুর মত হইলে ধনবিজ্ঞানেব নিয়ম সব সময়েই সত্য হইত। কিন্তু মানুষের কাজ অনেক সময় অদ্ভুত, যুক্তি দিয়া তাহার সমর্থন পাওয়া যায় না। কাজেই অণুপরমাণু লইয়া যে নিয়ম পাওয়া যায়, মানুষের কার্যাবলী লইয়া তদনুরূপ কোন নিয়ম পাওয়া সম্ভব নহে। ধনবিজ্ঞানে কখনই একথা বলা হয় না যে, একটি বিশেষ ফল সর্বদাই হইবে। তাহা হইতেও পারে, আবার না হওয়াও বিচিত্র নহে। ধনবিজ্ঞানের নিয়ম কেবল বলিয়া দেয় যে, সাধারণত একটি বিশেষ কারণ উপস্থিত থাকিলে একটি নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।

উপরোক্ত কথা হইতে ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই যে ধনবিজ্ঞানের নিয়ম একেবারেই অকেজো এবং কখনই তাহা সত্য নহে। ধনবৈজ্ঞানিক যেরূপ বলেন অধিকাংশ সময়ে সেরূপ ফল পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দাম বাড়িলে চাহিদা কমে ও যোগান বাড়ে। সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রের যেমন ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় তেমনি ধনবিজ্ঞানের নিয়মের ব্যতিক্রম সর্বদাই আছে। ব্যতিক্রম আছে বলিয়া সংস্কৃত লেখক ব্যাকরণের সূত্র অস্বীকার করিতে পারেন না। সেইরূপ ধনবিজ্ঞানের নিয়মের ব্যতিক্রম থাকিলেই তাহা ভ্রান্ত বা বাতিল হয় না।

অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ (Relation with other Social sciences) : ধনবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম বলিয়া অপরাপর সমাজবিজ্ঞানের সহিত ইহার সম্বন্ধ অত্যন্ত নিকট। মানুষের যে সমস্ত কার্যকলাপ ধনবিজ্ঞানে আলোচনা করা হয়, তাহা সামাজিক এবং ঐতিহাসিক ঘটনাদ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। লোকের নীতিবোধ এবং দেশের প্রচলিত আইনের প্রভাব তাহার উপর অসামান্য। কাজেই ধনবিজ্ঞানের সহিত সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, নীতিবিজ্ঞান প্রভৃতির সম্বন্ধ কি তাহা আলোচনা করা দরকার।

সমাজবিজ্ঞান (Economics and Sociology) : এই শাস্ত্রে মানব সমাজের প্রকৃতি, উৎপত্তি ও বিকাশের তথ্য জানিতে পারা যায়। মানবজীবনের প্রত্যেকটি সামাজিক দিক এই বিজ্ঞানে আলোচিত হয়। ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান সবই ইহার অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে সমাজের মাত্র একটি দিক আলোচনা করা হয়। এই হিসাবে ধনবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখামাত্র, কাজেই দুইটি বিজ্ঞানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

রাষ্ট্রনীতি (Economics and Politics) : রাষ্ট্রের গঠন ও কার্যকলাপ ইহাতে আলোচিত হয়। রাষ্ট্র মানুষের অর্থনৈতিক জীবন প্রভাবান্বিত করে বলিয়া রাষ্ট্রনীতি ও ধনবিজ্ঞানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। অতীতে ধনবিজ্ঞানকে রাষ্ট্রনীতির অন্যতম বিভাগ বলিয়া ধরা হইত। দেশের আর্থিক অবস্থা এবং উন্নতি অনেক পরিমাণে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতির উপর নির্ভব করে। স্বাধীনতা লাভ করিয়া আমরা আমাদের আর্থিক অভাবঅভিযোগ দূর করিবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস করিতে পারিব। এখন আর কোন বাধা নাই বলিয়া হয়ত অচিরেই আমাদের দারিদ্র্য দূর হইবে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানও আবাব দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনদ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। নাৎসিবাদ, ফ্যাসিস্টবাদ, বলসেভিকবাদ প্রভৃতি অর্থনৈতিক কারণেই উদ্ভূত।

ইতিহাস (Economics and History) : ইতিহাস হইতে চলমান মানবজাতির পতন-অভ্যুত্থানের সংবাদ জানিতে পারি। অতীতের ইতিহাস আমাদের বর্তমান আর্থিক জীবনের জন্য অনেকাংশে দায়ী। কাজেই ইতিগাসের সহিত ধনবিজ্ঞানের নিকট সম্বন্ধ আছে। ঐতিহাসিককেও মানুষের আর্থিক অবস্থা জানিতে হয়। তাহা ছাড়া মানুষের যে অন্তহীন যাত্রা লইয়া ইতিহাসের পঠিতব্য বিষয়, তাহা অসম্পূর্ণ থাকিবে।

নীতিবিজ্ঞান (Economics and Ethics) : এই বিজ্ঞানে মানুষের ভালমন্দবোধ আলোচনা করা হয়। যে সকল নীতি মানুষের কল্যাণসাধন করিতে পারে তাহা এই বিজ্ঞানে আলোচিত হয়। ধনবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য মানুষের হিতসাধন করা। অতএব এই দুইটি বিজ্ঞানের মধ্যে সম্বন্ধ অতি নিকট। কিন্তু শুধু ধন দিয়া মানুষের যাহা ভাল করা যাইতে পারে, তাহা ধনবিজ্ঞানের

আলোচ্য ; নীতিবিজ্ঞানের আলোচ্য মানুষের নৈতিক আচরণ এবং তাহা কতখানি মানুষের কল্যাণ সাধনে সক্ষম।

ধনবিজ্ঞান পাঠের নিয়ম (Methods of studying economics) : নানা পদ্ধতিতে ধনবিজ্ঞান পাঠ করা যাইতে পারে। তাহার মধ্যে দুইটি উপায় প্রধান, একটি অনুমান (deductive), অপরটি উপগম (inductive) পদ্ধতি। একটি সাধারণ তথ্য হইতে নূতন নূতন সূত্রে উপনীত হওয়াকে অনুমান (deductive method) পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতিতে কয়েকটি মূল তথ্য হইতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ও তাহা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ চাহিদার নিয়মের উল্লেখ করা যাইতে পারে। একটি সামগ্রী লাভ করিবার আকাংখা উহা পাইবার পরে কমিয়া আসে। এই তথ্য হইতে চাহিদার নিয়মটি উদ্ভূত। চাহিদার নিয়ম ইহাও বলে যে সামগ্রীর দাম কমিলে লোকে তাহা অধিকমাত্রায় কিনিয়া থাকে। এই সিদ্ধান্ত পরে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। বাজারে কমলালেবুর দাম কমিলে কমলালেবু বহু পরিমাণে বিক্রয় হইবে ইহাই আশা করা যায়। এইভাবে একটি উপকল্প (hypothesis) হইতে নানা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। রিকার্ডো এবং মিল প্রমুখ বিখ্যাত ইংরাজ লেখকেরা এই উপায়ে ধনবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা এই উপায়ে যথেষ্ট ফললাভ করিয়াছেন। কিন্তু এই পদ্ধতির অনেক ত্রুটি আছে। অতিমাত্রায় নিগূঢ় আলোচনা বিষয়টিকে অবাস্তব করিয়া তুলিয়াছে। একটি অনুকল্প হইতে তথ্য সৃষ্টি করিলে সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সব সময়ে সম্ভব নহে, যদি না উপকল্পগুলি বাস্তব ঘটনার সহিত মিলাইয়া দেখা হয়।

অনেকগুলি বাস্তব ঘটনা দেখিয়া একটি সূত্র স্থির করাকেই উপগম (inductive) পদ্ধতি বলা হয়। যে সকল লোক এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা পৃথিবীর সকল দেশ হইতে অর্থনৈতিক তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তাহা হইতে সূত্র সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করেন। ম্যালথস পৃথিবীর নানা দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার পরীক্ষা করিয়া জনসংখ্যা সম্বন্ধে একটি সূত্র স্থির করেন। এঙ্গেল্‌স্ সাক্সেনির লোকদের পারিবারিক হিসাব দেখিয়া ভোগব্যবহার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু এই উপায়েরও নানারকম অসুবিধা আছে। অর্থনৈতিক জীবনে তথ্যের অন্ত নাই, একটি আর একটির সঙ্গে

এমনভাবে জড়িত যে দুইটিকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা যায় না। কোন তথ্যকে অভ্রান্ত বলা যায় না, বা তথ্য হইতে নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। এরূপক্ষেত্রে অনুমানের উপর নির্ভর না করিয়া উপায় নাই।

কাজেই দুইটি পদ্ধতির মাত্র একটি অবলম্বন করিলে নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন্। যদি আলোচনায় অগ্রসর হইতে হয় তাহা হইলে অনুমান এবং উপগম দুইই প্রয়োজন। মূল্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনাতে অনুমান খুবই কার্যকরী; আবার, ব্যাংকিং প্রভৃতির আলোচনায় উপগমপদ্ধতি ব্যতীত চলে না। কাজেই দুইয়ের সমন্বয়ে ধনবিজ্ঞানের পাঠ করা উচিত।

ধনবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা (Utility of Economics) : এই শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা সকলেরই প্রয়োজন। সাময়িক বহু সমস্যার সমাধান ধনবিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশের প্রধান সমস্যা দারিদ্র্যের। অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত করিয়াই এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। যে বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিলে "সংস্কৃত এবং মহান জীবন যাপন করিবার মত সামগ্রীলাভের পথ উন্মুক্ত হইয়া যায়" তাহা কোন ভারতবাসী অবজ্ঞা করিতে পারে না। দাম উঠানামা কেন করে, বাজারের অবস্থা, উৎপাদন এবং চাহিদা এই সমস্ত সম্বন্ধে ব্যবসায়ীদের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সমাজসংস্কারকদের এ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া শ্রমিকের কর্মকুশলতা, তাহাদের থাকিবার ব্যবস্থা প্রভৃতি হিতকর বিষয়গুলি সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান তাহাদের দরকার। ধনবিজ্ঞানে পণ্ডিত না হইলে দেশের কোনরূপ স্থায়ী মঙ্গলসাধন করা রাজনীতিজ্ঞদের পক্ষে অসম্ভব। কৃষি ও শিল্প ব্যাপারে রাষ্ট্র কতদূর কি করিতে পারে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের সহিত রাষ্ট্র কি ভাবে জড়িত তাহা রাজনীতিজ্ঞদিগকে জানিতে হইবে। করনীতি সম্বন্ধেও তাহাদের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আধুনিক যুদ্ধে ধনবিজ্ঞান এত প্রয়োজনীয় যে, গত যুদ্ধে ইংলণ্ডে অর্থনৈতিক যুদ্ধ পরিচালনা করিবার জন্য একজন স্বতন্ত্র মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অর্থনৈতিক জীবনের ক্রমবিকাশ

প্রকৃতির ভাণ্ডার অফুরন্ত নহে। অথচ মানুষের সমস্ত অভাব দূর করিতে প্রকৃতির দ্বারস্থ হইতে হয়। প্রকৃতির সীমাবদ্ধ সম্পদ হইতে নিজ নিজ অভাব মিটাইতে গিয়া মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলী এক এক সময়ে একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ করে। আদিম যুগে মানুষের প্রয়োজন অল্প ছিল। ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারিত হইলেই মানুষ তখন খুশী থাকিত। বন্য পশু শিকার করিয়া এবং গুহাতে বাস করিয়া মানুষের দিন চলিয়া যাইত। বন্য পশুর হাত হইতে প্রাণ রক্ষা করিতে মানুষকে তখন সবদা সশস্ত্র থাকিতে হইত। এই অবস্থায় মানবজীবন সৌন্দর্যহীন, পশুপ্রায় এবং অল্পস্থায়ী ছিল। বন্য পশু শিকার করিয়া বেশী সংখ্যক লোকের দিন চলিতে পারে না। শিকার হইতেই আহার্য লাভ হইত। ক্রমাগত কয়েকদিন শিকার না পাওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। কাজেই আহার্য-সংগ্রহ অনিশ্চিত ছিল। আবার আহার্য জমাইয়া রাখাও সম্ভব হইত না, কারণ, মাংস সংরক্ষণ করিবার মত বিদ্যা তখনও মানুষ আয়ত্ত করিতে পারে নাই। কাহারও কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না, জমির উপর কাহারও মালিকানাস্বত্ব ছিল না।

ক্রমে ক্রমে মানুষ, গরু, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি জন্তু পালন করিতে শিখে। পশুপালনের ফলে আহার্য পাওয়া সহজ হইয়া উঠে। এই সব পশু দুধ দেয়, উহাদের বলি দিয়া সহজেই মাংস পাওয়া যায়। কাজেই পূর্ববর্তী যুগের অনিশ্চিত বন্য জীবনযাপন পশুপালন শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইল। পশুপালনের যুগে মানুষের জীবন অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়া উঠে। আহার্য সংগ্রহ সহজ হওয়াতে অধিক সংখ্যক লোকের জীবনধারণ সম্ভব হয়। কিন্তু এই যুগেও জমির উপরে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত হইত না। গোষ্ঠীই ছিল জমির মালিক, তবে গৃহপালিত পশুর পাল ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে স্বীকৃত হইত। এ যুগে কোনও নির্দিষ্ট আবাস ছিল না। পশুপালনের জন্য পশুচারণোপযোগী জমি চাই। তাই এই যুগের লোকেরা যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন না করিয়া পারে নাই।

বনে জঙ্গলে খাদ্যোপযোগী ফলমূল পাওয়া যায়। লোকে যখন তাহার সন্ধান পাইল, সমাজ তখন অগ্রগতির পথে আরও একধাপ অগ্রসর হইল। গম ও ধান ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত হয় এবং লোকে তাহা চাষ করিতে শিখে। তখন কৃষিযুগ আরম্ভ হইয়া গেল। অসংস্কৃত যন্ত্রাদি দ্বারা ভূমি চাষ করিতে শেখায় খাদ্য বহু পরিমাণে পাওয়া যাইতে থাকে। লৌহের আবিষ্কার ও লৌহ-লাঙ্গল দ্বারা চাষ করিতে শেখায় চাষের সমস্যার সমাধান হয়। চাষ করিতে শিখিলে স্থায়ী আবাস প্রয়োজন হইয়া পড়ে। একই জমি বৎসরের পর বৎসর চাষ করিয়া শস্য উৎপাদন করা চলে ও শস্য বপন করিয়া তাহা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়। কাজেই লোককে কর্ষিত ভূমির নিকটে বাস করিতে হয়। খাদ্য বেশী পরিমাণে পাওয়া সম্ভব হওয়াতে অধিক সংখ্যায় লোক প্রতিপালিত হইতে পারে। স্থায়ী আবাস হইতে প্রাচীন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এই যুগেই জমির উপরে প্রথম মালিকানা স্বীকৃত হয়, কারণ যে জমি পরিষ্কার করিয়া চাষ করিয়াছে সে জমির স্বত্ব দাবী করে। শক্তিশালী লোক অপরের জমি ছিনাইয়া লইয়া অপেক্ষাকৃত দুর্বল লোককে সেই জমি চাষ করিতে বাধ্য করে। অনেক সময় অপরের উদ্বৃত্ত ফসল জোর করিয়া কাড়িয়া লয়। ইহারাই পরবর্তী যুগে জমিদার হিসাবে পরিচিত হয়, এবং এইভাবে জমিদার-প্রজা সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। কৃষিযুগই ক্রমে সামন্তপ্রথায় (Feudalism) রূপান্তরিত হয়।

সামন্ততন্ত্র (Feudalism): জমির মালিক ছিল জমিদার, আবার জমিদার রাজার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিত। জমিদারের অধীনে কৃষক জমি চাষ করিত এবং উদ্বৃত্ত ফসল জমিদার অথবা সামন্তকে খাজনা হিসাবে দিত। গ্রামে আরও একশ্রেণীর লোক ছিল। তাহারা কারিগর.—গ্রামের ছোটখাট শিল্পদ্রব্য তাহারা উৎপাদন করিত। তাঁতি, কুমোর, ছুতোর, তেলি, মুচি প্রভৃতি এই শ্রেণীতে পড়ে। শ্রমবিভাগ ছিল বটে, কিন্তু অত্যন্ত সরলভাবে ছিল। একজন লোকেই একটি সামগ্রীর প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সব কিছু করিত। তাঁতি সুতা কাটা হইতে আরম্ভ করিয়া কাপড় বোনা, রঙানো সব কাজই করিত। নিজের নিজের বাড়ীতে কারিগরেরা এই সব সামগ্রী তৈয়ারী করিত। প্রত্যেকটি গ্রাম অথবা কয়েকটি গ্রাম মিলিয়া একটি পরগণা স্বয়ং-সম্পূর্ণ ছিল। গ্রামের প্রয়োজনীয় সব কিছুই তাহারা উৎপাদন করিত এবং উৎপন্ন দ্রব্য সবই ব্যবহার করিত।

এই সরল অর্থনৈতিক পরিবেশ ক্রমে ক্রমে জটিল হইয়া পড়ে। জমিদার ভূমির ফসল সঞ্চয় করিয়া ধনী হইয়া পড়ে। তাহাদের নূতন নূতন অভাব ও চাহিদা দেখা দেয়। জমিদারের রুচি চরিতার্থ করিবার জন্য সৌখীন বিলাসসামগ্রী তৈয়ারী হইতে থাকে। এই নূতন সামগ্রীর চাহিদা মিটানো অনেক সময়েই গ্রামের কারিগরদের পক্ষে সম্ভব হইত না। তখন এক নূতন শ্রেণীর লোক দেখা দিল। ধনী জমিদারদের ভোগ-বাসনা চরিচার্থ করিতে সদাগর বা ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্ভব হইল। তাহারা এক গ্রামের সামগ্রী কিনিয়া অন্য গ্রামে বিক্রয় করিত। দেশদেশান্তর হইতে বিলাস-সামগ্রী আহরণ করিয়া আনিয়া ধনীর নিকট উপস্থিত করিত। ব্যবসায় করিয়া এই সদাগর শ্রেণীর লোক প্রভূত অর্থের অধিকারী হইল। কেহ কেহ লোক নিযুক্ত করিয়া নিজেরাই শিল্পসামগ্রা উৎপন্ন করিতে আরম্ভ করে। ইতিমধ্যে বাষ্পীয় কল (Steam Engine) আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীতে অর্থনৈতিক বিপ্লব উপস্থিত হইল। যন্ত্র ও উহাব পরিচালনায় বাষ্পীয় কলেব প্রয়োগের ফলে কলকারখানা দ্রুত গড়িয়া উঠিল। রেল-স্টীমার হইবার ফলে সারা পৃথিবী জোড়া একটি বাজার তৈয়ারী হইল। কঠোর প্রতিযোগিতা দেখা দিল। শ্রমিক ও ধনিকের বিরোধ জাগিয়া উঠিল। ইহাই বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি।

ধনতন্ত্র (Capitalism): পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত তাহাকে ধনিকতন্ত্র (Capitalism) বলা হয়। জমি এখন আর ক্ষমতার উৎস নহে। যাহারা পুঁজি বা মূলধন সরবরাহ করে সেই ধনিক শ্রেণীই এখন সবাপেক্ষা প্রতাপশালী। শ্রমবিভাগ এখন অত্যন্ত পুংখানুপুংখ-ভাবে প্রতিষ্ঠিত, বাজার এখন সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া।

ধনিকতন্ত্রের এই কয়টি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, ইহাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার মানে। এই শ্রেণীর সমাজে জমি ও মূলধনের উপর ব্যক্তির মালিকানা-স্বত্ব স্বীকার করা হয়। দ্বিতীয়ত, যাহারা মূলধনের মালিক তাহারাই উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ কাহারা কি কি জিনিষ কতটুকু উৎপাদন করিবে তাহা মূলধনের মালিকগণই ঠিক করে। তৃতীয়ত, উৎপাদনের প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন। কোন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যদি যথেষ্ট মুনাফালাভের সম্ভাবনা না থাকে তবে কেহই তাহার উৎপাদনে অর্থ বা শক্তি ক্ষয় করিবে না। উপযুক্ত মুনাফা লাভের সম্ভাবনা থাকিলেই জিনিষটির উৎপাদনে অর্থ ব্যয় করা হয়। তাহার

ফলে সমাজের উপকার বা অপকার যাহাই হউক কিছু আসে যায় না। ধনিকতন্ত্রে ধনী ও নির্ধনের মধ্যে প্রচুর প্রভেদ থাকে। জাতীয় আয় অসমভাবে বণ্টন করা থাকে। ক্রমে ক্রমে একচেটিয়া ব্যবসায়ের সংখ্যা ও প্রভাব বাড়ে। রাসিয়া, চীন ও পূর্ব-ইউরোপীয় রাজ্যগুলি ধনিকতন্ত্র বর্জন করিয়া সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কয়েকটি মৌলিক সংজ্ঞা

দ্রব্য (Goods): ধনকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের যে কার্যাবলী তাহাই ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য। ধন কাহাকে বলে, তাহা প্রথমে জানা দরকার। কতকগুলি দ্রব্যকে ধন বলা হয়। দ্রব্য কি? ধনবিজ্ঞানে দ্রব্যের একটি বিশেষ সংজ্ঞা আছে। মানুষের প্রয়োজন যাহা দিয়া মিটে, যাহা দিয়া অভাব দূর হয় তাহাকে দ্রব্য বলে। ইহা বাস্তব সামগ্রী হইতে পারে—যেমন টেবিল, চেয়ার, ঘড়ি, পাখা ইত্যাদি। আবার শ্রমিকের শ্রমক্ষমতার মত অবাস্তব পদার্থও দ্রব্য। যাহা মানুষের অভাব মিটাইতে পারে, তাহা স্থূল অথবা অবাস্তব, যাহা কিছু হউক না কেন, তাহাকেই দ্রব্য বলা হয়। অভাব মিটাইবার ক্ষমতাকে এক কথায় উপযোগ (Utility) বলে। কাজেই যাহার উপযোগ আছে তাহাই দ্রব্য।

দ্রব্যের নানা শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে মূল্যহীন এবং মূল্যবান দ্রব্যের বিভাগই প্রধান। কোন দ্রব্যের পরিমাণ যদি এত অধিক হয় যে মানুষের যতটা প্রয়োজন তাহা মিটাইয়াও অতিরিক্ত থাকে তবে তাহাকে মূল্যহীন দ্রব্য (Free goods) বলা হয়। নদীর জল, সূর্যের কিরণ, বাতাস প্রভৃতি মূল্যহীন দ্রব্যের পর্যায়ে পড়ে—অভাবের অনুপাতে ইহাদের সরবরাহ প্রচুর বলিয়া ইহাদের কেহ দাম দিয়া কিনিবে না। আবার যে সমস্ত দ্রব্য মানুষের অভাব মিটাইবার পক্ষে অপ্রচুর বা কম, তাহাদিগকে মূল্যবান দ্রব্য (Economic goods) বলা হয়। মূল্যবান দ্রব্যের পরিমাণ সব সময়ে চাহিদার তুলনায় সীমাবদ্ধ। খাদ্য, বস্ত্র, আবাস সবই মূল্যবান দ্রব্যের নিদর্শন।

কোন দ্রব্য এক স্থানে বা এক সময়ে মূল্যহীন হইলেও অপর এক স্থানে বা অন্য সময়ে মূল্যবান হইতে পারে। নদীর ধারে সাধারণত জলের অভাব নাই। সুতরাং নদীর তীরবর্তী গ্রামে জল মূল্যহীন দ্রব্য বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি বড় শহরের বিপুল জনসংখ্যাকে যোগান দিবার মত জল শহরে অভাব। কাজেই শহরে অথবা মরুভূমিতে জল মূল্যবান দ্রব্যের

পর্যায়ে পড়ে। শহরে জলের জন্য কর দিতে হয় এবং মরুভূমিতে পয়সা দিয়া জল কিনিতে হয়।

ধন (Wealth) : সাধারণ লোক ধন বলিতে টাকাকড়ি বুঝে। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে ধন শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। মূল্যবান দ্রব্য মাত্রকেই ধন আখ্যা দেওয়া হয়। যাহা লোকের অভাব দূর করিতে পারে ও যাহা সহজপ্রাপ্য নহে তাহাই ধন। চাহিদার অনুপাতে অপ্রচুর হইলে সেই দ্রব্যকে ধন বলা যায়। দ্রব্যের চারিটি গুণ থাকিলে তাহাকে ধন বলা হয়। যথা, উপযোগ, সীমাবদ্ধ যোগান, হস্তান্তর যোগ্যতা ও তাহা বাহ্যিক হওয়া চাই।

উপযোগ এবং অপ্রাচুর্য ধনের দুইটি পরিচায়ক লক্ষণ। আমাদের অভাব যাহা দূর করিতে অক্ষম তাহা কখনই ধন নহে। সন্ন্যাসীর নিকট পার্থিব বস্তু ধন নহে, কেন না সে "মণিরে না মানে মণি।" বাঁদরের কাছে মুক্তামালার কোন দাম নাই। যাহারা মদ পান করে না তাহাদের কাছে মদ ধন নহে।

কিন্তু অভাব দূর করিবার মত ক্ষমতা থাকিলেই সেই দ্রব্যকে ধন বলা যায় না। দ্রব্যটি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেলে চলিবে না। তাহার যোগান (Supply) সীমাবদ্ধ হওয়া চাই। তবেই তাহাকে ধনের পর্যায়ে ফেলা চলিবে। যোগান অপ্রচুর হইলে দ্রব্যটি সংগ্রহ করিতে পরিশ্রম করিতে হইবে। নদীর ধারে জল ধন নহে, কারণ জল সেখানে সহজলভ্য। শহরে জলের দাম আছে। শহরে জল ধনের পর্যায়ে পড়ে। পরিমিত যোগান ধনের দ্বিতীয় লক্ষণ।

কোন দ্রব্য যদি হস্তান্তর করা সম্ভব (Transferable) না হয়, তবে তাহা কিনিবার জন্য কেহই মূল্য দিবে না। দ্রব্যটির মালিকানাস্বত্ব হস্তান্তর করা সম্ভব না হইলে তাহা কেবলমাত্র বর্তমান মালিকেরই অভাব দূর করিতে পারে। অপরের অভাব ইহার দ্বারা দূর হইবে না। হস্তান্তরিত হইবার অর্থ ইহা নহে যে, দ্রব্যটি স্থানান্তরিত করিতে হইবে। মালিকানাস্বত্ব হস্তান্তরিত করা হইলেই চলিবে। জমি এক স্থান হইতে উঠাইয়া অপর স্থানে লওয়া যায় না। কিন্তু জমি হস্তান্তরিত করা যায়। এইরূপ হস্তান্তরযোগ্য না হইলে কোন দ্রব্যকে ধন বলা হয় না। ইহা ধনের তৃতীয় লক্ষণ।

সমস্ত দ্রব্যই হস্তান্তর করা যায় না। মানুষের অন্তর্নিহিত গুণ হস্তান্তর করা যায় না। তানসেনের মত গায়ক অথবা রবীন্দ্রনাথের মত কবি আপন

ক্ষমতা অপরের নিকট দিতে পারেন না। যে দ্রব্য বাহ্যিক কেবলমাত্র তাহাকেই হস্তান্তর করা যায়। কাজেই ধন বলিয়া গণ্য হইতে হইলে সেই দ্রব্যকে বাহ্যিক হইতে হইবে। ইহা ধনের চতুর্থ ও শেষ লক্ষণ।

বাস্তব এবং অবাস্তব দ্রব্য উভয়কেই ধন বলা যায়। একমাত্র বিচার্য উপরোক্ত চারিটি লক্ষণ উহার আছে কি না। প্রথম, উপযোগ থাকিবে; দ্বিতীয়, চাহিদার অনুপাতে যোগান হইবে অপ্রচুর; তৃতীয়, উহা হস্তান্তর করা চলিবে এবং চতুর্থ, উহা বাহ্যিক হইবে। কোন দ্রব্যকে ধন বলিবার জন্য বিচার করিতে হইলে এই চারিটি লক্ষণ আছে কিনা দেখিতে হইবে। দেশের আব-হাওয়াকে ধন বলা যায় না, কারণ তাহা হস্তান্তর করা যায় না। মানুষের বিশেষ গুণাবলী ধন নহে। রবীন্দ্রনাথ বা ইকবালের ক্ষমতা হস্তান্তব করা যায় না, উহা বাহ্যিক নহে। কাজেই তাহা ধন নহে।

সুতরাং ধন বলিতে আমরা এমন সামগ্রী বুঝি যাহার উপযোগ আছে (অর্থাৎ যাহা আমাদের অভাব মিটাইতে পারে); যাহার যোগান চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর, যাহা হস্তান্তর করা যায় এবং যাহা বাহ্যিক। ইহার যে কোন একটি লক্ষণ না থাকিলে সেই সামগ্রা ধন বলিয়া গণ্য হয় না।

ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত এবং জাতীয় ধন (Personal, Collective and National wealth): প্রত্যেক লোকের যত মূল্যবান সামগ্রী আছে, তাহাই তাহার ব্যক্তিগত ধন। বাড়ী ঘরের মত বাস্তব দ্রব্য যাহা একান্তই ব্যক্তিগত ধন, অথবা ব্যবসা্য়ের সুনামের মত অবাস্তব দ্রব্যও ধন। কেননা ব্যবসায়ের সুনাম বাজারে বেচাকেনা যায়। ব্যক্তিগত ধন ছাড়াও **সমষ্টিগত ধন** (Collective wealth) আছে। সমাজের সকলে তাহার মালিক। হাওড়ার পুল, রেলপথ, সেচের জন্য খাল, রাস্তাঘাট এগুলি কোন ব্যক্তি-বিশেষের সম্পত্তি নহে। জনসাধারণই এইগুলির মালিক। এইগুলি আমাদের প্রয়োজন মিটায়। ইহাদের যোগানও অপ্রচুর নহে এবং ইহারা বাহ্যিক পদার্থের পর্যায়ে পড়ে। কাজেই এইগুলিকে সমষ্টিগত ধন বলা যায়।

দেশের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ধনের সহিত সমষ্টিগত ধন যোগ করিলেই **জাতীয় ধনের** (National wealth) পরিমাণ জানিতে পারা যায়। ইহাই সাধারণ মত। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। এমন অনেক সামগ্রী আছে যাহা লোকে ব্যক্তিগত ধন হিসাবে মনে করে। কিন্তু তাহা জাতীয় ধন হিসাবে গণ্য

নহে। ন্যাসনাল সেভিং সার্টিফিকেট অথবা কোম্পানীর কাগজ (Promissory note) নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত ধন। কারণ এই কাগজগুলিতে ধনের সবগুলি লক্ষণ বর্তমান। কিন্তু ইহা আসলে ঋণ পত্র। সরকার জনসাধারণের পক্ষ হইতে এই ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। কাজেই জাতীয় ধন হিসাব করিবার সময় মোট ধনের পরিমাণ হইতে সরকারী ঋণের পরিমাণ বাদ দিতে হইবে।

আয় (Income) : একটি লোক প্রতি মাসে অথবা প্রতি বৎসরে যত টাকা উপার্জন করে তাহাই লোকটির মাসিক বা বাৎসরিক আয় বলিয়া ধরা হয়। ইহা তাহার মোট আয় (Gross income)। অনেক সময়েই দেখা যায় যে এই অর্থোপার্জন করিতে লোকটিকে কিছু ব্যয় করিতে হইয়াছে। যেমন, উকিলদের একজন মুহুরী রাখিতে হয় এবং তাহাকে মাহিনা দিতে হয়। সুতরাং উকিলের মোট আয় হইতে মুহুরীর মাহিনা বাবদ যে টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা বাদ দিতে হইবে। বাদ দিলে যে টাকা থাকিবে তাহাই হইল উকিলের নীট আয় (Net income)।

এই ভাবে যে আয় নির্ধারণ করা যায় তাহাকে আর্থিক আয় (Money income) বলা হয়। আবশ্যকীয় খরচ খরচা বাদ দিয়া মোট আয় হইতে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই আর্থিক আয়। আর্থিক আয়ের পরিমাণ জানিয়া লোকের অবস্থা স্বচ্ছল কি অস্বচ্ছল তাহা সব সময়ে বুঝা যায় না। একটি লোক ১৯৩৯ সালে বৎসরে ১২০০৲ টাকা আয় করিত। বর্তমানে সে ২৫০০৲ টাকা আয় করে। আপাতদৃষ্টিতে তাহার অবস্থা ভাল হইয়াছে বলিতে হইবে।

কিন্তু ১৯৩৯ সালে একমণ চালের দাম ছিল চার টাকা ও বর্তমানে সেই চালের জন্য তাহাকে ২৫৲ টাকা দিতে হয়। অন্যান্য জিনিষের দামও সেইরূপ চার পাঁচ গুণ বাড়িয়াছে। সুতরাং লোকটির আসল অবস্থার উন্নতি না হইয়া বরং অবনতি হইয়াছে। অর্থাৎ ১৯৩৯ সালের রোজগার দিয়া সে যাহা যাহা কিনিতে পারিত, ১৯৫৩ সালের রোজগার ডবল হইলেও সে অনেক কম জিনিষ কিনিতে পারে। এইজন্য ধনবৈজ্ঞানিকেরা আর্থিক আয় অপেক্ষা **সামগ্রীক আয় (Real income)** এর পরিমাণ কত তাহাই জানিতে চাহেন। কোন কোন দ্রব্য কত পরিমাণে সে ক্রয় করিতে পারে তাহা দিয়া সামগ্রীক আয়ের নির্ণয় করা হয়।

ব্যক্তিগত আয়ের মত জাতীয় আয় (National income) একই ভাবে নির্ণয় করা হয়। দেশের প্রত্যেক লোকের আয় ও জাতীয় সম্পত্তির আয় যোগ দিলে জাতীয় আয়ের পরিমাণ জানা যায়। অবশ্য কাহারও দেনা থাকিলে কিংবা সরকারের দেনা থাকিলে তাহা মোট জাতীয় আয় হইতে বাদ দিতে হইবে।

মূল্য (Value): যাহার মূল্য আছে তাহাই ধন। কিন্তু মূল্য কাহাকে বলে? মূল্য কথাটির দুই অর্থ—প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে এবং বিনিময়ের দিক হইতে। জল ও বাতাস প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে অমূল্য। ইহাকে **প্রয়োজনমূল্য** (Value-in-use) বলে।

বিনিময়মূল্য (Value-in-exchange): একটি দ্রব্যের বিনিময়ে যে পরিমাণ অন্য দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাকে প্রথম দ্রব্যের বিনিময়মূল্য বলা হয়। এক মণ চাউলের পরিবর্তে যদি দুইমণ গম পাই তাহা হইলে চাউলের বিনিময়মূল্য দুইমণ গম। ধনবিজ্ঞানে মূল্য কথাটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিনিময়ে অপর দ্রব্যের যে পরিমাণ পাওয়া যাইবে তাহাই প্রথম দ্রব্যটির মূল্য। সাধারণত টাকা দিয়া মূল্য নিরূপণ করা হয়। একটি দ্রব্যের বিনিময়ে যত টাকা পাওয়া যায় তাহাই উহার **দাম** (Price)। পনের টাকায় এক মণ চাউল পাওয়া গেলে চালের দাম পনের টাকা মণ বলা হইবে।

কোন দ্রব্যের মূল্য থাকিতে হইলে দ্রব্যটির উপযোগ থাকিবে, তাহা দুষ্প্রাপ্য এবং হস্তান্তরযোগ্য হইবে। দ্রব্যটি দিয়া অভাব না মিটিলে তাহা কেহ কিনিবে না। দ্রব্যটি সহজপ্রাপ্য হইলে, ধনী দরিদ্র সকলেই বিনা আয়াসে তাহা লাভ করিতে পারিলে, দাম দিয়া কেহ তাহা কিনিবে না। যদি দ্রব্যটি হস্তান্তর করা না যায় তাহা হইলে দাম দিয়া কিনিবার কোন অর্থ হয় না। ধনেরই এইসব লক্ষণ। কাজেই যাহার বাজারে মূল্য আছে তাহাকেই ধন বলে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভোগ এবং অভাব

ভোগ (Consumption) : কথাটির অর্থ দ্রব্যের ব্যবহার, দ্রব্য নষ্ট করা নয়। ভোগের অর্থ কোনও দ্রব্য নিঃশেষ করা নহে। দ্রব্য ভোগ করার অর্থ হহার দ্বারা আমাদের অভাব মিটানো। চেয়ারে বসিলে আরাম পাই। এই আরাম পাওয়ার নামই ভোগ। শীতাতপ-নিবারণের জন্য জামা পরিলে সেই প্রয়োজন মিটে। কাজেই ভোগ কথাটির অর্থ অভাব বা প্রয়োজন মিটানো।

উৎপাদন এবং ভোগ পরস্পরের সহিত জড়িত। আমরা ভোগ করিতে চাহি বলিয়াই দ্রব্যের উৎপাদনের স্থুরু হয় ও ভোগেই উৎপন্ন দ্রব্যের পরিণতি। অভাব দূর করিবার জন্য মানুষ নানা রূপ উৎপাদনের কার্যে আত্মনিয়োগ করে। অভাববোধ যত বেশী রকমের হইবে, মানুষ ততই নানাবিধ দ্রব্য উৎপাদন করিবে। আদিম জীবনযাত্রা অত্যন্ত সরল ও মানবের প্রয়োজন কম ছিল বলিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থাও নিতান্তই সরল ছিল। স্তরে স্তরে সভ্যতার যত উন্নতি হইতেছে, মানুষের অভাব ক্রমে ক্রমে ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। সেই অভাব দূর করিবার জন্য মানুষ নানা জাতীয় দ্রব্যের উৎপাদনে লাগিয়া পড়ে। অভাব লোককে কর্মে প্রবৃত্তি দেয়; কম হইতেহ দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং দ্রব্য আমাদের অভাব দূর করে।

কাজেই ভোগের প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কিন্তু রিকার্ডো, মিল প্রভৃতি প্রথম যুগের ধনবৈজ্ঞানিকেরা এই দিকটির প্রতি তত বেশী দৃষ্টি দেন নাই। কিন্তু ধনবিজ্ঞানের আধুনিক পণ্ডিতেরা এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ জোর দেন। অধ্যাপক মার্সালের "Principles of Economics" এখনও প্রামান্য গ্রন্থ বলিয়া ধরা হয়। ঐ গ্রন্থের প্রথম দিকের কয়েকটি পরিচ্ছেদে এই বিভাগটি আলোচিত হইয়াছে।

অভাব (Wants) : মানুষ কি কি কারণে অভাব বোধ করে? অনেকগুলি বিষয় হইতে অভাবের উদ্ভব হয়। জীবনধারণের জন্য আমরা বহু প্রকারের দ্রব্যের অভাব বোধ করি। কিছু খাদ্য, বস্ত্র ও গৃহ, ইহা না

থাকিলে আমাদের জীবনধারণ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, তাহা ছাড়াও অন্য কতকগুলি দ্রব্যের অভাব আমরা অনুভব করি; কারণ দীর্ঘ দিন ধরিয়া উপভোগের ফলে তাহা অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছে। এই শ্রেণীতে চা, তামাক প্রভৃতি পড়ে। তৃতীয়ত, লোকের মধ্যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিবার ইচ্ছা হইতেও কোন কোন দ্রব্যের অভাব অনুভূত হয়। মহিলারা আধুনিকতম নকশার শাড়ী এবং গহনা এই কারণেই পরিতে ভালবাসেন। একটু বিশ্লেষণ করিলেই বোঝা যায় যে, মানুষ সমাজে বাস করে বলিয়া কেবলমাত্র জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যের অভাব অনুভূত হয়। মানুষের অভাববোধ সামাজিক পরিস্থিতি ও রীতিনীতি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। এক দেশের মেয়েরা কখনই সালোয়ার পরে না, আবার অন্যদেশে সালোয়ার ছাড়া আর কিছু মেয়েরা পরিবে না। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ নিরামিশ আহার করে, আর অব্রাহ্মণেরা মাছ, মাংস খাইতে ভালবাসে। জীবনধারণের জন্য যাহাকে একান্ত প্রয়োজনীয় বলা হইয়াছে, এমন কি তাহাও সামাজিক রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবান্বিত। বাঙ্গালী ভাত খাইতে চায়, পাঞ্জাবীরা ডাল-রুটি পাইলেই খুশী। আমরা যাহা খাই অথবা পরি, তাহা এইভাবে সামাজিক রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। যাহাদের মধ্যে আমরা বাস করি তাহাদের মত এবং রুচি অনুযায়ী আমাদের অভাববোধ এবং রুচি গড়িয়া উঠে।

অভাবের প্রকৃতি (Characteristics of wants) : যে কারণেই অভাববোধ জাগরূক হউক না কেন, অভাবের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। সন্ন্যাসীফকিরের কথা বাদ দিলে বলা যায় যে মানুষের অভাবের কোন শেষ নাই। 'যার ছেলে যত পায়, তার ছেলে তত চায়।' একটি অভাব দূর হইতে না হইতেই নূতন আর একটি অভাব দেখা দেয়। যখন সাধারণ ডালভাত খাই তখন পোলাও মাংসের জন্য মনে আকাংখা জাগে। নূতন নূতন জমকালো পরিচ্ছদ আমরা চাই। প্রতি দিন প্রতি বৎসর আমরা নূতন নূতন অভাব বোধ করি। এই কারণে প্রাচীন ধনবৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, বাহুল্য উৎপাদন সম্ভব নহে। আমাদের সকল অভাব দূর করিবার দ্রব্য যোগান দেওয়া অসম্ভব। কারণ যে মূহুর্তে আমাদের একটি অভাব দূর হইবে, পর মূহুর্তে আর একটি নূতন অভাব দেখা দিবে।

যদিও সাধারণভাবে মানুষের অভাবের কোন সীমা নাই, তথাপি একটি

বিশেষ সামগ্রীর অভাব সীমাবদ্ধ। যে কোন সামগ্রীই হউক আমরা তাহা যতই পাই ততই তাহা পাইবার আকাংখা কমিয়া যায়। যখন একটি না পাই তখন তাহার অভাব হয়ত খুব তীব্রভাবে বোধ করি। কিন্তু তাহা পাইবার পর অভাবের তীব্রতা কমে ও তাহা যত বেশী করিয়া পাই, তাহার অভাববোধও ক্রমেই কমিতে থাকে। আগার্য পাইলে মানুষের খাদ্যের অভাববোধ ক্রমশ দূর হইতে হইতে একেবারেই মিটিয়া যায়। প্রত্যেক অভাব সম্বন্ধেই এই কথা বলা যায়। ইহাই অভাবের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। এই তথ্য হইতে ধনবৈজ্ঞানিকেরা একটি সূত্র স্থির করিয়াছেন। একটি দ্রব্য যত বেশী পাওয়া যায়, ততই তাহার উপযোগ কমিয়া আসে। ইহাকে হ্রাসমান উপযোগের নিয়ম বা Law of Diminishing utilty বলা হয়।

যদিও আমাদের অভাব অসংখ্য, কিন্তু সব অভাব পূরণ করিবার শক্তি বা অর্থ আমাদের নাই। একটি অভাব পূর্ণ করিলে অন্য আর একটি অপূর্ণ থাকিয়া যায়। খাদ্যের জন্য বেশী অর্থ ব্যয় করিলে হয়ত সঞ্চয়ের পরিমাণ কম পড়িয়া যায়। কাজেই কোন্ কোন্ অভাব পূর্ণ করিব, তাহা আমাদের বিচার করিয়া ঠিক করিতে হয়। আমাদের অভাবগুলি যেন পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে। প্রত্যেকটি অভাবই যেন বলিতেছে আমাকে আগে পূর্ণ কর। এই প্রতিযোগিতার ফলে যে দ্রব্যের প্রয়োজন অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভূত হয়, তাহাই প্রথমে পূরণ করিবার দিকে লোকে দৃষ্টি দেয়। মার কাছ হইতে পাওয়া একটি পয়সা দিয়া ঘুড়ি না লজেঞ্জ কিনিব এই বিপদে কোন শিশু না পড়িয়াছে? অভাবের এই প্রকৃতি হইতে আর একটি নিয়ম আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার নাম পরিবর্তনের নিয়ম বা সমপ্রান্তিক উপযোগের নিয়ম (Equi-marginal utility)। দুইটি অভাবের মধ্যে যেটি তীব্রতর তাহাকেই সকলে প্রথমে মিটাইবে। কিন্তু একটি অভাব যতই মিটানো যায় ততই তাহার তীব্রতা কমে। ফলে প্রত্যেকেই এমন অবস্থায় পৌছাইবে যখন দুইটি অভাবের তীব্রতা সমান হইবে।

এমন কতকগুলি অভাব আছে যাহা একসঙ্গেই অনুভূত হয়। ক্ষুধা বোধ করিলে ভাত, ডাল, রুটি, নুন, মশলা সব কিছুরই অভাব একসঙ্গে মনে জাগে কারণ সব মিশাইয়া খাদ্য রন্ধন হয়। চায়ের অভাব মিটাইতে হইলে চা, চিনি, দুধ প্রভৃতি একসঙ্গে প্রয়োজন। কাজেই একটি অভাব অপরটির অনুপূরক।

অভাবের শ্রেণী বিভাগ (Classification of wants) : অভাবের প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ করা হয়। ইহা প্রধানত দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হয়, প্রয়োজনীয় (Necessaries) ও অপ্রয়োজনীয়। আমাদের বাঁচিতে হইলে কতকগুলি অভাব মিটাইতেই হইবে। যে সকল দ্রব্য আমাদের এই শ্রেণীর অভাব দূর করে তাহা প্রয়োজনীয়ের পর্যায়ে পড়ে। ইহাদের আবার তিনভাগে ভাগ করা হয় :—যথা, জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয়, কর্মক্ষমতা অব্যাহত রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয়, অভ্যাসজনিত প্রয়োজনীয়।

কয়েকটি দ্রব্য আছে যাহা না পাইলে মানুষ বাঁচিতেই পারে না। কিছু খাদ্য ও জল, সাধারণ বস্ত্র এবং একটি গৃহ, জীবনের সবনিম্ন প্রয়োজন ইহাই। ইহাদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য (Necessaries for life) বলা হয়। কিন্তু কার্যক্ষমতা অব্যাহত রাখিবার জন্য এই সবনিম্ন প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক সামগ্রী চাই। যেমন সামান্য খাদ্য পাইলে হয়ত কায়ক্লেশে জীবনধারণ সম্ভব হয়। কিন্তু কার্যক্ষমতা বজায় রাখিতে হইলে অধিক ও পুষ্টিকর খাদ্য চাই। দৈহিক শ্রম যে করে তাহার অধিক পরিমাণে খাদ্য চাই। সাধারণত যাহারা তত গুরু পরিশ্রম করে না, তাহাদের অপেক্ষাকৃত কম খাদ্য হইলেও চলে। শুধু মাত্র প্রাণে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য শিক্ষা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যে কাজ করিতে চায় তাহার কর্মকুশলতা অর্জন করিবার জন্য শিক্ষা চাই। এইগুলি কর্মক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় (Necessaries for efficiency)। অভ্যাসবশত কয়েকটি দ্রব্য প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়ায়; জীবনধারণের জন্য অথবা কার্যক্ষমতা বজায় রাখিতে ইহাদের প্রয়োজন নাই। কিন্তু লোকে দ্রব্যগুলি ব্যবহার করিতে করিতে এতই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, উহা না হইলে তাহাদের চলে না। হঠাৎ কোন কারণে আয় কমিয়া গেলে তাহারা অধিকতর প্রয়োজনীয় দ্রব্য কমাইয়া দিয়াও কিছু কিছু এই শ্রেণীর সামগ্রী কিনিবে। বিড়ি, তামাক, পান বাচিবার জন্য অপ্রয়োজনীয়। কর্মকুশলতাও কিছু তাহাতে বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু সাধারণ লোকের অভ্যাস এমন দাঁড়াইয়াছে যে অন্য জিনিষ বাদ দিয়া তাহারা বিড়ি তামাক কিনিবে। তামাক, চা, পান, সুপারী ইত্যাদি দ্রব্যকে অভ্যাসজনিত প্রয়োজনীয় বলা হয় (Conventional necessaries)। এইগুলির জন্য অর্থব্যয় করিতে না পারিলে অনেকের জীবন অর্থহীন মনে হয়।

অপ্রয়োজনীয় অভাবও দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, আরাম (Comfort) এবং বিলাস (Luxury)। প্রয়োজনীয় দ্রব্য না পাইলে জীবনযাপন সম্ভব নহে। যাহা জীবনযাত্রা আরামপ্রদ করিয়া তোলে তাহাকেই বলিব আরামের সামগ্রী। সুস্বাদু আহার্য, সুন্দর পরিধেয় ও মনোরম গৃহ, কিছু আসবাব, তেলসাবান, বই, খেলাধূলার সামগ্রী, আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা—সবই আরামের জন্য। এইগুলি পাইলে জীবনযাত্রা মধুর হইয়া উঠে।

বিলাস-সামগ্রীর সংজ্ঞা লইয়া মতভেদ আছে। মোটকথা যাহা অপ্রয়োজনীয় অথচ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, তাহাকেই বিলাস-সামগ্রী বলা হয়। যে অপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য অত্যন্ত বেশী তাহাকে বিলাসের পর্যায়ে ফেলা হয়। আরাম এবং বিলাস সামগ্রীর মধ্যে প্রকৃতিগত কোন ভেদ নাই, ভেদ কেবল মাত্রার। সুস্বাদু খাদ্যকে আরামের পর্যায়ে ফেলিলে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য আহার্যকে বিলাস বলিব। কোনটি প্রয়োজনীয়, কোনটি আরামের ও কোনটি বিলাসের দ্রব্য বলিয়া গণ্য হইবে, তাহা অনেকটা লোকের ও সমাজের উপর নির্ভর করে। ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছে ও এখনও হইতেছে। আজ আমরা যাহাকে প্রয়োজনীয় বা আরামের সামগ্রী বলিয়া মনে করি, আমাদেব পূর্বপুরুষেরা তাহার মধ্যে অনেক জিনিষকেই বিলাস-সামগ্রী মনে করিত। ৪০।৫০ বৎসর পূর্বে চা-পান বিলাসিতা বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু এখন উহা প্রয়োজনের পর্যায়ে পড়িয়াছে। কোন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের নিকট মোটরগাড়ী বিলাসের সামগ্রী; কিন্তু একজন ডাক্তারের নিকট ইহা প্রয়োজনীয় দ্রব্য বলিয়া গণ্য হয়।

বিলাস-ব্যসনে অর্থব্যয় কি নিন্দনীয়? (Is the consumption of luxuries harmful ?) : বিলাসের সামগ্রী যেন নিষিদ্ধ ফল। আমাদের সকলেরই ইচ্ছা যে আমরাও উহা ভোগ করি। কিন্তু বহু লেখক বিলাস-ব্যয়ের নিন্দা করেন। তাঁহাদের যুক্তি এই—আমেরিকার অধিবাসীরা বিলাস স্রোতে গা ভাসাইয়া দিতে পারে, কারণ তাহাদের প্রচুর অর্থ আছে। কিন্তু ভারতবাসী কেন তাহা অনুকরণ করিবে? আমাদের দেশ অত্যন্ত দরিদ্র। এখানে কোটি কোটি লোক অর্দ্ধাহারে অনাহারে দিন কাটায়। কাজেই যে সকল ভাগ্যবানের অর্থ আছে তাহাদের পক্ষে বিলাসে অর্থ নষ্ট করা উচিত নহে। যাহারা ধনী তাহারা হয়ত নিজেদের সমর্থনে এই যুক্তি

দেখাইবে যে, তাহাদের ব্যয় একেবারে মূল্যহীন নহে। তাহারা ব্যয় করে বলিয়াই বহু লোক কাজ পায়। ভৃত্য, চিত্রকর, স্থপতি, স্বর্ণকার প্রভৃতি ধনীদের অর্থেই পালিত। ধনীরা ব্যয় করে বলিয়াই উপরোক্ত লোকের জীবিকা-অর্জনের পথ হয়। ধনীরা অর্থব্যয় না করিলে তাহারা বেকার হইয়া পড়িবে। আপাতদৃষ্টিতে সত্য মনে হইলেও এই যুক্তি আসলে সত্য নহে। ধনীর স্ত্রী মুক্তামালা কিনিলে ডুবুরী, কারিগর ও ব্যবসায়ী প্রভৃতির কাজ অবশ্য জোটে। কিন্তু মুক্তামালা না কিনিয়া ধনীর স্ত্রী যদি একটি অনাথাশ্রম স্থাপন কবিত তবে বহুসংখ্যক লোকের জীবনের বোঝা হালকা হইয়া যাইত।

বিলাস-ব্যসনে অর্থব্যয় করা কি তবে নিন্দনীয়? ইহার বিচার কবিতে হইলে বিলাসের প্রকারভেদ করা প্রয়োজন। মদ্যপান একটি বিলাস, যাহাব ফল বিষময়। আবার শাহজাহানের বিলাসপ্রিযতাব ফলেই তাজমহলের সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। হিন্দু রাজা ও মুসলমান নবাবের বিলাসপ্রিয়তার ফলেই মসলিন তৈয়ারী সম্ভব হইযাছিল। কাজেই কোন কোন বিষয়ে বিলাস অনেক সময়ে দেশের উপকাব করে। চিত্রকলা, স্থাপত্য প্রভৃতির উন্নতিকল্পে অতীতে বিলাসীদের ব্যয় অবিস্মবণীয়। আরও একদিক হইতে বিলাস সমর্থনযোগ্য। বিলাসপ্রিয়তা লোককে কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। আয় না বাড়িলে ঈপ্সিত বিলাস সামগ্রী পাওয়া যাইবে না। কাজেই আয় বাড়াইতে হইবে। ফলে মানুষের কর্মস্পৃহা বাড়ে এবং দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পায়। কাজেই অর্থনৈতিক দিক হইতে বিলাসেব বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলা যায় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উপযোগ ও চাহিদা

উপযোগ (Utility): আমাদের অভাববোধ আছে বলিয়া আমরা দ্রব্য কিনিতে বা সংগ্রহ করিতে চাই। অভাব হইতে আকাংখা (desire) জন্মে। প্রথমেই একটা সাবধানতা অবলম্বন করা কর্তব্য। ধনবিজ্ঞানে আকাংখা কথাটির অর্থ সাধারণ অর্থ অপেক্ষা স্বতন্ত্র। যে কোন দ্রব্য পাওয়ার ইচ্ছাকেই "আকাংখা" বলা চলিবে না। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে "ছেড়া কাঁথায় শুইয়া লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে।" এই ধরণের ইচ্ছাকে ধনবিজ্ঞানে আকাংখা বলে না। কেবল মনে ইচ্ছা জাগিলেই চলিবে না। ঈপ্সিত দ্রব্য ক্রয় করিবার মত সামর্থ্য যদি সেই ব্যক্তির থাকে, তবেই তাহার ইচ্ছাকে ধনবিজ্ঞানে আকাংখা বলে। আকাংখা বলিতে কোন দ্রব্যের জন্য অভাববোধ বা ইচ্ছা এবং সেই জন্য টাকা খরচ করিবার ক্ষমতা ও ইচ্ছাও থাকা চাই।

এখন একটি নূতন শব্দ ব্যবহার করা হইবে। কথাটি হইতেছে উপযোগ (utility)। সাধারণত লোকে ইহার অর্থে প্রয়োজনীয়তা বুঝে। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে এই কথাটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অভাব মিটাইবার ক্ষমতাকে উপযোগ বলা হয়। প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয়, ভাল কিংবা মন্দ যে কোন জিনিষের দ্বারা আমাদের অভাব মিটানো যায় তাহারই উপযোগ আছে বলিতে হইবে। যাহা আকাংখা পূরণ করিতে পারে, তাহারই উপযোগ আছে। কোনও কোনও দ্রব্য বিশেষ ক্ষতিকর। তথাপি তাহার দ্বারা যদি মানুষের আকাংখা চরিতার্থ হয় তবে তাহার উপযোগ আছে বলিতে হইবে। যখন বলি কোন দ্রব্যের উপযোগ আছে, তখন তাহা প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় তাহা লইয়া মাথা ঘামাই না। শুধু এইটুকু বুঝি যে তাহা কোন না কোন লোকের অভাব মোচন করিতে পারে।

হ্রাসমান উপযোগের সূত্র (Law of Diminishing utility): মানুষের অভাবের সীমা না থাকিলেও কোন একটি বিশেষ দ্রব্যের জন্য অভাবের সীমা আছে। কোন একটি বিশেষ খাদ্যদ্রব্য পাইলে তাহার অভাব ক্রমেই কমিয়া যায়। অভাব হইতে আকাংখা জন্মে। কাজেই লোকে খাদ্য পাইতে

থাকিলে তাহাদের খাদ্য লাভের আকাংখা ক্রমশই কমিয়া যাইবে। এমন একটি অবস্থা নিশ্চয়ই আসিবে যখন খাদ্যের আকাংখা ত থাকিবেই না, বরং খাদ্যের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগিবে। বৈশাখের রৌদ্রে যাহাকে অনেকক্ষণ ঘুরিতে হয়, এক গ্লাস ঠাণ্ডা সরবৎ তাহার খুবই ভাল লাগিবে। এক গ্লাস সরবৎ পান করার পর দ্বিতীয় গ্লাস সরবতের জন্য আকাংখা পূবের মত হয়ত ততটা তীব্র থাকিবে না। দ্বিতীয় গ্লাস সরবৎ পান করিবার পরে আরো সরবৎ পানের আকাংখা আদৌ না থাকা বিচিত্র নহে। এই সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতে এই সূত্রটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হ্রাসমান উপযোগের সূত্র নামে খ্যাত।

একটি দ্রব্য যত বেশী আমরা পাই ততই তাহা পাইবার আকাংখা কমিয়া যায়, অর্থাৎ সামগ্রীর উপযোগ কমিয়া যায়। ইহাকেই সূত্রাকারে এইভাবে বলা যায়। কোন একটি দ্রব্য যত বেশী লাভ অথবা ব্যবহার করা যায়, ততই তাহার উপযোগ কমিয়া আসে। দ্রব্যটির জন্য তীব্র আকাংখা থাকিলে তাহার জন্য আমরা অধিক মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকি। আবার আকাংখা কম হইলে দামও কম দিয়া থাকি। আমরা যতই দ্রব্যটি বেশী পরিমাণে পাই ততই তাহা পাইবার আকাংখা কমিয়া আসে। কাজেই আমরা ক্রমেই তাহার জন্য কম মূল্য দিব। যেমন, কমলালেবুর কথা ধরা যাউক। শ্যামের হয়ত কমলালেবু খাইবার এমন প্রবল ইচ্ছা আছে যে প্রথম লেবুটির জন্য সে হয়ত চার আনা দিতে প্রস্তুত আছে। এই লেবুটি খাওয়ার পর তাহার লেবু খাইবার আকাংখা খানিকটা কমিবে। কাজেই লেবু কিনিবার আগ্রহও তাহার কমিয়া আসিবে। দ্বিতীয় লেবু খাইবার আকাংখা প্রথমটির অপেক্ষা কম হইবে। কাজেই দ্বিতীয় লেবুর জন্য সে হয়ত বার পয়সার বেশী দিতে চাহিবে না। দুইটি লেবু খাইবার পরও তৃতীয় লেবু খাইবার ইচ্ছা তাহার হয়ত থাকিতে পারে। কিন্তু দুইটি লেবু পর পর খাওয়াতে লেবু খাইবার আকাংখা অনেকটা মিটিয়াছে। কাজেই তৃতীয় লেবুর জন্য সে হয়ত দুই আনার বেশী দাম দিবে না। কেহ যদি একটি দ্রব্য ক্রমে ক্রমে পায় তবে তাহার নিকট সেই দ্রব্যের উপযোগ কমিয়া যাইবে এবং সেও ক্রমশ কম দাম দিবে। ইহা নিম্নলিখিত রেখাচিত্র দ্বারা সহজে বুঝাইয়া দেওয়া যায়।

কমলালেবুর পরিমাণ কগ অক্ষে ধরা যাউক এবং প্রত্যেকটি লেবুর উপযোগের মাপ থাকুক কখ অক্ষে। প্রথম কমলালেবু হইতে যে উপযোগ

পাওয়া যায় তাহার মাপ **টচ** অংশ ; দ্বিতীয় লেবুর উপযোগ **ঠছ** ; তৃতীয় লেবুর উপযোগের মাপ **ডজ** এবং চতুর্থ লেবুর উপযোগের মাপ **ঢঝ**। **চ ছ জ ঝ** বিন্দু-গুলি যোগ করিলে যে রেখা পাওয়া যায় তাহা হ্রাসমান উপযোগের রেখা। ইহার গতি নিম্নদিকে। কারণ যত বেশী দ্রব্য পাইবে, তাহার উপযোগ ততই কমিবে।

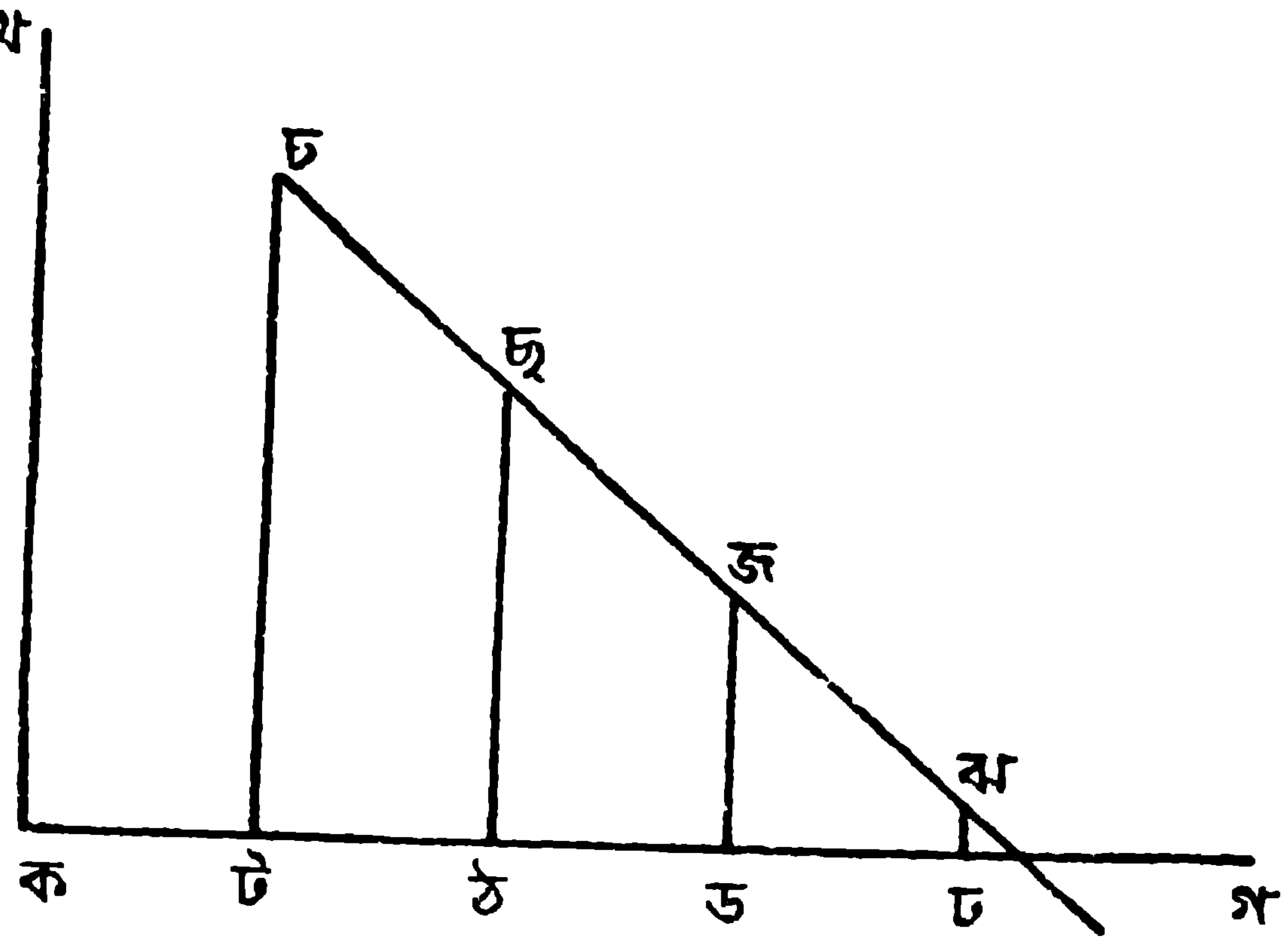

১নং চিত্র

ব্যতিক্রম (Limitations) : অবশ্য এই নিয়মের কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। কৃপণের অর্থলাভের আকাংখা ক্রমাগত টাকা পাইলেও কমে না। ইহা সত্য। ইহার উত্তরে ধনবৈজ্ঞানিক বলিতে পারেন যে, স্বাভাবিক ও সাধারণ মানুষ লইয়াই তাহার কারবার। অর্থাৎ সূত্রটি সাধারণ লোকের সম্বন্ধেই আরোপ্য। কৃপণের মানসিক অবস্থা অস্বাভাবিক। কাজেই তাহার কাজ ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য নহে।

দ্বিতীয়ত, একটি দ্রব্য পাইতে থাকিলে ক্রমে ক্রমে তাহার জন্য আকাংখা তখনই কমিবে, যখন দ্রব্যটি উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। তৃষ্ণার্ত লোককে ছোট একটি গ্লাসে সরবৎ আনিয়া দিলে দ্বিতীয় গ্লাসের জন্য তাহার আকাংখা প্রথম গ্লাসের মতই তীব্র থাকিতে পারে। কিন্তু গ্লাসটি বড় হইলে একটি গ্লাসেই তৃষ্ণা অনেকখানি নিবারিত হয়। কাজেই দ্বিতীয় গ্লাস সরবতের আকাংখা তত তীব্র থাকে না। কেন দ্রব্যের জন্য আকাংখা তখনই কমিবে যখনই তাহা প্রত্যেকবারই উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যাইবে। তৃতীয়ত, সূত্রটি বলিবার সময় ধরিয়া লওয়া হয় যে মানুষের রুচি ও অভ্যাস ইহার মধ্যে

অপরিবর্তিত থাকে। রুচি ও অভ্যাস পরিবর্তিত হইলে এই সূত্র নাও খাটিতে পারে। কেহ মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিলে ইহা তাহার অভ্যাসে দাঁড়াইতে পারে। তখন একপাত্র মদ্য পান করিবার পর দ্বিতীয় পাত্রের জন্য তাহার আকাংখা হয়ত না কমিতে পারে। ইহাকে অবশ্য সূত্রটির ব্যতিক্রম বলা যায় না, কারণ মদ্যপানের ফলে লোকটির অভ্যাস এবং রুচি একেবারেই বদলাইয়া গিয়াছে। সে একেবারে ভিন্ন লোক হইয়া যায়। কাজেই হ্রাসমান উপযোগের সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া হয়। কেহ যদি একটি দ্রব্য ক্রমাগত পাইতে থাকে বা ভোগ করে, তাহা হইলে অন্য কোন বিষয়ে কোন পরিবর্তন না হইলে দ্রব্যটির উপযোগ তাহার নিকট কমিয়া আসিবে।

প্রান্তিক উপযোগ ও সামগ্রিক উপযোগ (Marginal utility & Total utility) : পূর্বে কমলালেবুর যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখিয়াছি ছেলেটি প্রথম লেবুর জন্য চার আনা দিতে প্রস্তুত ছিল। অর্থাৎ প্রথম কমলালেবুটি হইতে যে পরিমাণ উপযোগ পাওয়া সম্ভব মনে করে তাহার জন্য সে চার আনা দিতে প্রস্তুত ছিল। তেমনি দ্বিতীয় কমলালেবু হইতে যে পরিমাণ উপযোগ সে পাইবে আশা করে তাহার জন্য বার পয়সা দিতে রাজী আছে। কাজেই এই দুইটি কমলালেবু হইতে মোট ১৬+১২=২৮ পয়সা মূল্যের উপযোগ পাইবে আশা করে। তাহার নিকট দুইটি লেবুর সামগ্রিক উপযোগ ২৮ পয়সা হইবে। ছেলেটি তৃতীয় লেবুটি দুই আনা দিয়া কিনিতে প্রস্তুত আছে। এই তিনটি লেবুর সামগ্রিক উপযোগ ১৬+১২+৮=৩৬ পয়সা। কাজেই একটি দ্রব্যের সব কয়টি হইতে লোকে যে মোট উপযোগ পায়, তাহারই পরিমাপকে সামগ্রিক উপযোগ (total utility) বলে।

প্রান্তিক উপযোগ বলিতে সাধারণত ক্রেতা শেষ যে জিনিষটি কিনিয়াছে, তাহার উপযোগকে বুঝায়। শ্যাম যদি মোট তিনটি লেবু কিনিয়াথাকে, তবে তৃতীয় লেবুর উপযোগকে প্রান্তিক অর্থাৎ প্রান্তস্থিত দ্রব্যের উপযোগ (marginal utility) বলিব। এক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ হইবে দুই আনা। শ্যাম যদি মাত্র দুইটি লেবু কিনিত তবে প্রান্তিক উপযোগ হইত বার পয়সা। জিনিষটির প্রত্যেক সংখ্যার প্রান্তিক উপযোগ যোগ দিলে সামগ্রিক উপযোগ পাওয়া যায়।

ক্রমহ্রাসমান উপযোগের সূত্রটি তাই অন্যভাবেও বলা যায়। একটি দ্রব্য পর পর সংখ্যায় পাওয়া গেলে দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ কমিতে থাকে।

যদি লেবুর দাম বার পয়সা হয়, তবে শ্যাম মাত্র দুইটি কিনিবে। তৃতীয় লেবু হইতে সে দুই আনার উপযোগ অনুভব করে। যে লেবু হইতে মাত্র দুই আনার সমপরিমাণ তৃপ্তি পাওয়া যায়, তাহা কোন মূর্খই বার পয়সা দিয়া কিনিবে না। তবে বাজারে লেবুর দাম কমিয়া দুই আনা হইলেই সে তৃতীয় লেবুটি হয়ত কিনিবে। বাজারে লেবু কি দামে বিক্রয় হইতেছে তাহা দেখিয়া কয়টি লেবু কিনিবে তাহা সে স্থির করিবে। যদি লেবুর দাম দুই আনা হয় তাহা হইলে সে তিনটি লেবু কিনিবে। কাজেই দেখা যায় যে লেবু হইতে প্রান্তিক উপযোগ মূল্যের সমান না হওয়া পর্যন্ত সে লেবু কিনিবে।

চাহিদা (Demand) : আকাংখা হইতে চাহিদার জন্ম হয়। আকাংখা অনুযায়ী অর্থ ব্যয় করিবার ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকিলেই তবেই আকাংখিত দ্রব্যটির জন্য চাহিদা হইবে।

চাহিদা সব সময়েই যোগান এবং মূল্যের উপরে নির্ভর করে। শ্যাম কয়টি লেবু কিনিবে তাহা নির্ভর করিবে লেবুর বাজার দরের উপরে। খরিদ্দার একটি দ্রব্য কত পরিমাণ কিনিবে তাহা দ্রব্যটির মূল্যের উপরেই নির্ভর করে। কাজেই চাহিদা বলিতে সব সময়েই কোন নির্দিষ্ট মূল্যে চাহিদা (Demand at a price) বুঝা হয়।

লোকে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন পরিমাণের জন্য যে মূল্য দিতে প্রস্তুত তাহাকেই চাহিদা-মূল্য (Demand-price) বলা হয়। ইহাকে বাজারে দরের সহিত ভুল করিলে চলিবে না। একটি দ্রব্যের জন্য লোকে কত দাম দিতে প্রস্তুত, তাহা দ্রব্যটির জন্য সে কতটা অভাব বোধ করে ইহার উপর নিভর করে। কাজেই চাহিদা-মূল্য প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়।

চাহিদার নিয়ম (Law of Demand) : লোকে যদি পর পর একই জিনিষ পায় তবে সেই জিনিষের জন্য তাহার আকাংখা কমিয়া আসে। কাজেই সেই জিনিষটির পর পর সংখ্যার জন্য সে ক্রমশই কম দাম দিতে চাহিবে। শ্যাম চার আনা দরে মাত্র একটি কমলালেবু কিনিবে, বার পয়সা দাম হইলে সে দুইটি লেবু কিনিতে পারে, দুই আনা হইলে তিনটি ইত্যাদি। অর্থাৎ দাম কমিলে ক্রেতা জিনিষ বেশী কেনে, দাম বাড়িলে কম কেনে—ইহাকে চাহিদার নিয়ম বলে। মূল্য যখন বাড়ে, চাহিদা তখন কমে ; আবার মূল্য কমিলে চাহিদা বাড়ে।

ইহার দুইটি কারণ আছে। প্রথম কারণ ক্রমহ্রাসমান উপযোগের নিয়ম। শ্যামের নিকট তিনটির বেশী লেবু বেচিতে হইলে বিক্রেতাকে দাম কমাইয়া দিতে হইবে। কারণ চতুর্থ লেবুটির উপযোগ তৃতীয়টি হইতে কম হইবে। তৃতীয়টির উপযোগ দুই আনা হইলে চতুর্থটির উপযোগ হয়ত এক আনা হইবে। সুতরাং লেবুর দাম দুআনা হইতে এক আনায় না নামিলে শ্যাম চারটি লেবু কিনিবে না। উপযোগ কমার সঙ্গে সঙ্গে দাম না কমিলে সে আর লেবু কিনিবে না।

আরও একটি কারণে দাম কম হইলে জিনিষ বেশী বিক্রয় হয়। বাজারে ধনী ও দরিদ্র নানা শ্রেণীর ক্রেতা থাকে। বেশী দামে কেবলমাত্র ধনীরাই কিনিতে পারে। দাম যখন কমে তখন গরীবেরা কিনিতে পারে। লেবুর দাম চার আনা হইলে অনেক গরীব লোক লেবু কিনিতে পারে না। কাজেই বিক্রয় কম হইবে। দাম কমিলে গরীবেরা লেবু কিনিতে পারে। তখন বিক্রয় বেশী হইবে।

চাহিদার নিয়মটিও রেখাচিত্র দিয়া বুঝানো যাইতে পারে। **কগ** অক্ষটিতে জিনিষের পরিমাণ দেখানো হইয়াছে। **কট** প্রথম লেবু, **টঠ** দ্বিতীয়, **ঠড** তৃতীয় লেবু ইত্যাদি। দাম দেখানো হইয়াছে **কখ** অংশ। **টপ** অংশটি দুই

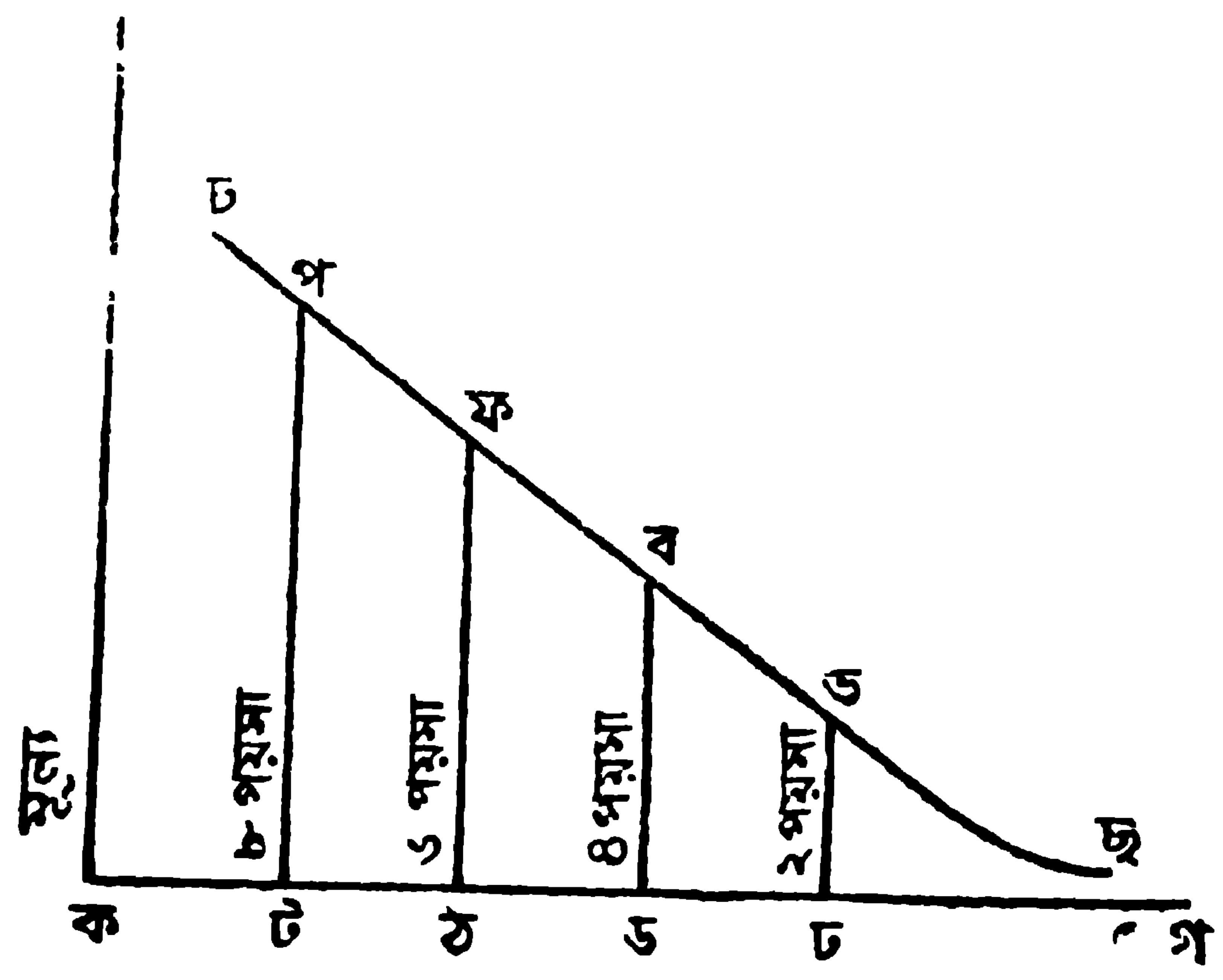

২নং চিত্র

আনা ধরা হইয়াছে। **ঠফ** ছয় পয়সা দ্বিতীয় লেবুর দাম। **ডব** তৃতীয় লেবুর দাম এক আনা ইত্যাদি। **প ফ ব ভ ছ** বিন্দুগুলি যোগ করিলে চাহিদার

রেখা **চছ** পাওয়া যায়। এই রেখা হইতে বলা যায় যে দাম **টপ** হইলে **কট** পরিমাণ, **ঠফ** দামে **কঠ** পরিমাণ লেবু কিনিবে ইত্যাদি।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Demand) : দাম বাড়িলে অথবা কমিলে লোকে জিনিষ কম বা বেশী কিনিবে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে দাম যে হারে বাড়ে কমে, চাহিদা সেই অনুপাতে কম অথবা বেশী হয় না। এমন অনেক জিনিষ আছে যাহার দাম সামান্য কমিলেই লোকে তাহা অধিক পরিমাণে কেনে। কিন্তু এমন দ্রব্যও বহু আছে সেখানে দাম অল্প কমিলে চাহিদা তুলনায় বিশেষ বাড়ে না। আটা বা চাউলের দাম সের প্রতি বারো আনা হইতে আট আনায় নামিলে খুব কম লোকেই তাহা পূবের অপেক্ষা বেশী পরিমাণে কিনিবে। কিন্তু ঝরণা-কলমের দাম বারো টাকা হইতে নয় টাকায় নামিলে অনেকেই ঝরণা-কলম কিনিবে। কাজেই দামের পরিবর্তনের সঙ্গে বিভিন্ন জিনিষের চাহিদা বিভিন্নরূপে পরিবর্তিত হইবে। দামের পরিবর্তনের সহিত চাহিদার পরিবর্তনের যে সম্বন্ধ তাহাকেই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Demand) বলে।

দাম সামান্য বাড়িলে কমিলে যদি কোন দ্রব্যের চাহিদা তুলনায় বেশী কমে বা বাড়ে তবে তাহার চাহিদা স্থিতিস্থাপকতা (Elastic) বলা হয়। এ ক্ষেত্রে দাম সামান্য বাড়িলে লোকে কম জিনিষ কিনিবে। তেমনি আবার দাম সামান্য কমিলে ক্রয়ের পরিমাণ বাড়িবে। ঝরণা-কলমের চাহিদা স্থিতিস্থাপক।

এমন দ্রব্য আছে যাহার দাম সামান্য ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয়ের পরিমাণ সামান্য পরিবর্তিত হয়। ইহাদের চাহিদাকে অস্থিতিস্থাপক (inelastic) বলা হয়। এ ক্ষেত্রে দাম সামান্য বাড়িলে চাহিদা বিশেষ কমে না, অথবা দাম কমিলে চাহিদা অল্পই বাড়ে। আটা বা চাউলের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা .কি ভাবে নির্ণয় করা যায়? (How to measure elasticity of demand ?) একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ধরা যাক, ছয় পয়সা দামে বাজারে মোট ২০০০ লেবু বিক্রয় হইতে পারে। চার পয়সা দাম হওয়ায় ৩০০০ হাজার লেবু বিক্রয় হইল। কমলালেবুর চাহিদা স্থিতিস্থাপক না অস্থিতিস্থাপক? কেহ বলিবেন যে লেবুর দাম পড়াতে চাহিদা যথেষ্ট বাড়িয়াছে, আবার অনেকে বলিতে পারেন যে চাহিদা তেমন কিছু বাড়ে নাই। তাহা হইলে এই সমস্যাটির সমাধান কি ভাবে হইতে পারে? এক উপায়ে আমরা বলিতে পারি যে জিনিষটির চাহিদা স্থিতিস্থাপক কি না। দাম কমিলে

জিনিষটির বিক্রয় যদি এইরূপ বাড়ে যে ক্রেতারা পূর্বে ইহার জন্য মোট যত অর্থব্যয় করিত বর্তমানেও ততই ব্যয় করিতেছে, তবে মোট জিনিষের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একক (Unit) বলা হয়। একটি দৃষ্টান্ত ধরা যাক। লেবুর দাম যখন দুই আনা তখন হয়ত মোট ১৫০০ লেবু বিক্রয় হয়। তাহা হইলে ক্রেতারা লেবুর জন্য মোট ৩০০০ হাজার আনা ব্যয় করিত। দাম কমিয়া ছয় পয়সা হইলে বাজারে ২০০০ লেবু বিক্রয় হইবে। এবারেও ক্রেতারা লেবুর জন্য মোট ৩০০০ আনা ব্যয় করিতেছে। এরূপ অবস্থায় লেবুর চাহিদাকে একক স্থিতিস্থাপক (Unit-ealsticity) বলা হইবে।

জিনিষের দাম কমিলে বিক্রয় যদি এত বাড়ে যে ক্রেতারা পূর্ব অপেক্ষা বেশী অর্থ ব্যয় করে, তবে সেই চাহিদাকে "একক অপেক্ষা অধিক স্থিতিস্থাপক", (greater than unity) অর্থাৎ এক কথায় স্থিতিস্থাপক বলা হইবে। ধরা যাউক যে ঝরণা-কলমের মূল্য যখন ১২৲ টাকা তখন হয়ত মোট ১০০টি কলম বিক্রয় হইত। মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ হইল ১২০০ টাকা। কলমের দাম কমিয়া ৯৲ টাকা হইলে ১৫০টি কলম বিক্রয় হয়। মোট বিক্রিত অর্থের পরিমাণ ১৩৫০ টাকা,—অর্থাৎ পূর্বাপেক্ষা অধিক। সুতরাং ঝরণা-কলমের চাহিদা স্থিতিস্থাপক। এইরূপক্ষেত্রে জিনিষের দাম বাড়িলে বিক্রয় এত কমিয়া যায় যে, মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণও কমিয়া যায়।

অস্থিতিস্থাপক চাহিদায় জিনিষটির দাম কমিলে মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ কমিয়া যায় এবং দাম বাড়িলে তাহা বাড়িয়া যায়। গমের দাম ১৲ মণ হইলে ১০০০ মণ বিক্রয় হয় ও বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ হইবে ১০০০৲ টাকা। দাম কমিয়া ৸০ মণ হইলে হয়ত ১২০০ মণ গম বিক্রয় হইবে। অর্থাৎ মোট বিক্রিত অর্থের পরিমাণ হইবে ৯০০৲ টাকা। গমের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক।

সুতরাং মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণও যদি বাড়ে বা কমে তবে চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইবে। এখানে মূল্য পরিবর্তনের গতি ও মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিবর্তনের গতি বিভিন্ন। আবার মূল্য হ্রাস ও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণও যদি কমে বা বাড়ে তবে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইবে। এ ক্ষেত্রে মূল্য ও বিক্রয়লব্ধ অর্থ উভয়ের পরিবর্তনের গতি একই দিকে।

কি কি কারণে দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক বা অস্থিতিস্থাপক হয়?

(Factors determining elasticity of demand)। প্রথমে দেখিতে হইবে দ্রব্যটি প্রয়োজনীয় বা বিলাস সামগ্রী, কোন পর্যায়ে পড়ে। চাল, আটা, নুণ প্রভৃতি জীবনধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষের চাহিদা স্থিতিস্থাপক নহে। কারণ উহাদের দাম সামান্য কমিলে বা বাড়িলে লোকে প্রায় একই পরিমাণ জিনিষ কিনিবে। মানুষের টাকা যতক্ষণ থাকে, প্রথমে সেই টাকা দিয়া সে আহার্য দ্রব্য কিনিবেই, তাহার দাম যতই হউক না কেন। কিন্তু বিলাস-সামগ্রীর বেলায় চাহিদার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। জীবনধারণের জন্য বা

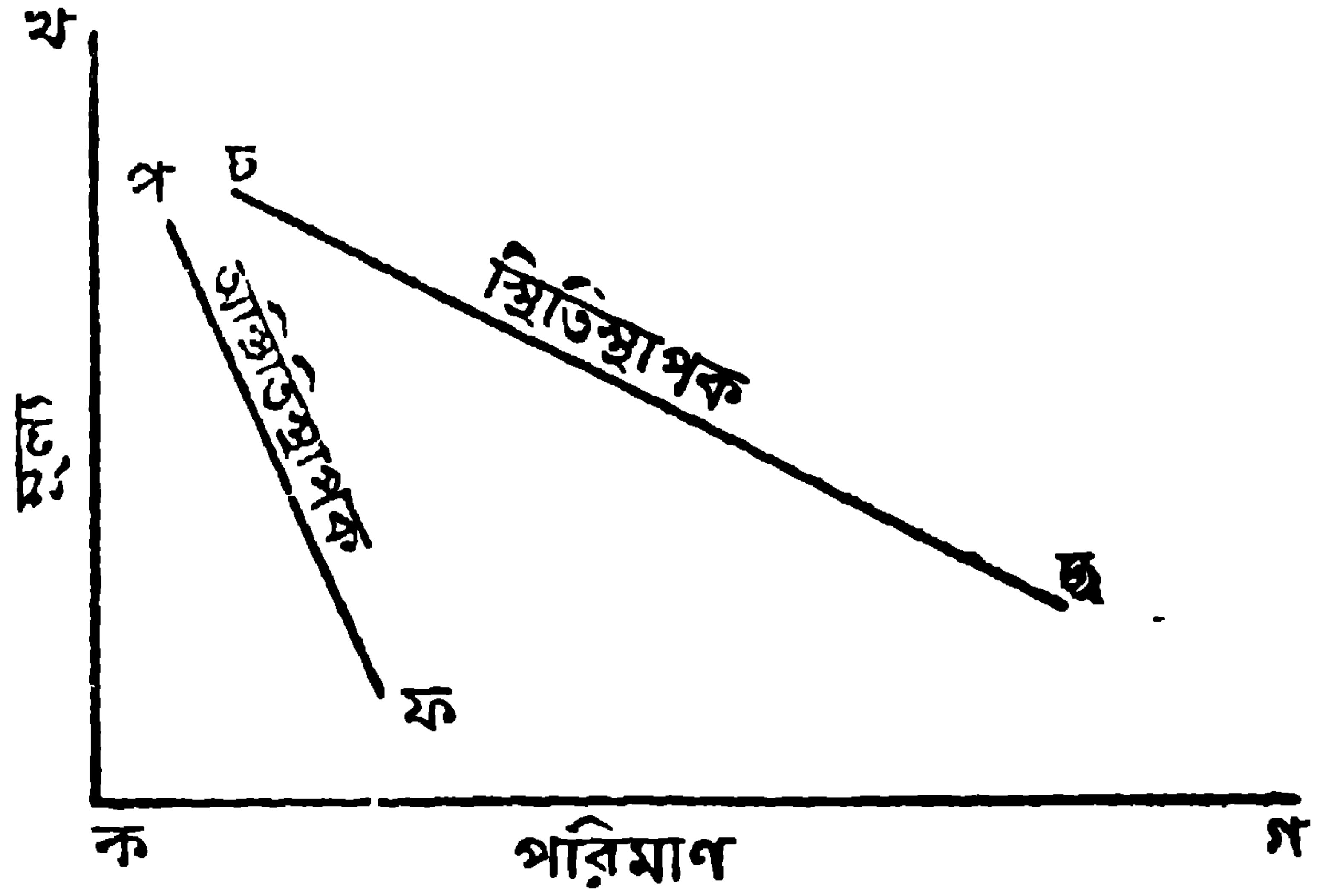

৩নং চিত্র

কর্মকুশলতা বজায় রাখিতে বিলাস-সামগ্রীর প্রয়োজন কম। এই সব জিনিষের দাম চড়া থাকিলেও ঐগুলি না কিনিয়া পারা যায়। দাম কমিলে অবশ্য অনেকেই এই জিনিষ কিনিবে। এইজন্য বিলাস সামগ্রীর চাহিদা খুবই স্থিতিস্থাপক। সুতরাং সাধারণ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক ও বিলাস দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক।

জিনিষের চাহিদা স্থিতিস্থাপক বা অস্থিতিস্থাপক তাহা নির্ণয় করিবার আরও একটি উপায় আছে। কোন জিনিষ যদি অন্য আর একটি জিনিষের পরিবর্তে (substitute) অনায়াসে ব্যবহার করা যায়, তবে এই দুইটি জিনিষের চাহিদাই স্থিতিস্থাপক হইবে। ট্রামের ভাড়া যদি একই থাকে ও বাসের ভাড়া কমিয়া যায়, তাহা হইলে লোকে বাসেই বেশী চড়িবে। বাসের চাহিদা তাহাতে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে ও ট্রামের বিক্রয় অনেক পরিমাণে কমিবে।

তৃতীয়ত, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা আয়ের পরিমাণ এবং দামের পরিমাণের

উপরেও অনেকাংশে নিভর করে। ধনী লোকে দামের সামান্য তারতম্য গ্রাহ্য করে না। দাম সামান্য বাড়িলে বা কমিলেও পূর্বের মতই জিনিষ কিনিতে থাকিবে। গরীবের পক্ষে একথা খাটে না। আবার কোন জিনিষের দাম খুবই কম থাকিলে সাধারণ লোকে ঐ দামের সামান্য ইতরবিশেষ বিশেষ গ্রাহ্য না করিয়া পূর্বের মতই জিনিষটি কিনিবে। লবণের দাম ইহার দৃষ্টান্ত।

স্থিতিস্থাপক এবং অস্থিতিস্থাপক চাহিদার রেখা চিত্র ২৭৩ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

ভোগোদ্বৃত্ত (Consumer's surplus): কমলালেবুর দাম এক আনা হইলে শ্যাম চারিটি লেবু কিনিতে প্রস্তুত। চারিটি লেবুর মোট দাম হইবে চার আনা। কিন্তু চারিটি লেবু হইতে সে বিভিন্ন পরিমাণ উপযোগ বা তৃপ্তি পায়। চারিটি লেবুর সামগ্রিক উপযোগ ১৬+১২+৮+৪=৪০। সে চারিটি লেবু হইতে দশ আনার মত উপযোগ লাভ করে। কিন্তু তাহার জন্য সে মাত্র চার আনা দিয়াছে। এক্ষেত্রে চারিটি লেবুর সামগ্রিক উপযোগ ৪০ পয়সা। কিন্তু ছেলেটি দিয়াছে মাত্র ১৬ পয়সা। কাজেই লেবু হইতে সে অতিরিক্ত ২৪ পয়সা মূল্যের তৃপ্তি লাভ করিতেছে। একটি জিনিষ কিনিতে যে মূল্য দেওয়া হয়, তাহা হইতে ইহার অতিরিক্ত পরিমাণে যে তৃপ্তি লাভ করা যায় তাহাকেই ভোগোদ্বৃত্ত বলা হয়।

দ্রব্যের সংখ্যার সহিত প্রান্তিক উপযোগ গুণ করিয়া যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাহা সামগ্রিক উপযোগ হইতে বিয়োগ করিলে ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাণ জানা যায়।

দ্রব্যের পরিমাণ	প্রান্তিক উপযোগ	বাজার দর	ভোগোদ্বৃত্ত
১ম লেবু	১৬ পয়সা	৪ পয়সা	১২ পয়সা
২য় „	১২ „	৪ „	৮ „
৩য় „	৮ „	৪ „	৪ „
৪র্থ „	৪ „	৪ „	০ „
চারিটি লেবুর সামগ্রিক উপযোগ—	৪০ পয়সা	১৬ পয়সা	২৪ পয়সা—ভোগোদ্বৃত্তের মোট পরিমাণ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভোগ সম্বন্ধে কয়েকটি সমস্যা

ব্যয় (Spending) : সাধারণ কথায় 'ব্যয়' শব্দটির অর্থ যে কোন বিষয়ে খরচকে বুঝায়। খাদ্যদ্রব্য কিংবা যন্ত্রপাতি উভয় প্রকারের জিনিষ কিনিবার জন্য খরচকেই ব্যয় বলা হয়। কিন্তু ধনবৈজ্ঞানিক ব্যয় শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেন। সাধারণ ভোগের দ্রব্যাদি কিনিবার জন্য খরচকেই ব্যয় বলে। যন্ত্রপাতি প্রভৃতি উৎপাদনের সহযোগী সামগ্রী কিনিলে তাহা ব্যয়ের পর্যায়ে পড়িবে না। কেবলমাত্র ভোগের সামগ্রী কিনিবার জন্য খরচকে ব্যয় বলা হয়।

সমপ্রান্তিক উপযোগের নিয়ম (Law of Equi-marginal utility) : বিভিন্ন ভোগের সামগ্রীর জন্য কিভাবে অর্থ ব্যয় করা উচিত ? আমাদের সকলেরই আয় অপ্রচুর, অথচ অভাবের কোন সীমা নাই। পরিমিত আয় সকল অভাব পূরণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কাজেই সকলেই এমনভাবে ব্যয় করিতে চায় যাহাতে তাহাদের পক্ষে সর্বাধিক তৃপ্তিলাভ সম্ভব হয়। ইহাকে সমপ্রান্তিক উপযোগের নিয়ম বলা হয়। আমরা এইভাবে অর্থ ব্যয় করি যাহাতে প্রত্যেক টাকা হইতে আমরা সমান সমান প্রান্তিক উপযোগ লাভ করি। আমাদের প্রয়োজন অনেক, কিন্তু আয় সীমাবদ্ধ। কাজেই কোন জিনিষ কিনিবার পূর্বে বিচার করিতে হয়। কিছু স্পষ্টভাবে চিন্তা না করিয়াও বিভিন্ন জিনিষ হইতে কতটা তৃপ্তি পাওয়া যাইবে তাহা আমরা তুলনা করি। যদি চায়ের জন্য আরও এক টাকা ব্যয় করিয়া আমরা অন্য আর একটি দ্রব্য অপেক্ষা বেশী তৃপ্তি পাই তাহা হইলে আমরা চা কিনিব, অপর দ্রব্যটি কিনিব না। আরও জামা, জুতা, কাপড়, মাছমাংস কিনিব কি না তাহা স্থির করিতে আমরা মনে মনে বিচার করিয়া দেখি যে, অতিরিক্ত দ্রব্য হইতে আমাদের কতখানি উপযোগ লাভ হয়। এইরূপ চিন্তার ফলে আমরা জিনিষ কিনি অথবা কেনা বন্ধ করি এবং ক্রমে ক্রমে সকল ক্রীত জিনিষের উপযোগ উহার দামের সহিত সমান হয়। বিভিন্ন সামগ্রীতে আমাদের ব্যয়ের পরিমাণ এমনি দাঁড়ায় যখন ব্যয় হইতে আমাদের যে সামগ্রিক উপযোগ লাভ হয় তাহা সর্বাধিক হয়।

ব্যয় ও সঞ্চয় (Saving and Spending): আয় যে পরিমাণ হইবে লোকে তদনুযায়ী ব্যয় করিবে। যাহাদের আয় খুব কম, তাহাদের সমস্ত অর্থ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য ব্যয় করিতে হয়। আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয় করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে না। আয় যদি এমন পরিমাণ হয় যে জীবনধারণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনিয়া কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তবেই সঞ্চয় করা সম্ভব। নানা প্রয়োজনে লোকে সঞ্চয় করে। আপদ-বিপদ অথবা বৃদ্ধ বয়সের জন্য সকলকেই সংস্থান রাখিতে হয়। মেয়ের বিবাহে অর্থের প্রয়োজন হয়। ছেলে বড় হইলে ব্যবসায় বা অপর কিছু করিবার জন্য মূলধন চাই। ভবিষ্যতের এই সকল প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেককেই আয়ের কিছু অংশ প্রতি মাসে বা প্রতি বৎসরে সঞ্চয় করিতে হয়। কিন্তু আয়ের কতখানি অংশ জমা করা উচিত? সে সম্বন্ধে কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। কৃপণ সব কিছু বাদ দিয়া কেবলই অর্থ সঞ্চয় করে। তাহা ঠিক নহে। 'কর্তব্য সঞ্চয়ো নিত্য, কর্তব্য নাতিসঞ্চয়।' সঞ্চয় করিবার একটি মাত্রা থাকা উচিত। প্রয়োজনীয় দ্রব্য না কিনিয়া সঞ্চয় করা উচিত নহে। তাই বলিয়া সবই খরচ করিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে ইহাও ঠিক নহে। অনেকে মনে করেন যে, লোকে যত বেশী জিনিষ কেনে ততই সকলের পক্ষে মঙ্গল। ব্যয় বেশী করার অর্থ বেশী দ্রব্য বিক্রয় হওয়া। তাহা হইলে ব্যবসায়বাণিজ্য বাড়িবে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, নূতন কলকারখানা সৃষ্টি হইবে। বেকারের সংখ্যা কমিবে ও লোকে জীবিকা অর্জনের জন্য নূতন নূতন কাজ পাইবে। কিন্তু বিষয়টি অত সরল নহে! সকলে যদি আয়ের সবই ব্যয় করে, তাহা হইলে সঞ্চয় কিছু হইবে না। সঞ্চয় হইতেই মূলধন হয়। সঞ্চয় না হইলে মূলধন পাওয়া যাইবে না। মূলধনের অভাব হইলে কলকব্জা তৈয়ারী সম্ভব হইবে না। ফলে শিল্পপতিরা দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারিবে না। কাজেই আয়ের সবটা ব্যয় করা উচিত নহে। অত্যন্ত সঞ্চয় বা অত্যধিক ব্যয় কোনটাই সমাজের পক্ষে মঙ্গলদায়ক নহে। বুদ্ধিমান লোক নিজের সব জরুরী প্রয়োজন মিটাইয়াও ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করে। সে তাহার ব্যয় এবং সঞ্চয় এইভাবে করিবে যাহাতে সে সর্বাপেক্ষা অধিক তৃপ্তি পায়।

পারিবারিক আয়ব্যয়ের হিসাব (Family budgets): একটি পরিবারের আয় ও ব্যয়ের হিসাবকে পারিবারিক বাজেট বলা হয়। এই

হিসাব হইতে পরিবারের সকলের আয় এবং কোন দ্রব্যের জন্য কত ব্যয় করা হইবে তাহা জানা যায়। পারিবারিক আয়ব্যয়ের হিসাব, বিশেষ করিয়া শ্রমিক শ্রেণীর আয়ব্যয়ের হিসাব ধনবৈজ্ঞানিকের নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই হিসাব হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে লোকের জীবনযাত্রার মান কিরূপ; উহা উন্নত না অত্যন্ত নীচু ধরণের এবং ইহা হইতে আমরা স্থির করিতে পারি জীবনযাত্রার মান বাড়াইতে হইবে কি না। বিভিন্ন বৎসরের পারিবারিক আয়ব্যয়ের হিসাব হইতে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে কোন শ্রেণীর লোকের উপরে কিরূপ প্রভাব হইয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি।

এঞ্জেলের সূত্র (Engel's Law): সংখ্যাবিজ্ঞানের পণ্ডিত জার্মান এঞ্জেল্ স্যাক্সনির অধিবাসী জার্মান পরিবারের আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, যাহারা অপেক্ষাকৃত গরীব, তাহারা আয়ের শতকরা ৬২ ভাগ খাদ্যের জন্য ব্যয় করে। ৩৩ ভাগ বস্ত্র, আবাস, আলো, কয়লা প্রভৃতির জন্য, ও বাকি ৫ ভাগ স্বাস্থ্য ও আমোদ-প্রমোদের জন্য ব্যয় করে। এই শ্রেণী অপেক্ষা যাহাদের আয় একটু বেশী, তাহারা খাদ্যের জন্য শতকরা ৫৫ ভাগ এবং আরামজনক দ্রব্যের জন্য ১০ ভাগ ব্যয় করে। ইহা হইতে তিনি চারিটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। (ক) আয় বেশী হইলে খাদ্যের জন্য ব্যয়ের আপেক্ষিক পরিমাণ কম হয়; (খ) বস্ত্রের জন্য প্রায় সকলেই আয়ের সমান অংশ ব্যয় করে; (গ) আবাস, আলো, কয়লা ইত্যাদির জন্য শতকরা ব্যয় সকল প্রকার আয়ের লোকেরই সমান; (ঘ) আয় বাড়িলে আরামপ্রদ দ্রব্যের জন্য শতকরা ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ে।

একটু পরিবর্তন করিলেই ভারতীয়দের সম্বন্ধেও এই সিদ্ধান্ত খাটে। আয় কম হইলে খাদ্যের জন্য ব্যয়ের শতকরা পরিমাণ নিশ্চয়ই বাড়িবে। আবহাওয়ার পার্থক্য থাকার জন্য বস্ত্রের জন্য ব্যয় আমাদের দেশে কম। বোম্বাই শহরের শ্রমিকদের আয়ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে ৩০্ টাকার নীচে আয় হইলে খাদ্যের জন্য ব্যয় শতকরা ৬০·৫ এবং ৮০্ হইতে ৯০্ টাকা আয় হইলে ঐ ব্যয় শতকরা ৫২ ভাগ হয়। কাজেই এঞ্জেলের সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষেও প্রযোজ্য।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

উৎপাদন

উৎপাদিকা (Productive) **ও অনুৎপাদিকা** (Unproductive) **:** উৎপাদন কথাটি শুনিতে খুব সরল। এমন কি স্কুলের ছাত্রও বিনা দ্বিধায় কথাটির অর্থ বলিয়া দিবে। কিন্তু কিছুদিন পূর্বেও ধনবৈজ্ঞানিকেরা কথাটির অর্থ সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন না। মানুষ কি উৎপাদন করে? অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের ধনবৈজ্ঞানিকেরা মনে করিতেন, উৎপাদন কথাটির অর্থ উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন এবং একমাত্র কৃষি হইতেই এই উদ্বৃত্ত মূল্য পাওয়া যায়। কাজেই একমাত্র কৃষিকেই উৎপাদিকা শ্রম বলিয়া গণ্য করা হইত, আর সবই ছিল 'বাজে' কাজ। এ্যাডাম-স্মিথ, যাঁহাকে আধুনিক ধনবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়, বলেন যে উৎপাদন কথাটির অর্থ স্থূল বস্তুর উৎপাদন। যে শ্রমের দ্বারা টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি স্থূল বস্তু উৎপন্ন হইত তাহাকেই মাত্র উৎপাদিকা শ্রম বলা হইত, "রাজা, বিচারক, মন্ত্রী, ধর্মযাজক, আইনজীবী, ডাক্তার, পণ্ডিত (এমন কি ধনবৈজ্ঞানিক), খেলোয়াড়, গায়ক, বাদক, নৃত্যশিল্পী" প্রভৃতি লোকেরা কোন স্থূল সামগ্রী উৎপন্ন করে না বলিয়া তাহাদের শ্রমকে অনুৎপাদিকা বলে। ইহা কি ঠিক? সর্বপ্রকার স্থূল সামগ্রীর ভিত্তিই হইল বস্তু এবং মানুষ তাহা তৈয়ারী করিতে পারে না। প্রকৃতি যে বস্তু সম্পদ দান করিয়াছে, তাহার উপরে একটি কণাও মানুষের পক্ষে উৎপাদন করা সম্ভব নহে। মানুষ কেবল বস্তু সংগ্রহ করিয়া তাহার আকার পরিবর্তন করে। চাষী চাষ করে, তাহার অর্থ এই যে লাঙ্গল দিয়া সে কেবল ভূমি কর্ষণ করে, তাহাতে বীজ বপন করে। প্রকৃতির কৃপা হইলে ফসল পাওয়া যায় কি না যায় না। কেহ ফসল উৎপন্ন করিবার বাহাদুরী পাইলে প্রকৃতিরই সেটা প্রাপ্য, কোনও মানুষের নহে। কুমার প্রকৃতিদত্ত মাটি সংগ্রহ করে এবং চাকার সাহায্যে নানা আকারের খেলনা বা বাসন তৈয়ারী করে। এখানে কেবল বস্তুর আকার পরিবর্তিত হইল। মানুষ লোহা তৈয়ারী করিতে পারে না, সে কেবল খনি হইতে লোহা বাহির করিয়া লইতে জানে। কাজেই উৎপাদনকে স্থূল সামগ্রী প্রস্তুত কার্য বলা যায় না। প্রকৃতি হইতে বস্তু আহরণ করিয়া মানুষ তাহা এইভাবে

পরিবর্তিত করে, যাহার ফলে সেই পরিবর্তিত জিনিষ হইতে আমাদের অনেক বেশী কাজ হয়, তাহা হইতে আমাদের বেশী অভাব দূর হয়। কাজেই উৎপাদন কথাটির আসল অর্থ বস্তুর প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগ বৃদ্ধি করা।

সাধারণত তিন প্রকারের উপযোগের কথা বলা হয়; স্থান, কাল ও রূপের উপযোগ। কোন জিনিষ এক স্থান হইতে স্থানান্তরিত করিলে অনেক সময়ে তাহার উপযোগ এবং মূল্য বৃদ্ধি পায়। স্থানান্তরিত করিবার ফলে যে উপযোগ বৃদ্ধি পায় তাহাকে স্থানগত উপযোগ (Place utility) বলা হয়। পাঞ্জাবে গমের যে মূল্য আছে, বাংলায় বা বোম্বাই প্রদেশে আনিলে উহার চেয়ে মূল্য বৃদ্ধি পায়। কাজেই যাহারা এই স্থানান্তরিত করিবার কাজে নিযুক্ত তাহাদের সকলের শ্রমকে উৎপাদিকা বা সার্থক বলা হয়। অনেক জিনিষ শুধু কিছু সময়ের জন্য রাখিয়া দিলেই জিনিষটির উপযোগ বাড়ে। ইহাকে সময়গত উপযোগ (Time utility) বলা হয়। ধান কাটার পরেই মাঘফাল্গুনে চাউলের দাম কম হয়, কিন্তু বর্ষাকালে ধান চাউলের দাম বাড়ে। মাঘফাল্গুনে কিছু ধান কিনিয়া তাহা বর্ষাকাল পর্যন্ত রাখিয়া দিলেই সেই চাউলের উপযোগ ও মূল্য বৃদ্ধি পায়। যাহারা এ কাজ করে তাহাদের শ্রমকে উৎপাদিকা বলা চলে। কোনও জিনিষ রূপান্তরিত হইবার ফলে তাহার উপযোগ বৃদ্ধি পাইলে তাহাকে রূপগত উপযোগ (Form utility) বলে। লৌহ হইতে ইস্পাত প্রস্তুত হয়। ইস্পাত রূপগত উপযোগ লাভ করিয়াছে। এই কাজ যাহারা করে, তাহাদের শ্রম উৎপাদিকা।

আধুনিক ধনবৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, যাহারা এমন জিনিষ তৈয়ারী করে যাহার উপযোগ আছে, যাহা আমাদের অভাবপূরণ করিতে পারে, তাহাদের শ্রম উৎপাদিকা। চাহিদা নাই এমন কোন জিনিষ যে তৈয়ারী করে, একমাত্র তাহারই শ্রম অনুৎপাদিকা। বাকী সকলেই উৎপাদিকা কার্যে নিযুক্ত, তাহারা বাস্তব জিনিষ তৈয়ারী করুক আর নাই করুক। খনির শ্রমিক কয়লা তোলে, গাড়ীতে করিয়া তাহা শহরে নীত হয়, ব্যবসায়ী সেই কয়লা মজুদ রাখে এবং পরে তাহা বিক্রয় করে। কাজেই কয়লা তোলা হইতে আরম্ভ করিয়া মজুদ করা পর্যন্ত সকলের শ্রমই উৎপাদিকা। জিনিষ তৈয়ারী না করিয়া অন্য কাজ যাহারা করিতেছে, যেমন গায়ক বা আইনজীবি, তাহারাও উৎপাদিকা শ্রম করিতেছে। কারণ তাহাদের কাজের ফলে আমাদের অভাব দূর হয়।

উৎপাদনের উপাদান (Factors of production) : একটি জিনিষ তৈয়ারী করিতে হইলে কি কি উপাদান চাই ? কয়লা উৎপন্ন করিবার অর্থ কয়লা তৈয়ারী করা নহে। খনি হইতে তুলিয়া কয়লা বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করা হয়। কাজেই কয়লা উৎপন্ন করিতে হইলে কয়লার খনি প্রথমে চাই। কয়লার খনি প্রকৃতিদত্ত সম্পদ। কাজেই প্রকৃতির নিকট উৎপাদনের প্রথম উপাদান পাওয়া যায়। তাহার পরে আসে শ্রমিকের কথা। কোন জিনিষ উৎপাদন করিতে হইলে লোক চাই। এই কারণে প্রকৃতির দান এবং মানুষের শ্রমকে উৎপাদনের মূল উপাদান বলা হয়। মানুষের শ্রমের ফলে প্রকৃতির বস্তুসম্ভার রূপান্তরিত হইয়া মানুষের অভাব মিটাইতেছে। কিন্তু মানুষ সব সময়ে উৎপাদনের কাজে কিছু কিছু যন্ত্র ব্যবহার করে। আদিম যুগের অসভ্যদেরও পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ছিল। চাষীর চাষের হাল ছিল। বর্তমান কালে অনেক জটিল যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয়। এইগুলিকে মূলধন বলে এবং ইহাই তৃতীয় উপাদান। আর এক শ্রেণীর লোক আছে যাহাদের কাজ হইতেছে উৎপাদন পরিচালনা করা। সুতরাং উৎপাদনের জন্য চারিটি উপাদান চাই—জমি, শ্রম, মূলধন এবং পরিচালক।

ধনবিজ্ঞানে জমি কথাটির অর্থ খুবই ব্যাপক। প্রকৃতির সমস্ত সম্পদকেই জমি বলা হয়। জমির প্রকৃতি, অবস্থান, উর্বরাশক্তি, আবহাওয়া, বর্ষার পরিমাণ, আলোবাতাস যাহা জমিতে লাগে, কয়লা, সোনা, লোহা প্রভৃতির খনি, মাছ ধরিবার স্থানগুলি, বনজঙ্গল, পশুপ্রাণী, বাতাসের গতি, জল—সবই জমি হিসাবে পরিগণিত হয়।

শ্রম বলিতে মানুষের সর্ববিধ কাজ বুঝিতে হইবে। উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় এবং উপভোগের কাজে মানুষের কায়িক এবং মানসিক সকল শ্রমই ইহার অন্তর্ভুক্ত। কেবল উৎপাদনের পরিচালনা-কার্যকে শ্রমের অধীনে ধরা হয় না।

মূলধন বলিতে যন্ত্রপাতি কলকারখানা বুঝিতে হইবে। উৎপাদনের কাঁচা মাল, উৎপাদনের সময় শ্রমিকের জীবন ধারণের জন্য এবং কর্মক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহা সমস্তই মূলধন বলিয়া গণ্য করা হয়।

উৎপাদনের উপাদান হিসাবে পরিচালকের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। তাহারা উদ্যোগী হইয়া একটি বিশেষ দ্রব্য উৎপাদন করে এবং উৎপাদনের সকল

লাভ-লোকসানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। জমি এবং মূলধন থাকিলেই উৎপাদন হয় না। এক বা একাধিক লোক উদ্যোগী হইয়া উভয়ের যথাযথ অংশ কাজে লাগাইলেই তবে জিনিষ উৎপন্ন হইবে।

প্রত্যেকটি উপাদানের বৈশিষ্ট্য পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচিত হইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জমি

ধনবিজ্ঞানে জমি শব্দটি ইহার সাধারণ অর্থ অপেক্ষা অনেক ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়। যাহা প্রকৃতির দান এবং মানুষ যাহা সৃষ্টি করিতে পারে না তাহাই জমি। জমির প্রকৃতি, অবস্থান উর্বরাশক্তি, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, জমিতে যতটা আলো-বাতাস লাগে, আবহাওয়া, খনি এবং খনিজ, বনজঙ্গল, নদী ও সমুদ্রের মাছ ধরিবার স্থান, বাতাসের গতি এবং জল প্রভৃতি সবই জমি কথাটির মধ্যে পড়ে। কারণ, সবই প্রাকৃতিক সম্পদ।

উৎপাদনের মূলে রহিয়াছে জমি। যে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ অধিক সেই দেশ ঐশ্বর্যে পূর্ণ হইয়া উঠে। জমি প্রকৃতির দান, কাজেই জমির পরিমাণ প্রকৃতির উদারতার উপরে নির্ভর করে. মানুষের চেষ্টায় তাহার পরিবর্তন হয় না। আমরা শত চেষ্টা করিয়াও দেশে সোনা অথবা কয়লার খনির সংখ্যা বাড়াইতে পারি না। কাজেই জমির যে পরিমাণ প্রকৃতি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে তাহা মানুষের চেষ্টায় বৃদ্ধি করা যায় না। এইখানেই জমি এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের মধ্যে পার্থক্য। জন সংখ্যা বাড়িলে এবং কমিলে শ্রমিকের সংখ্যাও বাড়ে বা কমে। যন্ত্রপাতি বা অন্যান্য মূলধন কালক্রমে বাড়ানো সম্ভব। কিন্তু জমির পরিমাণ বাড়ানো যায় না। জমির এই বৈশিষ্ট্যের জন্য উহা একটি বিশেষ নিয়মাধীন। নিয়মটিকে হ্রাসমান উৎপন্নের নিয়ম (Law of Diminishing returns) বলা হয়। এই নিয়মটি যে প্রত্যেক উৎপাদনের উপাদান সম্বন্ধে প্রযোজ্য, তাহা পরে দেখান হইবে। কিন্তু জমির বেলায় তাহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য এই কারণে যে, মানুষের চেষ্টাতে জমির পরিমাণ বাড়ানো যায় না।

হ্রাসমান উৎপন্নের সূত্র (Law of Diminishing returns) : বেশী ফসল তুলিতে চাহিলে হয় বেশী জমি চাষ করিতে হইবে, নচেৎ কর্ষিত জমি আরও গভীরভাবে চাষ করিতে হইবে। অধিক পরিশ্রমে অথবা বেশী সার দিয়া জমিটি আরও ভালভাবে চাষ করিলে ফসল নিশ্চয়ই বেশী পাওয়া যাইবে। যদি কেহ একটি জমিতে দ্বিগুণ পরিশ্রম করে তাহা হইলে উৎপন্ন ফসলের

পরিমাণ দ্বিগুণ বা তাহার বেশী হইতে পারে। এই ভাবে ক্রমে এমন অবস্থায় আসিয়া পৌছিবে যখন দ্বিগুণ পরিশ্রম করিয়া জমি চাষ করিলেও ফসলের পরিমাণ ঠিক দ্বিগুণ বাড়িবে না, দ্বিগুণ হইতে কম বাড়িবে। জমিতে চাষী যতই কঠোর পরিশ্রম করুক না কেন ফসলের পরিমাণ সেই অনুপাতে বাড়িবে না। ইহাই হ্রাসমান উৎপন্নের সূত্রের ভিত্তি। সূত্রটি এইভাবে বলা যায়ঃ "জমি চাষে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ বৃদ্ধি করিলে সাধারণত ফসল বৃদ্ধির পরিমাণ তুলনায় কম হয়।" একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি পরিষ্কার বুঝা যাইবে।

এক বিঘা জমি কতজন চাষী কাজ করে	উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ	প্রান্তিক বা সবশেষ চাষী যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন করে
একজন চাষী ও একটি লাঙ্গল	২০ মণ ধান	২০ মণ
দুইজন চাষী দুইটি লাঙ্গল	৩৫ মণ ধান	১৫ মণ
তিনজন চাষী তিনটি লাঙ্গল	৪৫ মণ ধান	১০ মণ
চারজন চাষী চারিটি লাঙ্গল	৫০ মণ ধান	৫ মণ

একজন চাষী একটি লাঙ্গল লইয়া যখন জমি চাষ করিত, তখন উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ছিল ২০ মণ। পরে সে আর একজন শ্রমিক নিযুক্ত করিল। কিন্তু ধান পাইল ৩৫ মণ। তৃতীয় একজন লোক নিয়োগ করিবার ফলে ফসলের পরিমাণ দাঁড়াইল ৪৫ মণ। কাজেই দ্বিতীয় লোক ১৫ এবং তৃতীয় ১০ মণ মাত্র ফসল বৃদ্ধি করিতে পারিল। চতুর্থ লোক নিযুক্ত হইবার ফলে মোট ফসল পাওয়া গেল ৫০ মণ, অর্থাৎ ফসল বৃদ্ধির পরিমাণ ৫ মণ মাত্র। কাজেই দেখা যাইতেছে যে একখণ্ড জমিতে যত বেশী শ্রমিক এবং মূলধন নিয়োগ করা যায়, তাহা হইতে ফসল বৃদ্ধির হার ততই কমিয়া যায়।

এই নিয়ম হইতে দেখা যায় যে, জমি হইতে ক্রমেই অধিক ফসল উৎপন্ন করিতে গেলে উৎপাদনব্যয় ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। ধরা যাক যে, চাষী প্রত্যেক শ্রমিককে ৪০৲ টাকা মজুরী দেয়। যখন একজন শ্রমিক দিয়া সে জমি চাষ করায় তখন তাহার ৪০৲ ব্যয় হয় এবং উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ২০ মণ হয়। তাহা হইলে একমণ ধানের জন্য ব্যয় হইল ২৲ টাকা। দ্বিতীয় শ্রমিক নিযুক্ত

করিবার ফলে তাহার খরচ হয় সর্বসমেত ৮০্ এবং ধান উৎপন্ন হয় ৩৫ মণ। কাজেই প্রতিমণ ধানের ব্যয় পড়িবে ২।১০। তৃতীয় শ্রমিক নিযুক্ত হইলে খরচ ১২০্ হইবে ও ৪৫ মণ ফসল পাওয়া যাইবে। কাজেই প্রতি মণের ব্যয় পড়ে ২৷৷৵১০। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মণপ্রতি ব্যয় ক্রমেই বাড়িতেছে। একটি জমি হইতে বেশী শস্য উৎপন্ন করিতে হইলে মণপ্রতি উৎপাদনের ব্যয় ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। আরও বেশী শস্য উৎপাদন করিতে চাহিলে গড়পড়তা ব্যয় বেশী পড়িবে।

ব্যতিক্রমঃ প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে ক্রমশ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিলে উৎপাদনের ব্যয় ক্রমশই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু উন্নত ধরণের উৎপাদনব্যবস্থা অবলম্বন করিলে এই ব্যয়বৃদ্ধির প্রবণতা দূর হইতে পারে। ভারতবর্ষে যদি আমরা উন্নত প্রণালীতে চাষ আরম্ভ করি, রাসায়নিক সার এবং tractor চাষে নিয়োগ করি, তাহা হইলে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ব্যয় অপেক্ষা বেশী হওয়ার সম্ভাবনা। বিঘা প্রতি জমিতে যে পরিমাণ অতিরিক্ত ব্যয় হইবে, অতিরিক্ত ফসলের পরিমাণ তদপেক্ষা বেশী হইতে পারে। কাজেই উন্নত ধরণের উৎপাদনব্যবস্থা হ্রাসমান উৎপন্নের নিয়মটি প্রতিরোধ করিতে পারে। ইহা হইতে আমরা একটি মূল্যবান তথ্য জানিতে পারি। আমরা যদি ভারতবাসীদের জীবনধারণের মান উন্নত করিতে চাই, তাহা হইলে জমি হইতে আরও অধিক শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মণ প্রতি ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি না করিয়া উন্নত কৃষিব্যবস্থা অবলম্বন করিলেই ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

নিয়মটির আরও একটি ব্যতিক্রম আছে। কোন কোন অবস্থায় একখণ্ড জমি দ্বিগুণ পরিশ্রমে চাষ করিলে ফসলের পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশী হইতে পারে। যে জমি পূর্বে কখনও ভালভাবে চাষ করা হয় নাই, তাহা বেশী করিয়া চাষ করার ফলে বেশী ফসল পাওয়া সম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া অতিরিক্ত উৎপন্নের পরিমাণ অনিশ্চিত কাল ধরিয়া শ্রম ও অর্থব্যয়ের তুলনায় বেশী হইবে না। কিছু দিন পরেই পূর্বোক্ত হ্রাসমান উৎপন্নের নিয়মটি কার্যকরী হইবে।

রেখাচিত্র দ্বারা বিষয়টি বুঝানো যায়। শ্রম আর অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ **কগ** অক্ষে ধরা হইবে, ফসলের পরিমাণ **কখ** হইতে পাওয়া যাইবে। **কপ** পরিমাণ শ্রম এবং মূলধন প্রয়োগ করা হইলে ফসল পাওয়া গেল **ভপ** পরিমাণ।

শ্রম এবং মূলধন **পফ** পরিমাণ বাড়াইয়া দিলে অর্থাৎ মোট শ্রম এবং মূলধন **কফ** পরিমাণ প্রয়োগ করা হইলে **থফ** পরিমাণ অতিরিক্ত ফসল পাওয়া যাইবে। অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধনের তুলনায় ফসল বেশী পাওয়া গিয়াছে। উপরে যে দ্বিতীয় ব্যতিক্রমের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত এখানে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু **ফব** পরিমাণ অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিলে

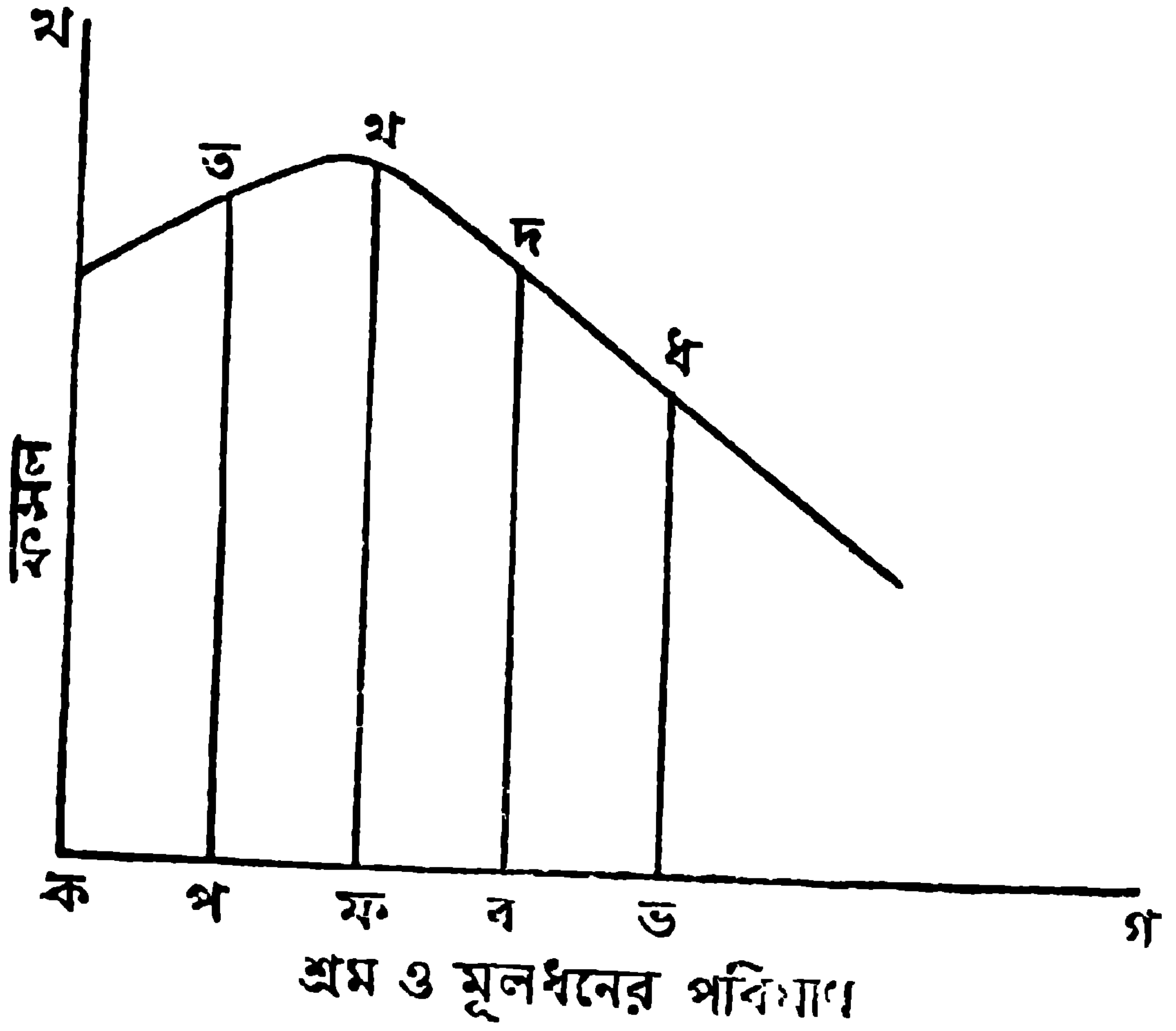

৪নং চিত্র

অতিরিক্ত ফসলের পরিমাণ **বদ** হইবে। ইহা **ফথ** অপেক্ষা কম। হ্রাসমান উৎপন্নের সূত্র এখানে দেখা দিয়াছে। আরও অধিক পরিমাণ শ্রম এবং মূলধন প্রয়োগ করিলে যে অতিরিক্ত ফসল পাওয়া যাইবে তাহার পরিমাণ **ধভ** উহা হইতেও কম। অতএব দেখা যাইতেছে যে যতই অতিরিক্ত শ্রম এবং মূলধন প্রয়োগ করা যায় উৎপন্ন ফসলের মোট বৃদ্ধির পরিমাণ ততই কমিয়া আসে।

খনি এবং মাছ ধরিবার স্থানঃ খনি এবং মাছ ধরিবার স্থানেও হ্রাসমান উৎপন্নের সূত্র প্রযোজ্য। খনির মালিক যদি বেশী কয়লা তুলিতে চাহে তাহা হইলে খনির আরও নীচে প্রবেশ করিতে হইবে। যত নীচে যাইতে হইবে, ততই নিরাপত্তা বিধানের জন্য তাহাকে আরও অধিক ব্যয় করিতে হইবে। এই কারণে অতিরিক্ত কয়লা তুলিতে হইলে তাহার অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ তুলনায় বেশী হইবে। মাছ ধরিবার বেলাতেও বলা যায় যে বেশী

মাছ ধরিতে হইলে নদীর অথবা সমুদ্রের ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে। কিন্তু ফলে তাহার যতটা পরিশ্রম হইবে তাহার তুলনায় মোট ধৃত মৎস্যের সংখ্যা কম হইবে।

শ্রমশিল্পে এই নিয়ম কতটা প্রযোজ্য?ঃ শ্রমশিল্পেও পূর্বের নিয়ম প্রযোজ্য। একই জমিতে অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিলে ফসল উৎপন্ন করিবার ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ইহা হ্রাসমান উৎপন্নের সূত্র। এ ক্ষেত্রে জমি একই আছে কিন্তু উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান বৃদ্ধি করা হইয়াছে। উৎপাদনের যে কোনও একটি উপাদানের পরিমাণ একই রাখিয়া অন্য উপাদানগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদন বাড়াইতে চেষ্টা করিলে সব সময়েই হ্রাসমান উৎপন্ন দেখা দিবে, অর্থাৎ উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশ কমহারে বৃদ্ধি পাইবে। উৎপাদনের প্রত্যেকটি উপাদান একই সময়ে বৃদ্ধি করিলে এই নিয়ম খাটিবে না। শিল্পের বেলায় এমন হইতে পারে যে সবগুলি উৎপাদনের উপাদান একত্রে বৃদ্ধি করা যাইতেছে না, অথচ উৎপাদন বাড়ানো প্রয়োজন। তখন মালিক উৎপাদনের কোন কোন উপাদান বাড়াইয়া দিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিতে পারে। একই কালে অধিক মজুর নিযুক্ত করিতে পারে। তাহা হইলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমিয়া যাইবে। কিন্তু ইহা নিতান্তই সাময়িক। কারণ শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান কিছু দিনের মধ্যেই বাড়ানো যায়। তখন আর এই নিয়ম খাটে না। কিন্তু জমির ক্ষেত্রে ব্যাপারটি অন্যরূপ। কারণ জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় না। মোট কর্ষিত জমির পরিমাণ ইচ্ছামত বাড়ান যায় না। পৃথিবীর উপরিভাগ যে অংশ চাষযোগ্য তাহাতেই কৃষিকার্য সম্ভব। কাজেই কৃষিতে হ্রাসমান উৎপন্নের সূত্রটি যত বেশী প্রযোজ্য শিল্পে ততটা নহে।

নবম পরিচ্ছেদ

শ্রম

শ্রমের যোগান (Supply of labour) : শ্রম বলিতে কেবল কায়িক পরিশ্রমকে বুঝায় না। ধনবিজ্ঞানে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার পরিশ্রমকারীকেই শ্রমিক বলিয়া গণ্য করা হয়। যাহারা বেতন বা মজুরীর বিনিময়ে কাজ করে তাহারাই শ্রমিক। মোট শ্রমিকের সংখ্যা দেশের জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে। অবশ্য দেশের সমস্ত লোক শ্রম করে না। বৃদ্ধ লোক এবং ধনীগৃহের স্ত্রীলোকেরা শ্রম করে না। কর্মকুশলতা শ্রমের একটি উপাদান। একজন কুশলী শ্রমিক দুই বা ততোধিক অকেজো শ্রমিকের কাজ করিতে পারে। কাজেই শ্রমিকের কুশলতা যদি বৃদ্ধি পায়, তবে তাহাদের সংখ্যা একই থাকিলেও বলা যায় যে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতএব শ্রমের যোগান দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে,—শ্রমিকের সংখ্যা এবং তাহাদের কর্মকুশলতা।

ম্যালথাসের জনসংখ্যাতত্ত্ব (Malthusian theory of population) : শ্রমিকের সংখ্যা জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে। দেশের জনসংখ্যা কি কি বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত করে? অষ্টাদশ শতাব্দীতে ম্যাল্থস্ নামক একজন ইংরেজ ধনবৈজ্ঞানিক জনসংখ্যা সম্বন্ধে একটি তত্ত্ব প্রচার করেন।

তিনি বলেন যে মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতির জন্য জনসংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু জনসংখ্যা যে অনুপাতে বাড়ে, আহার্য দ্রব্য সেই অনুপাতে বাড়ান সম্ভব হয় না। ম্যালথাস একটি উদাহরণ দিয়া ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করেন। জনসংখ্যা জ্যামিতিক প্রগতিতে (Geometrical Progression) (অর্থাৎ ১, ২, ৪, ৮, ১৬ ইত্যাদি) বাড়িলে আহার্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় পাটিগণিতিক প্রগতিতে (অর্থাৎ ১, ২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২ ইত্যাদি)। অতএব কিছু দিন পরে আহার্যের তুলনায় জনসংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু লোকে যদি 'জনসংখ্যা প্রতিরোধক' (Preventive checks) ব্যবস্থা অবলম্বন করে, তাহা হইলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কম হইতে পারে। অধিক বয়সে বিবাহ, ব্রহ্মচর্য পালন, জন্মশাসন প্রভৃতিকে 'প্রতিরোধব্যবস্থা' (Preventive checks) বলে। এই সমস্ত ব্যবস্থা

অবলম্বন করিলে জন্মের হার কমে। প্রতিরোধব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে জনসংখ্যা স্বাভাবিক ভাবেই বৃদ্ধি পাইবে। জনসংখ্যা বাড়িয়া এমন দিন আসিবে যখন সমস্ত লোকের জীবন ধারণের উপযোগী খাদ্য দেশে পাওয়া যাইবে না। তাহার ফলে অনাহারজনিত ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি দেখা দিবে। যুদ্ধবিগ্রহ বাধিবে। ইহাকে Positive checks বা 'প্রাকৃতিক নিরোধ' বলা হয়। প্রকৃতি এইভাবে অতিরিক্ত জনসংখ্যা কমাইয়া দেয়। দেশে যে পরিমাণ খাদ্য পাওয়া সম্ভব জনসংখ্যা ঠিক তদনুপাতে বজায় রাখিবার জন্য প্রকৃতি এই ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

ইহাই ম্যালথসের বিখ্যাত জনসংখ্যাতত্ত্ব। কিন্তু ম্যালথস যে তথ্যগুলি মানিয়া লইয়া উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা সব সময়ে সত্য নহে। খাদ্য উৎপাদন অপেক্ষা জনসংখ্যা সব সময়ে দ্রুততর হারে বৃদ্ধি পায় না। দেশের সকল লোকের জীবন ধারণের মান উন্নত হইলে জন্মের হার সাধারণত কমিয়া যায়। যাহাদের জীবনধারণের মান উন্নত, তাহারা অধিক সন্তান-সন্ততি পছন্দ করে না। বড়লোকের প্রতি মা ষষ্ঠীর কৃপা কম। পাশ্চাত্য দেশে জন্মশাসনপদ্ধতি ব্যাপকভাবে অবলম্বিত হওয়ার জন্য জন্মের হার কমিয়া গিয়াছে। ইউরোপে অনেক দেশে জন্মের হার কমিয়া যাওয়াটাই সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়াছে।

আধুনিক ধনবৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত শুধু উৎপন্ন খাদ্যের তুলনা করিলে চলিবে না, দেশের সমগ্র সম্পদ বৃদ্ধির হারের সহিত তুলনা করিতে হইবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও দেশের সম্পদ উহার বহুগুণ বেশী বৃদ্ধি পাইতে পারে। যদি খাদ্যসরবরাহ তেমন বৃদ্ধি না পায় তবে বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া খাদ্যের অভাব দূর করা যাইতে পারে এবং জীবনধারণের মানও উন্নত করা যাইতে পারে।

কাজেই জনসংখ্যা বাড়িলেই চিন্তিত হইবার কারণ নাই। অনেক সময় এমন হয় যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ তুলনায় অনেক বেশী বৃদ্ধি পায়। যত দিন এই ভাবে সম্পদবৃদ্ধি হইবে ততদিন গড়পড়তা মাথাপিছু আয়ও বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু কিছুদিন পরে জনসংখ্যা এমন অবস্থায় আসিবে যাহা অপেক্ষা বেশী লোক হইলে সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ কম হইয়া যাইবে। এই জনসংখ্যাকে অপটিমাম বা চরমকাম্য

জনসংখ্যা বলে। এই সময় দেশের জনসংখ্যা, সম্পদ এবং মাথা পিছু আয় সর্বাধিক থাকে। এই সংখ্যার পরেও জনবৃদ্ধি হইলে মাথাপিছু আয় কমিয়া যাইবে, সম্পদ বৃদ্ধিও তুলনায় কম হইবে। তাহা হইলে দেশে অতিপ্রজতা (Overpopulation) উপস্থিত হইবে। এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দেশের জনসংখ্যা চরমকাম্য জনসংখ্যার সীমা অতিক্রম করিয়াছে কি না তাহা নির্ণয় করিবার কোন পদ্ধতি আমাদের জানা নাই।

শ্রমিকের দক্ষতা (Efficiency of Labour)। শ্রমের যোগান শ্রমিকের দক্ষতার উপরেও অনেকটা নির্ভর করে। শ্রমিক কুশলী হইলে সে বেশী পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে। সুতরাং কি কি বিষয়ের উপরে শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভর করে তাহা বিশ্লেষণ করা উচিত।

প্রথমত, স্বাস্থ্য ভাল না হইলে কেহ নিপুণ শ্রমিক হইতে পারে না। শ্রমিককে কুশলী হইতে হইলে বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত হইতে হইবে। তাহার কাজে আগ্রহ থাকা চাই। ভাল স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা, দক্ষতা অর্জন করিবার প্রথম সোপান। স্বাস্থ্য আবার অনেকটা জন্মগত এবং জাতিগত। কোন কোন জাতির লোকের দৈহিক স্বাস্থ্য অপর জাতির তুলনায় ভাল হয়। কিন্তু তাহাই শেষ নহে। শরীরের গঠন ভাল থাকা সত্ত্বেও ভাল খাদ্যের অভাবে এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য অনেক সময়ে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। আবার দুর্বল লোকও যদি ভাল এবং পুষ্টিকর খাদ্য পায়, তবে তাহার স্বাস্থ্য ভাল হয়। কাজেই ভাল খাদ্য, স্বাস্থ্যকর আবাস এবং উপযুক্ত পরিচ্ছদ লাভের উপর শ্রমিকের দক্ষতা অনেকটা নির্ভর করে। দেশের আবহাওয়াও শ্রমিকের দক্ষতা প্রভাবান্বিত করে। গরম দেশে দীর্ঘ সময় ধরিয়া কঠোর পরিশ্রম সম্ভব নহে। আবার শীতের দেশে অধিক পরিশ্রম করা যায়।

দ্বিতীয়ত, শ্রমিক বুদ্ধিমান না হইলে কুশলী হইতে পারে না। বুদ্ধি থাকিলে সে খুব তাড়াতাড়ি কাজ শিখিতে পারে। শিক্ষিত শ্রমিক অধিক কর্মকুশল হয়। সাধারণ এবং যান্ত্রিক শিক্ষা দুইই প্রয়োজন। সাধারণ শিক্ষা বুদ্ধিকে সংস্কৃত করে মানসিক এবং নৈতিক গুণের উন্নতি করে। জনসাধারণের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা প্রচারিত হইলে তাহাদের কুশলতা বাড়ে। যান্ত্রিক শিক্ষা থাকিলে শ্রমিক ভাল ভাবে কাজ করিতে পারে। যন্ত্রপাতি চালাইবার ক্ষমতা ও যন্ত্রপাতির সম্বন্ধে

খুঁটিনাটি জ্ঞান থাকিলে শ্রমিক ভাল কর্মী হইতে পারে। যন্ত্র চালাইতে না জানিলে সেই যন্ত্র লইয়া কাজ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে।

তৃতীয়ত, শ্রমিকের কর্মে প্রবৃত্তি থাকা চাই। শ্রমিক পরিশ্রমী ও সাধু প্রকৃতির হইবে। উন্নতি করিবার আকাংখা না থাকিলে শ্রমিক কাজে মন দেয় না। যদি তাড়াতাড়ি উন্নতি হইবার সম্ভাবনা থাকে, যদি অদূর ভবিষ্যতেই পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পাইবার আশা থাকে, তাহা হইলে অনেক শ্রমিকেরই কাজে আকাংখা বাড়ে। শ্রমিকদের অধিকতর কাজে প্রবৃত্ত করাইতে ইহা অপেক্ষা অন্য কিছুই কার্যকরী নহে। কর্মে উন্নতি হইবার সম্ভাবনা শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। স্বাধীন শ্রমিক দাস শ্রমিক অপেক্ষা অধিকতর কুশলী হয়। মারপিট করিয়া দাসের নিকট হইতে কাজ আদায় করা যায় বটে, কিন্তু স্বাধীন শ্রমিক জানে যে, অধিক পরিশ্রম করিলে অধিক আয় সে নিজেই ভোগ করিতে পারিবে। কাজেই সে বেশী পরিশ্রম করিতে সহজেই রাজী হইবে। কারখানার ভিতরে আনন্দদায়ক পরিবেশও শ্রমিকের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে। আনন্দদায়ক পরিবেশ কাজের একঘেঁয়েমি দূর করে।

চতুর্থত, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং শ্রমিকের চারিত্রিক গুণ কি ভাবে শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করে, তাহা উপরে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু পরিচালকের সংগঠনক্ষমতার উপরেও শ্রমিকের কার্যদক্ষতা নির্ভর করে। কর্মকর্তা নিজে কার্যদক্ষ হইলে সে শ্রমিকদিগকে ভাল করিয়া কাজ করিতে অনুপ্রাণিত করিতে পারে। মালিক কার্যদক্ষ হইলে সে উপযুক্ত লোককে ঠিকমত কাজ দেয়; তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্য যথাসময়ে তাহার নিকট পৌছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করে। এই ভাবে পরিচালকও শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে।

দশম পরিচ্ছেদ

মূলধন

মূলধনের সংজ্ঞা (Definition of Capital) : মূলধন কথাটির সহিত আমরা যথেষ্ট পরিচিত। অনেক সময়েই শুনিতে পাই যে মূলধনের অভাবে অনেকে ব্যবসায় করিতে পারিতেছে না। মূলধন বলিতে কি বোঝে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিবে যে ব্যবসায় চালাইবার মত অর্থই মূলধন। ব্যবসায়ে যে টাকা খাটানো হয় তাহাকেই সাধারণ লোকে মূলধন বলে। কিন্তু ধন-বৈজ্ঞানিকেরা কথাটি অন্য অর্থে ব্যবহার করেন। তাঁহাদের মতে টাকা মূলধন নহে। টাকার বিনিময়ে আমরা জিনিষপত্র কিনিতে পারি মাত্র। দেশে টাকা বাড়িলেই মূলধন বাড়ে না। গত যুদ্ধের সময়ে আমাদের দেশে টাকার পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তাহাতে মূলধন বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। মূলধন বলিতে যন্ত্রপাতি., কাঁচামাল প্রভৃতি বুঝায়।

ধনকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। খাদ্য ও বস্ত্রের মতো দ্রব্য যাহা আমাদের দৈনন্দিন অভাব দুর করিতে পারে ও ভোগব্যবহারে লাগে, তাহা প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দ্রব্য উৎপাদক। ইহা দিয়া অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারি। প্রথম শ্রেণীর দ্রব্যকে উপভোগের সামগ্রী (Consumption goods) বলা হয়; দ্বিতীয় শ্রেণীর দ্রব্যকেই বলা হয় মূলধন। কাজেই যে দ্রব্যের সাহায্যে আরও অধিক দ্রব্য উৎপাদন করা হয় তাহাকেই মূলধন বলে। যন্ত্রপাতি, কারখানার বাড়ী ঘর, কাঁচামাল, শ্রমিকদের জন্য খাদ্যবস্ত্র ইত্যাদি যাহা যাহা উৎপাদনের কার্যে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে মূলধন বলা হয়।

জমি এবং মূলধন : প্রশ্ন উঠিতে পারে, জমিকে মূলধন বলা যায় কি না? জমি বা প্রাকৃতিক সম্পদ সরাসরি উপভোগ করা যায় না। তাহা সাধারণত উৎপাদনকার্যে ব্যবহৃত হয়। মূলধনের যে সংজ্ঞা উপরে দেওয়া হইয়াছে, তদনুযায়ী জমিকেও মূলধন বলিতে হয়। অনেক ধনবৈজ্ঞানিক জমিকে মূলধনের অন্তর্গত করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু কেহ কেহ এই মতের বিরুদ্ধে। তাঁহাদের মতে মানুষের শ্রমে উৎপন্ন দ্রব্যকেই মূলধন আখ্যা দেওয়া উচিত।

জমি না হইলে অবশ্য উৎপাদনের কাজ অসম্ভব। কিন্তু জমি প্রকৃতিদত্ত বলিয়া উহাকে স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করা প্রয়োজন। মানুষ যাহা তৈয়ারী করে তাহা যদি আবার উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়, তবেই তাহাকে মূলধন বলিব। জমি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ প্রকৃতির দান। মানুষ শত চেষ্টা করিয়াও তাহাদের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে না। চেষ্টা করিলে বোম্বাই রাজ্যে পাট উৎপন্ন করা যায় না। কিন্তু সময় পাইলে অধিকসংখ্যক যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করা অসম্ভব নহে। যন্ত্রপাতি সরবরাহের পরিমাণ প্রয়োজনমত বাড়ান বা কমান যায়। কাজেই জমি এবং মূলধনের মধ্যে প্রভেদ করা উচিত। এই প্রভেদ বুঝাইবার জন্য একজন বিখ্যাত ধনবৈজ্ঞানিক মূলধনের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়াছেন, "উৎপাদনের সহযোগী উৎপন্ন দ্রব্যই" হইতেছে মূলধন।

মূলধন ও ধন (Capital and Wealth) : মূলধন এবং ধনের মধ্যে প্রভেদ কি তাহাও এখন পরিষ্কার হইয়াছে আশা করা যায়। মূলধন মাত্রই ধনের পর্যায়ে পড়ে; কিন্তু সব ধনই মূলধন নহে। যে ধনজাতীয় দ্রব্য মানুষের আশু প্রয়োজন মিটাইতে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে মূলধন বলা হয় না। অর্থাৎ ভোগের সামগ্রী ধনের পর্যায়ে পড়ে, কিন্তু ইহা মূলধন নহে। ধনের যে অংশ পুনরায় উৎপাদনের জন্য নিয়োগ করা হয়, তাহাকেই মূলধন বলে। কাজেই কোন সামগ্রী মূলধন কিনা নির্ণয় করিতে হইলে তাহা কি কাজে ব্যবহার করা হইতেছে উহা দেখিতে হইবে। কোন বাড়ীতে যদি কারখানা খোলা হয়, তবে সে বাড়ী মূলধনের পর্যায়ে পড়িবে। কিন্তু বাড়ীটি যখন বাস করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় তখন তাহা আর মূলধন নহে। রন্ধনের কার্যে ব্যবহৃত কয়লা মূলধনের পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু রেল ইঞ্জিন অথবা কল চালাইবার কাজে যখন কয়লা দেওয়া হয় তখন সে কয়লা মূলধন বলিয়া গণ্য হইবে। যে ধন মানুষের অভাব সরাসরিভাবে মিটাইতে পারে তাহা ভোগের সামগ্রী। উহা মূলধন নহে। যখন উৎপাদনের কাজে ধন নিয়োগ করা হয় তখনই সেই ধনকে মূলধন বলা যায়। মূলধন এবং ধনের মধ্যে আরও একটি পার্থক্য আছে। জমিকে ধন বলা হয়। কিন্তু জমি মূলধন নহে। যে ধন মানুষের শ্রমের ফলে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাই মূলধন। প্রকৃতিদত্ত ধন মূলধন নহে।

মূলধনের প্রকারভেদ ঃ উৎপাদনের জন্য যে উৎপাদিত ধন ব্যবহৃত হয়, তাহাকেই মূলধন বলে। মূলধন সাধারণত দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—স্থায়ী

এবং পরিবর্তনশীল বা চলতি (Fixed and Circulating)। যে সামগ্রী বহুদিন ধরিয়া অনেকবার উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয় তাহাকে স্থায়ী মূলধন (Fixed capital) বলে। যন্ত্রপাতি, বাড়ীঘর ইত্যাদি দীর্ঘস্থায়ী ও বারে বারে উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত হইতে পারে। একবার কাজ হইয়া গেলে এই দ্রব্যগুলি অনুরূপ ধারণ করে। কিন্তু কাঁচামাল একবার ব্যবহারের ফলে সম্পূর্ণ নূতন আকার ধারণ করে। তুলা হইতে সুতা তৈয়ারী করা হইয়া গেলে তখন তাহা আর তুলা থাকে না। আবার সুতা হইতে কাপড় বোনা হয়। তখন আর সুতার অস্তিত্ব থাকে না। কাজেই তুলা পরিবর্তনশীল মূলধন। উৎপাদন-কার্য মাত্র একবার ব্যবহারে যাহা স্বতন্ত্র দ্রব্যে রূপান্তরিত হয় তাহাকেই পরিবর্তনশীল মূলধন (Circulating capital) বলা হয়। সুতা কাটিবার এবং কাপড় বুনিবার যন্ত্রকে স্থায়ী মূলধন বলে। তুলা পরিবর্তনশীল মূলধন।

কোন কোন লেখক মূলধনের আরও একটি শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, মূলধন দুই শ্রেণীর, একটি যান্ত্রিক বা সহায়ক (Auxiliary), অপরটি উপভোগ্য (Consumer's capital)। যন্ত্রপাতি, রেল, ডক, জাহাজ কারখানা প্রভৃতি যান্ত্রিক মূলধন। শ্রমিকেরা উৎপাদনের কার্যে এইগুলি ব্যবহার করে। যাহা সরাসরিভাবে মানুষের অভাব দূর করিতে পারে তাহা যখন উৎপাদনের কার্যে ব্যবহার করা হয়, তখন তাহা উপভোগ্য মূলধন হিসাবে গণ্য হয়। খাদ্য, বস্ত্র, বাড়ী প্রভৃতি শ্রমিকের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এই পর্যায়ে পড়ে।

আরও একটি শ্রেণী বিভাগ করা হয়,—বিশিষ্ট (Specialised or Sunk) এবং নির্বিশেষ বা ভাসমান (Unspecialised or Floating) মূলধন। যে সকল যন্ত্রপাতি মাত্র একটি বিশেষ শ্রেণীর উৎপাদনে নিয়োগ করা যাইতে পারে, তাহাকে বিশিষ্ট মূলধন বলা হয়। লৌহপ্রস্তুতের কারখানার ব্লাস্ট ফারনেস (Blast furnace) অন্য কোন শিল্পে নিয়োগ করা সম্ভব নহে। ইহাকে বিশিষ্ট মূলধন বলা যায়। যাহা একাধিক শিল্পে নিয়োগ করা সম্ভব, তাহাকে নির্বিশেষ বা ভাসমান মূলধন বলে। কয়লা, রেলপথ ভাসমান মূলধনের দৃষ্টান্ত।

জমি এবং শ্রমিকের ন্যায় মূলধন উৎপাদনের মূল উপাদান নহে। শ্রমের ফলেই মূলধন উৎপন্ন হয়। বয়নযন্ত্র একটি মূলধনের সামগ্রী। কিন্তু বয়নযন্ত্র

মানুষের শ্রমের দ্বারা তৈয়ারী হইয়াছে। খনিজ লৌহ হইতে ইস্পাত তৈয়ারী হইয়াছে। কিন্তু খনি প্রকৃতির দান এবং ধনবিজ্ঞানে প্রকৃতির দান ভূমির অন্তর্গত। কাজেই জমি এবং শ্রমের সংযোগেই মূলধন উৎপন্ন হয়।

মূলধনের কাজ (Functions of Capital) : আধুনিক শিল্প ও উৎপাদনকার্যে মূলধন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কোন না কোন প্রকারের মূলধন ব্যতীত উৎপাদন অসম্ভব। লাঙ্গল এবং মই না থাকিলে চাষী কি করিতে পারে? গাঁইতি না থাকিলে খনির শ্রমিক কি কয়লা কাটিতে পারে? বীজ না থাকিলে চাষী বপন করিত কি? সুতরাং উৎপাদনে মূলধনের স্থান কোথায়, তাহা ইহা হইতেই অনুমেয়। যন্ত্রের সাহায্যে আমরা অধিক পরিমাণে সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারি। সোভিয়েট রাসিয়ার যৌথ কৃষিক্ষেত্রগুলিতে কলের লাঙ্গল ও ট্রাক্টর নিয়োগ করায় ফসলের পরিমাণ সাধারণ লাঙ্গল কর্ষিত জমি অপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতাকাটার কলে একজন লোক যত সুতা তৈয়ারী করিতে পারে, চরকায় তাহা পারে না। তাঁতি কলে অনেক বেশী কাপড় তৈয়ারী করিতে পারে। মূলধনের সাহায্যে এইভাবে মোট উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন বাড়িলে মজুরীও বৃদ্ধি পায় এবং সবশ্রেণীর লোকের জীবনধারণের মান উন্নত হয়। আধুনিক সভ্যতা এবং বৃহদায়তন উৎপাদন মূলধন ছাড়া সম্ভব হইত না।

পরিবর্তনশীল মূলধন সবপ্রকার শিল্পে কাঁচা মাল সরবরাহ করিয়া থাকে। এই মূলধন আরও একটি জরুরী কাজ সম্পাদন করে। যাহারা উৎপাদনের কার্যে নিযুক্ত তাহাদের জীবনধারণের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য ইহা হইতে পাওয়া যায়। মূলধনের সাহায্যে উৎপাদন পরোক্ষ ও সময়সাপেক্ষ হইয়া উঠে। দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সরাসরি পরিশ্রম না করিয়া আমরা প্রথমে যন্ত্রাদি উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করি এবং পরে যন্ত্র দ্বারা আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করি। যে কোন জেলের কথা ধরা যাউক। মাছ ধরিতে হইলে নদী বা পুকুরে গিয়া সে হাত দিয়া মাছ ধরে না। হাত দিয়া মাছ ধরিলে তাহার প্রয়োজন সরাসরি মিটিয়া যাইত। পরিবর্তে সে হয়ত সারাদিন ধরিয়া ছিপ তৈয়ারী করিয়া লয়। পরে সেই ছিপ দিয়া মাছ ধরে। হাত দিয়া যত মাছ ধরা সম্ভব তদপেক্ষা বেশী মাছ সে ছিপ দিয়া ধরিতে পারে। কিম্বা একাধিক দিন পরিশ্রম করিয়া সে একটি জাল তৈয়ারী

করিল। জাল দিয়া সে ছিপ অপেক্ষা অনেক বেশী মাছ ধরিতে পারিবে। ছিপ অথবা জাল জেলের মূলধন। আধুনিক সমাজে আমাদের প্রয়োজন মিটাইতে হইলে প্রথমে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিয়া লইতে হয়। পরে সেই যন্ত্রপাতি হইতে সামগ্রী উৎপাদিত হইলে আমাদের প্রয়োজন মিটে। এই উৎপাদন পরোক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। জেলে যতদিন ধরিয়া ছিপ বা জাল তৈয়ারী করিবে ততদিন বাঁচিয়া থাকিবার জন্য তাহার অন্নবস্ত্র চাই। পরিবর্তনশীল মূলধনের কাজ হইতেছে একটি উপভোগের সামগ্রী উৎপন্ন হইবার পূর্ব পর্যন্ত শ্রমিকের সকল চাহিদা পূরণ করা। এইভাবে মূলধন শ্রমিককে অধিক সামগ্রী উৎপাদন করিতে সাহায্য করে। দেশের আর্থিক উন্নতি দেশের মূলধনের উপরে নির্ভর করে। আমাদের দেশের চাষীরা বিঘা প্রতি সবাপেক্ষা কম ফসল উৎপন্ন করে। তাহার অন্যতম প্রধান কারণ আমাদের দেশের চাষীর মূলধন নিতান্ত কম। আমাদের মূলধন কম বলিয়াই আমরা দরিদ্র জাতি।

মূলধনবৃদ্ধি (Growth of Capital): সঞ্চয় হইতেই মূলধন জমে। আদিম যুগের ধীবর প্রতিদিন মাছ ধরিয়া প্রতিদিন আহার করিত। কখনও অনেক মাছ ধরিলে অনেক মাছ আহার করিত। মাছ না জুটিলে অনাহারে থাকিতে হইত। এইরূপ অনিশ্চিত জীবনযাত্রা পরিবর্তন করিয়া জীবনের ধারা আরও উন্নত করিতে হইলে তাহাকে মৎস্য সঞ্চয় করিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে সে মাছ শুকাইয়া সঞ্চয় করিতে শিখে। এইরূপে কিছু মাছ সঞ্চিত হইলে সে বনে গিয়া গাছ কাটিয়া নৌকা তৈয়ারী করে। নৌকা তৈয়ারী করিতে যে সময় লাগে সেই সময়টা সে সঞ্চিত মাছ খাইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে। অবশেষে নৌকার সাহায্যে সে মাছ ধরিতে পারে। তাহার আত্মীয়স্বজনেরা সঞ্চয় করে নাই বলিয়া নৌকা তৈয়ারী করিতে পারে নাই, মাছও তাহারা কম ধরিবে। এই নৌকাই আদিম ধীবরের মূলধন। সঞ্চয় করাতেই তাহার পক্ষে নৌকা তৈয়ারী করা সম্ভব হইয়াছিল। অতএব সঞ্চয় হইতেই মূলধনের উৎপত্তি হয়।

সঞ্চয় বাড়িলে মূলধনও বাড়ে। **সঞ্চয় কি কি জিনিষের উপর নির্ভর করে?** সঞ্চয়ের ক্ষমতা ও প্রবৃত্তির উপর সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করে। সঞ্চয় করিবার মত অবস্থা না থাকিলে সঞ্চয় সম্ভব নয়। জীবনের নিম্নতম প্রয়োজন মিটাইবার মত যাহাদের আয় নাই, তাহারা সঞ্চয় করিবে কি? ক্ষুধার্ত লোক

তাহার আয়ের একভাগ সঞ্চয় করিবে ইহা আশা করা যায় না। মানুষের মোটামুটি প্রয়োজন মিটিয়া অন্তত কিছু উদ্বৃত্ত আয় না থাকিলে সঞ্চয় করা সম্ভব নহে।

সাধারণত ব্যয়ের অধিক আয় হইলে তবেই তাহা সঞ্চয় করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা যে সঞ্চিত হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। সঞ্চয়ের ক্ষমতা থাকিলেই সঞ্চয় হয় না; সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তিও থাকা দরকার। মানুষ কেন সঞ্চয় করে?' যে সাবধানী ও বুদ্ধিমান সে আয়ের কিছু সঞ্চয় করিবেই করিবে। যাহার ভবিষ্যৎদৃষ্টি আছে সে দুর্দিনের জন্য কিছু সঞ্চয় করিবেই। কাজেই লোকের প্রকৃতির উপরে সঞ্চয় অনেকটা নিভর করে। পরিবারের প্রতি স্নেহ-ভালবাসাও সঞ্চয়ে প্রেরণা দেয়। নিজের মৃত্যুর পরে স্ত্রীপুত্র পরিবার অর্থের অভাবে কষ্ট পায় ইহা কেহই চাহে না। এই কারণে সকলে আয় হইতে কিছু কিছু অর্থ বাঁচাইবার চেষ্টা করে। আবার অনেকের উচ্চাকাংখা থাকে। তাহারা ধনী হইতে চায়; কারণ তাহা হইলে মনুষ্যসমাজে তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িবে। তাহা ছাড়া সে হয়ত বিলাস সামগ্রী উপভোগ করিতে চায়। এই উদ্দেশ্যে লোকে কঠোর পরিশ্রম করে এবং সঞ্চয় করে।

কতকগুলি আনুষঙ্গিক সুবিধা থাকিলে লোক বেশী সঞ্চয় করে। সঞ্চয় কাজে লাগাইবার এবং খাটাইবার সুবিধা থাকিলে লোকে বেশী সঞ্চয় করে। নির্ভরযোগ্য ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, শেয়ার প্রভৃতিতে লোকে যদি নির্ভয়ে টাকা বিনিয়োগ করিতে পারে, তবে তাহাদের সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি বাড়িবে। জীবন এবং সম্পত্তির নিরাপত্তা না থাকিলে সঞ্চয় কম হইবে। শক্তিশালী সরকার ও দেশে ভাল আইন না থাকিলে, অথবা বৈদেশিক আক্রমণের ভয়ে যদি দেশের নিরাপত্তা বিপন্ন হইয়া উঠে, তবে লোকে নিজেদের সঞ্চিত অর্থ ভোগ করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ থাকিবে। ফলে লোকে বিশেষ সঞ্চয় করিবে না। মুদ্রা-স্ফীতির (Inflation) জন্য টাকার মূল্য কমিয়া গেলেও সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তি কমিয়া যাইতে পারে। নিজের সঞ্চয় বিনা বাধায় ভবিষ্যতে উপভোগ করা চলিবে, এইরূপ বোধ না থাকিলে লোকে সঞ্চয় করে না।

ভারতবর্ষে মূলধনের অভাব কেন? : ভারতবর্ষে মূলধনের অভাব। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের লোক অপেক্ষা ভারতবাসীদের সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তি কোন অংশে কম নহে। ভারতবাসীদের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি কম তাহাও বলা যায় না।

অবশ্য একটি কারণে আমাদের সঞ্চয় কম হয়। সামাজিক প্রথার জন্য আমাদের দেশের লোক বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়াকর্মে অর্থব্যয় করে, এমন কি ঋণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। ইহা কম সঞ্চয়ের একটি কারণ। সর্বাপেক্ষা বড় কারণ যে, আমাদের দেশের লোকের আয় এত কম যে তাহা হইতে সঞ্চয় করা সম্ভব নহে। আমাদের দেশে চাষীদের সংখ্যাই সর্বাধিক। তাহাদের আয় হইতে তাহাদের নিম্নতম প্রয়োজনই মিটে না। আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে কোন উদ্বৃত্ত থাকে না। দেশের ব্যাঙ্কগুলি এখনও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে নাই। সেজন্যও লোকে সঞ্চয় করিতে চায় না। বড় বড় শহর ছাড়া গ্রামে আজকাল ব্যাঙ্ক নাই বলিলেও চলে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

উৎপাদনের সংহতি

শ্রমবিভাগ (Division of Labour) : শ্রমবিভাগ কাহাকে বলে? তাঁতি ইচ্ছা করিলে নিজের হাতের লাগানো গাছের তূলা দিয়া নিজে সূতা কাটিয়া, তাঁত-তৈয়ারী করিয়া তাহাতে কাপড় বুনিতে পারে। অর্থাৎ একটি দ্রব্যকে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নিজে পরিশ্রম করিয়া উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু তাহা না করিয়া সে যদি বাজার হইতে সূতা ও তাঁত কিনিয়া কাপড় বোনে, তাহা হইলে কাপড় তৈয়ারী করার শ্রমকে বিভাগ করা হইবে। উৎপাদনের কাজকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভাগ করিয়া প্রত্যেক অংশটিতে পৃথক লোক নিযুক্ত করিলে সেই ব্যবস্থাকে শ্রমবিভাগ বলে। আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য শ্রমবিভাগ। শ্রমবিভাগ কোন না কোন আকারে সৃষ্টির আদিমকাল হইতেই পৃথিবীতে আছে। বাইবেলে কথিত আছে যে, আদম খাদ্যাদি উৎপন্ন করিত এবং ইভ ঘরকন্নার কাজ দেখিত। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে এইরূপ কর্মবিভাগকে শ্রমবিভাগের আদিমরূপ বলা যায়। শ্রমবিভাগের নীতি আধুনিক কালে আরও ব্যাপকভাবে গৃহীত হইয়াছে। এখন কোন মানুষই সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিজে উৎপাদন করে না, এমন কি কম লোকই নিজের পরিশ্রমে একটি সম্পূর্ণ জিনিস তৈয়ারী করে।

শ্রমবিভাগের ফলে কর্মবৈশিষ্ট্য (Specialisation) দেখা দিয়াছে। উৎপাদনের কাজ ছোট ছোট বহু অংশে বিভক্ত। একজন লোক একটি কাজই বিশেষভাবে করিতে শেখে। শুধু লোক নয়, এক একটি অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে দক্ষতা অর্জন করে। বেরার তূলা উৎপাদন করে; বাংলা দেশে পাট ও চা হয়। বেরারের কালো মাটি তূলার পক্ষে উপযোগী, আবার বাংলা দেশের মাটিতে পাট ভাল হয়। এইজন্য এক একটি দেশে বিশেষ ধরণের দ্রব্য উৎপন্ন হয়।

শ্রমবিভাগের ফলে আমাদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা (Co-operation) বৃদ্ধি পায়। এই ব্যবস্থায় এক বা একাধিক লোক কোন সামগ্রীর একটি অংশমাত্র উৎপাদন করে। প্রত্যেক অংশের নিযুক্ত লোক অপর

অংশের সহিত সহযোগিতা না করিলে উৎপাদন বন্ধ হইয়া যাইবে। হাত-মুখের অসহযোগ কাহিনী সকলেই জানে। হাত-মুখের সহিত সহযোগিতা না করিলে পেটে খাদ্য পড়ে না এবং মানুষ অনাহারে থাকে। তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কাজ করিয়া অপরের সহিত সহযোগিতা করিলেই উৎপাদন সম্ভব হয়। শ্রমবিভাগের ফলেই দ্রব্য-বিনিময় (Exchange) প্রয়োজন হয়। কুম্ভকার মাটির বাসন ও খেলনা তৈয়ারী করে। বিনিময়ে সে অপর দ্রব্যাদি পায় বলিয়াই অভাব মিটাইতে পারে। আবার তুলা যে উৎপাদন করে সে কাটুনীর নিকট তুলা বিক্রয় করে, কাটুনী সূতা কাটিয়া তাঁতীর কাছে দেয়। তাঁতী কাপড় বোনে। কাজেই ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য তৈয়ারী হইবার পূর্বেকার প্রত্যেকটি স্তরে টাকার সহিত বিনিময় ঘটিতেছে।

শ্রমবিভাগের প্রকারভেদ (Forms of division of labour) : শ্রমবিভাগ দুই প্রকার, সরল ও জটিল। সরল শ্রমবিভাগে একজন লোক একটি দ্রব্যের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি অংশ প্রস্তুত করে। গ্রামে দেখা যায় যে এক একটি জাতের লোক একটি বিশেষ দ্রব্য তৈয়ারী করে। চামড়া ছাড়ানো হইতে আরম্ভ করিয়া জুতা সেলাই পর্যন্ত সব কাজ মুচি করিয়া থাকে। সরল শ্রমবিভাগ আবার দুই প্রকারের,—ব্যবসায় ও বৃত্তিগত বিভাগ (Division into trades) এবং এক একটি স্তরের সম্পূর্ণ শ্রমবিভাগ (Division into complete processes)। যখন একজন লোক একটি দ্রব্য উৎপাদনের সব স্তরের কাজ একাই করে, তখন সমগ্র কাজকে ব্যবসায় ও কর্মগত শ্রমবিভাগ বলে। মুচি যদি চামড়া ছাড়ানো হইতে আরম্ভ করিয়া জুতা সেলাই পর্যন্ত সব কাজই করে, তবে তাহার কাজ এই পর্যায়ে পড়ে। ছুতোর কাঠের সব কাজ করে, কুমোর মাটির বাসন ও পুতুল তৈয়ারী করে, তাঁতি কাপড় বোনে। ইহাই ব্যবসায় ও বৃত্তিগত শ্রমবিভাগ। কিন্তু আদিম সমাজেও ইহা অপেক্ষা অধিকতর শ্রমবিভাগ প্রচলিত ছিল। মুচি চামড়া তৈয়ারী হইতে জুতা সেলাই পর্যন্ত সমস্ত কাজই করে না। চামড়া ছাড়ানো এবং চামড়া শোধন করিবার কাজ সাধারণত অন্য শ্রেণীর লোকে করে। বাজার হইতে শোধিত চামড়া কিনিয়া মুচি জুতা তৈয়ারী করে। এক্ষেত্রে শ্রমবিভাগ অনেকটা বিস্তৃত। একটি সামগ্রীর উৎপাদনের কাজকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা হয়, এবং একটি স্তরের কাজ শেষ হইলে বিক্রয়োপযোগী একটি জিনিষ

উৎপন্ন হয়। এই ধরণের প্রত্যেক স্তরের যে শ্রমবিভাগ, তাহাকে সম্পূর্ণ স্তরের শ্রমবিভাগ বলে।

আধুনিক সমাজে শ্রমবিভাগ আরো জটিল হইয়া পড়িয়াছে। চামড়া শোধনের কাজ বর্তমানে আর একজন লোক করে না। একজন শ্রমিক কেবলমাত্র চামড়া ছাড়াইয়া দেয়, অন্য জন চামড়া নানা দ্রাবকে ভিজাইয়া রাখে ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন কি একজন মুচি সম্পূর্ণ জুতা তৈয়ারী করে না। বাটা কোম্পানীর মত আধুনিক জুতার কারখানায় একদল শ্রমিক শুধু চামড়া নানা আকারে কাটিয়া দেয়। আর এক দল কেবল জুতার তলা তৈয়ারী করে; কেহ উপরের অংশ তলার সহিত জুড়িয়া দেয়। এইভাবে জুতা তৈয়ারীর কাজ অনেকগুলি স্তরে বিভক্ত হইয়াছে। আদম স্মিথ তাঁহার "Wealth of Nations" নামক পুস্তকটিতে বলিয়াছেন যে, সামান্য একটি আলপিন তৈয়ারী করিতে অন্যূন আঠারটি স্তরে কাজ করা হয়। আধুনিক যুগে পিন তৈয়ারীর কাজ আরও অধিক ভাগে ভাগ করা হইয়াছে ইহাকে অসম্পূর্ণ স্তরের শ্রমবিভাগ বলে।

আরও এক শ্রেণীর শ্রমবিভাগ আছে, তাহাকে ভৌগলিক শ্রমবিভাগ (Territorial division of labour) বলে। অনেক অঞ্চলে কতকগুলি বিশেষ সামগ্রী তৈয়ারী করিবার সুবিধা আছে। যেমন বাংলা দেশের জলবায়ু ও মাটিতে ভাল পাট জন্মে। উত্তরে চা ভাল হয়। আবার বেরারের কালো মাটিতে ভাল তুলা গাছ হয়। পাঞ্জাবে গম উৎপাদন করিবার বিশেষ সুবিধা আছে।

শ্রমবিভাগের উপকারিতা (Advantages of Division of Labour): বহুদিন পূর্বে আদম স্মিথ তাঁহার বিখ্যাত পুস্তকে বলিয়াছেন যে, যে শ্রমিক পিন তৈয়ারীর কাজ জানে না, তৈয়ারীর যন্ত্রপাতির সহিত পরিচিত নহে, সে চেষ্টা করিলে সমস্ত দিনে হয় একটি কি বড় জোর দুইটি পিন তৈয়ারী করিতে পারে। কিন্তু তাঁহার সময়ে ছোট কারখানায় এমন শ্রমবিভাগ করা হইয়াছে যে, মাত্র দশ জন শ্রমিক দিনে চল্লিশ হাজারের অধিক পিন তৈয়ারী করিত। শ্রমবিভাগের ফলে দ্রব্যের উৎপাদন প্রচুর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এই উৎপাদন বৃদ্ধির অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমত, শ্রমবিভাগের

ফলে উৎপাদন বহু অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ফলে যাহার যেরূপ যোগ্যতা তাহাকে তদনুরূপ কাজ করিতে দেওয়া যায়। আমাদের অনেকেরই বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা বা যোগ্যতা আছে। কেহ হয়ত যন্ত্রপাতির কাজ ভাল পারে, আর কেহ চারুশিল্প এবং চিত্রকলার প্রতি অনুরক্ত; তৃতীয়, একজনের গান-বাজনার দিকে ঝোঁক আছে। শ্রমবিভাগের ফলে নানা রকমারী কাজ সৃষ্টি হয় এবং তাই প্রত্যেককে তাহার মনোমত কাজ দেওয়া সম্ভব হয়। যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ ভাগ করা হয়। যে কাজের জন্য একজন সর্বাধিক যোগ্য তাহাকে সেই কাজ দেওয়া হয় বলিয়া উৎপাদন বহুগুণ বাড়িয়া যায়। যাহার কাজ তাহাকে দিলে লাঠি বাজিবে না। সব কাজ সুষ্ঠুভাবে চলিবে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে।

দ্বিতীয়ত, আবার যাহাদের বিশেষ কোন যোগ্যতা নাই, তাহারা যদি একই কাজ বার বার করে তবে তাহাদেরও দক্ষতা বাড়িবে। একজন লোক একটি কাজ যদি সারাজীবন ধরিয়া করে, তবে অভ্যাসের ফলে তাহার যোগ্যতা বাড়িতে বাধ্য। যে ডাক্তার সারা জীবন ধরিয়া কেবল চক্ষু রোগের চিকিৎসা করে, সে নিপুণ চক্ষু চিকিৎসক হইবে ইহা স্বাভাবিক। কাজেই প্রত্যেক শ্রমিকই নিজ নিজ কাজে দক্ষ হইয়া উঠিবে।

তৃতীয়ত, একজন লোককে একই কাজ করিতে দিলে অনেকখানি সময় বাচে। মুচিকে যদি একাই জুতা তৈয়ারীর সব কাজ করিতে হয়, তবে প্রত্যেক-বারে কাজের জন্য যন্ত্রাদি পরিবর্তন করিতে বহু সময় নষ্ট হয়। কিন্তু আধুনিক জুতার কারখানায় শ্রমিকেরা একই জায়গায় দাঁড়াইয়া একই কলে সবক্ষণ একই কাজ করে। ইহাতে সময় নষ্ট হয় না। প্রত্যেকের জন্য যন্ত্রাদিও বেশী প্রয়োজন হয় না। আরও এক উপায়ে সময় সংক্ষেপ হয়। আজকাল একজন শ্রমিককে একটি বিশেষ কাজ বা কাজের অংশ মাত্র করিতে হয়। উৎপাদনের সমগ্র কাজ একজনকে করিতে হইলে কাজ শিখিতে যত সময় লাগে তদপেক্ষা অংশ বিশেষ মাত্র শিখিতে সময় অনেক কম লাগে। ফলে খরচ ও সময় উভয়েই কম লাগে।

চতুর্থত, শ্রমবিভাগ ক্রমেই বাড়িয়া যাওয়াতে প্রত্যেকটি অংশের কাজ খুব সরল হইয়া পড়িয়াছে। একই কাজ বার বার করিতে হইলে যন্ত্রের সাহায্যে প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা সেই কাজ করা যায়। শ্রমবিভাগের ফলে নূতন

নূতন যন্ত্র উদ্ভাবনা করা সম্ভব হইয়াছে। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের প্রথম যুগে বয়লার ও সিলিণ্ডারের মধ্যবর্তী পথ বারে বারে খুলিতে ও বন্ধ করিতে একজন বালককে নিযুক্ত করা হইত। একটি বালক তাহার সঙ্গীদের সঙ্গে খেলাধূলা করিতে ভালবাসিত। সে দেখিল, যে ভাল্‌বের ডাণ্ডা এই পথ খুলিয়া দেয় এবং বন্ধ করে, তাহার সহিত ইঞ্জিনের আর একটি অংশ বাঁধিয়া দিলে তাহার সাহায্য ছাড়াই ঐ পথ খুলিতে ও বন্ধ হইতে থাকে এবং তাহা হইলে তাহাকে সব সময়ে কলের পাশে বসিয়া থাকিতে হইবে না। এইভাবে একটি বালকের শ্রম বাঁচাইবার চেষ্টা হইতে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের একটি বিশিষ্ট উন্নতি সাধিত হইল। শ্রমবিভাগের ফলে প্রত্যেক অংশের কাজ সরলতর হইয়া উঠে এবং তাহার ফলে নূতন নূতন যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়। যন্ত্রের উদ্ভাবনে উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়।

শ্রমবিভাগের অনুপকারিতা (Disadvantages of division of labour): শ্রমবিভাগের খারাপ দিকও আছে। প্রথমত, শ্রমবিভাগের ফলে শ্রমিক এখন আর সমগ্র দ্রব্যটি উৎপাদন করে না। প্রত্যেক শ্রমিক একটি দ্রব্যের সামান্য একটা অংশ তৈয়ারী করে। একজন শ্রমিক হয়ত সারাদিন ধরিয়া আলপিনের অষ্টাদশ অংশটিই তৈয়ারী করে। ইহার ফলে কাজ ভয়ানক একঘেঁয়ে হইয়া পড়ে ও কাজে উৎসাহ কমিয়া যায়। নিজে একটি জিনিষ উৎপাদন করিলে যে আনন্দ ও গর্ব অনুভূত হয়, তাহা হইতে আধুনিক কালের শ্রমিক একেবারেই বঞ্চিত। কাজের একঘেঁয়েমির জন্য শ্রমিকের মানসিক বৃত্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং পরিশ্রম করিবার ইচ্ছা ধীরে ধীরে লোপ পায়। ইহার ফলে অবশেষে কাজ করিবার ক্ষমতাও কমিয়া যায়। শ্রমবিভাগের ইহা একটি মস্ত ত্রুটি। আধুনিক শ্রমিকের জীবন এবং জীবিকা দুইই একঘেঁয়ে হইয়া উঠিতেছে।

দ্বিতীয়ত, শ্রমবিভাগের আরও একটি ত্রুটি আছে। যন্ত্র নিয়োগ এবং শ্রমবিভাগের ফলে বড় বড় কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহার সহিত অনেক কুফল দেখা দিয়াছে। কারখানার আশেপাশে শ্রমিকদের বাসের জন্য ঘন বসতিপূর্ণ অস্বাস্থ্যকর বস্তী ও শহর গড়িয়া উঠে। ইহার ফলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং নৈতিক অবনতি ঘটে। বর্তমান যুগে কারখানা প্রতিষ্ঠার ফলে ধনিক এবং শ্রমিকের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে।

এইসব খুব বড় ত্রুটি সন্দেহ নাই। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ইহা যে

কেবল শ্রমবিভাগের দোষ তাহা বলা যায় না। যে শ্রমিক সারাজীবন আলপিনের অষ্টাদশ অংশ তৈয়ারী করিয়াছে, তাহাকে সমগ্র পিন তৈয়ারী করিতে দিলেই কি তাহার বুদ্ধি প্রখর হইয়া উঠিবে? বরং বলা যায় বহু কাজ যন্ত্রের সাহায্যে করা হয় বলিয়া শ্রমবিভাগের ফলে কাজের একঘেঁয়েমি অনেক দূর হইয়াছে। শ্রমবিভাগের ফলে দিনে মাত্র আট ঘণ্টা কাজ করিতে হয়। শ্রমিকের যথেষ্ট অবসর থাকে। সেই অবসরে জ্ঞানচর্চা এবং অন্যান্য সব রকম কাজ করা সম্ভব হয়। শ্রমবিভাগের ফলে দ্রব্যাদি সস্তা হইয়াছে এবং জীবন ধারণের মান উন্নত হইয়াছে। কাজেই শ্রমবিভাগের ত্রুটি অপেক্ষা উপকারিতা অনেক বেশী।

যন্ত্র: শ্রমবিভাগের ফলে নূতন নূতন যন্ত্রাদির আবিষ্কার হয়। আবার যন্ত্র শ্রমবিভাগকে আরও ব্যাপক করিয়া তোলে। একটি শিল্পে একটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হইলে অনুরূপ অন্যান্য শিল্পেও ঐ যন্ত্রের ব্যবহার করিয়া অধিকতর শ্রমবিভাগ করা হয়। যন্ত্র উৎপাদনকে কি ভাবে প্রভাবিত করে, তাহা নীচে বলা হইল।

যন্ত্রের উপকারিতা (Merits of the use of machines): যন্ত্রের সাহায্যে আমরা প্রাকৃতিক শক্তিকে বন্দী করিয়াছি। বিখ্যাত নায়গ্রা জলপ্রপাত আদিমকাল হইতেই আছে। উপযুক্ত যন্ত্র আবিস্কৃত হইবার পূর্বে এই জলপ্রপাত আমরা কাজে লাগাইতে পারি নাই। এখন যন্ত্রের সাহায্যে নায়গ্রা প্রপাত বাঁধিয়া অতি সস্তায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইতেছে। দশম শতাব্দীতে কেহ কোন দিন কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, জলপ্রপাত হইতে শীতকালে উত্তাপ এবং অন্ধকারে আলোক সরবরাহ করা যাইতে পারে। বিজ্ঞানের উন্নতি এবং যন্ত্র উদ্ভাবনের ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। প্রাকৃতিক শক্তিকে আলাউদ্দিনের দৈত্যর মত আমরা নানা কার্যে লাগাইতে পারি। যন্ত্রের সাহায্যে প্রকৃতি মানুষের আয়ত্তে আসিয়াছে। বোম্বাই অথবা কলিকাতার ডকে গেলে দেখা যায় কত বড় বড় মাল ক্রেনের সাহায্যে অবলীলাক্রমে উঠানো নামানো হইতেছে। অতবড় বোঝা তোলা মানুষের ক্ষমতায় কুলায় না। আমাদের পার্থিব সুখ বৃদ্ধি করিতে যন্ত্র অনেকখানি সাহায্য করিতেছে। রেলগাড়ী, বিমান, টেলিফোন, বেতার প্রভৃতি না থাকিলে আধুনিক সভ্যতা কোথায় থাকিত? অতিকায় উৎপাদনব্যবস্থা যন্ত্রের সাহায্যেই সম্ভব হইয়াছে। ইহাতে মোট উৎপাদন

বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং দামও সস্তা হইয়াছে। যন্ত্র আরও একভাবে উৎপাদন বাড়ায়। যন্ত্রের সাহায্যে অতি সূক্ষ্ম কাজ করা সম্ভব। একপ্রকার বিভাজনযন্ত্র আছে, যাহার সাহায্যে এক ইঞ্চিকে দশ সহস্রভাগে ভাগ করা যায়। টিপ হ্যামার নামক একটি যন্ত্র মিনিটে তিনশতবার একই স্থানে আঘাত করিতে পারে। যন্ত্রের কাজ দ্রুত, নিয়মিত এবং নির্ভুল। ইহার ফলে উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

যন্ত্র ও শ্রমিক (Machines and labour): যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে শ্রমিকের অনেক সুবিধা হইয়াছে। যন্ত্র মানুষের শ্রম লাঘব করিয়াছে। ঠেলা গাড়ীর বদলে লরি এবং রিকসা ও পাল্কি গাড়ীর বদলে মোটর গাড়ী মানুষের দৈহিক পরিশ্রম অনেক কমাইয়া দিয়াছে। ক্রেনের সাহায্যে ভারী এবং বড় বোঝা তোলা যায়, তাহাতেও শ্রম লাঘব হয়। কাজের দৈহিক শ্রম এবং কাজের একঘেয়েমি যন্ত্রের সাহায্যে অনেক পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। যে কাজ একেবারে বাঁধাধরা তাহা যন্ত্রের সাহায্যে সম্পাদন করা যায়। যন্ত্র যে শুধু কাজের একঘেয়েমি দূর করিয়াছে তাহা নহে, উহা শ্রমিকের কার্যদক্ষতাও বৃদ্ধি করিয়াছে। সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি ব্যবহারে শ্রমিকের শক্তি বিকশিত হয়।

যন্ত্র ও বেকার সমস্যা (Does machinery create unemployment?): উপরোক্ত সুবিধা সত্ত্বেও শিল্পে নিয়োগ শ্রমিক সুদৃষ্টিতে দেখে না। যন্ত্রের বিরোধিতা একসময়ে এত প্রবল ছিল যে ইংলণ্ডে লডাইট নামে খ্যাত একদল শ্রমিক ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নব আবিষ্কৃত একটি যন্ত্র একেবারে চূর্ণ করিয়া ফেলে। ষোড়শ শতাব্দীতে ফিতা তৈয়ারী যন্ত্রের আবিষ্কর্তাকে শ্রমিকেরা সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করে। শ্রমিকদের এই বিরাগের কারণ, যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে শ্রমিকেরা অনেকেই বেকার হইয়া পড়ে। একটি যন্ত্র বহুশত লোকের কাজ করিতে পারে। বয়নযন্ত্র আবিষ্কারের ফলে তাঁতিরা বেকার হইয়াছে। লরীতে মাল পাঠাইলে ঠেলা গাড়ীর চালকের অন্ন যায়। কিন্তু এই ধারণা ভুল। ধনবিজ্ঞানীরা বলেন যে, যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে আজ যাহারা বেকার হইবে, তাহারা কিছুদিন পরে কোনও না কোন কাজ পাইবে। যন্ত্র প্রয়োগে কম ব্যয়ে বহু সামগ্রী উৎপাদিত হয়। শ্রমিকদের তাহাতে লাভ হয়। তাহারাও কম দামে জিনিষ পায়। লোকে কম দামে জিনিষ পায় বলিয়া নানারকম জিনিষ কিনিতে পারে। তাহার ফলে দ্রব্যের

উৎপাদন বাড়ে এবং বহুলোক তাহাতে নিযুক্ত হইতে পারে। এইভাবে এবং অন্যান্য উপায়ে বেকার শ্রমিক আবার নূতন কাজ পাইবে। ইহা সত্য হইলেও শ্রমিকেরা যে সাময়িকভাবে বেকার থাকিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই একথা বলা যায় যে, নূতন যন্ত্র আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হইলে শ্রমিকদের বেকার থাকিতে হয় ও কষ্টভোগ করিতে হয়।

শিল্পের একদেশতা (Localisation of Industries): শ্রমবিভাগের একটি সুবিধা যে ইহাতে যে কাজের উপযুক্ত তাহাকে ঠিক সেই কাজে দেওয়া যায়। শুধু লোকের বেলায় নয়, বিভিন্ন অঞ্চল সম্বন্ধেও ইহা সমানভাবে প্রযোজ্য। প্রত্যেক শিল্প এবং ব্যবসায় এরূপ অঞ্চলে গড়িয়া উঠে, যেখানে ঐ শিল্প প্রতিষ্ঠার সুবিধা সর্বাপেক্ষা অধিক পাওয়া যায়। এইজন্য এক একটি অঞ্চলে এক একটি শিল্প বা ব্যবসায়ের বহু প্রতিষ্ঠান একত্র সংস্থাপিত হয়। একটি স্থানে একটি বিশেষ ব্যবসায় বা শিল্প গড়িয়া উঠিবার প্রবণতাকে শিল্পের একদেশতা বলে। বোম্বাই ও আমেদাবাদ শহরের আশে পাশে বহুসংখ্যক কাপড়ের কল আছে। গঙ্গার দুই পার্শ্বে বহু পাটের কল রহিয়াছে। বহু চিনির কল উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

একদেশতার কারণ (Causes of Localisation): কি কি কারণে বোম্বাই শহরের আশেপাশে কাপড়ের কল, বিহার ও উত্তরপ্রদেশে চিনির কারখানা এবং কলিকাতায় পাটের কল স্থাপিত হইয়াছে? শিল্পের একদেশতার অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক কারণ আছে। প্রথম কারণ কাঁচামালের নৈকট্য (Nearness to raw materials)। কাঁচা মাল যেখানে পাওয়া যায় তাহার সন্নিকটেই সেই কাঁচা মাল হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের শিল্প গড়িয়া উঠিবে। যেখানে মাটির নীচে কয়লা আছে, সেখানেই কয়লা খনি থাকিবে। সমস্ত খনিজ শিল্প সম্বন্ধেই এই কথা বলা যায়। লোহা ও কয়লার খনি কাছাকাছি আছে বলিয়া জামসেদপুরে ইস্পাতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। বাংলাদেশে পাট হয় বলিয়া পাটের কল এদেশে সবচেয়ে বেশী। তাই বলিয়া সব শিল্পই যে কাঁচা মালের নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইবে, এমন কোন কথা নাই। কাঁচা মালের জন্য খরচ যদি মোট উৎপাদনের খরচের সামান্য এক অংশ হয়, তবে কারখানা কাঁচা মালের নিকতবর্তী অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত নাও হইতে পারে। কিন্তু কাঁচা মালের মূল্য উৎপাদনের ব্যয়ের মোটা অংশ হইলে,

কাঁচা মাল যেখানে পাওয়া যায় তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলে সেই শিল্পটি গড়িয়া উঠিবে।

শিল্পের একদেশতার দ্বিতীয় কারণ শক্তিসম্পদের নৈকট্য (Nearness to sources of power)। কল চালাইবার শক্তি না হইলে শিল্প এবং ব্যবসায় চলে না। কাজেই যেখানে সস্তায় শক্তি পাইবার সম্ভাবনা, সেখানেই শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে। পূর্বে ইংলণ্ডে ময়দার কল জলশক্তির দ্বারা চালিত হইত বলিয়া কলগুলি নদীর ধারে নির্মিত হইত। আজকাল কয়লার খনি অথবা জল-বিদ্যুৎ শক্তির নিকটেই কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিল্প এবং ব্যবসায়ের একদেশতার তৃতীয় কারণ বাজারের নৈকট্য (Nearness to markets)। শহরে বহু লোক থাকে ও উৎপন্ন দ্রব্য সহজে বিক্রয় করা যায় বলিয়া, শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান শহরে বা শহরতলিতে স্থাপিত হয়। কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে পাটের কল নির্মিত হইবার কারণ নানা স্থান হইতে যেমন কাঁচা মাল সহজেই কলিকাতায় নীত হয়, তেমনি পাটের বস্তা ইত্যাদি কলিকাতা বন্দর হইতে পৃথিবীর নানাস্থানে সহজে প্রেরণ করা যায়।

চতুর্থত, প্রাকৃতিক কারণেও শিল্পের একদেশতা হয়। চাষের ভাল-মন্দ আবহাওয়া ও জমির গুণের উপর বেশীর ভাগ নির্ভর করে। বাংলা দেশের মাটি ও জল-হাওয়া চা ও পাট তৈয়ারীর পক্ষে খুব উপযোগী। এইজন্য এই দুইটির চাষ বেশী হয়।

পঞ্চমত, কখনও কখনও শাসক এবং ধনিক শ্রেণীর পোষকতায় এবং আমন্ত্রণে শিল্পের একদেশতা হয়। মুসলমান বাদশাহেরা দেশবিদেশ হইতে উচ্চশ্রেণীর চারুশিল্পীদের আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া রাজধানীর আশেপাশে বাস করিতে দিতেন। ভারতবর্ষের অনেক কুটির-শিল্প এইভাবে এক একটি অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে।

একজাতীয় পাখী একত্র বাস করে, ইহা একটি চলতি প্রবচন। কোন একটি স্থানে একটি বিশেষ শিল্পের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান থাকিলে সেখানে সেই ধরণের আরও কারখানা গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা। ইহাই মানুষের প্রকৃতি; ইহার একটি প্রধান কারণ অবশ্য ইহাই যে, একদেশতার সমস্ত সুবিধা ইহাতে পাওয়া যায়। একদেশতাই অধিক একদেশতার কারণ।

একদেশতার সুবিধা (Advantages of Localisation) : একটি স্থানে শিল্প কেন্দ্রীভূত হইলে সেখানকার উৎপন্ন দ্রব্যের সুনাম প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই অর্জন করে। বাংলা দেশে ফরাসডাঙ্গা এবং শান্তিপুরের ধুতি শাড়ীর খুবই সুনাম আছে। সুইস ঘড়ির নিখুঁত কারিগরি পৃথিবী বিখ্যাত। ইংলণ্ড-স্থিত সেফিল্ডের ছুরি কাঁচির খুবই প্রশংসা আছে। কাজেই উপরোক্ত কোন জিনিষের কারখানা করিতে হইলে যে স্থানের দ্রব্যের সুনাম আছে লোকে সেই স্থানটির নির্বাচন করিবে। কারণ, তাহা হইলে নূতন কারখানা হইলেও স্থানের নামে জিনিষটি চলিয়া যাইবে। কোন ঘড়িনির্মাতা সুইজারল্যাণ্ডে কারখানা স্থাপন করিলে তাহার ঘড়ি "সুইজারল্যাণ্ডে প্রস্তুত" বলিয়া অনায়াসে বিক্রয় হইবে।

দ্বিতীয়ত, দক্ষ ঘড়ির কারিগরও সুইজারল্যাণ্ডেই পাওয়া যাইবে। কারণ, সেখানে বহু ঘড়ির কারখানা, ভাল কাজ পাইতে কোন অসুবিধা হইবে না। তেমনি সব কুশলী তাঁতি শান্তিপুরে আসিয়া জুটিবে। যেখানে কাজ পাইবার সম্ভাবনা বেশী সেখানে বহু শ্রমিক জমা হইবে। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রমিকের অভাব হইবে না।

তৃতীয়ত, পরিবেশ যেখানে শিল্পের অনুকূল, যেখানে সেই শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধে সর্বদা কথাবার্তা হয়, সেখানে শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরা অনায়াসে শিল্পের গূঢ় তথ্য শিখিতে পারে এবং কাজ করিবার কৌশল আয়ত্ত করিতে পারে। শিশুকাল হইতে একটি কাজের কথা শুনিয়া তাহাদের ঐ কর্মে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং দক্ষতা জন্মায়।

চতুর্থত, শিল্পের একদেশতায় আরও একটি সুবিধা পাওয়া যায়। শিল্প কেন্দ্রীভূত হইলে যানবাহনের ব্যবস্থাও তাহার প্রয়োজনানুযায়ী গড়িয়া উঠে। রেলওয়ে হইতে সেই শিল্পের প্রয়োজন মত সাইডিং, বিশেষ আকারে মাল গাড়ি প্রভৃতি তৈয়ারী করা হয়।

অবশেষে এ কথার উল্লেখ প্রয়োজন যে, শিল্পের একদেশতা হইলে সেখানে নানারূপ প্রতিপূরক শিল্পের (Subsidiary industries) প্রতিষ্ঠা হয়। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। যে সব কারখানায় কলের তাঁতের অংশ তৈরী এবং মেরামত হয়, সেগুলি বয়নশিল্পের নিকটবর্তী স্থানেই স্থাপিত হইবে। ফলে উভয়েরই সুবিধা হইবে।

একদেশতার ত্রুটি : শিল্প কেন্দ্রীভূত হওয়াটা সব সময়েই সুবিধাজনক নহে। কোনও কারণে যদি ব্যবসায় মন্দা দেখা দেয় এবং শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য লাভজনক দামে বিক্রয় না হয়, তাহা হইলে ঐ স্থানের লোকদের বেকার হইতে ও কষ্ট পাইতে হয়। বেকার সমস্যা দেখা দিলে সেখানে অন্য কাজ পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। হৃদয়যন্ত্র দুর্বল হইয়া পড়িলে দেহের সকল অঙ্গই দুর্বল হয়। নিয়োগের বহুমুখী পথ সব সময়ই থাকা বাঞ্ছনীয়।

বৃহদায়তন উৎপাদন (large-scale production): বৃহদায়তন উৎপাদন আধুনিক শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আধুনিক কারখানাগুলি প্রকাণ্ড, হাজার হাজার লোক সেখানে কাজ করে, কোটি কোটি দ্রব্য উৎপন্ন হয়। শ্রম বিভাগের নীতি কার্যকরী করিতে হইলে এইরূপ বৃহদায়তন উৎপাদন প্রয়োজন। উৎপাদন ছোট ছোট অংশে ভাগ করিতে হইলে বহুসংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক অংশে কাজ করিবার মত যদি লোক না থাকে, তবে কাজ ভাগ করিয়া লাভ নাই। এইজন্যই শ্রমবিভাগনীতি গ্রহণ করিলে উৎপাদন বৃহদাকারে করিতে হইবে।

সুবিধা (Advantages of large-scale production): বৃহদায়তন উৎপাদনের অনেক দিক দিয়াই লাভ হয়। অধ্যাপক মার্সাল এই সুবিধাগুলি, আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক, এই দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। প্রথমে আভ্যন্তরীণ সুবিধার (Internal economies) কথা বলা হইতেছে। কারখানা বড় করিলে অনেক বিষয়ে ব্যয়সংকোচ হয়। প্রথমত, দ্রব্যপিছু বিজ্ঞাপনের খরচ কম হয়। জিনিষ বিক্রয় করিতে প্রতি বৎসর বহু টাকা বিজ্ঞাপনে ব্যয় করিতে হয়। ধরা যাউক, এই ব্যয় বৎসরে ৫০০০৲ টাকা। কারখানায় বৎসরে পাঁচ হাজার জিনিষ উৎপন্ন হইলে বিজ্ঞাপনের খরচ জিনিষ প্রতি এক টাকা পড়ে। কিন্তু উৎপাদন বাড়িয়া ৭৫০০ হইলে খরচ দাঁড়ায় বারো আনা। এইভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি হইলে খরচ কম হয়। বড় কারখানার মালিকদের মূলধন বেশী। তাহারা বিজ্ঞাপনের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিতে পারে। বিজ্ঞাপনের ফলে সাধারণত বিক্রয় বাড়ে। বিক্রয় যত বাড়িবে জিনিষ পিছু খরচও কমিবে।

দ্বিতীয়ত, বড় কারখানা একসঙ্গে বেশী কাঁচা মাল কিনিতে পারে। যে বেশী মাল একত্র কিনে, সে পাইকারী দরে জিনিষ পায়। সুতরাং এই বাবদ তাহার ব্যয় কম হয়। ছোট কারখানায় মালিকের এই সুবিধা নাই।

তৃতীয়ত, বড় কারখানায় জিনিষ নষ্ট হয় কম। আমাদের দেশের চাষের জমি অতি ক্ষুদ্র আয়তনের। প্রত্যেকটি জমির সীমানা ঠিক করিতে আইল থাকে। বহু ক্ষেত থাকায় আইলে অনেক জমি নষ্ট হয়। যদি জমির আকার বড় হইত, তাহা হইলে আইলের জন্য কম জমি লাগিত ও উদ্বৃত্ত জমিতে চাষ করা সম্ভব হইত। বড় কারখানায় জিনিষ উৎপাদন করিতে গিয়া যাহা উদ্বৃত্ত পড়িয়া থাকে, তাহাও কাজে লাগানো যায়। ছোট কারখানায় তাহা আবর্জনা হিসাবে ফেলিয়া দেওয়া হয়। বড় চিনির কারখানায় চিটাগুড় হইতে মোটর চালাইবার স্পিরিট তৈয়ারী করা যায়। কারখানা ছোট হইলে তাহা ফেলিয়া দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

চতুর্থত, বড় কারখানায় আরও একটি সুবিধা আছে। কারখানা বড় হইলে বেশী মাহিনা দিয়া সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত লোককে কাজে নিয়োগ করা যায়। যাহার গুণ বেশী সে একটু বেশী মাহিনা দাবী করে। কিন্তু তাহারা যে কাজ দেয় তাহা মাহিনার তুলনায় বেশী। কাজেই বড় কারখানায় ভাল যন্ত্র বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালনা করা সম্ভব।

বড় কারখানায় শ্রমবিভাগ চূড়ান্তভাবে করা যায়। যে কাজের জন্য যে উপযুক্ত তাহাকে সেই কাজে লাগানো হয়। এইভাবে এবং অন্যান্য উপায়ে বড় কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, অথচ ব্যয় কম হয়। গবেষণা প্রভৃতির জন্য প্রভূত ব্যয় করিয়া উৎপাদনের উন্নততর ব্যবস্থা করাও বড় কারখানাতে সম্ভব। এইগুলিকে মার্স্যাল আভ্যন্তরীণ সুবিধা (Internal economies) বলিয়াছেন।

বাহ্যিক সুবিধাগুলি (External economies) কোন কারখানায় আয়তনবৃদ্ধির উপর নির্ভর করে না, শিল্পের প্রসার হইলেই ইহা পাওয়া যায়। একটি শিল্পের কারখানার সংখ্যা বাড়িয়া একটি স্থানে একদেশীভূত হইলে কয়েকটি সুবিধা দেখা যায়। শিল্পের একদেশতা হইতে যে সুবিধা পাওয়া যায়, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। শিল্প কেন্দ্রীভূত হইলে সেই স্থানের সুনামের ভাগ প্রত্যেক কারখানাই পাইয়া থাকে। অভিজ্ঞ শ্রমিক পাইতে কোন কষ্ট হয় না। এইগুলি বৃহদায়তন উৎপাদনের বাহ্যিক সুবিধা, যাহার ফলে ব্যয়সংকোচ হয়। বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ এই সকল সুবিধা পাওয়া যায় বলিয়া বৃহদায়তন উৎপাদনব্যবস্থায় কম ব্যয়ে বেশী দ্রব্য উৎপন্ন হয়।

বৃহদায়তন উৎপাদনের সীমা (Limits to Large-scale Production) : বৃহদায়তন উৎপাদনব্যবস্থা হইতে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের ব্যয় কম বলিয়া তাহারা ছোট কারখানা অপেক্ষা কম দামে জিনিষ বিক্রয় করিতে পারে। কাজেই স্বভাবত ইহাই মনে হয় যে, সব কারখানাই প্রকাণ্ড হইয়া গড়িয়া উঠিবে ও ছোট কারখানার কোন স্থানই থাকিবে না। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে ছোট ছোট কারখানা অনেক ক্ষেত্রেই বেশ চলিতেছে।

ইহার কারণ কি? কারখানার আয়তন বাড়িলে ব্যয় কমে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার একটি সীমা আছে। বড় কারখানার অনেকগুলি বিভাগ, অনেক লোক এবং অনেক যন্ত্র থাকে। এতগুলি লোক, বিভাগ ও যন্ত্রের সমন্বয়সাধন করা সব সময়ে সহজ নহে। বড় কারবার দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিবার মত যোগ্যতা সকলের থাকে না। ব্যবসায়ীরা কখনও অতিমানব নয়, তাহাদের ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। তাহারা হয়ত সাধারণ ব্যবসায় দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতে পারে, কিন্তু ব্যবসায় প্রকাণ্ড হইয়া উঠিলে তাহা চালানো তাহাদের পক্ষে সম্ভব নাও হইতে পারে। এই কারণে একটি নির্দিষ্ট আয়তন অপেক্ষা বড় হইলে তাহার পক্ষে ব্যবসায় ভালভাবে চালানো অসম্ভব।

দ্বিতীয়ত, বড় ব্যবসায়ীর পক্ষে সব দিকে নজর রাখা সম্ভব নহে। কিন্তু ছোট ব্যবসায়ী পরিদর্শনের কাজে অধিক মনোযোগ দিতে পারে। শ্রমিকেরা তাহার চোখের সামনে কাজ করে। বড় ব্যবসায়ে শ্রমিক কাজে ফাঁকি দিতে পারে, কিন্তু ছোট কারখানায় তাহা সম্ভব নহে। বড় ব্যবসায়ী খুঁটিনাটি জিনিষ দৃষ্টি দিতে পারে না, সে সময়ও তাহার নাই। কাজেই তাহাকে অধীনস্থ কর্মচারীদের সাধুতা ও যোগ্যতার উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু ছোট ব্যবসায়ী সব কিছু খুঁটিনাটি নিজে দেখিতে পারে। তাহার কর্মচারীগণ কাজে অবহেলা করিতে পারে না। সুতরাং তাহার খরচ কম হয়।

কারখানা বৃদ্ধির তৃতীয় বাধা হইতেছে বাজারের আয়তন। বাজারে বেশী সংখ্যায় বিক্রয় না হইলে বেশী জিনিষ উৎপাদন করিয়া লাভ নাই। যদি ক্রেতার সংখ্যা কম হয় তাহা হইলে জিনিষ বেশী উৎপাদন করিলে কে কিনিবে? এইজন্য আদম স্মিথ বলিয়াছেন, শ্রমবিভাগ এবং উৎপাদনের পরিমাণ বাজারের আয়তন দ্বারা সীমাবদ্ধ। যাহার খুঁতখুঁতে স্বভাব সে বাজারের তৈয়ারী পোষাক

ব্যবহার করিবে না। জামা ঠিক মত গায়ে না লাগিলে তাহা তাহার পছন্দ হয় না। কাজেই দরজীর কারখানা খুব বড় হইতে পারে না। একই ধরণের জিনিষের বহু চাহিদা থাকিলে তখন তাহা পাইকারীভাবে উৎপন্ন হইতে পারে। একই ধরণের গহনা, একই নক্সার শাড়ী মেয়েদের ভাল লাগে না। মহিলারা বিভিন্ন ধরণের গহনা ও শাড়ী পছন্দ করেন। কাজেই একই নক্সার জিনিষের চাহিদা কম হয়। এইজন্য সুন্দর ও রুচিসম্মত জিনিষ সাধারণত ছোট কারখানায় তৈয়ারী হয়।

চতুর্থত, এমন শিল্পও আছে যেখানে বৃহদায়তন উৎপাদন আদৌ সম্ভব নহে। উৎকৃষ্ট ক্ষুর যন্ত্রে তৈয়ারী সম্ভব নহে। সুদক্ষ কারিগরেরাই ভাল ক্ষুর তৈয়ারী করিতে পারে। আবার অনেক সময়ে মূলধনের অভাবেও কারখানা বড় হইয়া উঠিতে পারে না।

বর্ধমান উৎপন্নের নিয়ম (Law of Increasing Returns): বড় ব্যবসায় ও শিল্পের কি সুবিধা তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, শিল্পে বেশী শ্রমিক ও মূলধন নিয়োগ করিলে সংগঠন এমনভাবে উন্নত করা যায়, যাহার ফলে প্রত্যেকটি উপাদানের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। কাজেই কম ব্যয়ে বেশী উৎপাদন সম্ভব হয়। ইহাকেই বর্ধমান উৎপন্নের অথবা হ্রাসমান ব্যয়ের নিয়ম (Law of increasing returns) বলা হয়।

নানা কারণে ইহা সম্ভব হয়। কোন কিছু উৎপাদনের পূর্বে যন্ত্রপাতি ইত্যাদির জন্য বহু মূলধন বিনিয়োগ করিতে হয়। রেলপথ স্থাপন করিতে রেল-লাইন, ইঞ্জিন, গাড়ী প্রভৃতি কিনিতে হয়। ঐ পথে লোক এবং মাল চলাচল কম হইলে উহা হইতে কিছুই লাভ হয় না। কিন্তু মাল এবং লোক চলাচল যাহাই হউক না কেন, কর্মচারীদের মাহিনা, মূলধনের সুদ একই থাকে। চলাচলের জন্য যাত্রী ও মালের সংখ্যা কম হইলে গড়পড়তা ব্যয় অত্যন্ত বেশী পড়ে। কিন্তু যাত্রী ও মাল বেশী হইলেই ব্যয় কম হইতে থাকে। যাত্রীসংখ্যা যাহাই হউক না কেন, কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্যন্ত ট্রেণ চালাইতে খরচ একই পড়ে। কিন্তু ট্রেণে যত জায়গা আছে তত যাত্রী হইলে মাথা পিছু খরচ কমিয়া যায়। মূলধন ও শ্রমিক বেশী নিয়োগ করিবার ফলে শ্রমবিভাগে আরও লোক লইয়া উৎপাদন ব্যাপকতর করা যায়। বড় যন্ত্র লাগাইয়া উৎপাদনের কাজ ছোট ছোট অংশে ভাগ করিয়া ফেলা যায়। কাজেই উৎপাদনের ব্যয় কম হয়।

হ্রাসমান উৎপন্নের নিয়ম (Law of diminishing returns) সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইয়াছে। উৎপাদনের একটি উপাদানের পরিমাণ স্থির রাখিয়া অপর উপাদানগুলি বেশী পরিমাণে ব্যবহার করিলে উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। কৃষির বেলায় এই নিয়ম খুবই প্রযোজ্য, কারণ জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। উৎপাদনের ব্যয়বৃদ্ধি এবং ব্যয়হ্রাস এই দুইটি প্রবণতা সমান হইলে উৎপন্নের ব্যয় একই থাকে। ইহাকেই স্থির উৎপন্নের নিয়ম (Law of constant returns) বলা হয়। এই নিয়মানুসারে মূলধন এবং শ্রমিক ক্রমাগত বাড়াইতে থাকিলে উৎপাদনের পরিমাণ সমান হারে বৃদ্ধি পাইবে। উৎপাদনের পরিমাণ যাহাই হউক, প্রত্যেক দ্রব্য উৎপাদনের ব্যয় একই থাকে। লোকে সর্বদা সংগঠনের উন্নতি করিয়া অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে অধিক উৎপাদন করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ভূমি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সীমাবদ্ধ হওয়াতে উৎপাদন বাড়াইতে হইলে ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। সংগঠনের উন্নতি করিয়া মানুষ এই প্রবণতা দূর করিতে পারে। এই দিকে মানুষ যতই সফল হইবে, ততই তাহার আয় বৃদ্ধি পাইবে এবং তুলনায় ব্যয় কম হইবে। অর্থাৎ বর্ধমান উৎপন্নের নিয়ম কার্যকরী হইবে। বেশী উৎপাদন করিতে হইলে বেশী কাঁচামাল প্রয়োজন। কাঁচামালের উৎপাদন বাড়াইতে গেলে উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে কাঁচামালের মূল্য বাবদ যাহা বেশী ব্যয় হয়, তাহা যখন সংগঠনের উন্নতির জন্য কম ব্যয়ের সমান হয়, তখন প্রত্যেক জিনিষ উৎপাদনের ব্যয় পূর্বেকার সমান থাকে। আবার সংগঠনের উন্নতির জন্য যে কম ব্যয় হয়, তাহা অপেক্ষা ভূমি, কাঁচামাল প্রভৃতির দাম বেশী হইলে হ্রাসমান উৎপন্নের নিয়ম কার্যকরী হয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ব্যবসায়ের উদ্যোক্তা ও বিভিন্ন ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান

উদ্যোক্তার কার্য (Functions of the Entrepreneur): শ্রম-বিভাগ ব্যাপকতর হইয়া উৎপাদনের কাজ বহুবিভক্ত হইয়া পড়িলে বিভিন্ন লোক এবং বিভিন্ন শাখার কার্যের সমন্বয়ের জন্য এক বা একাধিক লোক প্রয়োজন হয়। এই লোককে উদ্যোক্তা বলে। আধুনিক ব্যবসায় অত্যন্ত জটিল। নানা ধরণের কলকব্জা ও বহু শ্রমিক লইয়া কারখানা চালাইতে হয়। উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান সবাপেক্ষা কম ব্যয়ে একত্র করিতে হয়। উদ্যোক্তাই এই সব কাজ করিয়া থাকে। উদ্যোক্তার যোগ্যতার উপরেই ব্যবসায়ের সাফল্য নির্ভর করে। সেনাপতি ব্যতীত সেনাবাহিনী সংগঠন করা, অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত করা এবং পরিচালনা করা যেমন সম্ভব নহে, তেমনি আধুনিক ব্যবসায়ে উদ্যোক্তা ছাড়া সবপ্রকার ব্যবস্থা করাও অসম্ভব।

উদ্যোক্তার বহু কাজ। প্রথমত, ব্যবসায় শুরু করিবার বহুপূর্বে তাহাকে ব্যবসায়ের একটি খতিয়ান তৈয়ারী করিতে হয়। কখন কি উৎপাদন করিবে, কি ধরণের জিনিষ তৈয়ারী হইবে, খরিদ্দার কাহারা, দাম কি হইবে এবং দাম কি ভাবে লওয়া হইবে, সবই উদ্যোক্তাকে পূর্ব হইতেই স্থির করিতে হয়। দ্বিতীয়ত, ভুমি, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল তাহাকেই যোগাড় করিতে হয়। উদ্যোক্তা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এই সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করে, এবং যথাযোগ্য যন্ত্র ও উপযুক্ত লোক যথাস্থানে নিয়োগ করে। উৎপাদনের উপাদানগুলির উপযুক্ত মূল্য তাহাকেই নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হয়। জমিদারকে খাজনা, শ্রমিককে মজুরী, মূলধনের সুদ প্রভৃতি সকলকে সব দিয়া যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবেই তাহা উদ্যোক্তার লাভ হয়। এই লাভের পরিমাণ তাহার ব্যবসায় সংগঠনের সাফল্যের উপর নির্ভর করে।

এগুলি সমস্তই খুব প্রয়োজনীয় কাজ। কিন্তু ইহা বেতনভুক কর্মচারী দ্বারা করানো যাইতে পারে। যৌথ কোম্পানীর পরিচালক সাধারণত এই কাজ করিতে পারে। কিন্তু উদ্যোক্তার একটি বিশেষ কাজ আছে যাহা পরিচালকের পক্ষে করা সম্ভব নহে। উদ্যোক্তাকে ব্যবসায়ের সমস্ত ঝুঁকি

বহন করিতে হয়। এমন হইতে পারে যে, উদ্যোক্তার সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও উৎপন্ন দ্রব্য গ্রাহকের মনস্তুষ্টি করিতে পারিল না। তাহাকে বহুদিন পূর্ব হইতে উৎপাদনের কাজ শুরু করিতে হয়। ইতিমধ্যে ক্রেতাদের রুচি পরিবর্তিত হইতে পারে, চাহিদা কমিয়া যাইতে পারে, অথবা ব্যবসায়ে মন্দা পড়িতে পারে। এরূপ হইলে উপযুক্ত দাম পাওয়া যাইবে না। কাজেই উদ্যোক্তার সকল আশা ব্যর্থ হইয়া বহু ক্ষতি হইতে পারে। ব্যবসায়ের এই ঝুঁকি এবং লোকসান তাহাকেই বহন করিতে হয়। এমনও হইতে পারে যে, এক বৎসর একেবারে লাভ হইল না, অন্য বারে অনেক লাভ হইল। উদ্যোক্তাকে এই লাভ-লোকসানের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা লইয়া কাজ করিতে হয়। এইখানে উদ্যোক্তা ও সাধারণ পরিচালকের কাজের প্রভেদ আছে। তৃতীয়ত, নূতন যন্ত্র ও উৎপাদনপদ্ধতি আবিষ্কার করা এবং তাহা নিজের ব্যবসায়ে গ্রহণ করিবার ভার উদ্যোক্তার। কখন নূতন যন্ত্র অথবা পদ্ধতি নিয়োগ করিতে হইবে, তাহা উদ্যোক্তাকেই স্থির করিতে হয়। তাহার সিদ্ধান্ত নির্ভুল হইলে সে বহু লাভ করিতে পারে, তেমনি আবার সামান্য কারণে বহু লোকসানও হইতে পারে। কাজেই আধুনিক যন্ত্রশিল্পে উদ্যোক্তার কাজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান

একমালিকী কারবার (One-man Business) : ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে ও কারণে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। সর্বাপেক্ষা পুরাতন ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান হইতেছে একজনের মালিকানা কারবার। এইরূপ প্রতিষ্ঠানের মালিক ও পরিচালক একজন লোক। সে নিজের মূলধন নিজেই ব্যবসায়ে খাটায় এবং সমস্ত দায়িত্ব বহন করে। সে শ্রমিক নিয়োগ করে এবং শ্রমিকের মজুরী দেয়। কি পরিমাণ এবং কোন ধরণের জিনিষ বাজারে চলিবে, তাহাও সে নিজেই স্থির করে। লাভ হইলে লাভ সবটাই তাহার এবং লোকসান হইলে লোকসানের সমস্ত বোঝা তাহার ঘাড়ে চাপে। এই ধরণের ব্যবসায় সাধারণত খুব দক্ষতার সহিত পরিচালিত হয়। কিন্তু আধুনিক ব্যবসায় অত্যন্ত বৃহৎ আকারের, ইহাতে বহু মূলধনের প্রয়োজন। একজন লোকের তত মূলধন থাকে না এবং থাকিলেও সমস্তই এক ব্যবসায়ে নিয়োগ করা যুক্তিযুক্ত হয় না। সুতরাং প্রয়োজন হইলে

অথবা ব্যবসায় বাড়াইতে হইলে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান যৌথ কারবারে পরিণত করা হয়।

অংশীদারী কারবার (Partnership): অংশীদারী কারবারে কয়েকজন লোক মিলিত ভাবে মূলধন সরবরাহ করে ও ব্যবসায়ের ঝুঁকি বহন করে। কাজেই একমালিকী কারবারের তুলনায় ইহাতে বেশী মূলধন সংগ্রহ করা যায়। এই শ্রেণীর কারবারও খুব দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতে পারে। যাহার অনেক মূলধন আছে অথচ ব্যবসায়বুদ্ধি নাই, সে সুযোগ্য লোককে অংশীদার করিয়া লইতে পারে। ব্যবসায়ী নিজে বৃদ্ধ হইলে তাহার যোগ্য কর্মচারীদের কাহাকেও অংশীদার করিয়া পূর্বের মতই দক্ষতার সহিত ব্যবসায় পরিচালনা করিতে পারে। কিন্তু এই কারবারের বড় ত্রুটি আছে। একজন অংশীদারের ভুলের জন্য ব্যবসায়ে লোকসান হইতে পারে। সেই অংশীদার হয়ত এরূপ লোকসানের কথা আদৌ চিন্তা করে নাই। কিন্তু কারবার ফেল হইলে মহাজন প্রাপ্য টাকার জন্য প্রত্যেক অংশীদারের সমস্ত সম্পত্তিই ক্রোক করিতে পারে। এই কারবারের অংশীদারের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নহে (Unlimited liability)। এই কারণে ধনীরা এরূপ ব্যবসায়ে যোগ দিতে ভয় পায়।

যৌথ মূলধনী কারবার (Joint-stock Company): আজকাল এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের প্রচলন বাড়িয়াছে। বহু লোকে কম বা বেশী টাকার শেয়ার কিনিয়া মূলধন সংগ্রহ করিয়া যৌথ কারবার গঠন করে। অংশীদারগণ নিজেদের মধ্য হইতে কয়েকজনকে পরিচালক নিযুক্ত করে। পরিচালকসভা (Board of Directors) ব্যবসায়ের কার্য পরিচালনা করে, কর্মচারীদের নিয়োগ করে ও লাভ-লোকসানের হিসাব তৈয়ারী করে। এই কারবারের একটি বৈশিষ্ট্য ইহাই যে অংশীদারের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ (Limited liability)। প্রত্যেকে যত টাকার শেয়ার কেনে, কোম্পানীর ঋণের জন্য তাহার দায়িত্ব ঠিক ততটুকু। কারবার ফেল হইলে মহাজন অংশীদারদের অন্য সম্পত্তিতে হাত দিতে পারে না।

যৌথ কারবারে দুই উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করা হয়—(ক) শেয়ার এবং (খ) ঋণপত্র বা বণ্ড বা ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া। যাহারা শেয়ার কিনে তাহারা কারবারের মালিক এবং ব্যবসায়ের সব ঝুঁকি তাহাদেরই। বৎসরের শেষে

কোম্পানীর লাভ হইলে তাহা ডিভিডেণ্ট (লভ্যাংশ) হিসাবে শেয়ারের মালিকদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। যদি লোকসান হয় তাহাও অংশীদারেরা বহন করে।

যাহারা ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার কেনে তাহারা কোম্পানীর মহাজন। প্রত্যেক মহাজনের মতই তাহারা নির্দিষ্ট হারে সুদ পায়। কোন বৎসরে লোকসান হইলেও কোম্পানীকে এই সুদ দিতে হয়। এই ঋণপত্রের অর্থ নির্দিষ্ট কয়েক বৎসর পরে শোধ করা হয়।

শেয়ার দুই প্রকারের—সাধারণ এবং সর্বাগ্রগণ্য (Preference) শেয়ার। কোম্পানীর লাভ হইল দ্বিতীয় শ্রেণীর শেয়ারের মালিকদের সাধারণত নির্দিষ্ট হারে ডিভিডেণ্ট দেওয়া হয়। কিন্তু লাভ না হইলে সে কিছুই পায় না। অবশ্য এই শ্রেণীর শেয়ার যদি সঞ্চয়মূলক (Cumulative) হয়, তবে কোন বৎসর ডিভিডেণ্ট না দেওয়া হইলে পরবর্তী বৎসরে পূর্ব বৎসরের বাকী ডিভিডেণ্ট দিতে হয়। এই শেয়ারের মালিকদের ডিভিডেণ্ট দেওয়া হইলেই তবে সাধারণ শেয়ারে ডিভিডেণ্ট দেওয়া যাইবে। সাধারণ শেয়ারের ডিভিডেণ্ট নির্দিষ্ট থাকে না, বৎসরে কোম্পানীর লাভের পরিমাণ অনুযায়ী তাহা বাড়ে বা কমে। এক বৎসর তাহা খুব বেশী হইতে পারে, অপর বৎসরে তাহা আবার খুব কম হওয়াও বিচিত্র নহে। টাটা আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী শতকরা ৬ এবং ৭½ টাকা হারে সঞ্চয়মূলক সর্বাগ্রগণ্য শেয়ার বিক্রয় করিয়াছে। ধরা যাক, ১৯২২ সালে কোম্পানীর কোন লাভ হইল না এবং সে বৎসরে কোম্পানীর পক্ষে কোন ডিভিডেণ্ট দেওয়া সম্ভব হইল না। পরবর্তী বৎসরের কারবারে কিছু লাভ হইল। এই লাভ হইতে প্রত্যেক সর্বাগ্রগণ্য অংশীদারকে ১৯২২ সালের বাকি ও বর্তমান বৎসরের ডিভিডেণ্ট দিতে হইবে। এই ডিভিডেণ্ট দিবার পরেও লাভের কিছু অবশিষ্ট থাকিলে সাধারণ শেয়ারের মালিকদের মধ্যে তাহা বণ্টন করা হয়।

যৌথকারবারের সুবিধা (Merits of Joint-stock Company) : যৌথ কারবার সর্বাপেক্ষা প্রধান ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান। বহু একমালিকী কারবার আজকাল যৌথ কারবারে পরিণত হইতেছে। তাহার কারণ যৌথ কারবারের নিম্নলিখিত গুণ রহিয়াছে। প্রথমত, একমালিকী কারবারের তুলনায় ইহা একটি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। আজকালকার দিনে ব্যবসায় বড় করিয়া গড়িতে হয়। তাহার

জন্য বহু মূলধন প্রয়োজন। একজন লোকের পক্ষে তত মূলধন বিনিয়োগ করা সম্ভব নয়। কয়েকজন অংশীদার মিলিয়া হয়ত এই মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু একজন অংশীদারের ভুল বা অসাধুতার জন্য ব্যবসায়ে ক্ষতি হইলে অংশীদারের সব সম্পত্তিই নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই ধনী লোকেরা এই ধরণের ব্যবসায় ঘেঁসিতে চায় না। এইসব ত্রুটি যৌথ কারবারে নাই। এই কারবারে বহু লোক শেয়ার কিনিয়া প্রচুর মূলধন যোগার করিতে পারে। যে যত টাকার শেয়ার কিনে তাহার দায়িত্ব ঠিক ততটুকু। কারবার ফেল হইলে বহু মূলধন অবশ্য নষ্ট হয়, কিন্তু প্রত্যেক অংশীদারের অতি সামান্যই ক্ষতি হইবে। এইজন্যই যৌথ কারবারে লোকে মূলধন খাটাইতে উৎসাহ পায়। যাহার কিছু টাকা আছে, সে জানে যে যৌথ কারবারের শেয়ার কিনিলে তাহা হইতে একটা আয়ের পথ হয়। যাহাদের ব্যবসায়ে দক্ষতা আছে, অথচ মূলধন নাই, তাহারা এই কারবারে চাকুরী গ্রহণ করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, মূলধন বেশী বলিয়া এই কারবার বেশী মাহিনা দিয়া শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের নিয়োগ করে। ইহার ফলে উৎপাদনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। তৃতীয়ত, কোম্পানীর অনেক মূলধন থাকায় তাহার পক্ষে গবেষণা এবং নূতন পরীক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়। গবেষণার দ্বারা নূতন নূতন উৎপাদনপদ্ধতি ও যন্ত্র আবিষ্কার হইতে পারে। ইহার ফলে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। চতুর্থত, এই কারবারে মূলধন বেশী থাকার জন্য বৃহদায়তন উৎপাদনপদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভব হয়। কোটি কোটি টাকার মূলধনের কারবার এই পদ্ধতি ছাড়া সংগঠন করা সম্ভব নয়।

যৌথ কারবারের ত্রুটি (Demerits of Joint-stock Company) : যৌথ কারবারের গুরুতর কয়েকটি ত্রুটি আছে। প্রথমত, বড় বড় কারবারে বহু লোক শেয়ার কিনিয়া থাকে। তাহাদের পক্ষে কোম্পানীর পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নহে। পরিচালকেরা অসাধু হইলে তাহারা শেয়ারের মালিকদের বঞ্চনা করিতে পারে। পরিচালকদের পরিচালনার ত্রুটি ও অসাধুতার জন্য বহু লোকের অর্থনাশ ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়ত, এই কারবারে কার্য-পরিচালনার ভার বেতনভুক কর্মচারীদের হাতে থাকে। পরের জন্য কেহ বড় বেশী পরিশ্রম করে না। কোম্পানীর সাফল্যের জন্য কর্মচারীরা যথেষ্ট যত্ন না করিতেও পারে। তাহার ফলে দক্ষতার সহিত কারবার পরিচালনা নাও হইতে পারে।

কিন্তু যৌথ কারবারের ত্রুটি অপেক্ষা গুণ অনেক বেশী। যৌথ কারবারের প্রসার না হইলে বৃহদায়তন উৎপাদন সম্ভব হইত না।

সরকারী কারবার: আরও দুই প্রকারের ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান আছে। বহু দেশে সরকার অথবা স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ব্যবসায় পরিচালনা করে। এই ব্যবসায়গুলি কখনও সরকার নিজেই প্রতিষ্ঠা করে, কখনও বা পূর্ব মালিকদের নিকট হইতে কিনিয়া লয়। এই শ্রেণীর কারবারের মূলধন জনসাধারণের নিকট হইতে অথবা সরকারী তহবিল হইতে সংগ্রহ করা হয়। লাভ-লোকসানের ঝুঁকি জনসাধারণ বহন করে। ভারতবর্ষে রেলের মালিক সরকার এবং সরকারই তাহা পরিচালনা করে। বিশেষজ্ঞদের লইয়া একটি সংঘ স্থাপন করিয়া সরকার তাহার হাতে রেল পরিচালনা করিবার ভার দিয়াছে। ভারতবর্ষে রেল পরিচালনা করে রেলপথসংঘ (Railway Board)। এই শ্রেণীর ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে সরকারী কর্মচারীদের দক্ষতা এবং সাধুতার উপর।

সমবায় (Co-operation): প্রায় প্রত্যেক দেশেই কিছু কিছু সমবায়ী ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান আছে। মূলধনী প্রথার দোষ দূর করাই সমবায়ের উদ্দেশ্য। এই প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকেরাই মূলধন জোগায়, ব্যবসায় পরিচালনা করে এবং লাভ-লোকসানের বোঝা বহন করে। কৃষিকার্যে সমবায় প্রথা খুব সাফল্য অর্জন করিয়াছে।

ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানের একত্রীকরণ (Combinations): অনেক সময় দুই বা ততোধিক প্রতিষ্ঠান একত্র মিলিত হয়। এই সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।

নানারূপে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের একত্রীকরণ হইতে পারে। অনেক সময়ে একই সামগ্রীর উৎপাদনকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নিজেদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট দামে জিনিষ বিক্রয় করিবার চুক্তি করে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া উৎপাদন করে। কিন্তু প্রত্যেকেই বাজারে পূর্ব নির্দিষ্ট দামে বিক্রয় করিবে। ইহাকে "দামসম্বন্ধীয় চুক্তি" বলে। এই ধরণের সংযোগ সাধারণত বেশীদিন স্থায়ী হয় না। কারণ প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা সামান্য কমে বেশী জিনিষ বিক্রয় করিতে চায়।

আর এক ধরণের সংযোগকে বিক্রয়সংঘ (Kartel) নাম দেওয়া হয়।

একটি দ্রব্যের উৎপাদনকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একত্র হইয়া বিক্রয় করিবার জন্য একটি সংঘ গঠন করে। এই সংঘ জিনিষটির মূল্য স্থির করে ও কখনও কখনও কোন প্রতিষ্ঠান কি পরিমাণ উৎপাদন করিবে, তাহাও স্থির করিয়া দেয়। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা এবং অন্যান্য ব্যাপারে আপনার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। জার্মানীতে এই ধরণের সংঘ খুব প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশেও কয়েকটি সিমেণ্ট কোম্পানী একত্র হইয়া সিমেণ্ট বিক্রয়সংঘ স্থাপন করিয়াছে।

আর এক ধরণের সংযোগ আছে, তাহাকে ট্রাষ্ট (Trust) বলে। যখন একাধিক প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে মিলিত হয়, কোন ব্যাপারেই কাহারও স্বাতন্ত্র্য থাকে না, তখন সেই সংযোগকে ট্রাষ্ট বলে। ইহা কেবলমাত্র মূল্য নির্ধারণ এবং উৎপাদনের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে না, উৎপাদনের পদ্ধতিও নিয়ন্ত্রণ করে। প্রয়োজন হইলে কোন কোন প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া অপরগুলিতে উৎপাদন চালানো হয়। আমেরিকা এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের জন্য বিখ্যাত।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বিনিময় এবং বাজার

বিনিময়ের সর্ত (Conditions of Exchange) : মানুষের পক্ষে নিজের প্রয়োজনের সব জিনিষ উৎপন্ন করা সম্ভব নহে ; এই কারণে নিজের উৎপন্নের একাংশের সহিত অন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিনিময় করিতে হয়। প্রত্যেক জিনিষের প্রান্তিক উপযোগ (Marginal utility) এক একজন লোকের নিকট এক এক রকম। ইহাই বিনিময়ের ভিত্তি। ক-এর কয়েকটা কমলালেবু আছে, কিন্তু আপেল নাই। সুতরাং তাহার নিকট লেবুর প্রান্তিক উপযোগ অপেক্ষা আপেলের উপযোগ বেশী। খ-এর আবার আপেল আছে কমলালেবু নাই। সুতরাং খ-এর নিকট লেবুর প্রান্তিক উপযোগ খুবই বেশী ও আপেলের উপযোগ অপেক্ষাকৃত কম। ক আপেলের জন্য বেশী উপযোগ অনুভব করে বলিয়া লেবু দিয়া আপেল কিনিতে রাজী থাকিবে। খ লেবুর জন্য খুব উপযোগ অনুভব করে বলিয়া আপেলের বিনিময়ে লেবু লইতে পারে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে বিনিময় সম্ভব ও বিনিময়ের ফলে দুইজনেরই লাভ হইবে। বিনিময়ের প্রধান সর্ত হইল যে, দুইটি জিনিষের জন্য লোকে বিভিন্ন পরিমাণ প্রান্তিক উপযোগ অনুভব করিবে। বিনিময়ের ফলে দুই তরফেরই লাভ হয়। বিনিয়ময় হইলে ক কিছু আপেল পাইবে, আবার তাহার লেবুর সংখ্যা কমিয়া যাইবে। তখন আপেলের প্রান্তিক উপযোগ একটু কমিবে ও কমলালেবুর প্রান্তিক উপযোগ বৃদ্ধি পাইবে। কমলালেবু পাইয়া খ-এর কমলালেবু পাইবার আগ্রহ কিছুটা কমিবে এবং আপেলের সংখ্যা কমিয়া যাওয়াতে তাহার নিকট আপেলের প্রান্তিক উপযোগ কিছু বাড়িবে। যতক্ষণ প্রান্তিক উপযোগ বিভিন্ন থাকিবে, ততক্ষণ বিনিময় চলিবে। বিনিময় হইতে থাকিলে দুইজনের দুইটি বিষয়ের প্রান্তিক উপযোগের পার্থক্য কমিতে থাকে। এমন একটি অবস্থা আসিবে যখন ক এবং খ-এর নিকট আপেল এবং কমলালেবুর জন্য প্রান্তিক উপযোগ সমান হইয়া যাইবে—তখন আর বিনিময় সম্ভব হইবে না।

মূল্য ও দাম (Value and Price) : মূল্য এবং দামের সংজ্ঞা পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। একটি জিনিষের বিনিময়ে অপর জিনিষের যে পরিমাণ

পাওয়া যায়, ধনবিজ্ঞানে তাহাকে মূল্য বলে। একটি জিনিষের বিনিময়ে যে অর্থ পাওয়া যায় তাহাকে দাম (Price) বলে। যখন টাকা দিয়া মূল্য নিরূপিত হয়, তাহাকে দাম বলা হয়।

মূল্য একটি সম্বন্ধ মাত্র। চিনির সহিত গমের মূল্য স্থির করিতে হইলে একমণ গমের পরিবর্তে যে পরিমাণ চিনি পাওয়া যায়, তাহাকে গমের মূল্য বলে। চাউলের তুলনায় পাটের মূল্য স্থির করিতে হইলে দেখিতে হইবে একমণ পাটের বিনিময়ে কত সের চাউল পাওয়া যায়। ধরা যাউক যে, দুই মণ গমের বিনিময়ে একমণ চাউল পাওয়া যায়। সুতরাং একমণ গমের মূল্য হইল আধমণ চাউল। আরও ধরা যাউক যে, গমের মূল্য কমিয়া একমণ ধানের বিনিময়ে ১৫ সের চাউল হইল। পূর্বে আধমণ চাউল দিয়া একমণ গম পাওয়া যাইত ও বর্তমানে মাত্র ১৫ সের চাউল দিয়া একমণ গম মিলিবে। সুতরাং চাউলের মূল্য বাড়িয়াছে। গমের মূল্য কমিলে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। অপর একটি জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি হইলে প্রথমোক্ত জিনিষটির মূল্য কমিয়া যায়। কাজেই সব জিনিষের মূল্য একই সময়ে বাড়িতে বা কমিতে পারে না। কিন্তু বর্তমান সময়ে সব জিনিষেরই দাম বাড়িয়াছে। পনের ষোল বছর আগে সব জিনিষেরই দাম খুবই কম ছিল।

বাজারঃ বাজারে জিনিষের মূল্য কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, আমরা তাহা জানিতে চাই। কিন্তু বাজার কাহাকে বলে? সাধারণ ভাষায় যেখানে জিনিষ বেচাকেনা হয় তাহাকেই বাজার বলে। বাজার বলিতে কোন জায়গাকে বুঝায়। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে বাজার বলিতে কোন স্থানকে বুঝায় না, কোন দ্রব্যের বাজারকে বুঝায়। যথা—সোনা-রূপার বাজার, তুলাব বাজার, পাটের বাজার, শেয়ার বাজার প্রভৃতি। কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকিলে বাজার হয়ঃ প্রথম জিনিষটির ক্রেতা এবং বিক্রেতা অনেক থাকিবে ও তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকিবে। দ্বিতীয়, প্রতিযোগিতার ফলে বাজারে জিনিষটি একটি মাত্র দামে বিক্রয় হইবে।

বাজারের আয়তন (Extent of the market)**:** কোন সামগ্রীর বাজারের আয়তন বড় কিংবা ছোট হইতে পারে। সোনা-রূপার বাজার প্রায় পৃথিবীব্যাপী। আবার মাছ-শাকসব্জীর বাজার সাধারণত ছোট হয়। দ্রব্যের বাজার বড় হইবে কি না, তাহা কিরূপে স্থির করিতে হয়? একটি কারণ খুব

সহজেই প্রতিভাত হয়। যদি জিনিষটির চাহিদা খুব ব্যাপক (wide demand) হয়, দেশের সর্বত্র, পৃথিবীর সর্বত্র, যদি সেই জিনিষের ক্রেতা থাকে তাহা হইলে তাহার বাজার খুব বড় হইতে পারে। ক্রেতা এবং চাহিদা কম হইলে বাজারও ছোট হয়। সোনা-রূপার চাহিদা পৃথিবীর সর্বত্র। সেইজন্য সোনা-রূপার বাজার পৃথিবীজোড়া।

কিন্তু কেবল ব্যাপক চাহিদা থাকিলেই হয় না। পৃথিবীর সর্বত্র লোকে তাজা শাকসব্জী ও দুধ খায়। কিন্তু শাকসব্জী ও দুধের বাজার একটি বিশিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ। ইহার কারণ দুধ এবং শাকসব্জী সহজেই নষ্ট হয়। সোনা-রূপা দেশদেশান্তরে প্রেরিত হইলেও খারাপ হয় না। খাঁটি দুধ কলিকাতা হইতে বোম্বাই পাঠান যায় না। কাজেই কোন জিনিষ ক্ষয়িষ্ণু হইলে তাহার বাজার বড় হয় না। আবার ইট প্রভৃতির মত জিনিষের দেশজোড়া চাহিদা থাকিলেও তাহার বাজার ছোট। একস্থান হইতে অপর স্থানে ইট লইয়া যাওয়ার খরচ অত্যন্ত বেশী পড়ে। পাঞ্জাব হইতে মাদ্রাজে ইট পাঠাইতে গেলে যে ব্যয় হয় তাহা ইটের দামের তুলনায় অত্যন্ত বেশী। কাজেই একস্থান হইতে স্থানান্তরে উহা পাঠানো লাভজনক নহে। পাঠাইবার সুবিধা না হইলে জিনিষের বাজার বড় হয় না। অনায়াসে এবং অল্প ব্যয়ে স্থানান্তরিত করিবার সুবিধা থাকা বাজার বড় হইবার অন্যতম সর্ত।

আরও একটি কারণে জিনিষের বাজার বহুদূরব্যাপী হয়। জিনিষ কিনিবার পূর্বে আমরা জিনিষটি পছন্দসই কি না তাহা দেখিতে চাই। দূর দেশের সহিত বেচা-কেনা হইলে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দেখা শোনা হয় না, জিনিষটিও ক্রেতার পক্ষে পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না। বিক্রেতা কিন্তু যথাযথ নমুনা পাঠাইতে পারিলে এই অসুবিধা অনেকটা দূর হয়। নমুনা পছন্দ হইলে ক্রেতা জিনিষ পাঠাইবার জন্য নির্দেশ দেয়। এইভাবে দূরদেশের মধ্যেও জিনিষ বেচাকেনা হইতে পারে। জালিয়াতি না হইলে ক্রেতা নির্দিষ্ট নমুনার জিনিষ পাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। অতএব একটি জিনিষের প্রকৃত নমুনা পাঠানো সম্ভব হইলে বাজারের আয়তন বড় হইতে পারে।

বাজার ও প্রতিযোগিতা (Markets and competition) : বাজারে একটি জিনিষের যদি বহু ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে, তবে সাধারণত তাহাদের

মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিবে। বহু বিক্রেতা একই জিনিষ বিক্রয় করিতে চাহিলে তাহাদের মধ্যে কেহই অন্যের অপেক্ষা বেশী দাম চাহিতে পারিবে না। কারণ তাহা হইলে ক্রেতারা অন্য বিক্রেতার নিকট যাইবে। কাজেই বহু ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকিলে সেই বাজারকে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার (Perfectly competitive market) বলা হয়। আবার বাজারে বহু ক্রেতা ও একজন বা অল্পসংখ্যক বিক্রেতা থাকিতে পারে। তাহা হইলে ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকিবে। কিন্তু বিক্রেতাদের মধ্যে কম প্রতিযোগিতা থাকিবে কিংবা কোন প্রতিযোগিতা থাকিবে না। এই অবস্থায় বিক্রেতা সাধারণত কিছু বেশী দামে জিনিষটি বিক্রয়ের সুযোগ পায়। এইরূপ বাজারকে অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার (Imperfectly competitive market) বলে। একজন বিক্রেতা থাকিলে তাহাকে একচেটিয়া বাজার (Monopolistic market) বলে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মূল্যনিরূপণ

পূর্ণ প্রতিযোগিতা (Prefect competition): বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকার অর্থ সেখানে অনেক ক্রেতা ও বহু বিক্রেতা থাকে। কারণ তাহা না হইলে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিতে পারে না। ইহা ছাড়া আরো দুইটি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। বিক্রেতারা একই জিনিষ বিক্রয় করে এবং কি দামে জিনিষ বেচাকেনা হইতেছে তাহা সকলেই জানে।

ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতার ফলে বাজারে একটি জিনিষের মাত্র একটি মূল্য থাকিতে পারে। ইহা অতি সহজেই প্রমাণ করা যায়। ধরা যাক যে বাজারে একই জিনিষ দুইটি মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। কোন বিক্রেতা দুই টাকা ও কেহ কেহ দেড় টাকা চায়। প্রত্যেক ক্রেতাই বাজার দর জানে এবং প্রত্যেকেই সস্তা দামে জিনিষ কিনিতে চেষ্টা করে। কাজেই দুই টাকা দামে কেহই জিনিষ কিনিবে না। যে সব বিক্রেতা দেড় টাকায় জিনিষটি দিতে রাজী, ক্রেতারা তাহার নিকট যাইবে। ক্রেতা আকৃষ্ট করিতে হইলে দুই টাকা দরের বিক্রেতাদের দাম কমাইয়া দিতে হইবে। অন্যথায় তাহাদের কিছুই বিক্রয় করা সম্ভব হইবে না। প্রত্যেক ক্রেতা সর্বনিম্ন দামে জিনিষ চায়, আর বিক্রেতা সর্বোচ্চ দাম আদায় করিতে চেষ্টা করে। ক্রেতাদের কিনিবার আগ্রহ অপেক্ষা যদি বিক্রেতাদের বেচিবার গরজ বেশী হয়, তাহা হইলে দামের গতি নীচের দিকে হইবে। ক্রেতাদের আগ্রহ বেশী হইলে দাম বাড়তির দিকে থাকিবে। বেশী হউক অথবা কম হউক যতক্ষণ বহু ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনার জন্য প্রতিযোগিতা করিবে, ততক্ষণ বাজারে একটি জিনিষের একটিমাত্র দর থাকা সম্ভব।

দর কি ভাবে নির্দিষ্ট হয়? (How is value deteımined): জিনিষের দাম তাহার চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ণিত হয়। জিনিষের চাহিদা আসে ক্রেতাদের নিকট হইতে। ক্রেতারা বিভিন্ন দরে বিভিন্ন পরিমাণ সামগ্রী কিনিতে চায়। ক্রেতা কেন জিনিষ চায়? ক্রেতা জিনিষটির উপযোগ অনুভব করে বলিয়াই ঐ জিনিষটি চায়। যদি জিনিষটি পাইবার আকাংখা তাহার তীব্র

হয়, তবে তাহার চাহিদাও খুব বেশী হইবে। কাজেই চাহিদা উপযোগের উপর নির্ভর করে এবং দামের সহিত উহার সম্বন্ধ আছে। জিনিষের দাম অনুযায়ী ব্যক্তির চাহিদা বেশী অথবা কম হয়। দাম কম হইলে চাহিদা বাড়িবে, বেশী হইলে চাহিদা কমিবে। ইহাই চাহিদার নিয়ম। এই নিয়ম অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বিভিন্ন দামে কত জিনিষ কিনিবে তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করা যায়।

পূর্বে শ্যাম ও কমলালেবুর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে আবার তাহাই অন্যভাবে ধরা যাউক।

ক্রীত কমলালেবুর সংখ্যা	দাম
১	৮ পয়সা
২	৬ ,,
৩	৪ ,,
৪	২ ,,
৫	১ ,,

উপরের তালিকাকে ব্যক্তিগত চাহিদার তালিকা (Individual demand schedule) বলা হয়। বিভিন্ন দামে শ্যাম বা অন্য কেহ কত লেবু কিনিবে, তাহাই উপরের তালিকা হইতে জানা যায়। বিভিন্ন ব্যক্তি যে দামে যে পরিমাণ জিনিষ কিনে, তাহা যোগ করিয়া আরও একটি তালিকা প্রস্তুত করা যায়। তাহাকে বাজারের চাহিদার তালিকা (Market demand schedule) বলা হয়। বিভিন্ন দামে বাজারে মোট কি পরিমাণ জিনিষ বিক্রয় হয় তাহা এই তালিকা হইতে বলা যায়। ধরা যাউক যে কমলালেবুর দাম ৮ পয়সা হইলে বাজারে ১,০০০ লেবু বিক্রয় হয়; ৬ পয়সা দামে ১,৫০০ শত, ৪ পয়সা দামে ২,৫০০ শত, ২ পয়সা দামে ৫,৫০০ এবং ১ পয়সা দামে ১২,০০০ বিক্রয় হয়।

যে পরিমাণ লেবু বিক্রয় হয়	দাম
১,০০০	৮ পয়সা
১,৫০০	৬ ,,
২,৫০০	৪ ,,
৫,৫০০	২ ,,
১২,০০০	১ ,,

একটি বিশেষ দিনে বাজারে কমলালেবুর চাহিদা এই তালিকায় পাওয়া যায়।

যোগান (Supply) : এখন যোগানের দিকটি বিবেচনা করা যাউক। একটি নির্দিষ্ট দামে যে পরিমাণ জিনিষ বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হয়, তাহাকেই যোগান বলে। চাহিদার মত যোগান অর্থেও একটি নির্দিষ্ট দামে যোগান বুঝিতে হইবে। জিনিষের দাম বাড়িলে বিক্রেতাদের বিক্রয় করিবার আগ্রহ বাড়ে। তখন তাহারা বিক্রয়ের জন্য বেশী জিনিষ বাজারে ছাড়িবে। আবার দাম পড়িলে তাহাদের বিক্রয় করিবার ইচ্ছা কমে। কাজেই তাহারা কম জিনিষ বাজারে ছাড়ে। দাম বাড়িলে যোগান বাড়ে, দাম কমিলে যোগান কমে —ইহাই যোগানের নিয়ম। বিভিন্ন দামে কি পরিমাণ জিনিষ বিক্রেতারা বিক্রয় করিবে তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে পারা যায়। তালিকাটি নিম্নরূপ হইবে :

দাম	বিক্রীত জিনিষের পরিমাণ	
৮ পয়সা	১০,০০০	কমলালেবু
৬ "	৬,০০০	"
৪ "	২,৫০০	"
২ "	১,৫০০	"
১ "	৫০০	"

দুইটি তালিকা একত্রিত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় :—

ক্রেতারা যে পরিমাণ জিনিষ কেনে	দাম	বিক্রেতারা যত বিক্রয় করিতে প্রস্তুত
১,০০০ কমলালেবু	৮ পয়সা	১০,০০০ কমলালেবু
১,৫০০ "	৬ "	৬,০০০ "
২,৫০০ কমলালেবু	৪ "	২,৫০০ "
৫,৫০০ "	২ "	১,৫০০ "
১২,০০০ "	১ "	৫০০ "

ধরা যাউক বাজারে বিক্রেতারা প্রথমে কমলালেবুর দাম ৮ পয়সা চাহিল। এই দামে ক্রেতারা মাত্র ১,০০০ লেবু কিনিবে, তাহা আমরা চাহিদার তালিকা হইতে বলিতে পারি। বিক্রেতাদের তাহা হইলে বহু লেবু অবিক্রিত থাকিবে। আরও বিক্রয় করিবার জন্য দাম না কমাইয়া তাহাদের উপায় থাকিবে না।

দাম তখন ছয় পয়সায় নামিবে। এই দামে ক্রেতারা ১,৫০০ লেবু কিনিতে প্রস্তুত, কিন্তু বিক্রেতাগণ ৬,০০০ লেবু বিক্রয় করিবার জন্য উৎসুক। কাজেই অনেক বিক্রেতা দাম আরও কমাইয়া চার পয়সা করিবার চিন্তা করিবে। কিন্তু এই দামে বিক্রয় করা কোন কোন বিক্রেতার পোষাইবে না। তাহারা বাজারে বিক্রয় বন্ধ করিবে ও কমলালেবুর যোগান তাহাতে কমিয়া ২,৫০০ শতে মাত্র দাঁড়াইবে। কম দামে আরও নূতন ক্রেতা বাজারে উপস্থিত হইবে। যাহারা ছয় পয়সা দামে লেবু কিনে নাই, তাহারা অনেকে এখন লেবু কিনিবে। ফলে চাহিদা বাড়িয়া ২,৫০০ শতে দাঁড়াইবে। এই দামে বাজারে যোগান লেবু সবটাই বিক্রয় হইয়া যাইবে। এমন কোন বিক্রেতা আর নাই যাহার জিনিষের ক্রেতা বাজারে নাই। এমন ক্রেতাও নাই যে যোগানের অভাবে কিনিতে পারিতেছে না। এই দামকে স্থিতমূল্য (Equilibrium price) বলা হয়। বাজার দরের গতি এই দিকে এবং ইহাতেই দামের স্থিতি হইবার সম্ভাবনা। পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দাম এইভাবে চাহিদা ও যোগান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

উৎপাদনের ব্যয় ও জিনিষের মূল্য

চাহিদা ও যোগান যে মূল্যে সমান হয়, বাজার দর তাহারই সমান হয়। কিসের দ্বারা চাহিদা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহাও বলা হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে যোগান কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

উৎপাদনব্যয় (Cost of Production): কোন জিনিষ উৎপন্ন করিতে হইলে ব্যবসায়ীকে নিজে ব্যয় করিতে হয়। যাহারা খুচরা বিক্রয় করে তাহারা আড়তদার অথবা পাইকারী বিক্রেতার নিকট হইতে মাল কেনে। আড়তদার এবং পাইকারী বিক্রেতা উৎপাদকের নিকট হইতে মাল পায়। প্রত্যেকেই দাম দিয়া মাল কিনিতে হয়। প্রত্যেকেরই দোকান অথবা অফিস রাখিতে হয়। বাড়ীর মালিককে খাজনা দিতে হয়, কর্মচারীদের মাহিনা দিতে হয়। উৎপাদনের জন্য কাঁচা মাল কিনিতে হয়, মূলধনের জন্য সুদ দিতে হয়। ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপাতির ক্ষয় হয়, কাজেই তাহার স্থলে নূতন যন্ত্র কিনিবার জন্য কিছু টাকা প্রত্যেক বৎসর তাহাকে রাখিতে হয়। ইহার উপরে তাহার লাভ হওয়া চাই। লাভ না হইলে সে জিনিষ উৎপাদন কেন

করিবে ? উপরোক্ত বিষয়গুলি বাবদ যাহা খরচ হয়, তাহাই উৎপাদনের ব্যয় (Cost of production)।

প্রথম দিকে অনেক ধনবৈজ্ঞানিকেরা মনে করিতেন যে, উৎপাদনের ব্যয়ের উপরেই জিনিষের মূল্য নির্ভর করে। চাহিদা বা উপযোগ জিনিষের মূল্য নিয়ন্ত্রিত করে না। বাতাস ও জলের মত জিনিষের প্রয়োজন খুব বেশী। কিন্তু তাহাদের কোন মূল্য নাই। সোনা এবং হীরার প্রয়োজন খুব কম, অথচ উহাদের মূল্য খুব বেশী। অতএব তাঁহারা মনে করিতেন যে প্রয়োজন বা উপযোগ মূল্য নিয়ন্ত্রিত করে না। উৎপাদনের ব্যয়ই মূল্যের নিয়ামক। রেডিও তৈয়ারীর খরচ যদি সাইকেলের দ্বিগুণ হয়, তবে রেডিওর মূল্য সাইকেলের দ্বিগুণ হইবে। জিনিষটির মূল্য যদি উহার গড়পড়তা উৎপাদন-ব্যয়ের কম হয় তবে ব্যবসায়ীরা লোকসান দিবে। কেহই লোকসান দিয়া বেশী দিন কারবার করে না। ফলে ক্রমে ক্রমে জিনিষটির উৎপাদন ও যোগান কমিয়া যাইবে। যোগান কমিলে মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। এইভাবে মূল্য গড়পড়তা উৎপাদন ব্যয়ের সমান হইবে।

ইহা ঠিক নহে। উৎপাদনের ব্যয় না পোষাইলে কেহ কোন জিনিষ তৈয়ারী করিবে না সত্য। কারণ, লাভ ছাড়া কারবার চলে না। বিক্রেতারা চিরকালই সর্বোচ্চ দরে জিনিষ বিক্রয় করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সব সময়ে তাহা সম্ভব হয় না। একটি জিনিষ তৈয়ারী করিতে হয়ত খরচ অনেক পড়ে। কিন্তু জিনিষটির চাহিদা না থাকিলে ক্রেতা তাহার জন্য বেশী দাম দেয় না। এই দামে যদিও খরচ পোষায় না, তবুও বিক্রেতাকে তৈয়ারী জিনিষটি লোকসান দিয়াই বিক্রয় করিতে হইবে। বাজার দর সব সময়েই উৎপাদন ব্যয়ের সমান হইলে কোন ব্যবসায়ীকে কোন দিন লোকসান দিতে হইত না। বাস্তব জীবনে বাজার দর সব সময়ে উৎপাদনের গড়পড়তা ব্যয়ের সমান থাকে না। অনেক সময়েই ব্যবসায়ীকে উৎপাদনের ব্যয় অপেক্ষা কম দামে জিনিষ বিক্রয় করিতে হয়। বাজার দর উৎপাদন ব্যয়ের উপর খুব কমই নির্ভর করে।

তাই বলিয়া উৎপাদনের ব্যয় কোন রকমেই মূল্য প্রভাবিত করে না একথা বলা চলে না। উৎপাদনের ব্যয় অপেক্ষা বাজার দর কম হইলে বিক্রেতাদের ক্ষতি হয়। ক্ষতি স্বীকার করিয়া কিছুদিন তাহারা হয়ত জিনিষ বিক্রয় করিতে পারে। কিন্তু তাহা বেশী দিন সম্ভব নহে। ব্যবসায়ীরা যদি দেখে বাজার

দর গড়পড়তা উৎপাদনের ব্যয় অপেক্ষা কম, তাহা হইলে কিছুদিনের মধ্যেই তাহারা উৎপাদন বন্ধ করিবে। এই জন্য যোগান কমিয়া যাইবে। কিন্তু চাহিদা কমিবার কোন কারণ ঘটে নাই। যোগান কমিয়া যাওয়ার জন্য ক্রমে ক্রমে বাজার দর চড়িতে থাকিবে এবং অবশেষে তাহা উৎপাদনের ব্যয়ের সমান হইয়া যাইবে। কাজেই দীর্ঘ সময়ের কথা বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে মূল্য উৎপাদনের ব্যয়ের সমান হইবার সম্ভাবনা। দীর্ঘ সময়ের পরে যে দাম বহাল থাকে তাহাকে স্বাভাবিক মূল্য (Normal value) বলা হয়। স্বাভাবিক মূল্য গড়পড়তা উৎপাদনের ব্যয়ের সমান হইবে।

জিনিষের মূল্য ও সময়ের গুরুত্ব (Value and the importance of the time element): চাহিদা এবং যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে মূল্য নিরূপিত হয়। দুই জন ক্রেতা একজন বিক্রেতার পিছনে ছুটিলে দাম বেশী হইবার সম্ভাবনা। আবার দুইজন বিক্রেতা একজন ক্রেতার নিকট জিনিষ বিক্রয়ের চেষ্টা করিলে দাম কম হইবে। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই বাজার দর প্রভাবান্বিত করিতেছে, কিন্তু প্রত্যেকের প্রভাব সব সময়ে সমান নহে। কখনও কখনও মনে হয় যে, বাজার দর নির্ধারণ করিতে চাহিদার প্রভাবই বেশী। আবার অন্য এক সময়ে মনে হইবে যোগানের উপরেই মূল্য নিভর করে। যদি অল্প সময়ের কথা ধরা হয়, তবে মূল্য নিরূপণের উপর চাহিদার প্রভাবই বেশী। কারণ এই অল্প সময়ের মধ্যে যোগানের বিশেষ পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় জিনিষটির চাহিদা বেশী হইলে উহার মূল্যও বেশী হইবে। চাহিদা কমিয়া গেলে দাম কমিবে। যত কম সময় ধরা হয় চাহিদার প্রভাব তত বেশী। দীর্ঘদিন সময় লইলে মূল্য গড়পড়তা উৎপাদনব্যয়ের সমান হয়। জিনিষের দরের উপর যোগানের প্রভাব তাড়াতাড়ি বুঝা যায় না, কারণ উহার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ধীরে হয় এবং অনেক সময় লাগে। কিন্তু চাহিদার ফল শীঘ্রই দেখা যায়। গল্পের খরগোস খুব জোরে দৌড়ায় বটে, কিন্তু খানিকদূর গিয়া খরগোস ঘুমাইয়া পড়ে। কচ্ছপ ধীরে চলে বটে, কিন্তু কচ্ছপই অবশেষে জয়লাভ করে। সেইরূপ চাহিদা ও যোগানের প্রতিযোগিতায় অল্প সময়ের কথা ভাবিলে চাহিদার প্রভাবই প্রবল মনে হইবে। কিন্তু সময় বেশী হইলে চাহিদার প্রভাব কমিয়া যোগানের প্রভাব বৃদ্ধি পায় ও তাহার দ্বারাই মূল্য নির্দিষ্ট হয়। কাজেই মূল্যতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে সময়ের

কথা বিবেচনা করিতে হইবে। অল্প সময়ে চাহিদার দ্বারা ও দীর্ঘ সময়ে উৎপাদনের ব্যয় দ্বারা মূল্য নিরূপিত হয়।

মূল্য, প্রান্তিক উপযোগ এবং উৎপাদন ব্যয় (Value, marginal utility and cost of production): চাহিদা ও যোগানের প্রভাবেই দ্রব্যের মূল্য নির্দিষ্ট হয়। ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগ যতক্ষণ দাম অপেক্ষা বেশী থাকে ততক্ষণই সে জিনিষটি কেনে। এইভাবে একটি দুইটি তিনটি করিয়া একই জিনিষ কিনিতে থাকিলে জিনিষটির প্রান্তিক উপযোগ কমিয়া আসে ও ক্রমে তাহা দামের সমান হয়। প্রান্তিক উপযোগ দামের সমান হওয়ার পর আর কেহ ইহার অধিক জিনিষ কিনিবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। বাজারে কমলা লেবুর দাম চার পয়সা করিয়া। শ্যাম প্রথম লেবু হইতে ৮ পয়সা মূল্যের উপযোগ বোধ করে; দ্বিতীয়টি হইতে ৬ পয়সা, তৃতীয়টি হইতে ৪ পয়সা ও চতুর্থটি হইতে ২ পয়সা মূল্যের উপযোগ লাভ করে। বাজার দর চার পয়সা হইলে সে তিনটি লেবু কিনিবে। চতুর্থটি কিনিবে না। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার নিকট লেবুর প্রান্তিক উপযোগ দামের সমান না হয়, ততক্ষণ সে লেবু কিনিবে। কাজেই জিনিষের দাম প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়।

বিক্রেতা এবং উৎপাদকেরা চিন্তা করে যে দীর্ঘ সময়ে তাহাদের খরচ উঠিয়া আসে কিনা। গড়পড়তা উৎপাদনের ব্যয় অপেক্ষা দাম বেশী হইলে লাভ অধিক হইবে এবং তাহাদের আরও জিনিষ উৎপাদন করিয়া বেশী লাভ করিবার ইচ্ছা হইবে। ফলে যোগানের পরিমাণ বাড়িবে। যোগান বাড়িলে দাম কমিবে ও দাম কমিতে কমিতে দ্রব্য পিছু উৎপাদনের ব্যয়ের সমান হইয়া যাইবে। উৎপাদনের ব্যয় অপেক্ষা দাম কম হইলে ফল ঠিক বিপরীত হইবে। উৎপাদক এবং বিক্রেতা তাহা হইলে লাভ করিতে পারিবে না, কাজেই তাহারা উৎপাদন কমাইবে। যোগান কমিলে বাজারে তাহার দাম চড়িতে থাকিবে এবং অবশেষে তাহা উৎপাদনের ব্যয়ের সমান হইয়া যাইবে। কাজেই জিনিষের দাম ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগ (Marginal utility) এবং বিক্রেতার উৎপাদনব্যয় (Marginal cost of production) উভয়েরই সমান হয়।

বাজার দর ও স্বাভাবিকমূল্য (Market value and normal value): বাজারে একটি দ্রব্যের যে কোন সময়ে যে দাম থাকে, তাহাকে বাজার-দর (Market value) বলা হয়। চাহিদা এবং যোগান এই

দুইটি দ্বারা বাজার দর স্থির করা হয়। কিন্তু বাজার-দর সাধারণত চাহিদার দ্বারাই বেশী প্রভাবান্বিত হয়। দীর্ঘ সময় অন্তর বাজারে শেষ পর্যন্ত যে মূল্য বহাল থাকে, তাহাকে স্বাভাবিক মূল্য (normal value) বলা হয়। স্বাভাবিক মূল্য উৎপাদনের ব্যয়ের সমান হয়।

বাজার-দর ও স্বাভাবিক মূল্যের মধ্যে কি সম্বন্ধ? একটি অপরটির সহিত সমান হইতে পারে, আবার নাও হইতে পারে। বাজার-দর যে স্বাভাবিক মূল্যের সমান হইবে, তাহার কিছু ঠিক নাই। একটি জিনিষের চাহিদা খুব কমিয়া যাইতে পারে। তখন ক্রেতারা উহার জন্য কম দাম দিবে। এই অবস্থায় উৎপাদনের ব্যয় না পোষাইলেও বিক্রেতাকে হয়ত লোকসান দিয়াই মাল বিক্রয় করিতে হয়। তাহা হইলে বাজার-দর উৎপাদন ব্যয়ের স্বাভাবিক মূল্যের কম হইবে। কিন্তু বাজার-দর স্বাভাবিক মূল্য হইতে পৃথক হইলেও তাহার গতি স্বাভাবিক মূল্যের সমান হইবার দিকে থাকে। ঘড়ির দোলক সর্বদা দুই দিকে চলিতেছে। তবুও তাহার ঠিক একটি কেন্দ্রাবস্থা আছে। দোলক তাহার আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায় ও যে দিকেই থাক না কেন, আবার কেন্দ্রের দিকেই ফিরিয়া আসিতে চায়। স্বাভাবিক মূল্যকে ঘড়ির দোলকের এই কেন্দ্রাবস্থার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। বাজার-দর দোলকের মত স্বাভাবিক মূল্যের উপরে বা নীচে সর্বদাই ওঠানামা করিতেছে, কিন্তু কেন্দ্রে স্থিতি হইবার দিকে ঝোঁক তাহার সর্বদাই আছে। এই কেন্দ্রই হইল স্বাভাবিক মূল্য।

চাহিদার পরিবর্তন ও মূল্য (Value and changes in demand): চাহিদা পরিবর্তিত হইলে দ্রব্যের মূল্য কি ভাবে প্রভাবান্বিত হয়? ধরা যাউক কমলালেবুর চাহিদা বাড়িয়া গেল। ইহাতে প্রথমেই লেবুর দাম বাড়িয়া যাইবে। জিনিষপত্রের যোগান হঠাৎ বাড়ান সম্ভব হয় না। সেইজন্য হঠাৎ চাহিদা বাড়িলে দাম বাড়ে, চাহিদা কমিলে দাম কমে। অল্প সময়ের জন্যই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। দাম বেশী হইলে বিক্রেতারা পূর্বাপেক্ষা অধিক লাভ করিবে। লাভ বেশী হইলে তাহারা আরও অধিক মাল বাজারে বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিবে। ফলে উৎপাদন বাড়াইতে হইলে দ্রব্যটির উৎপাদনের ব্যয় পূর্বের মত থাকিতে পারে, আবার কম বেশী হওয়াও বিচিত্র নহে। যদি একই খরচে (Constant cost) উৎপাদন হয়, তাহা হইলে কম বেশী যতই উৎপাদন হউক না কেন, গড়পড়তা উৎপাদনের ব্যয় একই থাকিবে। প্রথমে চাহিদা বাড়িবার

সঙ্গে সঙ্গে জিনিষটির দাম বাড়িবে; দাম বাড়িলে ধীরে ধীরে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ও সঙ্গে সঙ্গে দাম আবার কমিয়া পূর্বের দামের সমান হইবে। দ্রব্যটির উৎপাদন যদি হ্রাসমান উৎপন্নের (Law of diminishing returns) নিয়মানুগত হয়, তাহা হইলে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যপিছু ব্যয়ও বাড়িয়া যাইবে, যেমন কৃষি এবং খনিজ উৎপাদনে হইয়া থাকে। চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দাম বাড়িলে বিক্রেতারা অধিক মাল বিক্রয় করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু সেই পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে গড়পড়তা ব্যয় বেশী হইবে। দীর্ঘকাল অন্তর জিনিষের দাম উৎপাদনের ব্যয়ের সমান হয়, তাহা বলা হইয়াছে। এইজন্য উপরোক্ত দ্রব্যগুলির দাম দীর্ঘকাল সময়েও বেশীই থাকিয়া যাইবে। আবার যদি বর্ধমান উৎপন্নের (Increasing returns) নিয়মাধীনে উৎপাদন হয়, তাহা হইলে উৎপাদনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গড়পড়তা ব্যয় কম হইবে। তখন প্রথম দিকে দাম বাড়িলেও কিছুদিনের মধ্যেই তাহা কমিয়া পূর্বেকার দাম অপেক্ষাও কম হইতে পারে। সর্বক্ষেত্রেই চাহিদা বাড়িলে তৎক্ষণাৎ দাম বাড়িবে। হ্রাসমান উৎপন্নের উৎপাদনে দাম কিছুদিন পরেও বেশী থাকিবে। স্থির খরচে কিছুদিনের মধ্যে দাম আবার পূর্বের মত হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বর্ধমান উৎপন্নের বেলায় কিছুদিন পরে দাম পূর্বাপেক্ষাও কমিয়া যাইতে পারে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

একচেটিয়া কারবার

প্রতিযোগিতার বাজারে বহু ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে। কখনও কখনও বিক্রেতা মাত্র একজন বা সামান্য কয়েকজন থাকিতে পারে। ইহাকেই একচেটিয়া কারবার বলে। একচেটিয়া কারবারে মূল্য কি ভাবে নিরূপিত হয় তাহা এখন আলোচনা করা যাইতে পারে।

একচেটিয়া মূল্য (Monopoly Value): যখন কোন একটি দ্রব্যের উৎপাদনকারীর অথবা বিক্রেতার সংখ্যা একজন বা সামান্য কয়েকজন, তখন সেই দ্রব্যের একচেটিয়া কারবার আছে বলা হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একত্র মিলিত হইলে একচেটিয়া কারবারপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কিংবা রাষ্ট্র হইতে সনন্দ লাভ করিয়াও একচেটিয়া কারবার স্থাপিত হয়।

কারবার একচেটিয়া হউক অথবা প্রতিযোগিতামূলক হউক, সকল মালিকের লক্ষ্য লাভের অংশ যতদূর সম্ভব বাড়ান। কিন্তু প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বহু বিক্রেতা থাকে বলিয়া একজন বিক্রেতা বাজার দরে মাল বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। বাজার দরের বেশী দাম চাহিলে তাহার জিনিষ কেহ কিনিবে না। কিন্তু একচেটিয়া কারবারীর কোন প্রতিযোগী থাকে না বলিয়া সে ইচ্ছামত দামে জিনিষ বিক্রয় করিতে পারে। ইচ্ছামত উৎপাদন বাড়ানো অথবা কমানো তাহার পক্ষে সম্ভব। ক্রেতারা খরিদ করিতে অস্বীকার না করা পর্যন্ত সে দাম বাড়াইয়া অধিক লাভ করিতে পারে।

কিন্তু তাই বলিয়া একচেটিয়া কারবারের মালিক সব সময়ে খুব চড়া দাম আদায় করে না। দাম বেশী করা তাহার লক্ষ্য নহে, লক্ষ্য সর্বাধিক লাভ করা। দাম খুব বেশী হইলে ক্রেতা হয়ত কিছুই কিনিবে না, কিনিলেও সামান্য কিছু কিনিতে পারে। তাহাতে হয়ত মোট লাভের অঙ্ক খুবই কম হইবে। অথচ দাম কমিলে ক্রেতারা বহু সংখ্যায় জিনিষ কিনিতে পারে। তাহাতে মোট বিক্রিত দ্রব্যের পরিমাণ বাড়িবে এবং মোট লাভ বেশী হইতে পারে। কাজেই একচেটিয়া কারবারে মূল্য সব সময়ে খুব উচ্চ নাও হইতে পারে।

কারবারীর লাভ কেবল দামের উপরে নির্ভর করে না, মোট বিক্রয়ের

পরিমাণের উপরও নির্ভর করে। একটি নির্দিষ্ট দামে কতগুলি দ্রব্য বিক্রয় হইবে, তাহা নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন দামে ক্রেতারা কত জিনিষ কিনিবে তাহার উপরে। ক্রয়ের পরিমাণ দ্রব্যটির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপরে নির্ভর করে। এই ক্ষেত্রে একটি চাহিদার তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

দাম	বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ
৮ আনা ইউনিট	১,০০০ ইউনিট
৭ ,, ,,	১,৫০০ ,,
৬ ,, ,,	২,৩০০ ,,
৫ ,, ,,	৩,৫০০ ,,
৪ ,, ,,	৪,৫০০ ,,

মনে করা যাউক যে, বিদ্যুতের উৎপাদনের গড়পড়তা খরচ স্থির থাকে (Constant cost) এবং ইউনিট প্রতি উৎপাদনের খরচ ৪ আনা পড়ে। প্রতি ইউনিটের দাম আট আনা হইলে মোট এক হাজার ইউনিট বিক্রয় করিয়া ৮,০০০ আনা পাওয়া যায় ও উৎপাদন করিতে ব্যয় হয় ৪,০০০ আনা ; তাহা হইলে মোট লাভ হইল ৪,০০০ আনা। আরও ইউনিট উৎপাদন এবং বিক্রয় করিয়া অধিক লাভ করা যায় কিনা তাহা দেখিবার জন্য একচেটিয়া মালিক প্রতি ইউনিটের দাম ৭ আনা করিল। মোট বিক্রিত ইউনিট হইবে ১,৫০০ এবং মোট আয় ৭×১,৫০০=১০,৫০০ আনা হইবে। মোট উৎপাদনের ব্যয় ৪×১৫০=৬,০০০ আনা। লাভের পরিমাণ ৪,৫০০ আনা হইল। অর্থাৎ লাভ বাড়িল। আরও কিছু বেশী বিক্রয় হইলে তাহার লাভ বাড়ে কিনা দেখিবার জন্য মালিক ৬ আনা দাম ঠিক করিল। এই দামে ২,৩০০ ইউনিট বিক্রয় হইবে। ইহাতে মোট আয় ২৩×৬=১৩,৮০০ আনা হইবে। মোট উৎপাদনের ব্যয় ২,৩০০×৪= ৯,২০০ আনা। সুতরাং মোট লাভ ৪,৬০০ আনা হইল। ফলে লাভ আরও বাড়িল। প্রতি ইউনিট ৫ আনায় বিক্রয় করিলে ৩,৫০০ ইউনিট বিক্রয় হইবে। উহার মোট উৎপাদনের ব্যয় পড়ে ৩,৫০০×৪=১৪,০০০ আনা এবং মোট আয় ১৭,৩৫০ আনা হয়। তাহা হইলে লাভের পরিমাণ দাঁড়াইল ৩,৫০০ আনা অর্থাৎ এই দামে লাভ কম হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রতি ইউনিট ছয় আনায় বিক্রয় করিলেই তাহার সর্বাধিক লাভ হয়। কাজেই একচেটিয়া কারবারী ছয় আনা দামে বিদ্যুৎ বিক্রয় করিবে।

মাত্র একজন লোক সমস্ত উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে, ইহা বাস্তব জীবনে কদাচ দেখা যায়। বোম্বাই, কলিকাতা এবং অন্যান্য শহরে অন্য কোনও নূতন বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান কারখানা স্থাপন করিতে পারে না। কারণ বর্তমান বিদ্যুৎ কোম্পানীকে একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যুতের দাম খুব বেশী হইলে লোকে গ্যাস অথবা কেরোসিন তেল জ্বালাইবে। তাহার ফলে বিদ্যুতের চাহিদা কমিয়া যাইবে এবং বিক্রয় কমাতে লাভের পরিমাণও কম হইবে। গ্রাহকেরা এই ধরণের অন্য জিনিষ ব্যবহার করিতে পারে এই ভয়ে একচেটিয়া কারবারের মালিক খুব চড়া দাম দাবী করিতে পারে না।

একচেটিয়া কারবারের আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এই কারবারের মালিক একই জিনিষ ভিন্ন ভিন্ন ক্রেতার নিকট বিভিন্ন দামে বিক্রয় করিতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। বিদ্যুৎ-কোম্পানী সাধারণ লোককে যে দামে বিদ্যুৎ বিক্রয় করে, সরকার এবং কলকারখানার মালিকের নিকট তাহা হইতে কম দাম লইয়া থাকে। ইহাকে মূল্যপার্থক্যকরণ (Price discrimination) বলা হয়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অর্থ

অর্থ রোজগার এবং ব্যয় করিবার জন্য মানুষ যে সমস্ত কাজ করে তাহাই অর্থনীতির আলোচ্য, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। বর্তমান যুগে আহার্য, বস্ত্র সব কিছুই অর্থের বিনিময়ে কেনা যায়। কাজেই অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা বিনিময় অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

অর্থ (Money) : অর্থ জিনিষটি কি ? এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে লোকে টাকাপয়সা ও কাগজী নোট দেখাইয়া বলিবে উহাই ত অর্থ। কিন্তু প্রশ্নটি অত সরল নহে। মুদ্রা মাত্রই অর্থ নহে। ভিক্টোরিয়া আমলে রৌপ্যমুদ্রাকে এখন আর অর্থ বলা যায় না। কাহারও নিকট যদি সেই মুদ্রার দুই একটি থাকে, সে তাহা দিয়া বাজারে কিছুই কিনিতে পারিবে না। সাধারণ লোকে তাহা লইবে না। পোস্ট অফিসেও তাহা চলিবে না। কাজেই রাণী মার্কা টাকাকে আর অর্থ বলা যায় না। কিন্তু ঐ মুদ্রাতে বর্তমান মুদ্রা অপেক্ষা অধিক খাঁটি রূপা থাকা সত্ত্বেও অর্থ হিসাবে তাহা চলে না কেন ? ইহার উত্তর অত্যন্ত সহজ। জনসাধারণ গ্রহণ না করিলে কিছুই অর্থ বলিয়া গণ্য হয় না। যাহা জনসাধারণ সব সময়েই গ্রহণ করিতে সম্মত থাকে এবং যাহা দ্বারা বেচাকেনা, দেনাপাওনার হিসাব নিষ্পত্তি হয়, তাহাকেই অর্থ বলা হয়।

দ্রব্য বিনিময়ের অসুবিধা (Inconveniences of barter) : এমন দেশ নাই যেখানে কোন না কোন রূপ অর্থ ছিল না। আধুনিক উৎপাদনব্যবস্থা অর্থ ছাড়া অচল। তাহার কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। এমন একটি দেশের কথা চিন্তা করা যাউক যেখানে অর্থ নাই। সে দেশে দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য দেওয়া হয়। একটি উৎপন্ন সামগ্রীর পরিবর্তে লোকে আর একটি দ্রব্য পাইতে পারে। এই ধরণের বিনিময়ব্যবস্থার কতকগুলি বিশেষ অসুবিধা আছে। এই ব্যবস্থাতে অনেক সময়ে জিনিষ কেনা অথবা বেচা দুইই অসম্ভব হইতে পারে। তোমার হয়ত আপেল আছে ; তুমি কিছু লেবু চাও। যাহার লেবু আছে সে আপেল চায় না, তাহার দরকার কিছু বাদামের। কিন্তু বাদামওয়ালা লেবু বা আপেল কিছুই না চাহিতে পারে। সে হয়ত আম কিনিতে চায়।

এই অবস্থায় বিনিময় কি প্রকারে হইতে পারে? ইহাকে অভাবসংযোগের অবিদ্যমানতা (Lack of double coincidence of wants) বলা হয়। একজনের অভাব আর একজনের অভাবের সহিত যোগাযোগ নাও ঘটিতে পারে। তখন সেই দুইজনের অভাব মিটাইবার উপায় থাকিবে না। অর্থ থাকিলে এই সমস্যা দূর হয়। অর্থ সর্বপ্রকার বিনিময়ের মাধ্যম বলিয়া প্রথম ব্যক্তি অর্থের বিনিময়ে আপেল বিক্রয় করিবে এবং সেই অর্থ দিয়া লেবু কিনিতে পারে। অতএব অর্থ থাকিলে বিনিময় পরোক্ষ হইয়া পড়ে, সোজাসুজি জিনিষের বদলে জিনিষ বিনিময় আর হয় না। তাহা অর্থের বিনিময়ে জিনিষ বিক্রয় হয় এবং অর্থ দিয়া অন্য জিনিষ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, দ্রব্যবিনিময়-ব্যবস্থায় আরও একটি অসুবিধা দেখা দিতে পারে। ধরা যাউক, একজন লোক ঘোড়ার বিনিময়ে ছুরি চায়। যে লোক ছুরির বদলে ঘোড়া কিনিতে রাজী, তাহাকেও হয়ত পাওয়া গেল। কিন্তু কোন্ হিসাবে বিনিময় হইবে? ঘোড়ার দাম ছুরি অপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু ঘোড়া কাটিয়া অংশ বিক্রয় করা বুদ্ধিমানের কাজ নহে। একজন অন্য একজনের দ্রব্য চাহিলেও এইভাবে অনেক সময় বিনিময় সম্ভব হইয়া উঠে না। একটি দ্রব্য টুকরা টুকরা করিয়া অল্পমূল্য দ্রব্যের সহিত বিনিময় করা অনেক সময় সম্ভব হয় না। কিন্তু অর্থ বহু ভাগে ভাগ করা যায়। ঘোড়ার মালিক অর্থ লইয়া ঘোড়াটি বিক্রয় করিতে পারে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থের সামান্য কিছু অংশের বিনিময়ে ছুরি পাইতে পারে।

তৃতীয়ত, দ্রব্যবিনিময়ব্যবস্থায় আর একটি প্রধান ত্রুটি আছে। প্রত্যেকটি দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করিবার কোন মান নাই। এই ব্যবস্থায় থাকা সম্ভব নহে। মূল্য নির্ধারিত হওয়া সম্ভব নয় বলিয়া প্রথম একজন হয়ত একটি আপেলের পরিবর্তে তিনটি লেবু বিনিময় করিল; দ্বিতীয় ব্যক্তি করিল দশটি বাদামের পরিবর্তে একটি লেবু; তৃতীয় একজন লোক আর কুড়িটি বাদামের বিনিময়ে একটি আম কিনিল। তাহা হইলে আমের সহিত তুলনায় আপেলের মূল্য কি হইল? ইহার উত্তর দিতে হইলে বহু অঙ্ক করিতে হয়। অর্থ থাকিলে আর এই অসুবিধা থাকে না। তখন সব জিনিষের মূল্যই অর্থ দিয়া নিরূপিত করা যায়। প্রত্যেক জিনিষের দাম তুলনা করিয়া একের তুলনায় অপরের মূল্য স্থির করিতে কোনই অসুবিধা হয় না। আপেলের দাম যদি তিন আনা হয় এবং

দুই আনায় একটি আম পাওয়া যায়, তাহা হইলে একটি আপেলের দাম দেড়টি আমের সমান।

ভাল অর্থের গুণাবলী (Qualities of good money) : বিনিময় ব্যবস্থার সব অসুবিধা অর্থের প্রবর্তনে দূর হয়। অর্থের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন দেশে কত রকমারী দ্রব্য অর্থ হিসাবে প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশে এক সময়ে গরু অর্থ হিসাবে গৃহীত হইত। অতীতে কড়ি অর্থ হিসাবে প্রচলিত ছিল, এখনও কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত আছে। তামাকপাতা, চামড়া, লবণ, চা, ষাঁড় প্রভৃতি আরও অনেক জিনিষ নানা দেশে অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু সমাজের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই জিনিষগুলি একে একে পরিত্যক্ত হইয়াছে। সোনা ও রূপা সব দেশেই জনপ্রিয় হইয়া উঠিল এবং উহাই সব দেশে অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হইল। ক্রমে ক্রমে কাগজী মুদ্রা সর্বত্র প্রচলিত হইল। ইহার অর্থের যে সব গুণ থাকা প্রয়োজন, এই কারণাদির ইহাদের মধ্যে তাহার প্রত্যেকটি গুণ আছে। দেশের সব লোক গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেই জিনিষটি অর্থ বলিয়া গণ্য হয়। সোনারূপা দীর্ঘকাল স্থায়ী, সহজে নষ্ট হয় না। উহাদের ওজন এবং ঔজ্জ্বল্য অনেকদিন স্থায়ী থাকে। উহাদিগকে একস্থান হইতে অন্য স্থানে অনায়াসেই বহন করিয়া লওয়া যায়। এই ধাতু দুইটি বিভিন্ন আকারে পরিবর্তিত করা চলে। সোনারূপা গলাইয়া বিভিন্ন মূল্যের মুদ্রা প্রস্তুত করা কিছুই কঠিন নহে। হীরক ইত্যাদি মূল্যবান প্রস্তরের এই গুণ নাই। হীরক ঢালাই করা যায় না, কাজেই মুদ্রা প্রস্তুতের কাজে তাহা লাগে না। একটি হীরা ষোল ভাগে ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগের মূল্য সমগ্র মূল্যের ষোলভাগের এক ভাগ অপেক্ষা কমিয়া যাইবে। কিন্তু ষোল তোলার একটি সোনার টুকরা ষোলভাগ করিলে প্রত্যেক টুকরার দাম সমগ্র অংশের একষোড়শাংশ হইবে। সব হীরা এক রকম নহে। কিন্তু খাঁটি সোনারূপা একই রকমের। যাহা অর্থ হিসাবে গ্রাহ্য, সাধারণ লোকের অনায়াসে তাহা চিনিতে পারা চাই। সাধারণ লোকে খাঁটি সোনা অথবা রূপা সহজে চিনিতে পারে, কিন্তু এক টুকরা কৃত্রিম হীরক সাধারণ লোকের পক্ষে দেখিয়া চেনা সম্ভব নহে। তাহা ছাড়া সোনারূপার দাম সাধারণত একই থাকে।

কাজেই ভাল অর্থের সব গুণ সোনারূপায় আছে। কিন্তু আজকাল

মুদ্রা হিসাবে সোনারূপার ব্যবহার কমিয়া যাইতেছে। এখন কোন দেশেই স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত নাই। কাগজী অর্থ সুবর্ণ মুদ্রার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। ভাল অর্থের প্রায় সব কয়েকটি গুণই কাগজী অর্থে আছে। কাগজী অর্থ ব্যবহারে সাধারণ লোকে অভ্যস্ত এবং ইহা গ্রহণ করিতে কেহই অস্বীকার করে না। সোনা অপেক্ষা কাগজের দাম কম। কাজেই সরকার এখন সোনার পরিবর্তে কাগজী অর্থ চালু করিয়াছে।

অর্থের কাজ (Functions of money): অর্থের মাধ্যমে দ্রব্য বিনিময়ই প্রধান কাজ। দ্রব্য-বিনিময়ব্যবস্থার অসুবিধা কি তাহা বলা হইয়াছে। অর্থ এই অসুবিধা দূর করে। অর্থ সর্বদা গৃহীত হয় বলিয়া লোকে অর্থের বিনিময়ে জিনিষ দিতে আপত্তি করে না। যাহার লেবু আছে সে বিনিময়ে আপেল লইতে অস্বীকার করিতে পারে। কিন্তু অর্থ লইতে তাহার আপত্তি নাই। এই কারণে অর্থের সাহায্যে দ্রব্য বিনিময় সহজ হয়। অর্থের মাধ্যমে সব জিনিষ বিনিময় হয় বলিয়া প্রত্যেক জিনিষের দাম আমরা জানিতে পারি। ইহাই অর্থের দ্বিতীয় কাজ। অর্থ দিয়া জিনিষের মূল্য নিরূপিত হয়। আপেলের দাম তিন আনা এবং আমের দাম দুই আনা হইলে আমরা অনায়াসে বলিতে পারি যে, একটি আপেলের মূল্য দেড়টি আমের সমান। বিভিন্ন জিনিষের দাম তুলনা করিয়া এইভাবে প্রত্যেক জিনিষের মূল্য নিরূপণ করা যায়।

অর্থ সঞ্চয়ের বাহন। কেহ সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক হইলে সে অর্থ সঞ্চয় করে। ভবিষ্যতে কোন বিপদ-আপদের সময় এই সঞ্চিত অর্থ দিয়া সে জিনিষপত্র কিনিতে পারে। অর্থের মূল্য মোটামুটি স্থির থাকে। যখন সে অর্থ জমায়, সে জানে ভবিষ্যতে অর্থের বিনিময়ে সব-মূল্যের জিনিষ পাওয়া যাইবে। অর্থ দিয়া এই কাজটি পাইতে হইলে বহু বৎসর ধরিয়া অর্থের মূল্য স্থির রাখা উচিত।

অর্থের চতুর্থ কাজ হইতেছে, দেনাপাওনার হিসাব-নিকাশ করা। যে ধার দেয় সে সাধারণত যে মূল্য ধার দেয় অন্তত তাহাই ফিরিয়া পাইবে এই মনে করিয়াই ধার দেয়। অর্থের মূল্য স্থায়ী বলিয়া মহাজন যে মূল্য ধার দেয়, সেই মূল্যই ফিরিয়া পায়। কাজেই দেনা-পাওনায় মহাজনের কোন ক্ষতি হয় না। অর্থ থাকার জন্য দেনাপাওনার পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অর্থের সুবিধা (Advantages of money): সবশ্রেণীর লোকে অর্থ হইতে কি সুবিধালাভ করিয়াছে তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। প্রথমত, দ্রব্যবিনিময়ের সব অসুবিধা ইহা হইতে দূর হইয়াছে। অর্থ না থাকিলে বেচাকেনা কঠিন, এমন কি প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। অভাবের সংযোগসাধন নাও ঘটিতে পারে, টাকা এই অসুবিধা দূর করে। বহু বিভাগের অসুবিধাও অর্থে দূর হয়। অর্থের মাধ্যমে সবপ্রকার বিনিময় হইয়া থাকে। উৎপাদক উৎপাদনের দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করিতে পারে। কারণ, তাহার উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময়ে সে অর্থ পাইবে। সাধারণ লোকেরও অনেক সুবিধা হইয়াছে। অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় সব দ্রব্যই তাহারা কিনিতে পারে। নিজের জিনিষের বিনিময়ে কাহার নিকটে প্রয়োজনীয় জিনিষ পাওয়া যাইবে, তাহা আর তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না। এইভাবে সবশ্রেণীর লোক অর্থ হইতে নানা সুবিধা লাভ করে। অর্থ ছাড়া আধুনিক শিল্পের এত উন্নতি হইত না।

বিহিত অর্থ (Legal tender): কতকগুলি মুদ্রাকে সরকার বিহিত মুদ্রা বলিয়া ঘোষণা করে। এইগুলি আইন অনুযায়ী অর্থ বলিয়া গণ্য হয় এবং পাওনাদারেরা ইহা গ্রহণ করিতে বাধ্য। বিহিত অর্থ লইয়া দোকানে জিনিষ কিনিতে যাও। দোকানী ঐ অর্থ লইতে অস্বীকার করিলে তুমি তাহাকে পুলিসে দিতে পার। কিন্তু সব অর্থ বিহিত নহে। রাণী মার্কা টাকা বিহিত অর্থ নহে। উহা লইতে কেহ বাধ্য নয়।

দুই প্রকারের বিহিত অর্থ আছে, অসীম বিহিত অর্থ (Unlimited legal tender) ও সসীম বিহিত অর্থ। অসীম বিহিত অর্থ পাওনাদার যে কোন পরিমাণে গ্রহণ করিতে বাধ্য। কিন্তু কোন কোন মুদ্রা নির্দিষ্ট পরিমাণে বিহিত অর্থ বলিয়া স্বীকৃত হয়। কেহ যদি এই মুদ্রা নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা বেশী দিতে যায়, তবে গ্রহীতা তাহা লইতে অস্বীকার করিতে পারে। এই ধরণের মুদ্রাকে সসীম বিহিত অর্থ বলে। ইংলণ্ডের সিলিং চল্লিশ সিলিং পর্যন্তই বিহিত অর্থ। দুই পাউণ্ডের জিনিষ কিনিয়া চল্লিশটি সিলিং দিলে দোকানী তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য। কিন্তু তাহার বেশী দাম হইলে সিলিং এ তাহা দেওয়া চলে না।

প্রামাণিক অর্থ (Standard money): আর একরূপে মুদ্রার শ্রেণী

বিভাগ করা হয়—প্রামাণিক অর্থ (Standard money) ও নিদর্শক অর্থ (Token money)। দেশে যাহা বিনিময়ের মান সেই মুদ্রাকে প্রামাণিক অর্থ বলা হয়। দেশের এই মুদ্রায় সব হিসাব রাখা হয়। ভারতবর্ষের প্রামাণিক অর্থ টাকা, আমেরিকার ডলার এবং ইংলণ্ডে পাউণ্ড স্টার্লিং। প্রামাণিক অর্থে যে পরিমাণ সোনা অথবা রূপা থাকে, তাহার মূল্য মুদ্রামূল্যের সমান। কাজেই প্রামাণিক অর্থ গলাইয়া সোনা অথবা রূপা হিসাবে বিক্রয় করিলে একই দাম পাওয়া যাইবে। প্রামাণিক অর্থ অসীম বিহিত অর্থ হিসাবে গণ্য হয়। প্রত্যেক পাওনাদার তাহার প্রাপ্যের সবটাই এই মুদ্রাতে গ্রহণ করিতে বাধ্য। প্রামাণিক অর্থে সাধারণত অবাধ মুদ্রাঙ্কনব্যবস্থা থাকে। লোকে সোনা অথবা রূপার তাল টাঁকশালে লইয়া গেলে সরকার উহা হইতে উপযুক্ত পরিমাণ মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া দেয়। প্রামাণিক অর্থ সোনা অথবা রূপার অথবা উভয়েরই হইতে পারে।

নিদর্শক অর্থ (Token coin): নিদর্শক অর্থে যে পরিমাণ ধাতু থাকে, তাহার দাম মুদ্রার মূল্য হইতে কম। এই মুদ্রা গলাইয়া যে ধাতু পাওয়া যায়, তাহার মূল্য মুদ্রার মূল্য অপেক্ষা কম হইবে। ইহা সাধারণত রেজগি হিসাবেই চলে। আধুলি, সিকি, দুয়ানি, সিলিং, পেনি ইত্যাদি নিদর্শক মুদ্রা। এই ধরণের মুদ্রা অবাধ মুদ্রাঙ্কনব্যবস্থায় প্রস্তুত হয় না। কোন কোন দেশে এই মুদ্রা সসীম বিহিত অর্থ হিসাবে গণ্য হয়। অর্থাৎ ইহা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত দিয়া দেনা শোধ করা যায়। সিলিং চল্লিশটি পর্যন্ত বিহিত অর্থ।

টাকা (The Rupee): আমাদের দেশে টাকাই প্রামাণিক অর্থ। কিন্তু প্রামাণিক অর্থের যে সব লক্ষণ উপরে বলা হইল, তাহার সবগুলি টাকাতে নাই। প্রথমত, টাকা নিদর্শক মুদ্রা। উহাতে টাকার মূল্যের সমান রূপা নাই। টাকার ওজন ১৮০ গ্রেণ, কিন্তু এখনকার টাকার রূপা আদৌ নাই। এখনকার টাকা নিকেলের তৈয়ারী। টাকার বেলাতে অবাধ মুদ্রাঙ্কনব্যবস্থা নাই। সরকারই কেবল টাকা তৈয়ারী করিবার অধিকারী। কাজেই টাকাতে প্রামাণিক ও নিদর্শক উভয় প্রকারের অর্থের বৈশিষ্ট্য বর্তমান আছে।

মুদ্রাঙ্কন (Coinage): প্রত্যেক দেশে একমাত্র সরকারই মুদ্রা তৈয়ারী করিবার অধিকার রাখে। সরকারী টাঁকশালে মুদ্রা তৈয়ারী হয়। কত মুদ্রা

তৈয়ারী হইবে তাহা সরকার ঠিক করিয়া দেয়। কখনও কখনও এইরূপ ব্যবস্থা হয় যে, সাধারণ লোক টাঁকশালে সোনা কিংবা রূপা লইয়া গেলে তাহা হইতে যতগুলি মুদ্রা হইতে পারে, টাঁকশালের কর্তারা তাহা তৈয়ারী করিয়া দেয়। এইরূপ ব্যবস্থাকে অবাধ মুদ্রাঙ্কন (Free coinage) বলে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ভারতবর্ষে রূপার টাকায় অবাধ মুদ্রাঙ্কনব্যবস্থা বহাল ছিল। সরকার এই অধিকার রদ করিয়া দিলে তখন তাহাকে সীমাবদ্ধ মুদ্রাঙ্কন (Limited coinage) বলে। এখন টাঁকশালে কেহ রূপা লইয়া গেলে তাহাকে টাকা তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয় না। সরকার নিজেই প্রয়োজন মত মুদ্রা তৈয়ারী করে।

মুদ্রা তৈয়ারী করিতে খরচ আছে। সরকার যখন এই তৈয়ারীর খরচ সম্পূর্ণ বহন করে এবং সাধারণের নিকট হইতে খরচ লয় না, তখন তাহাকে বিনাশুল্কে মুদ্রাঙ্কন (Gratuitous coinage) বলে। এই অবস্থায় মুদ্রা তৈয়ারী করিতে দিলে মুদ্রাস্থ ধাতুর দাম মুদ্রার সমান হয়। কখনও কখনও মুদ্রা তৈয়ারীর খরচ সরকার মুদ্রা হইতে তুলিয়া লয়। যদি ঠিক খরচই গ্রহণ করা হয়, তখন তাহাকে ব্রাসেজ (Brassage) বলা হয়। প্রত্যেক মুদ্রা তৈয়ারী করিতে যে ব্যয় হয় সেই মূল্যের ধাতু বাদ দিয়া মুদ্রাঙ্কন হয়। এই অবস্থায় মুদ্রাতে যে ধাতু থাকে, তাহার দাম মুদ্রার মূল্য অপেক্ষা কম হয়। কিন্তু আসল খরচ অপেক্ষা অধিক আদায় করা হইলে তখন তাহাকে বানি বা সিনিওরেজ (Seigniorage) বলে। এ ক্ষেত্রে সরকার মুদ্রা তৈয়ারী করিয়া লাভ করে। মুদ্রা তৈয়ারীতে যে ব্যয় হয়, তাহা অপেক্ষা কম মূল্যের ধাতু বাদ দিয়া মুদ্রা প্রস্তুত করা হয়। আমাদের বর্তমান টাকায় প্রচুর বানি লওয়া হয়।

কাগজী অর্থ (Paper Money): সব দেশেই আজকাল কাগজী অর্থের প্রচলন আছে। কাগজী অর্থ তিন প্রকারের, প্রতিভূ (Representative), পরিবর্তনীয় (Convertible) এবং অপরিবর্তনীয় (Inconvertible)। সাধারণত, এই অর্থের পিছনে সংরক্ষিত তহবিলে নির্দিষ্ট মূল্যের সোনা অথবা রূপা রাখা হয়। যখন সংরক্ষিত ধাতুর পরিমাণ চলিত কাগজী নোটের মূল্যের সমান হয়, তখন তাহাকে প্রতিভূ কাগজী অর্থ বলা হয়। সংরক্ষিত ধাতু ও মুদ্রার মূল্য মোট চালু নোটের মূল্যের সমান হয়। মার্কিনী সরকার

যে সোনার নিদর্শনপত্র প্রচলন করিয়াছেন, তাহা এই ধরণের কাগজী অর্থের খাঁটি নিদর্শন।

কাগজী অর্থের বিনিময়ে ধাতব মুদ্রা দিবার ব্যবস্থাও থাকিতে পারে, আবার নাও থাকিতে পারে। কাগজী অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনমত ধাতব মুদ্রা পাওয়া গেলে, তাহাকে পরিবর্তনীয় কাগজী অর্থ বলা হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতবর্ষে নোট চালু করিবার একমাত্র অধিকারী। এই ব্যাঙ্ক পাঁচ টাকা, দশ টাকার নোটের পরিবর্তে সমমূল্যের ধাতব মুদ্রা দেয় বলিয়া নোটগুলিকে পরিবর্তনীয় কাগজী অর্থ বলে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কাগজী নোটের পরিবর্তে ধাতব মুদ্রা দিবার জন্য তহবিলে সর্বদাই কিছু কিছু ধাতুমুদ্রা জমা রাখে।

অপরিবর্তনীয় কাগজী অর্থের নামটিতে প্রকাশ যে, ইহার পরিবর্তে ধাতব মুদ্রা পাওয়া যায় না। এই কাগজী অর্থ সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক চালু করে। অনেক সময় পরিবর্তনীয় কাগজী অর্থের বিনিময়ে মুদ্রা দিতে অক্ষম হওয়ায় উহা অপরিবর্তনীয় হইয়া পড়ে। ১৯১৪ সালের পূর্বে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড হইতে যে কাগজী অর্থ চালু হইয়াছিল, তাহার বদলে সোনা পাওয়া যাইত; কিন্তু ১৯৩১ সালের সেপ্টম্বর মাস হইতে তাহা অপরিবর্তনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

পরিচালিত মুদ্রা (Managed money): কথাটি লর্ড কীন্‌স্ একটি বিশেষ প্রকার কাগজী অর্থ সম্বন্ধে ব্যবহার করিয়াছেন। সরকার বাজার মূল্যের স্থিরতা রাখিবার উদ্দেশ্যে যে কাগজী অর্থ চালু করে, তাহাকে পরিচালিত মুদ্রা বলা হয়। পরিচালিত মুদ্রা পরিবর্তনীয় হইতে পারে, আবার না হইতেও পারে; উহার একমাত্র লক্ষ্যের বিষয় ইহাই যে, তাহা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া পরিচালনা করা হয়।

কাগজী অর্থের সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and demerits of Paper money): ভাল অর্থের যে কয়টি লক্ষণ, তাহার সব কয়টিই কাগজী অর্থে আছে। ধাতব মুদ্রা অপেক্ষা কাগজী অর্থ সহজে বহন করা যায়। দশ হাজার টাকার ধাতব মুদ্রা লইয়া যাওয়া সুবিধাজনক বা নিরাপদ নহে। কিন্তু কাগজী অর্থ হইলে তাহা লইয়া যাইতে কোন ভয় বা অসুবিধা নাই। বড় বড় দেনা মিটাইতে কাগজী অর্থ খুবই সুবিধাজনক, লোকে তাহাতে প্রত্যেটি মুদ্রা গোণা ও পরীক্ষা করিবার দায় হইতে বাঁচে। দ্বিতীয়ত, কাগজী অর্থ ধাতব মুদ্রা অপেক্ষা কম ব্যয়সাধ্য। ধাতব মুদ্রা তৈয়ারী করিতে যত ব্যয়

হয়, তাহার তুলনায় কাগজী অর্থের জন্য ব্যয় নাই বলা যায়। মুদ্রা তৈয়ারী করিবার জন্য যে বিপুল ব্যয় হয়, সরকার তাহা হইতে রেহাই পায়। তৃতীয়ত, কাগজী অর্থের আরও একটি সুবিধা আছে। কেবল মাত্র ধাতব মুদ্রা চলিত থাকিলে দেশে যতখানি ধাতু আছে, ঠিক সেই পরিমাণ মুদ্রা চালু রাখা সম্ভব। ব্যবসায়-বাণিজ্য বাড়িলেও আর অধিক পরিমাণ মুদ্রার প্রচলন করা সম্ভব নহে। নূতন ধাতু সংগ্রহ হইলেই তবে নূতন মুদ্রা তৈয়ারী করা যাইবে। কিন্তু চাহিদা বাড়িলে বেশী পরিমাণ কাগজী অর্থ অনায়াসেই চালু করা যায়। কাজেই কাগজী অর্থ চালু থাকিলে দেশের মুদ্রাব্যবস্থা খুবই স্থিতিস্থাপক হয়।

কিন্তু কাগজী অর্থের সবাপেক্ষা বড় ত্রুটি ইহাই যে, ইহার মূল্য ধাতব মুদ্রার মূল্যের মত স্থির নহে। দেশে কেবল ধাতব মুদ্রা থাকিলে সরকার খুশীমত মুদ্রা প্রচলন করিতে পারে না। সরকারের নিকট যতটুকু ধাতু আছে, কেবল ততসংখ্যক মুদ্রা তৈয়ারী করা সম্ভব হয়। মুদ্রার যোগান বাড়িলে তাহার মূল্য কমে। ধাতব মুদ্রার সংখ্যা খুব বাড়ান সম্ভব নহে বলিয়া তাহার মূল্য বেশী কমিতে পারে না। কিন্তু অপরিবর্তনীয় কাগজী অর্থ সরকার ইচ্ছামত বাজারে চালু করিতে পারে। উহার কোন সীমা সংখ্যা নাই। প্রয়োজনের তাড়নায় দুঃস্থ সরকার হয়ত প্রচুর পরিমাণে কাগজী অর্থ চালু করিবে। ফলে তাহার মূল্য খুবই কমিয়া যাইতে পারে। অর্থের মূল্যহ্রাস মানে জিনিষ পত্রের দাম বৃদ্ধি পাওয়া। দাম বাড়িলে জনসাধারণের খুবই অসুবিধা হয়। ইহা খুব বড় ত্রুটি।

আর একটি অসুবিধা এই যে, কাগজী অর্থ কেবলমাত্র দেশেই চলে। বিদেশীরা কাগজী অর্থ লইতে অস্বীকার করিতে পারে। কিন্তু সোনা লইতে কেহই আপত্তি করে না। কাজেই বৈদেশিক বাণিজ্যে কাগজী অর্থ অচল। এদিক হইতেও কাগজী অর্থ ধাতব মুদ্রা অপেক্ষা হীন।

আদিষ্ট মুদ্রা (Fiat money) : নিদর্শক মুদ্রা এবং কাগজী অর্থকে কখন কখন আদিষ্ট অর্থ বলা হয়। যে অর্থ সরকারী আদেশ অনুযায়ী লোকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, তাহাকে আদিষ্ট অর্থ বলা হয়। কাগজী অর্থের কোন নিজস্ব মূল্য নাই। নিদর্শক মুদ্রার ধাতব মূল্য আসল মূল্য অপেক্ষা কম। এই সামান্য নিজস্ব মূল্য থাকা সত্ত্বেও লোকে সরকারী আদেশের জন্য তাহা গ্রহণ করে। এই জন্য ইহাকে আদিষ্ট অর্থ বলা হয়।

গ্রেসামের আইন (Gresham's Law): সব দেশেই একাধিক রকমের মুদ্রা প্রচলিত থাকে। ভারতবর্ষে বিভিন্ন রকমের মুদ্রা চলিত আছে। যেমন রৌপ্য মুদ্রা, এক টাকার নোট, আধুলি, সিকি, দুয়ানি, দুই টাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকা ইত্যাদি কাগজী অর্থ। বিভিন্ন প্রকারের অর্থ প্রচলন সম্বন্ধে একটি নিয়ম আছে।

নিয়মটি এই যে, হীন মুদ্রা ও ভাল মুদ্রা থাকিলে ক্রমে ক্রমে ভাল মুদ্রা অন্তর্হিত হয় ও কেবলমাত্র হীন মুদ্রাই বাজারে প্রচলিত থাকে। হীন মুদ্রা ভাল মুদ্রাকে বাজার হইতে হটাইয়া দেয়। ইহাকে গ্রেসামের সূত্র বলে। স্যার টম্যাস গ্রেসাম লণ্ডন রয়্যাল এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি রাণী এলিজাবেথের আমলের লোক। তৎকালে ইংলণ্ডে বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা প্রচলিত করা হইলে দেখা গেল যে, সব রকম মুদ্রা চালু থাকে না। ভাল মুদ্রা অন্তর্হিত হইয়াছে এবং হীন মুদ্রা তাহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। গ্রেসাম সাহেব এই ঘটনাটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বলিয়া ইহা তাঁহার নামে পরিচিত।

এখন হীন মুদ্রা ও ভাল মুদ্রা কাহাকে বলে, তাহা বিচার করা প্রয়োজন। হীন মুদ্রার অর্থ জাল মুদ্রা নহে। ভাল মুদ্রা অপেক্ষা যে মুদ্রার নিজস্ব মূল্য কম তাহাকে হীন মুদ্রা বলে। একই ধাতুর মুদ্রা প্রচলিত থাকিলে নূতন মুদ্রাকে ভাল মুদ্রা ও পুরাতন মুদ্রাকে হীন মুদ্রা বলা হয়। বহু ব্যবহারের ফলে পুরাতন মুদ্রার ক্ষয় হয় ও তাহাতে ধাতুর পরিমাণ কমিয়া যায়। কিন্তু নূতন মুদ্রায় ধাতুর পরিমাণ পুরাই থাকে।

কাগজী মুদ্রা এবং ধাতব মুদ্রা পাশাপাশি চালু থাকিলে কাগজী মুদ্রার মূল্যই কম বলিয়া তাহাকে হীন মুদ্রা ও ধাতব মুদ্রাকে ভাল মুদ্রা বলে। যখন সোনা এবং রূপা উভয়বিধ মুদ্রার প্রচলন থাকে, তখন হয় সোনা না হয় রূপার মুদ্রা অপরকে বাজার হইতে হটাইয়া দেয়। ধরা যাক সোনা ও রূপার বাজার-দর সরকার ১ : ১৫ এই অনুপাতে স্থির করিয়া দিয়াছে। অর্থাৎ এক তোলা সোনার পরিবর্তে সরকার ১৫ তোলা রূপা দিবে। কিন্তু হয়ত বাজারে রূপার মূল্য কমিয়া গিয়া এক তোলা সোনার বদলে ১৬ তোলা রূপা পাওয়া যাইতে লাগিল। এই অবস্থায় সরকার-নির্ধারিত রূপার মূল্য বাজার দর অপেক্ষা বেশী এবং সোনার মূল্য কম। সরকারী দর অনুযায়ী সোনা অপেক্ষাকৃত মাগগী হওয়াতে উহা বাজার হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে।

টাঁকশালে যাহার মূল্য বাজার-দর অপেক্ষা বেশী, সেই মুদ্রা হীন মুদ্রা এবং ইহা কম মূল্যের মুদ্রাকে অর্থাৎ ভাল মুদ্রাকে সরাইয়া দিবে।

ভাল মুদ্রা কিভাবে বাজার হইতে অন্তর্হিত হয়? প্রথমত, ভাল মুদ্রা লোকে জমাইবে। কাহারও নিকট দুইটি মুদ্রা থাকিলে যেটি পুরাতন তাহাই সে আগে খরচ করে, নূতনটি নিজের নিকট রাখিয়া দেয়। এইভাবে ভাল মুদ্রার প্রচলন কমিয়া যায় ও হীন মুদ্রা চালু থাকে। দ্বিতীয়ত, যাহার সোনা-রূপার অলঙ্কার তৈয়ারী করিবার জন্য মুদ্রা গলায়, তাহারা নূতন মুদ্রাই গলান পছন্দ করে। কারণ, বহু ব্যবহারে পুরাতন মুদ্রায় ধাতুর পরিমাণ কমিয়া যায়। সুতরাং স্বর্ণকার ভাল মুদ্রাগুলি অলঙ্কার নির্মাণের জন্য গলাইয়া ফেলিবে ও ভাল মুদ্রার প্রচলন কমিয়া যাইবে। তৃতীয়ত, বিদেশীরা ভাল মুদ্রাই চাহে। তাহারা কাগজী মুদ্রা গ্রহণ করে না এবং ধাতব মুদ্রায় প্রাপ্য দাবী করে। এইরূপ তিন উপায়ে ভাল মুদ্রা বাজার হইতে অন্তর্হিত হয় ও কেবল মাত্র হীন মুদ্রা প্রচলিত থাকে।

কিন্তু দুইটি বিশেষ অবস্থায় এই নিয়ম কার্যকরী থাকে না। প্রথমত, লোকে যদি হীন মুদ্রা লইতে অস্বীকার করে, তবে ভাল মুদ্রা বাজারে চালু থাকিবে। দ্বিতীয়ত, ভাল এবং হীন মুদ্রা মিলিয়া মোট মুদ্রার পরিমাণ লোকের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট হওয়া চাই। তাহা না হইলে ভাল ও হীন দুই রকমের মুদ্রাই বাজারে চালু থাকিবে। নূতন এবং পুরাতন মিলাইয়া কাহারও যদি পঞ্চাশটি মুদ্রা থাকে এবং তাহার চল্লিশটি খরচ করিলে চলে, তবে সে দশটি নূতন এবং ভাল মুদ্রা রাখিয়া বাকি টাকা খরচ করিবে। কিন্তু তাহার যদি পঞ্চাশ টাকাই খরচ করিতে হয়, তবে সে কোন টাকাই রাখিতে পারিবে না। কাজেই প্রয়োজন অপেক্ষা মোট মুদ্রার পরিমাণ বেশী না হইলে ভাল মন্দ উভয়বিধ মুদ্রাই চালু থাকে।

মুদ্রাব্যবস্থা (Monetary system) : বিভিন্ন দেশে যে সকল মুদ্রামান আছে, তাহা এখন আলোচনা করা যাইতে পারে। যদি প্রামাণিক অর্থ একটি ধাতুর তৈয়ারী হয়, তাহা হইলে উহাকে একধাতুমান (Single standard) মুদ্রাব্যবস্থা বলা হয়। দেশে স্বর্ণমান অথবা রৌপ্যমান প্রচলিত থাকিতে পারে। আজকাল কোন দেশেই রৌপ্যমান প্রচলিত নাই বলিয়া উহার আলোচনা স্থগিত রাখা যাইতে পারে।

দেশের প্রামাণিক মুদ্রার বিনিময়ে যখন নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা দিবার ব্যবস্থা থাকে, তখন সেই দেশে স্বর্ণমান (Gold standard) আছে বলা হয়। দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে স্বর্ণমুদ্রা চালু থাকিতেও পারে। কিংবা সেই দেশের কেবলমাত্র কাগজী মুদ্রা প্রচলিত থাকিতে পারে। কিন্তু কাগজী মুদ্রার হিসাবে সোনার মূল্য স্থির রাখিতে হইবে এবং সরকার অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে ঐ দামে অবাধে সোনা কেনাবেচা করিতে হইবে। দেশ হইতে সোনা আমদানী অথবা রপ্তানীতে বাধা থাকিবে না। এইসব সর্তগুলি পূর্ণ হইলে দেশে স্বর্ণমান আছে বলা যায়।

দেশের প্রামাণিক মুদ্রা সোনা এবং রূপা উভয় ধাতুর হইতে পারে। ইহাকে দ্বিধাতুমান (Bimetallism) মুদ্রাব্যবস্থা বলে। দুইটি ধাতুর মুদ্রা অবাধে চলিতে থাকিলে সেই দেশে মুদ্রাব্যবস্থাকে দ্বিধাতুমান বলা হয়। প্রামাণিক মুদ্রা স্বর্ণ এবং রৌপ্যের হইবে ; উভয়েই অসীম বিহিত অর্থ এবং উভয়ের ধাতব মূল্য মুদ্রা-মূল্যের সমান হইবে। সোনা এবং রূপায় অবাধ মুদ্রাঙ্কন-ব্যবস্থা থাকিবে। সরকার সোনা এবং রূপার মধ্যে একটি অনুপাত নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বহুদেশে এই মুদ্রাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এখন কোন দেশেই দ্বিধাতুমান চলে না।

ভারতবর্ষে স্বর্ণমান অথবা দ্বিধাতুমান কোনটি নাই। আমাদের মুদ্রা-নীতিকে পরিচালিত মুদ্রামান বলা চলে। একটি নির্দিষ্ট হারে ডলার ও স্টার্লিং-এর সহিত টাকা বিনিময় করা চলে। স্টার্লিং-টাকার হার ১ সিলিং ৬ পেন্স ঠিক রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ যে কেহ এক টাকার পরিবর্তে ১ সিলিং ৬ পেন্স দাবী করিতে পারে। আবার একজন ইংরেজ এক পাউণ্ডের বদলে ১৩৷৷০ তের টাকা আট আনার মত পাইতে পারে। আবার বর্তমান টাকার বিনিময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট হারে ডলার বা আমেরিকার মুদ্রা দিয়া থাকে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অর্থের মূল্য

আর সব জিনিষের মত অর্থের বিনিময়ে যে পরিমাণ অন্যান্য সামগ্রী পাওয়া যায়, তাহাকেই অর্থের মূল্য বলে। যদি এক টাকায় বহু জিনিষ পাওয়া যায়, তবে বলিতে হয় টাকার মূল্য খুব বেশী; আবার কম জিনিষ পাওয়া গেলে টাকার মূল্য কম বলিতে হইবে। জিনিষপত্রের দাম যখন খুব বেশী তখন টাকার বদলে কম জিনিষ পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ টাকার মূল্য তখন কম। আবার যখন জিনিষের দাম কম তখন টাকার বিনিময়ে অনেক জিনিষ পাই। টাকার মূল্য তখন খুব বেশী। কাজেই জিনিষপত্রের দাম চড়া হইলে অর্থের বিনিময়ে আমরা কম জিনিষ কিনিতে পারি। কিন্তু দাম কম হইলেই তবে বেশী জিনিষ কেনা সম্ভব। প্রথমটিকে অর্থের উপচয় (Appreciation of money) এবং দ্বিতীয়টিকে অর্থের অবচয় (Depreciation of money) বলে। গত যুদ্ধের সময় হইতে টাকার মূল্য কমিয়া গিয়াছে, জিনিষপত্রের দাম এখন খুবই চড়া।

সূচকসংখ্যা (Index-numbers): অর্থের মূল্য বৃদ্ধি অথবা কম ইহা কিভাবে ঠিক করা হয়? বিভিন্ন জিনিষের বিভিন্ন সময়ের গড়পড়তা দাম তুলনা করিয়া আমরা অর্থের মূল্য বুঝিতে পারি। অর্থের মূল্য স্থির করিবার জন্য বিভিন্ন জিনিষের যে গড়পড়তা দাম ঠিক করা হয়, তাহাকে সূচকসংখ্যা বলে। একটি বিশেষ বৎসর অথবা কালকে ভিত্তি হিসাবে ধরা হয়। এই সময়ে লোকে সাধারণত যে সব জিনিষ কেনে তাহাদের দামের গড়পড়তা হিসাব করা হয়। এখান হইতে সুরু। পরবর্তী সময়ে সেই জিনিষগুলি দামেরও এইরূপে গড়পড়তা হিসাব ধরা হয়। ভিত্তিকালের সূচকসংখ্যা হইতে যদি এই সংখ্যা বেশী হয়, তবে বুঝিতে পারা যাইবে যে, অর্থের মূল্য কমিয়াছে। আবার যদি ঐ সংখ্যা কম হয়, তাহা হইলে অর্থের মূল্য বাড়িয়াছে বলিতে হইবে। এইভাবে সূচকসংখ্যার সাহায্যে অর্থের মূল্য নিরূপণ করিতে পারি।

অর্থের পরিমাণতত্ত্ব (Quantity theory of money): অর্থের মূল্য কিভাবে নিরূপিত হয়? অপরাপর সমস্ত জিনিষের মত অর্থের মূল্য

উহার চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে। অর্থের চাহিদা কেন হয়? অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম। জিনিষপত্র কেনাবেচার সময় দাম দিতে অর্থ চাই। জিনিষ কিনিলেই টাকা দিতে হয়। অতএব দেশে যে পরিমাণ জিনিষ ক্রয়-বিক্রয় হয়, তাহার উপরেই অর্থের চাহিদা নির্ভর করে। ক্রয়-বিক্রয় আবার দ্রব্য উৎপাদনের উপর নির্ভর করে। উৎপাদন বাড়াইতে অথবা কমাইতে সময় লাগে। সুতরাং কোন একটি বিশেষ সময়ে বিক্রয়ার্থ জিনিষের পরিমাণ স্থির থাকে। কাজেই কোন নির্দিষ্ট সময়ে অর্থের চাহিদাও স্থির থাকে।

অর্থের চাহিদা স্থির থাকিলে তাহার মূল্য একমাত্র যোগানের উপর নির্ভর করে। জিনিষ ক্রয় করিবার জন্য যত অর্থ বাজারে চালু আছে, তাহাই অর্থের যোগানের পরিমাণ। কাজেই বলা যায় বাজারে চালু অর্থের পরিমাণের উপরেই তাহার মূল্য নির্ভর করে। ইহাকেই অর্থের পরিমাণতত্ত্ব বলে। এই মত অনুযায়ী যে পরিমাণ অর্থ বাজারে চালু থাকে, তাহা দিয়াই অর্থের মূল্য নির্ধারিত হয়। অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ হইলে উহার মূল্য অর্ধেক হইবে, সব জিনিষের দাম দ্বিগুণ হইয়া যাইবে। অর্থের পরিমাণ কমিলে তাহার মূল্য বাড়িবে ও জিনিষের দাম কমিবে।

অর্থের যোগান সম্বন্ধে একটি বৈশিষ্ট্য স্মরণ রাখা কর্তব্য। মনে কর তোমার বাবা তোমাকে বাজার হইতে মাছ কিনিবার জন্য একটি টাকা দিলেন। তুমি বাজারে গিয়া মাছ কিনিয়া মাছওয়ালাকে টাকা দিলে। মাছওয়ালা আবার সেই টাকা দিয়া কাপড়ওয়ালার নিকট হইতে কাপড় কিনিল। কাপড়-ওয়ালা আবার মনোহারী দোকান হইতে তাহার পুত্রের জন্য এই টাকা দিয়াই কাগজ কিনিল। একই দিনে এইভাবে একই টাকায় তিনবার কেনা-বেচা হইল। কাজেই একটি টাকা তিনটি টাকার কাজ করিল। এই বৈশিষ্ট্যকে অর্থের প্রচলন-বেগ (Velocity of circulation) বলা হয়। প্রত্যেকটি মুদ্রা দিনে বা একটি নির্দিষ্ট সময়ে যতবার হাত বদলায় তাহাই অর্থের প্রচলনবেগ। অতএব মোট অর্থের পরিমাণের হিসাব করিতে হইলে এইভাবে মুদ্রা এবং কাগজী নোটের পরিমাণকে অর্থের প্রচলনবেগ দিয়া পূরণ করিলে তবে মোট অর্থের পরিমাণ পাওয়া যাইবে।

অর্থের মূল্য এবং দাম মোট মুদ্রাসংখ্যা এবং অর্থের প্রচলনবেগের উপরে নির্ভর করে। দেশে যদি অর্থ বাড়ে তবে তাহা হইলে দাম বাড়িবে এবং অর্থ

কমিলে দাম কমিবে। ধরা যাক ম (P) জিনিষপত্রের গড়পড়তা মূল্য ; স (T) একটি নির্দিষ্ট সময়ে মোট বিক্রীত সামগ্রীর পরিমাণ। তাহা হইলে মোট বিক্রীত জিনিষের দাম ম × স (P T)। মেটে অর্থের পরিমাণকে অ (M) এবং অর্থের প্রচলনবেগকে প (V) বলা যাক তাহা হইলে লোকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে অ × প (M. V.) পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে। লোকে জিনিসপত্র কিনিতে যত অর্থ ব্যয় করে তাহা বিক্রীত জিনিষপত্রের দামের সমান হইবে।

কাজেই ম × স = অ × প অর্থাৎ $ম = \frac{অ \times প}{স}$ $(P = \frac{M.V.}{T})$

আধুনিক কালে লোকে চেক দিয়াও জিনিষ কেনে। অর্থাৎ টাকার বদলে একটি ক্রেডিটপত্র দিয়া লোকে জিনিষ কিনিল। অতএব মোট অর্থের পরিমাণ কেবল মুদ্রা ও কাগজী মুদ্রার সংখ্যার উপরে নিভর করে না, যে পরিমাণ ক্রেডিটপত্র (Credit instrument) ব্যবহৃত হয়, তাহা ইহার সহিত যোগ দিতে হইবে। তাহা হইলে অর্থের পরিমাণ অ × প + আ × ফ-এর সমান হইবে। যে পরিমাণ ক্রেডিটপত্র ব্যবহৃত হয় তাহাই আ (M′) এবং ক্রেডিট-পত্রের প্রচলন বেগ ফ (V′)। কাজেই উপরোক্ত সমীকরণ নূতনভাবে লিখিতে হইবে :

$$ম = \frac{অ \times প + আ \times ফ}{স}$$

অ = অর্থ, আ = আমানত, প = অর্থের প্রচলন বেগ, ফ = আমানতের প্রচলনবেগ, স = মোট সামগ্রী।

অতএব মোট অর্থের পরিমাণকে (অ.প + আ.ফ) মোট সামগ্রী স দিয়া ভাগ করিলে গড়পড়তা দাম পাওয়া যাইবে। এই সমীকরণ অর্থের পরিমাণ-তত্ব নামে খ্যাত। অধ্যাপক আরভিং ফিসার নামক একজন বিখ্যাত আমেরিকান ধনবৈজ্ঞানিক উপরোক্ত সমীকরণটি লিখিয়াছেন বলিয়া ইহাকে ফিসারের পরিমাণতত্বের সমীকরণও বলা হয়।

অর্থের মূল্য পরিবর্তন (Causes of changes in the value of money): জিনিষপত্রের দাম হইতেই অর্থের মূল্য বুঝিতে পারা যায়। সব জিনিষের মূল্য বাড়িলে, যেমন বর্তমানে আমাদের দেশে বাড়িয়াছে, এক টাকায় আমরা কম জিনিষ কিনিতে পারি। পূর্বেকার তুলনায় এখন টাকার মূল্য কম।

আবার জিনিষপত্রের দাম কমিলে এক টাকায় বেশী জিনিষ পাওয়া যায়। তখন টাকার মূল্য বাড়ে। অর্থের মূল্য কি কি কারণ বিশেষে বাড়ে এবং কমে?

অর্থের পরিমাণতত্ত্ব হইতে আমরা জানি যে, অর্থের মূল্য উহার চাহিদা এবং যোগদানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। দেশে যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে, তাহার উপর অর্থের চাহিদা নির্ভর করে। উৎপাদন বৃদ্ধি হইবার ফলে বিক্রয়ার্থ জিনিষের পরিমাণ বাড়িলে অর্থের চাহিদা বাড়িবে। অর্থের যোগান যদি ইতিমধ্যে না বাড়ে, তাহা হইলে অর্থের মূল্য বাড়িবে। অর্থাৎ গড়পড়তা জিনিষ পত্রের দাম কমিয়া যাইবে। আবার বিক্রয়ার্থ দ্রব্যের পরিমাণ একই থাকা সত্ত্বেও অর্থের পরিমাণ কমিলে দাম কমিয়া যায়। জিনিষপত্রের উৎপাদন বাড়িলে অথবা অর্থের পরিমাণ কমিলে এবং আর সব অবস্থা একই থাকিলে দাম কমে। যে কারণেই হউক উৎপাদন বাড়িলে বা অর্থের পরিমাণ কমিলে জিনিষপত্রের দাম কমিয়া যায়। উৎপাদন-ব্যবস্থার উন্নতি হইলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বাড়ে এবং দাম কমে। সরকার যদি বাজারে কম অর্থ চালু করে তাহা হইলেও দাম কমে।

চালু অর্থের পরিমাণ বাড়িলে অথবা বিক্রয়ার্থ দ্রব্যাদি কমিয়া গেলে জিনিষপত্রেব দাম বাড়ে। সরকার অনেক অর্থ বাজারে চালু করিলে, অর্থের পরিমাণ অনেকটা বাড়াইয়া দিলে জিনিষপত্রের দাম বাড়ে, অর্থের মূল্য কমিয়া যায়। যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধিলে যুদ্ধের ব্যয় চালাইবার জন্য সরকার কাগজী নোটের প্রচলন বাড়াইতে বাধ্য হয়। বিদেশ হইতে আমদানী বন্ধ হইলে দ্রব্যাদির যোগান কমিয়া যায়। যুদ্ধের সময়ে শ্রমিকেরা কারখানা ত্যাগ করিয়া সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেও উৎপাদন কম হয়। যথেষ্ট সংখ্যক শ্রমিকের অভাবে কারখানাতে পূরাদমে উৎপাদন হয় না—তখন জিনিষ-পত্রের দাম বাড়ে।

মুদ্রাস্ফীতি (Inflation): সাধারণত জিনিষ-পত্রের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিলেই লোক মুদ্রাস্ফীতি বা ইনফ্লেসন হইয়াছে বলে। কিন্তু জিনিষ-পত্রের দাম বাড়িলেই তাহাকে ইনফ্লেসন বলা সব সময়ে চলে না। যদি কোন কারণে দেশের মূলধন কমিয়া যায় ও তাহার ফলে উৎপাদনের ব্যয় বাড়ে তবে সেইজন্য মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতে পারে। তাহাকে ইনফ্লেসন বলা চলে না। আবার অনেক সময়ে জিনিষপত্রের দাম না বাড়িলেও ইনফ্লেসন হইতে পারে। যদি দেশের লোকের কর্মদক্ষতা বাড়ে ও তাহার ফলে উৎপাদনের ব্যয় কমিয়া যায়, তখন

মূল্য সমান থাকিলেও ব্যবসায়ীদের লাভ খুব বেশী পরিমাণে বাড়িবে ও দেশে ইনফ্লেসনের সব লক্ষণ প্রকাশ পাইবে।

কি কি অবস্থায় ইনফ্লসন হইয়াছে বলা যায়? গভর্ণমেণ্ট যদি বাজারে অত্যাধিক পরিমাণে মুদ্রা চালু করিতে থাকে তবেই ইনফ্লেসন হইতে পারে। দেশের মধ্যে যতক্ষণ লোক বেকার বসিয়া থাকে ততক্ষণ বাজারে বেশী মুদ্রা চালু করিলে বেকার লোক কাজ পাইতে পারে ও ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ক্রমে বেকারের সংখ্যা কমিয়া যাইবে ও দেশে পূর্ণ বিনিয়োগ (Full employment) অবস্থা দেখা দিবে। ইহার পরও যদি বেশী মুদ্রা চালু করা হয়, তবে জিনিষপত্রের দাম বাড়িতে থাকিবে। এই অবস্থাকে ইনফ্লেসন বলা হয়। যখন পূর্ণ বিনিয়োগ হয় তাহার পরে আর উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ান যায় না। এই অবস্থার পরেও যদি বেশী মুদ্রা চালু করা হয়, তবে আর উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে না। শুধু জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি ঘটিবে। এই মূল্য বৃদ্ধিকে ইনফ্লেসন বলে। বেশী মুদ্রা চালু করার ফলে লোকের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আয় বাড়িলেই ব্যয় বাড়ে। অর্থাৎ লোকে বেশী পরিমাণ অর্থ দিয়া বেশী পরিমাণ জিনিষ কিনিতে চাহে। কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ান যায় না বলিয়া জিনিষপত্রের যোগান একই থাকে। লোকের ব্যয়ের স্পৃহা বাড়িয়াছে, অথচ জিনিষপত্রের যোগান বাড়ে নাই এই অবস্থায় দাম বাড়িতে বাধ্য। জিনিষপত্রের যোগানের তুলনায় লোকেদের আয় যখন বেশী পরিমাণে বাড়িতে থাকে তখন ইন্‌ফ্রেসন হইয়াছে বলা হয়।

ইহার বিপরীত অবস্থাকে ডিফ্লেসন বা মূল্যহ্রাস বলে। জিনিষপত্রের যোগানের তুলনায় লোকেদের আয় বেশী পরিমাণে কমিতে থাকে তখন ডিফ্লেসন হইয়াছে বলা হয়।

মূল্য বৃদ্ধির ফল (Effect of rising prices) : জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে সবশ্রেণীর লোকের অবস্থার পরিবর্তন হয়। যাহাদের আয় নির্দিষ্ট, জিনিষপত্রের দাম বাড়িলে তাহারা বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। সরকারী চাকুরিয়া, শিক্ষক, অধ্যাপক, কেরানী প্রভৃতি লোকেরা মাসে নির্দিষ্ট মাহিনা পায়। জিনিষপত্রের মূল্য বাড়িলে তাহাদের আয় বাড়ে না। কাজেই তখন তাহাদের কষ্টের সীমা থাকে না। সব জিনিষের বেশী দাম দিতে হয় বলিয়া পূর্বের মত জিনিস কেনা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। দুইশত টাকা যে বেতন পায়,

তাহার কথাই ধরা যাউক। প্রতিমাসে হয়ত তাহার দুইমণ চাউল দরকার। যখন চাউলের মণ পাঁচ টাকা, তখন চাউল কিনিয়া তাহার অন্যান্য জিনিষ কিনিবার মত ১৯০\ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। কিন্তু চাউলের দর বাড়িয়া ১৬\ টাকা হইলে তাহার দুই মণ চাউল কিনিতে ৩২\ টাকা ব্যয় হয় এবং মাত্র ১৬৮\ টাকা অবশিষ্ট থাকে। অন্যান্য জিনিষেরও দাম তখন বাড়িয়া গেলে এই লোকটির অবস্থা কি হইবে তাহা কল্পনা কর। তখন অন্যান্য জিনিষ খুব কম করিয়া কেনা ছাড়া তাহার গতি নাই। ইহাতে তাহার এবং তাহার পরিবারের সকলের খুবই কষ্ট হইবে। এখন জিনিষপত্রের চড়া দাম। নির্দিষ্ট আয়ের লোকের কত কষ্ট হইতেছে তাহা আমরা সকলেই জানি।

মজুরেরাও দাম বাড়িলে কষ্ট পায়। দাম বাড়িলে মজুরী চট করিয়া বাড়ে না। তাহা হইলে নির্দিষ্ট আয়ের লোকদের মত তাহাদেরও কষ্ট হইবে। কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মঘট করিয়া তাহারা অধিক মজুরী অথবা মাগ্‌গী ভাতা আদায় করিয়া লইতে পারে। কিন্তু মজুরী বৃদ্ধির হার বা মাগ্‌গী ভাতার পরিমাণ মূল্য-বৃদ্ধির তুলনায় কম হয়। ফলে মূল্য বাড়িলে মজুরদেরও কষ্ট হয়।

দাম বাড়িলে ব্যবসায়ীরা লাভবান হয়। জিনিষের মূল্য বাড়িলে লাভের মাত্রা বৃদ্ধি হয়।

কাজেই দাম বাড়িলে ব্যবসায়ীর লাভ হয়, কিন্তু মজুর এবং নির্দিষ্ট আয়ের লোকদের ক্ষতি হয়।

মূল্যহ্রাসের ফল (Effect of falling price) : জিনিষপত্রের দাম বাড়িলে যেমন নির্দিষ্ট আয়ের লোকের কষ্ট হয়, দাম কমিয়া গেলে আবার তাহাদের সুবিধা হয়। কারণ দাম কমিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আয় কমে না। সরকারী চাকুরীয়া বা অন্যান্য চাকুরিয়াদের মাহিনা ঠিকই থাকে। কিন্তু জিনিষ-পত্রের মূল্য নামার ফলে তাহারা সব রকম জিনিষই বেশী করিয়া কিনিতে পারে।

মজুরদের অবস্থাও ভাল হয়। কারণ তাহাদের মজুরীও বিশেষ কমে না। যদি কমে তবে দাম যে পরিমাণ কমে মজুরীর হার সেই পরিমাণে কমে না। কাজেই মজুরেরা বেশী জিনিষ কিনিতে পারে। অবশ্য আর একদিক দিয়া মজুরদের অসুবিধা হইতে পারে। জিনিষপত্রের দাম বেশী কমিয়া গেলে ব্যবসায়ীরা লোকসান দেয়। তাহা হইলে তাহারা হয়ত কিছু কিছু মজুর ছাঁটাই করিতে পারে। ফলে বেকারের সংখ্যা বাড়িবে।

দাম কমিলে ব্যবসায়ীরা বিপদে পড়ে। তাহাদের লাভ ত কমিয়া যায়ই, হয়ত রীতিমত লোকসান হইতে পারে। দাম কমিলে ব্যবসায়ীদের আয় কমে। কাজেই দাম কমিলে ব্যবসায়ীদের আয় কমে; কিন্তু মজুর ও নির্দিষ্ট আয়ের লোকদের অবস্থার উন্নতি হয়।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ক্রেডিট

অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা ধরিয়া লইয়াছি সব আদান-প্রদান নগদ টাকায় হয় ও নগদ টাকা দিয়া জিনিষ বেচাকেনা হয়। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। অনেক আদান-প্রদান ধারে চলে। ভবিষ্যতে শোধ দিবার অঙ্গীকারে যে বেচাকেনা হয়, তাহাকে ধারের কারবার বলা হয়। ইংরাজীতে ইহাকে ক্রেডিট বলে। 'ক্রেডিট' বিষয়টি কি? দোকানদার ক্রেডিটে জিনিষ বিক্রয় করিতে রাজী হইলে 'ক্রেতাকে নগদ টাকা দিতে হয় না, ভবিষ্যতে নগদ টাকা দিবার অঙ্গীকার লিখিয়া দিতে হয়। ক্রেতার উপর বিশ্বাস না থাকিলে দোকানদার ধারে জিনিষ দিবে না। তাই ক্রেডিটের মূলে রহিয়াছে বিশ্বাস। দোকানী বিশ্বাস করে যে, নির্দিষ্ট দিনে ক্রেতা টাকা দিবে। দ্বিতীয়ত, নগদ কেনাবেচায় টাকা সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হয়। কিন্তু ক্রেডিটে বা ধারের কারবারে টাকা ভবিষ্যতে দেয়। কাজেই ক্রেডিটের কারবার শেষ করিতে সময় লাগে। ক্রেডিটের মূলে রহিয়াছে বিশ্বাস ও সময়।

ক্রেডিটপত্র (Credit Instrument): ধারের কারবারে ক্রেতা ভবিষ্যতে টাকা দিবার অঙ্গীকার করে। এই অঙ্গীকার সাধারণত কাগজে লিখিত হয় এবং তাহাকে ক্রেডিটপত্র বলে। কাগজী অর্থ, চেক, হুণ্ডি প্রভৃতি ক্রেডিটপত্রের উদাহরণ। কাগজী অর্থ লোকে গ্রহণ করে; কারণ, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নগদ টাকা দিবার ক্ষমতায় তাহাদের বিশ্বাস আছে। তাই কাগজী অর্থকে ক্রেডিটপত্র বলা হয়।

চেক (Cheque): ব্যাঙ্কে লোকে টাকা জমা রাখে। আমানতকারী ব্যাঙ্কের উপর অপর একজনকে অথবা বাহককে তাহার আমানত হইতে টাকা দিবার যে লিখিত আদেশ দেয়, তাহাকে চেক বলে।

আমানতকারী যাহাকে টাকা দিবে, তাহার নাম Pay কথাটির পরে ফাঁকা স্থানটিতে লিখিয়া দেয়। Rupees কথাটির পরে দেয় টাকার পরিমাণ কথায় লিখিতে হয়। নীচে সে নাম সই করে এবং টাকা অঙ্কে লিখিয়া দেয়। ব্যাঙ্ক হইতে আমানত-কারীদের এইরূপ চেক-বই দেওয়া হয়।

সাধারণত চেক দিয়া বহু দেনাপাওনা মিটান হয়। যে চেক দিবে তাহার ব্যাঙ্কে টাকা আছে এই বিশ্বাস থাকিলেই তবে লোকে তাহার চেক লইবে। ব্যাঙ্কের উপরেও বিশ্বাস থাকা চাই যে, চাহিলে চেকের বদলে টাকা পাওয়া যাইবে। এই কারণে চেককে ক্রেডিটপত্র বলা হয়।

চেককে কি অর্থ বলা যায়? চেক দিয়া দেনা মিটানো নগদ মুদ্রা দেওয়ার সামিল। কিন্তু তাই বলিয়া চেক ও মুদ্রার মধ্যে পার্থক্য আছে। সর্বজনগ্রাহ্যতা অর্থের প্রধান লক্ষণ। অর্থ সকলেই গ্রহণ করিতে রাজী থাকে। কিন্তু কাগজী অর্থ যে হিসাবে সর্বজনগ্রাহ্য, চেক সে রকম নহে। যিনি চেক দিতে চাহেন তাহাকে না চিনিলে কেহই চেক লইবে না। কিন্তু কাগজী অর্থ যে কোনও লোকের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে কাহারও বাধে না। তাই চেককে সর্বজনগ্রাহ্য বলা যায় না। দ্বিতীয়ত, চেক দিলেই দেনা মিটে না। ব্যাঙ্ক হইতে চেক ফেরৎ দিলে পাওনাদার চেকদাতার নিকট হইতে নগদ টাকার দাবী করিতে পারে। কিন্তু কাগজী অর্থ দিলে পাওনা তৎক্ষণাৎ মিটিয়া গেল। অর্থের সহিত চেকের আরও একটি তফাৎ আছে। সকলেই গ্রহণ করে বলিয়া উহা ক্রমাগত হস্তান্তরিত হয়। কিন্তু চেক খুব কমই হস্তান্তরিত হয়। কাজেই চেককে অর্থ বলা যায় না।

চেকের প্রয়োজনীয়তা: চেক ব্যবহৃত হইলে নগদ টাকার ব্যবহারের প্রয়োজন কমিয়া যায়। ধরা যাক **ক** **খ**-এর নিকট ১০০৲ টাকা ধারে এবং ঐ টাকার একটি চেক সে **খ**কে দিল। **খ** সেই চেক ব্যাঙ্কে দিয়া ১০০৲ টাকা পাইতে পারে। **খ**-এর আবার ব্যাঙ্কে হিসাব থাকিতে পারে। তখন **খ** ঐ চেক তাহার নিজের হিসাবে জমা দেওয়ার জন্য পাঠাইবে। দুইজনেরই এক ব্যাঙ্ক হইলে ব্যাঙ্ক **ক**-এর হিসাব হইতে টাকা কাটিয়া **খ**-এর হিসাবে জমা দিবে। ফলে কেবল মাত্র খাতায় লিখিয়া হিসাব মিটিয়া গেল। নগদ টাকার প্রয়োজন হইল না। **খ**এর যদি অন্য ব্যাঙ্কে হিসাব থাকে, তবে সেই ব্যাঙ্কে চেকটি চেকবিনিময়কেন্দ্রে (Clearing house-এ) পাঠাইবে। সেখানে প্রত্যেক ব্যাঙ্কের দেয় এবং প্রাপ্য টাকার হিসাব হয়। দেয় এবং প্রাপ্যের মধ্যে যাহা তফাৎ হইবে প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে তাহা দিতে হইবে, অথবা তাহাই সে পাইবে। ধর প্রথম ব্যাঙ্ক দ্বিতীয় ব্যাঙ্কের উপরে সর্বসমেত ১,০০০৲ টাকার চেক পাইল এবং দ্বিতীয় ব্যাঙ্ক প্রথম ব্যাঙ্কের উপরে ৯০০৲ টাকার চেক পাইল।

দ্বিতীয় ব্যাঙ্ককে দিতে হইবে হাজার টাকা, কিন্তু সে পাইবে ৯০০৲ টাকা। কাটাকাটি করিয়া দ্বিতীয় ব্যাঙ্কে তাহা হইতে মাত্র ১০০৲ দিতে হইবে। এই ১০০৲ টাকাও নগদ দিতে হয় না। বিনিময়-কেন্দ্রে প্রত্যেক ব্যাঙ্কের হিসাব থাকে। সেই হিসাবে জমা অথবা খরচ লেখা হয়। কাজেই চেক দিলে নগদ টাকা ব্যবহারের প্রয়োজন থাকে না বলিলেই হয়।

হুণ্ডি (Bill of Exchange) : বিক্রেতা ক্রেতাকে বাহক অথবা তৃতীয় কোন এক ব্যক্তিকে ক্রীত দ্রব্যের মূল্য দিতে যে লিখিত আদেশ দেয় তাহাকে হুণ্ডি বলে। বিক্রেতাকে হুণ্ডিপ্রেরক (drawer) এবং ক্রেতাকে হুণ্ডিগ্রাহক (drawee) বলা হয়।

প্রেরক এবং গ্রাহক উভয়েই একই দেশের লোক হইলে হুণ্ডিকে আভ্যন্তরীণ হুণ্ডি বলা হয়। ক্রেতা অথবা বিক্রেতা বিদেশী হইলে ইহাকে বৈদেশিক হুণ্ডি বলে। হুণ্ডি একটি ক্রেডিটপত্র। কারণ হুণ্ডি যেদিন ক্রেতার নিকট উপস্থিত করান হয়, তাহার কিছু দিন পরে এক নির্দিষ্ট দিনে ক্রেতাকে টাকা দিতে হইবে। প্রেরক ও গ্রাহক টাকা দিতে পারিবে বিশ্বাস থাকে বলিয়া লোকে হুণ্ডি কেনে।

হুণ্ডির কারবার : আন্তর্জাতিক দেনাপাওনা মিটাইবার ইহা একটি চমৎকার ব্যবস্থা। মনে কর, দেশের এক অংশ হইতে **ক** দেশের অন্য অংশ বা বিদেশস্থিত **খ**এর নিকট হইতে মাল কিনিয়া তাহাকে হুণ্ডি কাটিতে বলিল। আর একটি কারবারে **ক**এর নিকটবর্তী স্থানের অধিবাসী **চ** **খ**এর প্রতিবেশী **ছ**এর নিকট জিনিষ বিক্রয় করিল। দুইটি কারবারে জিনিষের দাম একই। হুণ্ডি না থাকিলে **চ** এবং **ক** উভয়কেই হয় টাকা না হয় সোনা-রূপা পাঠাইতে হইবে। কিন্তু তাহা না করিয়া **খ** **ক**এর নামে বিক্রিত মালের দামের জন্য হুণ্ডি লিখিয়া **ক**এর নিকট উপস্থিত করিলে সে তাহা স্বীকার করে। **খ** তখন হুণ্ডিটি **ছ**এর নিকট বিক্রয় করিয়া দেয়। **ছ** টাকার বদলে এই হুণ্ডিটি **চ**এর নিকট পাঠাইয়া দেয়। **চ** **ক**এর নিকট হইতে টাকা পায়। এইভাবে হুণ্ডি দিয়া দুইটি কারবারের কাজ হইয়া যায়, নগদ টাকার দরকার হয় না। বিদেশে সোনা-রূপাও পাঠাইতে হয় না।

বাস্তব জীবনে ব্যাঙ্কের মারফতেই হুণ্ডির কারবার চলে। **খ** মাল বিক্রয় করিয়া **ক**এর উপরে হুণ্ডি কাটে। কিন্তু তাহা **ছ**এর নিকট বিক্রয় না করিয়া

সে তাহা ব্যাঙ্কে দেয়। প্রেরক এবং গ্রাহক উভয়েই নামকরা ব্যবসায়ী হইলে ব্যাঙ্ক হুণ্ডি কিনিয়া তখনই টাকা দিয়া দেয়। ব্যাঙ্ক নিজের শাখায় বা প্রতিনিধিব নিকট ঐ হুণ্ডি আদায় করিবার জন্য পাঠায়। ব্যাঙ্কের শাখা বা প্রতিনিধি হুণ্ডির বদলে গ্রাহকের টাকা লয়। হুণ্ডি বিদেশের হইলে বিদেশের প্রতিনিধিব নিকট ব্যাঙ্কের জমা বাড়ে। ইতিমধ্যে আর কেহ হয়ত বিদেশে দেনা মিটাইবার জন্য ব্যাঙ্ক হইতে ড্রাফট বা ব্যাঙ্কেব হুণ্ডি চাহিতে পারে। ব্যাঙ্কে টাকা দিয়া সে ড্রাফট কেনে। এই ড্রাফট বিদেশের প্রতিনিধির উপরে দেওয়া হয়। প্রতিনিধি ব্যাঙ্কেব জমা হইতে টাকা দিষা দেয়। এই দুইটি কাজে বিদেশে টাকা পাঠানো প্রযোজন হইল না।

ক্রেডিটপত্রের সুবিধা : ক্রেডিটপত্রের প্রধান সুবিধা এই যে, তাহাদের ব্যবহারে ধাতব মুদ্রাব প্রয়োজন কমিষা যায়। ধাতব মুদ্রা অপেক্ষা কাগজী অর্থের খবচ কম তাহা বলা হইযাছে। চেক এবং হুণ্ডির সাহায্যে লোকে দেশে এবং বিদেশে নগদ টাকা না পাঠাইয়াও দেনাপাওনা মিটাইতে পারে। দেনাপাওনা মিটাইবার পক্ষে ক্রেডিটপত্রই বিশেষ সুবিধাজনক।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

ব্যাঙ্ক

সাধারণ লোকের নিকট ব্যাঙ্ক একটি রহস্যময় স্থান। লোকে সেখানে টাকা জমা দিতে অথবা চেক ভাঙ্গাইতে যায়। কেহ কেহ টাকা ধার করিতেও সেখানে যায়। ব্যাঙ্ক টাকা জমা দিবার ও ধার পাইবার প্রতিষ্ঠান। ব্যাঙ্ক লোকের টাকা জমা রাখে ও জমা টাকার উপর আমানতকারীকে নির্দিষ্ট হারে সুদ দেয়। পূর্বে সঞ্চিত অর্থ চোর-ডাকাতের হাত হইতে রক্ষা করাই দায় ছিল। প্রথমে স্বর্ণকারদের নিকট লোকে টাকা জমা রাখিত, কারণ তাহাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যে এবং সাধুতায় লোকের বিশ্বাস ছিল। প্রথম প্রথম স্বর্ণকারেরা টাকা রাখিবার জন্য লোকদের নিকট হইতে পারিশ্রমিক লইত। ক্রমে তাহারা দেখিল যে, আমানতকারীরা কদাচিত টাকা উঠায়। তখন তাহারা এই টাকা অপরের নিকট সুদে খাটাইতে আরম্ভ করিল। ফলে তাহাদের লাভ হইতে আরম্ভ করে। স্বর্ণকারদের নিকট টাকা জমা রাখা এবং ঐ টাকার অংশ ধার দেওয়া হইতেই আধুনিক ব্যাঙ্কের উৎপত্তি।

ব্যাঙ্ককে ক্রেডিটের কারবারী বলা হয়। লোকে ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখে। কারণ তাহাদের বিশ্বাস আছে যে, চাহিলেই ব্যাঙ্ক টাকা ফেরৎ দিবে। তাহা না হইলে লোকে টাকা জমা রাখিবে না। ব্যাঙ্ক টাকা ধার দেয়, কারণ, ব্যবসায়ীদের উপর ব্যাঙ্কের আস্থা আছে যে, নির্দিষ্ট সময় অন্তে তাহারা ধার শোধ দিবে। ব্যাঙ্কের সমস্ত কারবারই এইভাবে ক্রেডিটের উপর নির্ভর করে।

ব্যাঙ্কের কাজ (Functions of banks): আধুনিক ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ লোকের টাকা জমা রাখা এবং ব্যবসায়ীদের টাকা ধার দেওয়া। লোকে তাহাদের সঞ্চিত অর্থ ব্যাঙ্কের নিকট আমানত রাখে। আমানত তিন রকমের—চলতি, সঞ্চয়ী ও স্থায়ী। চলতি আমানতের (Current account deposits) টাকা যে কোন সময়ে ব্যাঙ্ক হইতে তোলা যায়। সঞ্চয়ী আমানতের (Savings deposits) এক অংশ, সাধারণত মোট জমার এক চতুর্থাংশ, চলতি আমানতের মত তোলা যায়। কিন্তু বাকি অংশ ব্যাঙ্ককে পূর্ব

হইতে জানাইয়া নির্দিষ্ট সময় অন্তর তোলা যায়। স্থায়ী আমানতের(Fixed deposit) টাকা নির্দিষ্ট সময়ের পর তোলা যায়। ব্যাঙ্ক আমানতী সব টাকা জমা রাখিয়া দেয় না। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা হইতে জানা গিয়াছে যে, আমানতকারীরা সব টাকা এক সঙ্গে তুলিয়া লয় না। প্রত্যেক দিন মোট জমার একটি সামান্য অংশই লোকে তোলে। কাজেই ব্যাঙ্ক সামান্য কিছু টাকা লোককে দিবার জন্য নগদ তহবিলে রাখে ও বাকি টাকা অন্য লোককে ধার দেয়। স্থায়ী এবং সঞ্চয়ী আমানতের উপরে ব্যাঙ্ক সুদ দেয়, অনেক সময়ে চলতি আমানতেরও সুদ দেওয়া হয়।

ধার দেওয়া ব্যাঙ্কের দ্বিতীয় কাজ। ব্যাঙ্কের মূলধন এবং আমানতের একটা বড় অংশ ব্যবসায়ীদের ধার দেওয়া হয়। সাধারণত, সোনা, কোম্পানীর কাগজ, ভাল কোম্পানীর শেয়ার প্রভৃতি জামানত লওয়া হয়। ধার দিয়াই ব্যাঙ্কের লাভ হয়।

পূর্বে ইংলণ্ডে প্রায় প্রত্যেক ব্যাঙ্কেই কাগজী অর্থ চালু করিত। উহাকে ব্যাঙ্ক নোট বলা হইত। আজকাল একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতেই কাগজী অর্থ চালু হয়। কাগজী অর্থ ধাতুর মুদ্রার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের চেকবই দেয়। চেক অনেক সময়েই নগদ মুদ্রার বদলে দেনাপাওনা মিটাইতে ব্যবহৃত হয়।

ব্যাঙ্ক আরও কয়েকটি কাজ করে। হুণ্ডি বাটা দিয়া ক্রয় করা এবং বৈদেশিক হুণ্ডি ও মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি ব্যাঙ্কের কাজ। যাহারা বিদেশে আমদানী-রপ্তানীর কাজ করে, তাহারা ব্যাঙ্কের নিকট হইতে বৈদেশিক মুদ্রা কিনিতে ও বেচিতে পারে। ব্যাঙ্ক আপনার মক্কেলদের জন্য আরও অনেক প্রয়োজনীয় কাজ করে। লোকে অলঙ্কার, দলিল ইত্যাদি মূল্যবান জিনিষ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখে। ইহার জন্য ব্যাঙ্ককে সামান্য কিছু অর্থ দিতে হয়। শেয়ার বেচাকেনা সম্বন্ধে ব্যাঙ্ক উপদেশ দিয়া থাকে এবং মক্কেলদের জন্য শেয়ার কেনাবেচার কাজ করিয়া থাকে। মক্কেলের পক্ষে ব্যাঙ্ক অনেক সময়ে অছি (Trustee)-র কাজ করে এবং মক্কেলের চিঠি যথাযথ স্থানে পৌঁছাইয়া দেয়।

ব্যাঙ্কিংব্যবস্থার সুবিধা (Advantage of the Banking system) : ভাল ব্যাঙ্ক দেশের বহু উপকার করে। লোকেরা সঞ্চিত অর্থ

ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়া চোর-ডাকাতের ভয় হইতে রক্ষা পায়। ভাল ব্যাঙ্ক দেশে থাকিলে লোকের সঞ্চয়প্রবৃত্তি বাড়ে। কারণ, ব্যাঙ্কে টাকা থাকিলে তাহারা সুদ পায়। যাহারা মাটির নীচে টাকা পুঁতিয়া রাখিত তাহারা নিজেদের জমানো টাকা ব্যাঙ্কে রাখে। . এইভাবে দেশে যে সম্পদ অব্যবহৃত থাকে, ব্যাঙ্ক তাহা সংগ্রহ করে এবং উৎপাদনবৃদ্ধির কাজে তাহা নিয়োগ করে। ব্যাঙ্ক উদ্যমশীল ব্যবসায়ীদের টাকা ধার দিয়া দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করে। উৎপাদক ও ব্যবসায়ীরা জানে যে, ব্যবসায় বাড়াইবার জন্য প্রয়োজন হইলে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার পাওয়া যাইবে। ইহাতে তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহ পায় এবং ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়। দেশে ভাল ব্যাঙ্ক থাকিলে লোকে মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী হইবার শিক্ষা লাভ করে। দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য তাহাতে বৃদ্ধি পায়। চেকের প্রচলন হইলে লোকের নগদ টাকা, পরিশ্রম এবং সময় বাচে। দেশ-দেশান্তরের সহিত বেশী টাকার আদান-প্রদান সহজে এবং নিরাপদে সম্পাদিত হয়। ইহা ছাড়া ব্যাঙ্ক লোকের বহু কাজ করিয়া দেয়। দেশের আর্থিক উন্নতি শক্তিশালী ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর করে। যে দেশে ভাল ব্যাঙ্ক নাই, সে দেশে শিল্প গড়িয়া উঠা কষ্টসাধ্য। আমাদের দেশে যে শিল্প ভাল করিয়া গড়িয়া উঠে নাই, তাহার অন্যতম কারণ আমাদের দেশে ভাল ব্যাঙ্কের সংখ্যা খুবই কম।

বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাঙ্ক: সবজাতীয় ব্যাঙ্ক লইয়াই দেশের ব্যাঙ্কিং সমাজ। এই সমাজের শীর্ষে আছে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (Central Bank)। দেশের মুদ্রা ও ব্যাঙ্ক নীতি এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কাগজী অর্থ চালু করিবার ক্ষমতা এই ব্যাঙ্কেরই থাকে। সরকারী টাকাপয়সা এই ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকে। ইহাই দেশের অন্যান্য ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক। আর সব ব্যাঙ্ক তাহাদের আমানতী অর্থের একটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখে এবং দরকার হইলে তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা ধার পায়। দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট মূল্যে সোনা ক্রয়-বিক্রয় করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ছাড়া অনেক সাধারণ ব্যাঙ্ক থাকে। তাহারাই ব্যাঙ্কের সব কাজ করে। এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কগুলি দীর্ঘদিনের মেয়াদে টাকা ধার দেয় না। উহারা অল্পকালের জন্যই ব্যবসায়ীদের টাকা ধার দেয়। জার্মানীতে যৌথ ব্যাঙ্কগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে দীর্ঘদিনের মেয়াদে টাকা ধার দিত।

ইহা ছাড়া, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক, কৃষি ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক প্রভৃতি থাকে। সেভিংস্ ব্যাঙ্ক লোকের সঞ্চিত অর্থ জমা রাখে এবং সরকারী কাগজ প্রভৃতিতে টাকা খাটায়। কৃষি ব্যাঙ্ক ও সমবায় ব্যাঙ্ক কৃষিকার্যে টাকা ধাব দেয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (Central Bank) : দেশের ব্যাঙ্কগুলির নেতা ও কর্তা হিসাবে যে ব্যাঙ্ক আছে তাহাকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বলে। আমাদের দেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়াকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বলা হয়। গ্রেট্ ব্রিটেনের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নাম ব্যাঙ্ক অফ্ ইংগল্যাণ্ড। এই তুইটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেব মালিক গভর্ণমেণ্ট এবং গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত পরিচালকসংঘ ইহাদেব কার্য পরিচালনা করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হস্তে কতকগুলি বিশেষ কার্যের ভাব ন্যস্ত আছে। প্রথমত, দেশের মধ্যে কাগজী মুদ্রা চালু কবিবার অধিকাব একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের থাকে। অন্যান্য সকল প্রকারের মুদ্রা সরকারী টাঁকশালায় তৈয়ারী হইলেও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই তাহাদের বাজারে চালু করে। এই ব্যাঙ্কেব দ্বিতীয় কাজ হইতেছে যে, গভর্ণমেণ্টেব ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করা। সরকারের তহবিল সমস্তই এই ব্যাঙ্কে জমা রাখা হয়। সরকারের কোন সময়ে অর্থের প্রয়োজন হইলে এই ব্যাঙ্ক সরকারকে টাকা ধাব দেয়। সবকারী ঋণ সম্বন্ধীয় সমস্ত কাজও এই ব্যাঙ্ককে করিতে হয়—যেমন ঋণেব সুদ দেওয়া ইত্যাদি। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের অন্যান্য ব্যাঙ্কেব ব্যাঙ্কার। এই সমস্ত ব্যাঙ্ক তাহাদের আমানতী অর্থের একটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখে এবং প্রয়োজন মত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে তাহারা টাকা ধার লইতে পারে। সুতবাং বিপদে-আপদে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই তাহাদের একমাত্র বন্ধু ও আশ্রয়। আজকাল অনেক দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে অন্য ব্যাঙ্কগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা দেওযা হইয়াছে। ব্যাঙ্কগুলি কি হাবে সুদ লইবে, কি কি উদ্দেশ্যে টাকা লগ্নী করিতে পারিবে—ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাহাদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ মানিয়া চলিতে হইবে। চতুর্থত, দেশীয মুদ্রার বিনিময়ে নির্দিষ্ট হারে বিদেশী মুদ্রা ক্রয় বা বিক্রয় করাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একটি প্রধান কাজ। নির্দিষ্ট মূল্যে সোনা কেনাবেচা করাও ইহার একটি কাজ।

বিংশ পরিচ্ছেদ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

দেশের লোকের সব প্রয়োজন মিটাইবার মত সামগ্রী কোন দেশেই হয় না। যাহা দেশে হয় না, তাহা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। ইতিহাসের আদি যুগ হইতে আমরা জানি যে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য চলিত। জুলিয়াস সীজারের সময় ঢাকা হইতে রোমে মসলিন রপ্তানী হইত। একটি দেশ অপর দেশের সহিত যে ব্যবসায়-বাণিজ্য করে, তাহাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এক দেশ অপর দেশের সহিত বাণিজ্য করে না, করে একদেশের লোক ভিন্ন দেশের লোকের সঙ্গে।

তুলনামূলক ব্যয়ের নীতি (Law of comparative cost): আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কোন্ নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়? ভারতবর্ষ হইতে পাট, তুলা এবং চা কেন রপ্তানী হয় এবং যন্ত্রপাতি কেন আমদানী হয়? তাহার বিপরীত কেন হয় না? মানুষ নিজের প্রয়োজনের সব জিনিষ উৎপন্ন করিতে পারে না। কাজেই যে জিনিষ উৎপন্ন করিবার সর্বাধিক যোগ্যতা তাহার আছে, সেই জিনিষই সে উৎপন্ন করে এবং অপরের সামগ্রীর সঙ্গে তাহা বিনিময় করে। তেমনি প্রত্যেক দেশেও যে জিনিষ সর্বাপেক্ষা যোগ্যতার সহিত উৎপন্ন করিতে পারে, তাহাই সে দেশে উৎপন্ন হয় এবং বিদেশে তাহা রপ্তানী হয়। যে সামগ্রী উৎপন্ন করিবার যোগ্যতা তাহার কম, তাহা বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়। মাটি এবং আবহাওয়ার গুণে ভারতবর্ষে পাট, চা এবং তুলা খুব কম ব্যয়ে উৎপাদন করা যায়। ইংলণ্ডের মাটিতে এই সব জিনিষ উৎপাদন করিতে গেলে খরচ বেশী পড়ে। আমাদের শিল্পদক্ষতা কম বলিয়া জটিল যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিবার ব্যয় ইংলণ্ডের অপেক্ষা ভারতবর্ষে বেশী পড়ে। ইংলণ্ড শিল্পে অগ্রসর এবং সেখানকার কারিগর নিপুণ বলিয়া যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর ব্যয় সেখানে কম। কাজেই ভারতবর্ষে শস্য এবং ফসল উৎপন্ন হয় এবং ইংলণ্ডে যন্ত্রপাতি তৈয়ারী হয়। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডে ফসল পাঠায়। ইংলণ্ড ভারতবর্ষে যন্ত্রপাতি পাঠায়। ইহাতে উভয়ের লাভ হয়। ইংলণ্ড কম ব্যয়ে

খাদ্যশস্য ও কাঁচা মাল পায় ও ভারতবর্ষও কম ব্যয়ে আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি আমদানী করে। এই নীতিকে তুলনামূলক ব্যয়ের নিয়ম বলা হয়।

বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা (Advantages of foreign trade) : বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান সুবিধা এই যে, বিদেশে উৎপন্ন জিনিষ দেশে বসিয়া উপভোগ করা যায়। নিজেদের প্রয়োজনীয় সব কিছু কোন দেশেই তৈয়ারী হয় না। দেশে যাহা তৈয়ারী হয় না, তাহা বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে বিদেশ হইতে আনা হয়। ভারতবর্ষে রূপা ও টিনের খনি নাই, এবং পেট্রোলও ভারতবর্ষে কম হয়। ইংলণ্ডে পাট, চা হয় না। দেশে নিজের যাহা নাই, তাহা অন্যদেশ হইতে আনিতে পারা যায়। দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্বারা সর্বনিম্ন দামে সামগ্রী ক্রয় করিতে পারা যায়। ভারতবর্ষে রং তৈয়ারী হইতে কোন বাধা নাই। কিন্তু রং তৈয়ারী করিতে গেলে ব্যয় জার্মানী অপেক্ষা অনেক বেশী পড়িবে। জার্মানীর নিকট হইতে রং কিনিলে ভারতবর্ষকে কম দামই দিতে হয়। ক্রেতা হিসাবে দেশের সকলেরই তাহাতে লাভ হয় এবং সকলেরই জীবিকানির্বাহের মান উন্নত হয়।

দুইটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য আরম্ভ হইলে প্রত্যেক দেশেই এমন জিনিষ তৈয়ারী হয়, যাহা তৈয়ারী করিবার দক্ষতা সেই দেশের সর্বাধিক। অন্য দেশের তুলনায় দক্ষতা বেশী যাহাতে হইবে সেই জিনিষই দেশে তৈয়ারী হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তির মত প্রত্যেক দেশও নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী দ্রব্য উৎপন্ন করিবে। শ্রমবিভাগের যে সকল লাভ হয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতেও তাহা পাওয়া যায়।

আর্থিক সুবিধা ছাড়া অন্য সুবিধাও ইহাতে আছে। আমদানী ও রপ্তানীর ফলে একটি দেশ অপর দেশের মুখাপেক্ষী হয়। ইহাতে শান্তি এবং আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়। সামগ্রী বিনিময়ের ফলে ভাববিনিময়ও সহজ হয়। অতএব আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দ্বারা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথ প্রশস্ত হয়।

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য অপর দেশের উপর নির্ভরশীল হইলে শান্তি বজায় থাকে ইহা সত্য, কিন্তু তাহাতে একটি ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে। যুদ্ধ বাধিলে বিদেশ হইতে জিনিষ আমদানী বন্ধ হইতে পারে। গত যুদ্ধে ভারতীয়দের কত কষ্ট গিয়াছে, তাহা সকলেরই স্মরণ আছে। প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানী করা সম্ভব হয় নাই। পরমুখাপেক্ষী হওয়া সব সময় ভাল নয়।

বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত এবং হিসাব উদ্বৃত্ত (Balance of trade and Balance of accounts) : যে সমস্ত সামগ্রী বিদেশে পাঠান হয় তাহাকে রপ্তানী এবং যাহা বিদেশ হইতে আনীত হয় তাহাকে আমদানী বলে। রপ্তানী দ্রব্যের মোট মূল্য হইতে মোট আমদানী দ্রব্যের মূল্য বাদ দিয়া যাহা থাকে, তাহাকে বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত (Balance of trade) বলে। মোট রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য হইতে আমদানীর মূল্য কম হইলে তাহাকে অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত (Favourable balance of trade) বলে। ভারতবর্ষ হইতে যদি বৎসরে ৮০ কোটি টাকার মাল রপ্তানী করা হয় এবং ৬০ কোটি টাকার জিনিষ আমদানী করা হয়, তাহা হইলে বিদেশ হইতে ২০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে। বিদেশীরা ভারতবর্ষে যাহা বিক্রয় করিয়াছে তদপেক্ষা অধিক মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করিয়াছে। কাজেই উপরোক্ত ২০ কোটি টাকার সোনা বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রেরিত হইবে। এই কারণেই আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী বেশী হওয়াটা অনুকূল বলিয়া ধরা হইত। আবার আমদানীর পরিমাণ রপ্তানী অপেক্ষা বেশী হইলে তাহাকে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত বলা হয়।

দুইটি দেশের মধ্যে যে সমস্ত জিনিষ আমদানী ও রপ্তানী হয় তাহার তালিকাকে অন্তর্বাণিজ্যের প্রত্যক্ষতালিকা (Visible items of trade) বলে। কিন্তু দুইটি দেশের মধ্যে জিনিষপত্র বেচাকেনা ছাড়াও অন্যান্য বাবদ দেনা-পাওনা থাকে। বিদেশী জাহাজে মাল পাঠাইলে জাহাজের মালিকদের মাল লইবার খরচ বাবদ অর্থ দিতে হয়। কিংবা বিদেশীরা আমাদের দেশের জাহাজ ব্যবহার করিলে আমরা তাহাদের নিকট অর্থ পাইব। সেই রকম বিদেশী ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী আমাদের দেশে কাজ করিলে তাহারা আমাদের নিকট এই বাবদ অর্থ পাইবে। বিদেশীর নিকট আমরা যদি পূর্বে টাকা ধার লইয়া থাকি, তবে প্রত্যেক বৎসর সুদ ও আসল বাবদ বিদেশে কিছু অর্থ পাঠাইতে হইবে। আবার বিদেশীরা আমাদের দেশে দেনা করিলে সুদ ও আসল বাবদ আমাদের পাওনা দিবে। জিনিষপত্র কেনা-বেচা ব্যতীত এই সমস্ত কারণে দুইটি দেশের মধ্যে যে দেনাপাওনার হিসাব রাখা হয় তাহাকে অপ্রত্যক্ষ তালিকা (Invisible items of trade), বলা হয়।

কাজেই এক দেশ হইতে অপর দেশে নানা কারণে টাকা দিতে হয়, কিংবা

পাওনা হয়। এই সমস্ত দেনাপাওনার হিসাবকে হিসাবের উদ্বৃত্ত (Balance of accounts) বলা হয়।

আমদানী রপ্তানীর সমতা (Exports pay for imports) : অনেকে বলেন যে, সব দেশেরই রপ্তানী-আমদানী পরিমাণ সমান হয়। কিন্তু ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে যে রপ্তানীর পরিমাণ আমদানী অপেক্ষা বেশী হইতে পারে। তাহা হইলে এই দুইটি উক্তির সামঞ্জস্য কি ভাবে হইতে পারে? রপ্তানী-আমদানী সমান হয় বলিলে একথা বোঝায় না যে, মোট রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য সব সময়েই আমদানী দ্রব্যের মূল্যের সমান হইবে। আমরা কেবল জিনিষপত্র আমদানী-রপ্তানী করি না। বিদেশ হইতে কেবল মাল বেচিয়া আমরা টাকা পাই না, আরও অনেক খাতে টাকা পাওয়া যায়, কিংবা দিতে হয়। আমাদের বিদেশে মোট দেয় ও বিদেশ হইতে মোট প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ সমান হইবে। শুধু কেবল সামগ্রী রপ্তানি-আমদানীর বেলায় হয়ত কিছু উদ্বৃত্ত থাকিতে পারে, আবার নাও থাকিতে পারে। কিন্তু সমস্ত দেনাপাওনার হিসাবের কিছুই উদ্বৃত্ত থাকিতে পারে না। অর্থাৎ একটি দেশ রপ্তানী দ্রব্য এবং আরও অন্যান্য বাবদ যে টাকা পাইবে, তাহা এই সমস্ত খাতে দেয় টাকার পবিমাণের সমান হইবে। রপ্তানী দ্রব্য যদি আমদানী অপেক্ষা বেশী অথবা কম হয়, তবে অন্য খাতে দেনাপাওনা দিয়া তাহা পূরণ হয়।

অবাধ বাণিজ্য (Free trade) **অথবা সংরক্ষণ?** বিদেশ হইতে মাল আমদানীর উপরে কোনও বাধা আরোপিত না হইলে তাহাকে অবাধ বাণিজ্য (Free trade) বলে। এই ব্যবস্থায় বিদেশী দ্রব্যের উপরে সাধারণত আমদানী শুল্ক ধার্য করা হয় না। যদি বা এই শুল্ক ধার্য করা হয়, তবে তাহা খুবই কম হারে বসান হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের যত কিছু সুবিধা আছে, তাহা একমাত্র অবাধ বাণিজ্যে পাওয়া যায়। অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রচলিত থাকিলে প্রত্যেক দেশে শুধু সেই জিনিষটিই উৎপন্ন হইবে, যাহা সেই দেশে সর্বাধিক দক্ষতার সহিত উৎপন্ন হইতে পারে। তাহা হইলে শ্রমবিভাগ নীতির ব্যাপকতম প্রয়োগ হইবে এবং প্রত্যেক দেশেই সর্বাধিক উৎপাদন হইবে।

সংরক্ষণ (Protection) : বিদেশীর প্রতিযোগিতা হইতে দেশের শিল্পকে রক্ষা করাকে সংরক্ষণ বলে। দেশের শিল্পকে দুইভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

বিদেশী দ্রব্যের উপরে খুব উচ্চহারে আমদানী শুল্ক ধার্য করা যাইতে পারে। কিংবা দেশীয় শিল্পের মালিকদের সরকার আর্থিক সাহায্য করিতে পারে। দেশের শিল্পকে সংরক্ষিত করিবার যুক্তি এই যে, দেশীয় শিল্পের উৎপাদনের ব্যয় অধিক হওয়াতে দেশী জিনিষ বিদেশী দ্রব্যের মত কম দামে বিক্রয় করা সম্ভব নহে। বিদেশী দ্রব্যের উপর উচ্চ হারে শুল্ক বসাইলে তাহার দাম বাড়িবে। তখন বিদেশী দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় দেশী জিনিষ বিক্রয় করা যাইবে। ধরা যাউক যে, যাভার চিনি ভারতবর্ষে ৪৲ মণ হিসাবে বিক্রয় হয়। ভারতের চিনির উৎপাদকেরা ৭৲ মণের নীচে চিনি বিক্রয় করিতে পারে না, কারণ তাহাদের উৎপাদনের ব্যয় বেশী। চিনির উপরে জাভার সরকার ৪৲ হারে শুল্ক ধার্য করিলে জাভার চিনির ব্যবসায়ীরা ৮৲ টাকার নীচে চিনি বিক্রয় করিতে পারিবে না। তাহা হইলে ভারতীয় চিনি দামে অপেক্ষাকৃত সস্তা হইবে। দ্বিতীয়ত, সরকার আর্থিক সাহায্য করিলেও দেশীয় শিল্পের মালিক কম মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে এবং বিদেশী দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে।

সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি: সংরক্ষণ-নীতির পক্ষে নানা যুক্তি দেখানো হয়। সর্বাপেক্ষা পরিচিত যুক্তিটি আমেরিকার একজন লেখক বহুদিন পূর্বে উপস্থিত করিয়াছেন: "বিদেশ হইতে দ্রব্য আমদানী করিলে আমরা দ্রব্যটি পাই বটে, কিন্তু বিদেশীরা পায় টাকা। দেশের জিনিস কিনিলে, দেশের টাকা দেশেই থাকিয়া যায়।" স্বদেশীপ্রীতি অনেক সময়ে সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি হিসাবে দেখানো হইয়াছে। কিন্তু সে যুক্তি সব সময়ে সমর্থনযোগ্য নহে। বিদেশী দ্রব্য সস্তা বলিয়া আমরা তাহা কিনি। শুল্ক বসাইয়া দেশী দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করিলে ক্রেতা হিসাবে আমাদের ক্ষতি হয়। অন্যান্য গুরুতর কারণে আমরা হয়ত এই ক্ষতি স্বীকার করিতে পারি, কিন্তু তাহা পরিষ্কারভাবে জনসাধারণকে বুঝাইতে হইবে।

আরও একটি কারণে সংরক্ষণ-নীতি সমর্থিত হইয়াছে। যুক্তিটি নিম্নরূপ। আমেরিকার জীবনধারণের মান খুব উচ্চ এবং সেইজন্য আমেরিকার শ্রমিকদের উচ্চ মজুরী দিতে হয়। কাজেই আমেরিকাতে উৎপাদনের ব্যয় বেশী হইবে। কিন্তু জাপানে মজুরীর হার কম বলিয়া উৎপাদনের ব্যয়ও জাপানে কম। কাজেই জাপানের বিরুদ্ধে আমেরিকার শিল্পকে সংরক্ষিত করা উচিত। তাহা না হইলে

আমেরিকার মজুরেরা তাহাদের জীবিকানির্বাহের মান বজায় রাখিতে পারিবে না। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, যুক্তিটিতে অনেক ফাঁকি আছে। মজুরী বেশী দিলেই উৎপাদনের ব্যয় বেশী হয় না। মজুরেরা দক্ষ হইলে উৎপাদন বেশী হইবে। তাহা হইলে মজুরী বেশী হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদনের ব্যয় কম হইবে। ধরা যাউক, একজন কাটুনীকে দিনে আট আনা মজুরী দেওয়া হয় ও সে দিনে হাজার গজ সূতা কাটে। আর একজন মজুরকে দিনে বারো আনা দেওয়া হয়, কিন্তু সে দিনে ২,০০০ হাজার গজ সূতা কাটে। দ্বিতীয় কাটুনীকে যদিও মজুরী বেশী দিতে হইতেছে, তথাপি উৎপাদনের ব্যয় দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ছয় আনা এবং প্রথম ক্ষেত্রে আট আনা পড়ে। কাজেই মজুরী কম হইলেই উৎপাদনের ব্যয় কম হয় না। মজুরী অল্প দিলেও উপাদনের ব্যয় সাধারণত বেশী হয়। ভারতবর্ষে মজুরীর হার আমেরিকা হইতে অনেক কম, কিন্তু তবুও ভারতের শিল্পপতিরা ব্রিটিশ ও আমেরিকার শিল্পপতিদের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে না। সবই শ্রমিকের দক্ষতার উপর নিভর করে।

সংরক্ষণনীতির পক্ষে আর একটি যুক্তি এই যে, দেশে বহু লোক বেকার থাকিলে সংরক্ষণনীতি গ্রহণ করাই উচিত। সংরক্ষণ বেকারসংখ্যা কমায়। দেশীয় শিল্প সংরক্ষিত হইলে তাহার প্রসার হইবে। তাহা হইলে অনেক লোক এই শিল্পে কাজ পাইবে। ১৯৩১ সালে চিনির মিলগুলিকে সংরক্ষিত করিবার ফলে বিহার এবং উত্তর প্রদেশে বহু চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে এবং বহু লোকে এই সমস্ত কলে কাজ পাইতেছে। অবাধ বাণিজ্যের সমর্থগণ তাহাতে এই যুক্তি দেখাইয়াছে যে, উচ্চ শুল্ক বিদেশী জিনিষের আমদানী বন্ধ করে। বহিবাণিজ্যের হিসাবের আর সব খাতে আয়ব্যয় সমান থাকিলে, আমদানী কমিলে রপ্তানীও কমিবে। দেশের আমদানী দেশের রপ্তানীর সমান হয়। আমদানী করিয়া রপ্তানী দ্বারাই তাহার দাম দিয়া থাকি। কাজেই আমদানী কমিলে রপ্তানীও কমিবে। আমদানী কমাইয়া দিলে রপ্তানীবাণিজ্যের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। রপ্তানী জিনিষ বিক্রয় না হইলেই সেই শিল্পগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকেরা বেকার হইয়া পড়িবে। তাহা হইলে সংরক্ষণের ফলে এক দিক দিয়া যেমন দেশীয় শিল্পে শ্রমিকের নিয়োগ বৃদ্ধি পায়, তেমনি আবার রপ্তানীর পরিমাণ কমিয়া যাওয়াতে সেই সমস্ত শিল্পে শ্রমিকেরা বেকার হয়।

সংরক্ষণনীতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় যুক্তির নাম "শিশু-শিল্প" যুক্তি (Infant industry argument)। একটি শিল্প গড়িয়া তুলিবার সর্ব প্রকার সুবিধা দেশে থাকিতে পারে। কিন্তু শক্তিমান বৈদেশিকের প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে ঐ শিল্পটি দাঁড়াইতে পারিতেছে না। শিশু এবং বয়স্কের মধ্যে প্রতিযোগিতায় শিশুর পরাজয় নিশ্চিত। শিশুকে পরিণত বয়স পর্যন্ত লালন-পালন করিতে হয়। শিশুসন্তানকে পিতামাতা পালন করেন। তাহা না করিলে শিশু বাঁচিতে পারে না। শিশুকালে যত্ন লওয়া হইলে পরে অনেক শিশু হয়ত খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করিতে পারে। ঠিক একই যুক্তিতে বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিয়া শিশু-শিল্পকে বিকাশের সুযোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু এই যুক্তি অনুসারে একটি শিল্পকে পূর্ণবয়স্ক হওয়া পর্যন্তই সংরক্ষণ করা যাইতে পারে। একজন ভারতীয় ব্যবসায়ী বলিয়াছে, "শিশুকে লালন কর, কিশোরকে রক্ষা কর এবং বয়স্ককে ছাড়িয়া দাও।"

সংরক্ষণের পক্ষে আরও একটি যুক্তি আছে। আধুনিক জগতে প্রত্যেক দেশই স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে চাহে। দেশরক্ষার জন্যই তাহা প্রয়োজন। অপরিহার্য দ্রব্যের জন্য বিদেশের দিকে চাহিয়া থাকিলে যুদ্ধের সময়ে আমাদের খুবই অসুবিধা হয়। যুদ্ধ বাধিলে সেই জিনিষগুলি আর পাওয়া যায় না। জাতীয় জীবনের পূর্ণ বিকাশের জন্য নানাপ্রকার শিল্প দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

সংরক্ষণ-নীতির বিপদ (Dangers of Protection) : কিন্তু সংরক্ষণ-নীতির ফলে জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পায়। বিদেশী দ্রব্যের উপর উচ্চ শুল্ক ধার্য করিলে তাহার দাম বাড়িয়া যায়। দাম বাড়িলে, প্রত্যেকেরই কষ্ট হয়। সংরক্ষণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা দৃঢ় যুক্তি "শিশু-শিল্পের" যুক্তি। কিন্তু এই যুক্তি চিরকালের জন্য কোন শিল্পকে সংরক্ষণ করা সমর্থন করে না। যেসব শিল্পের বিকাশের সত্য সত্যই সম্ভাবনা আছে, তাহা বাছিয়া বাহির করা কঠিন। তাহা ছাড়া সংরক্ষণনীতি একেবার অবলম্বন করা হইলে তাহা স্থায়ী হইয়া দাঁড়ায়। শিশুটি বয়প্রাপ্ত হইলেও অধিক সংরক্ষণের জন্য আন্দোলন করে। তাহার ফলে ক্রেতাদের চিরদিনই বেশী দামে জিনিষ কিনতে হয় এবং তাহাদের কষ্ট হয়।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বণ্টন এবং জাতীয় আয়

উৎপাদনের চারিটি উপাদানের মধ্যে কি ভাবে জাতীয় আয় বণ্টন করা হইবে, তাহাই বণ্টনতত্ত্বের (Distribution) অন্তর্ভুক্ত। প্রতি বৎসর দেশে বহু দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে। জমি, মূলধন প্রভৃতি চারিটি উপাদানের সহযোগে তাহা উৎপন্ন হয়। ইহাই আবার উক্ত চারিটি উপাদানের মধ্যে ভাগ হয় এবং দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির আয় ইহার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। এই কারণে ধনবিজ্ঞানের এই বিভাগটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পূর্বে উৎপাদনব্যবস্থা যখন সরল ছিল, বণ্টনসমস্যাও তখন এত জটিল হইয়া উঠে নাই। শ্রমবিভাগ তখন সামান্যই ছিল, প্রত্যেকে নিজের উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রীত মূল্য গ্রহণ করিত। গ্রামের মুচি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত জুতা তৈয়ারীর কাজ করিত এবং জুতার মূল্যের ভাগ কাহাকেও দিতে হইত না। কাজেই বণ্টনসমস্যা সহজ ছিল। সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমবিভাগ জটিল হইয়া উঠিয়াছে। জুতার মত জিনিষ এখন কেহ একা তৈয়ারী করে না। বহু লোকের সহযোগের ফলে জুতা তৈয়ারী হয়। বহু লোকের মধ্যে এই জুতার মূল্য ভাগ করিয়া দেওয়া এই কারণেই জটিল হইয়া পড়িয়াছে।

বণ্টনতত্ত্বের সহিত বহু গুরুতর সমস্যা জড়িত। আমরা তাহার তিনটি মাত্র আলোচনা করিব। কি বণ্টন করা হইবে? কাহাদের মধ্যে বণ্টন করা হইবে? কোন্ নীতি অনুযায়ী বণ্টন করা হইবে?

জাতীয় আয় (National Dividend): প্রথম সমস্যা দেশের জাতীয় আয় নিরূপণ করা। দেশে যত দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং কর্ম (services) সাধিত হয়, তাহার সমষ্টিই জাতীয় আয়। সারা বৎসরে দেশের লোক অসংখ্য দ্রব্য উৎপন্ন করিতেছে। ইহা হইতে মূলধনের ক্ষয়পূরণের জন্য কিছু অংশ বাদ দিতে হইবে। কারণ উৎপাদনে ব্যবহারের ফলে মূলধন ক্ষয় হয় এবং অনেক সময়ে একেবারেই শেষ হইয়া যায়। সুতরাং এই বাবদ মোট জাতীয় আয় হইতে কিছু অংশ আলাদা সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয়। বাকি অংশকে

দেশের জাতীয় আয় (National Income) বলা হয়। জাতীয় আয় নিম্নলিখিত ভাবে নিরুপিত হয়।

একটি বস্ত্রশিল্পের আয় বিশ্লেষণ করা যাউক। একটি জমিতে কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। কারখানায় যন্ত্রপাতি বসানো হইয়াছে। শ্রমিক এবং অন্যান্য কর্মী সেই কারখানায় কাজ করে। বস্ত্র তৈয়ারী হইবে বলিয়া কারখানার মালিককে তুলা কিনিতে হইবে। সব জিনিষ ভালভাবে একত্র করিয়া কল চালু করা হইল। বছরের শেষে কিছু কাপড় তৈয়ারী হইল। ইহাই কারখানার মোট উৎপাদন। এই উৎপন্ন বস্ত্রের মূল্য হইতে তাহাকে কিছু অর্থ আলাদা করিয়া রাখিতে হইবে। কারণ মূলধনের ক্ষয় হয়। যন্ত্রপাতি সর্বদা ব্যবহারে ক্ষয় হয়। পুরাতন অথবা অকেজো হইয়া পড়িলে যন্ত্রপাতি বদলাইতে হইবে। কাজেই বুদ্ধিমান মালিক পূর্ব হইতেই ইহার ব্যবস্থা করিয়া রাখে। প্রত্যেক বৎসর মোট উৎপাদনের একটি অংশ বা অংশের মূল্য সে আলাদা করিয়া সঞ্চয় করে। তাহা হইলে যন্ত্রপাতি বদলাইবার সময় আসিলে তাহার কোন অসুবিধাই হইবে না। কারণ ইতিমধ্যে যন্ত্রপাতির দাম জমা হইয়া যাইবে। বাকি দ্রব্য সমষ্টি তাহার নীট উৎপাদনের পরিমাণ। ইহা হইতে সে খাজনা দিবে, শ্রমিকের মজুরী এবং মূলধনের সুদ দিবে। বাকি যাহা থাকে তাহাই তাহার লাভ।

চাষীর কথা বিবেচনা করা যাউক। লাঙ্গল এবং গরুর সাহায্যে চাষী এক খণ্ড জমি চাষ করে। কিছু দিন পরে সে কিছু ফসল ঘরে তোলে। ইহা হইতে সে একটি অংশ বীজের জন্য রাখিয়া দিবে। বাকি ফসল হইতে জমিদারের খাজনা, ধারের সুদ এবং মজুর লাগাইয়া থাকিলে তাহার মজুরী দিতে হইবে। অবশিষ্ট অংশ তাহার লাভ।

উপরের দুইটি দৃষ্টান্ত হইতে জাতীয় আয় কিভাবে নির্দিষ্ট হয়, তাহা বুঝা গেল। ভূমি, শ্রমিক ও মূলধন বিশেষভাবে সংহত হইয়া কিছু পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদন করে। প্রত্যেক বৎসরেই দেশে কৃষি এবং শিল্পসামগ্রী উৎপন্ন হয়। ইহাই সেই বৎসরের মোট জাতীয় আয়। কারখানার মালিক বা চাষীর মত এই আয় হইতে একটা অংশ মূলধনের ক্ষয়পূরণের জন্য আলাদা করিয়া রাখিতে হইবে। বীজ প্রভৃতির মত কাঁচা মাল পূর্তি করিতে হইবে। সর্বদা ব্যবহারে যন্ত্রপাতি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিছুদিন পরে তাহা বদলাইতে হইবে।

তাহার ব্যবস্থা পূর্ব হইতে করিয়া রাখিতে হয়। মোট জাতীয় আয় হইতে এই বাবদ কিছু বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই নীট জাতীয় আয়।

কাহাদের মধ্যে বণ্টন করা হইবে? উৎপাদনের চারিটি উপাদান এক সঙ্গে কাজ করিয়া জাতীয় আয়ের সৃষ্টি করে। আবার সকলের আয়ের উৎসও ইহাই। উৎপাদনের চারিটি উপাদানের মধ্যে জাতীয় আয় ভাগ হয়; জমির মালিক খাজনা পায়; মূলধনের মালিক সুদ পায়; শ্রমিক পায় মজুরী; এবং উদ্যোক্তা (Entrepreneur) লাভের অধিকারী হয়। এই বিভাগে আমরা খাজনা, সুদ, মজুরী এবং লাভ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকি।

এই ভাগকে কর্মগত (Functional) বণ্টন বলা হয়। উৎপাদনের উপাদানগুলির মধ্যে জাতীয় ভাগ করিবার নীতি আমরা আলোচনা করি। শ্রমিক, পুঁজিপতি, ভূস্বামী এবং উদ্যোক্তার আয় কিরূপে নির্দিষ্ট হয়, তাহা এই বিভাগের আলোচ্য। প্রায় প্রত্যেক লোকই বিভিন্ন রকমের কাজ করিয়া আয় করে। কাহারও জমি থাকিলে তাহা হইতে সে খাজনা পায়। সরকারী ঋণপত্র বা কোম্পানীর কাগজে সঞ্চিত পুঁজি নিয়োগ করিলে সে তাহার সুদ পায়। অফিসে কাজ করিয়া সে বেতন পায়। অন্য লোকে হয়ত জমি হইতে এবং শ্রমিক হিসাবে আয় করে।

বণ্টনের নীতি (Principles of distribution): এই সমস্যাই অত্যন্ত গুরুতর। জাতীয় আয় কি ভাবে উৎপাদনের উপাদানগুলির মধ্যে বণ্টন করা হয়? প্রত্যেক উপাদানের আয় নির্দিষ্ট করিবার নীতি কি হইবে?

সমস্যাটি আর এক ভাবে বিবৃত করা যাইতে পারে। উৎপাদনের চারিটি উপাদানের প্রত্যেকের কাজের মূল্য কি ভাবে নির্ধারিত হইবে? প্রত্যেকেই উৎপাদনের কার্যে কিছু কিছু সাহায্য করিতেছে। তাহাদের পারিশ্রমিক এই কাজের মূল্যের উপরে নির্ভর করিবে।

সবক্ষেত্রে মূল্য যে ভাবে নিরূপিত হয়, এখানেও সেইরূপ চাহিদা এবং যোগানের উপরেই নির্ভর করে। পূর্বে মূল্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই কিছু পরিবর্তিত করিয়া এখানেও বলা যাইবে। মজুরী বা শ্রমিকের পারিশ্রমিক চাহিদা এবং যোগানের উপরেই নির্ভর করিবে। ব্যবসায়ের অবস্থা যদি ভাল হয়, যদি কলকারখানার মালিকেরা তাহাদের ব্যবসায় বাড়াইতে চায়, তাহা হইলে শ্রমিকের চাহিদা বাড়িবে এবং মজুরীও বাড়িবে। কিন্তু মজুরের সংখ্যা যদি

বাড়ে, তাহা হইলে মজুরী কমিবার সম্ভাবনা। প্রত্যেক শ্রমিক ঠিক মজুরীর সমান মূল্যের দ্রব্য উৎপাদন যতক্ষণ করিতে পারিবে, ততক্ষণই নূতন মজুর নিযুক্ত হইবে। নিযুক্ত হইলে প্রত্যেক শ্রমিক কিছু কিছু জিনিষ উৎপাদন করে। এই উৎপন্ন জিনিষ হইতে আর সব খরচ বাদ দিলে যাহা থাকিবে, তাহা যদি মজুরী অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে মালিক আরও মজুর লইবে। কারণ তাহাতে মালিকের লাভ হইবে। কিন্তু বেশী মজুর নিযুক্ত করিলে মজুরের প্রান্তিক উৎপাদন কমিয়া যায়। এই ভাবে প্রত্যেক মজুরের প্রান্তিক উৎপাদন (Marginal product) যতক্ষণ মজুরীব সমান না হয়, ততক্ষণ নূতন নূতন মজুর নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা। যতই শ্রমিক নিযুক্ত হয় ততই মজুরের প্রান্তিক উৎপাদন কমিয়া যায় ও অবশেষে তাহা মজুরীর সমান হয়। উৎপাদনের প্রত্যেক উপাদানের মূল্য এই ভাবে নিরূপিত হয়।

সুদের বেলাতেও একই নিয়ম খাটে। মূলধনের চাহিদা এবং যোগান দ্বারাই সুদের হার নির্দিষ্ট হয়। যদি সঞ্চয় বেশী হয় এবং মূলধনের যোগান বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে সুদের হার কমিবে। এই ভাবে উৎপাদনের প্রত্যেক উপাদানের পারিশ্রমিক, চাহিদা এবং যোগান দ্বারাই নির্দিষ্ট হয়।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

খাজনা

সাধারণত লোকে খাজনা বলিতে জমিদারকে বা বাড়ীর মালিককে দেয় টাকা বুঝে। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে কথাটি ঠিক এই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা হইতে যে আয় হয়, তাহাকেই খাজনা বলে। মনে করা যাউক যে, একজন মাসিক ১০০৲ টাকা ভাড়ায় একটি বাড়ী ভাড়া লইল। এই একশত টাকা হইতে বাড়ী তৈয়ারীর জন্য বাড়ীওয়ালা যে টাকা লাগাইয়াছিল তাহার সুদ ৮০৲ টাকা ধরা যাউক। তাহা হইলে বাড়ীওয়ালার জমি হইতে কুড়ি টাকা আয় হইল। ইহাকে জমির খাজনা বলে। খাজনা প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার হইতে পাওয়া যায়। রিকার্ডো বলেন, "জমিতে উৎপন্নদ্রব্যের যে অংশ জমির আদি এবং অবিনশ্বর গুণের জন্য জমির মালিককে দিতে হয় তাহাই খাজনা। সাধারণত খাজনা বলিতে যাহা বুঝায় ইহা তাহা হইতে স্বতন্ত্র। সাধারণ লোকে খাজনা বলিতে যাহা বুঝে, তাহাতে খাঁটি খাজনা ছাড়াও আরও কয়েকটি বিষয় ধরা হয়। জমির মালিক জমির উন্নতির জন্য অথবা বাড়ী তৈয়ারী করিতে যাহা ব্যয় করিয়াছে, তাহার সুদ এবং লাভ ইহাতে ধরা হয়। মোট দেয় খাজনা হইতে জমিতে নিযুক্ত মূলধনের সুদ এবং লাভ বাদ দিলেই খাঁটি খাজনার পরিমাণ পাওয়া যাইবে।

খাজনা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে দুইটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে হইবে। প্রথমত, কেন খাজনা দেওয়া হয়? দ্বিতীয়ত, খাজনার পরিমাণ নির্দিষ্ট হইবে কি প্রকারে? প্রথম প্রশ্নটির উত্তর সহজ। চেয়ার তৈয়ারী করিয়া ছুতার কেন টাকা চায়, তাহা আমরা জানি। ছুতারকে কাঠ এবং অন্যান্য জিনিষপত্র কিনিতে এবং শ্রমিকদের মজুরী দিতে হইয়াছে। কাজেই তাহাদের খরচ পোষাইয়া দিতে হইবে। তাহা না হইলে ছুতার চেয়ার তৈয়ারী করিবে না। কিন্তু ভূমি উৎপন্ন বা তৈয়ারী হয় না। ইহা প্রকৃতির দান। জমিদারের জমি তৈয়ারী করিতে কোনও খরচ হয় না। তবে কেন জমি ব্যবহারের জন্য সে খাজনা দাবী করে? তাহার প্রধান কারণ জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। সব জমি সমান উর্বর বা সমান চাষযোগ্য নহে। শহরের যে দিকে ব্যবসায়-বাণিজ্যের

কেন্দ্র, সেখানকার বা আবাস-নির্মাণের উপযোগী জমি নিতান্তই সীমাবদ্ধ। কিন্তু ঐ জমির চাহিদা খুব বেশী। সেইজন্যই এই সমস্ত জমির মালিক প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিতে পারে।

খাজনা দিবার আর একটি কারণ আছে। জমি হ্রাসমান আয়ের নিয়মাধীন। চাষী একখণ্ড জমি অধিক পরিশ্রমের সহিত চাষ করিলে মোট উৎপন্ন-বৃদ্ধির হার ক্রমশই হ্রাস পায়। অর্থাৎ ফসল উৎপাদনের ব্যয় বাড়িতে থাকে। কাজেই একই জমি অধিকতব চাষ না করিয়া অন্য জমি চাষ কবা কৃষকের পক্ষে লাভজনক হয়। ফসল বাড়াইবার প্রয়োজন হইলেই নূতন জমির চাহিদা হয়। কিন্তু জমির পরিমাণ বাড়ানো যায় না। কাজেই জমিদার প্রজার নিকট হইতে বেশী খাজনা আদায় করিতে পারে।

খাজনা কি ভাবে নির্দিষ্ট হয়? ডেভিড রিকার্ডো নামে বিখ্যাত ধন-বৈজ্ঞানিক খাজনা-নিরূপণের পদ্ধতি লইয়া বহুদিন পূর্বে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে জমির আদিম এবং অবিনশ্বর গুণের জন্য খাজনা দিতে হয়। একখণ্ড জমি হয়ত অপর জমি অপেক্ষা উর্বর। তাহাতে ফসল ভাল হয় এবং এই ফসলেবই একাংশ জমিদারকে দিতে হয়। জমির উর্বরতার জন্যই যে অধিক ফসল পাওয়া যায় তাহার এক অংশ জমির মালিককে খাজনা দিতে হইতেছে।

জমি হইতে কি ভাবে খাজনার উৎপত্তি হয়, তাহা একটি দৃষ্টান্ত দিলে বুঝা যাইবে। মনে কর, মহাসমুদ্রে একটি দ্বীপ আবিষ্কৃত হইল, সেখানে কোন মানুষ নাই। কয়েকজন ভাবতায় চাষী সেখানে গিয়া বাস করিতে শুরু করিল। তখনও জমিব কেহ মালিক নাই। যে যতটা পারে জমি লইয়া ধান চাষ করিতে লাগিল। ইচ্ছামত জমি পাওয়া গেলে চাষীরা সর্বোৎকৃষ্ট জমিই প্রথমে চাষ করিবে। ক্রমে ক্রমে ভাল জমি সব চাষ হইয়া যাইবে এবং সেই ধানে সেখানকার লোকদের প্রয়োজন মিটিবে। এরূপ অবস্থায় কেহ খাজনা দিবে না।

কিন্তু কালক্রমে দ্বীপের জনসংখ্যা বাড়িবে। তখন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে নূতন নূতন জমি চাষ করিতে হইবে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর জমিগুলিতে ইতিপূর্বেই চাষ হইয়া গিয়াছে। কাজেই তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ ছাড়া গত্যন্তর নাই। এই জমিগুলির উর্বরতা কম, সুতরাং ফসলও তাহাতে কম হইবে। ধরা যাউক যে, প্রথম শ্রেণীর

এক বিঘা জমিতে ১৫ মণ ধান হয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে মাত্র ১০ মণ ধান হয়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই চাষের ব্যয় একই রকম পড়ে। কারণ, উভয় জমিতে একই ধরণের লাঙ্গলে চাষ করা হয়, একই বীজ বপন করা হয় এবং সমান পরিশ্রম করা হয়। প্রত্যেক বিঘা চাষ করিবার খরচ ত্রিশ টাকা ধরা যাউক। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে ত্রিশ টাকা ব্যয় করিয়া দশ মণ ধান পাওয়া যায় বলিয়া ধান-উৎপাদনের ব্যয় মণ প্রতি তিন টাকা হইবে। বাজারে ধানের দাম অন্তত তিন টাকা হইবে, কারণ তাহা না হইলে কেহ দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করিবে না। বাজার দর ৩৲ টাকা হইলে ১ম শ্রেণীর জমির চাষী তিন টাকা দামে পনের মণ ধান বিক্রয় করিয়া পঁয়তাল্লিশ টাকা পাইবে, কিন্তু তাহার খরচ হয় মাত্র ত্রিশ টাকা। তাহা হইলে প্রথম শ্রেণীর জমির চাষী ফসল বেচিয়া খরচ বাদে পনের টাকা বেশী আয় করিতেছে। এই উদ্বৃত্তকে খাজনা বলে। দ্বিতীয় জমিতে চাষ করিয়া সব খরচ বাদে কিছুই উদ্বৃত্ত থাকে না। সেখানে খরচ পড়ে ত্রিশ টাকা এবং ধান বেচিয়া ত্রিশ টাকাই আয় হয়। খরচের মধ্যে চাষীর লাভ ধরা হইয়াছে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে চাষের ব্যয় ঠিক উৎপন্ন ফসলের সমান। ইহাকে প্রান্তিক (Marginal) জমি বলে। যে জমি চাষ করিয়া ও ফসল বিক্রয় করিয়া চাষী তাহার খরচটাই কেবল উঠাইতে পারে, তাহাকে প্রান্তিক জমি বলে। প্রান্তিক জমিতে যে ফসল উৎপন্ন হয় এবং ভাল জমিতে যাহা উৎপন্ন হয়, এই দুইয়ের পার্থক্য ভাল জমির খাজনা। ভাল জমির খাজনা বেশী হয়। তাহার কারণ এই যে, অধিক উর্বরতার জন্য ঐ জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বেশী হয়।

চাষীরা নিজেরা যদি ভাল জমির মালিক হয়, তাহা হইলে এই খাজনা আর কাহাকেও দিতে হয় না। কিন্তু অন্য লোকে জমিদার হইলে প্রতিযোগিতায় বাধ্য হইয়া চাষীকে এই পরিমাণ খাজনা জমিদারকে দিতে হয়।

জিনিষের মূল্য উহার উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। সুতরাং ফসলের মূল্য উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবে। ধানের দাম যখন তিন টাকা মণ, তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ হইবে। তাহা হইলে ধানের দাম উৎপাদনের ব্যয়ের সমান হইবে। সব খরচ বাদ দিলে যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহাই খাজনা। কাজেই ফসলের দাম হইতে ব্যয় বাদ দিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহাই খাজনা। অর্থাৎ খাজনা ফসলের উৎপাদনের ব্যয় বা মূল্যের অন্তর্ভুক্ত নহে।

খাজনা ও দামের সম্বন্ধ (Rent and Price): রিকার্ডোর মত অনুসারে খাজনা জমির উর্বরতা এবং ফসলের দামের উপর নির্ভর করে। খরচ বাদ দিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহাই খাজনা। ভাল জমি বেশী উর্বর, সেজন্য উহাতে উদ্বৃত্ত ফসল বেশী পাওয়া যায়। আবার ফসলের দাম বাড়িলেও খাজনা পাওয়া যায়। ধরা যাউক, দ্বিতীয় কৃষক দল ঐ দ্বীপে পৌছিবার পূর্বে দুই টাকা দামে ধান বিক্রয় হইত। তাহা হইলে প্রথম শ্রেণীর জমির চাষী ১৫ মণ ধান বিক্রয় করিয়া ৩০৲ টাকা পাইবে। কিন্তু তাহার খরচও ৩০৲ টাকা হইত। প্রথম শ্রেণীর জমির চাষীদের কিছু উদ্বৃত্ত থাকিত না, তাহাদের কিছু খাজনাও দিতে হইত না। ঐ দ্বীপে ক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে বা বাহির হইতে আরও লোক আসিলে খাদ্যের চাহিদা বাড়িবে। তাহা হইলে ধানের দামও বাড়িয়া তিন টাকা হইবার সম্ভাবনা। তখন চাষীরা পনের মণ ধান বিক্রয় করিয়া পঁয়তাল্লিশ টাকা পাইবে এবং খরচ বাদ দিয়া পনের টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। লোকসংখ্যা আরও বাড়িলে চাহিদা আরও বাড়িবে। চাহিদা বাড়িলে দামও বৃদ্ধি পাইবে। ধানের দাম যদি সাড়ে তিন টাকা হয়, চাষীরা তাহা হইলে পনের মণ ধান বেচিয়া বাহান্ন টাকা আট আনা পাইবে। সে ক্ষেত্রে সাড়ে বাইশ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। উদ্বৃত্তই খাজনা। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, দাম বাড়িলে খাজনাও বাড়িতে থাকে। তাই রিকার্ডো বলিয়াছেন যে, দাম বাড়িলে খাজনা বাড়ে। কিন্তু খাজনা বাড়িলে দাম বাড়ে, এ কথা বলা ঠিক হইবে না। অবশ্য বাস্তব জীবনে লোকে বলে যে, দাম বেশী লওয়া হয় কারণ খাজনার হার বেশী। এই কথা ঠিক নহে। একটি কৃষককে উচ্চ হারে খাজনা দিতে হইতে পারে, কিন্তু এইজন্য সে বেশী দামে ফসল বিক্রয় করিতে পারিবে তাহা নয়। তাহাকেও বাজার দরে ফসল বিক্রয় করিতে হয়। সে যে জমি চাষ করে, তাহার উবরতা খুব বেশী বলিয়া অন্যের জমির তুলনায় ফসল অনেক বেশী হয়। সুতরাং খরচ বাদ দিয়া উদ্বৃত্ত অনেক বেশী থাকে। উদ্বৃত্ত বেশী থাকে বলিয়াই সে বেশী হারে খাজনা দিতে পারে। দুই টাকার অধিক দামে ধান বিক্রয় হইলেই প্রথম শ্রেণীর জমির কৃষকদের কিছু উদ্বৃত্ত থাকিবে। অন্য কোন ভাবে খাজনার উৎপত্তি হয় না। মোট উৎপন্ন ফসলের মূল্য মোট ব্যয় অপেক্ষা বেশী হইলেই উদ্বৃত্ত থাকে এবং এই উদ্বৃত্তই খাজনা।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাজনা (Population and rent): দেশে

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে খাজনা বাড়ে, না কমে ? রিকার্ডোর মত অনুসারে দুইটি কারণে খাজনার হার নির্দিষ্ট হয়—জমির উর্বরতা এবং ফসলের মূল্য। উর্বরতা অনুযায়ী দেশের সব জমির শ্রেণী বিভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণীর জমির পরিমাণ নিতান্তই সীমাবদ্ধ। লোকে প্রথমে এই জমিই চাষ করে। ক্রমে ক্রমে চাষযোগ্য প্রথম শ্রেণীর জমি আর অবশিষ্ট থাকে না। তখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে চাষ না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে ফসল অপেক্ষাকৃত কম হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করিবার খরচ পোষাইতে হইলে ফসলের মূল্য বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন। প্রথম শ্রেণীর জমির ফসলও এই বর্ধিত মূল্যে বিক্রয় হইবে। তখন প্রথম শ্রেণীর জমির চাষীদের কিছু উদ্বৃত্ত থাকিবে। ফসলের মূল্য হইতে চাষের খরচ বাদ দিলে এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ পাওয়া যায়। এই উদ্বৃত্তই খাজনা। অতএব দেখা যাইতেছে যে, জনসংখ্যা বাড়িলে প্রথম শ্রেণীর জমি হইতে খাজনা পাওয়া যায়। কালক্রমে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি সব চাষ হইয়া থাকে। এবং লোকসংখ্যা আরও বাড়িলে তৃতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করিতে হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর জমি হইতে উদ্বৃত্ত বা খাজনা বেশী পাওয়া যাইবে এবং তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি হইতেও কিছু উদ্বৃত্ত থাকিবে। কাজেই জনসংখ্যা বাড়িলে খাজনা বাড়িবার সম্ভাবনা হয়। লোক বাড়িলে খাদ্যের চাহিদা বাড়িবে এবং খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে খাজনা বাড়িবে। দাম বাড়িলে খাজনার হার বেশী হয়। কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়িলে তাহার দাম বাড়ে এবং তাহা হইলে খাজনাও বাড়ে।

বাড়ী তৈয়ারীর জমির খাজনা (Urban site rent) : যে জমির উপরে বাড়ী তৈয়ারী হয়, তাহা হইতেও খাজনা পাওয়া যায়। জমি খুব উর্বর বলিয়া সেই জমি কেহ বাড়ী তৈয়ারী করিবার জন্য ক্রয় করে না। এই জমির অবস্থান অনুযায়ী মূল্য স্থির হয়। যে সব জমি অফিস বা বাসগৃহ তৈয়ারীর উপযোগী, তাহার খাজনা অন্য জমি অপেক্ষা বেশী হইবে। যাহারা ব্যবসায় করিতে চায়, তাহারা ব্যবসায়ী মহল্লায় অফিসের জন্য বেশী ভাড়া দিতে প্রস্তুত থাকে। কারণ সেইরূপ জায়গায় অফিস হইলে সে অনেক সুবিধা পাইবে। ধনী লোকেরা সৌখীন মহল্লার জমির জন্য বহু খাজনা দিতে প্রস্তুত। শহরের উপান্তে জমির খাজনা কম হয়। কারণ ঐ সব জমির চাহিদা সৌখীন মহল্লার মত নহে। অতএব বাসের জমির খাজনা জমির অবস্থানের উপর নির্ভর করে।

অনুপার্জিত মূল্যবৃদ্ধি (Unearned increment): অনেক সময়ে দেখা যায়, মহল্লার বা শহরের উন্নতি হইবার পর ঐ অঞ্চলের জমির মূল্য বাড়িয়া যায়। জামসেদপুর পূর্বে একটি ছোট গ্রাম ছিল। তখন সেখানে জমির দাম সামান্যই ছিল। কিন্তু টাটা কোম্পানী সেখানে লৌহকারখানা স্থাপন করাতে বহু লোক সেখানে গিয়াছে, জমির দামও বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু জমির এই মূল্যবৃদ্ধি মালিকের কোন চেষ্টার ফলে হয় নাই। সেই জন্য এইরূপ মূল্যবৃদ্ধিকে অনুপার্জিত মূল্যবৃদ্ধি (Unearned increment) বলে। এই মূল্যবৃদ্ধি জমির মালিকেরাই আত্মসাৎ করিয়াছে, যদিও জমির উন্নতির জন্য তাহাদিগকে কিছুই করিতে হয় নাই। যানবাহনের উন্নতি, শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রসার বা অপর কোন কারণে শহরের বা মহল্লার উন্নতি হইবার ফলে জমির দাম বাড়ে, তাহাকেই অনুপার্জিত মূল্যবৃদ্ধি বলে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

মজুরী

উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিককে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তাহাকে মজুরী বলে। শ্রমিক বলিতে শুধু কারখানার কুলি বা দৈহিক শ্রম যাহারা করে তাহাদের বুঝায় না; উদ্যোক্তার অধীনে যাহারা কাজ করে, তাহাদের সকলকেই বুঝায়।

মজুরী সাধারণত দুই ভাবে দেওয়া হয়। মালিক নির্দিষ্ট হারে প্রতি সপ্তাহে বা মাসে শ্রমিকদের মজুরী দিতে পারে। সময় হিসাবে, যথা দিনে বা সপ্তাহে বা মাসে এত টাকা করিয়া মজুরী স্থির হয়। ইহাকে সময়-মজুরী (Time-wages) বলে। আবার কাজের পরিমাণ অনুযায়ীও মজুরী দেওয়া হয়। যেমন, প্রত্যেকটি কাপড় বুনিবার জন্য তাঁতিকে একটা বিশেষ হারে মজুরী দেওয়া হয়। ইহাকে কমানুগ মজুরী (Piece wage) বলে।

সামগ্রীক মজুরী (Real wages): যে উপায়েই দেওয়া হউক না কেন, শ্রমিকেরা মালিকের নিকট কিছু অর্থ মজুরী হিসাবে পায়। ইহাকে আর্থিক মজুরী (Money wages) বলে। কিন্তু শ্রমিক মজুরী বাবদ যে অর্থ পায়, তাহা হইতে শ্রমিকের আসল অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। তাহা জানিতে গেলে শ্রমিকের সামগ্রিক মজুরী কি তাহা জানিতে হইবে। সামগ্রিক মজুরী কাহাকে বলে? মোট আয়ের বিনিময়ে শ্রমিক যে সমস্ত সামগ্রী কিনিতে পারে ও সুবিধা লাভ করে, তাহার সমষ্টিকে সামগ্রিক মজুরী বলে।

শ্রমিকের সামগ্রিক আয় কত তাহা স্থির করিতে হইলে কেবলমাত্র আর্থিক মজুরী জানিলে চলিবে না, আরও কয়েকটি বিষয় জানা প্রয়োজন। প্রথমত, তাহার কাজ কত দিনের জন্য তাহা জানিতে হইবে। একজন হয়ত সাময়িক চাকুরীতে বেশী বেতন পায় ও আর একজন স্থায়ী কাজে কম বেতন পায়। শুধু টাকার সংখ্যা দেখিলে মনে হইবে প্রথম ব্যক্তির অবস্থা ভাল। প্রথম ব্যক্তির মাহিনা বর্তমানে হয়ত বেশী, কিন্তু কিছু দিন পরে তাহাকে হয়ত বেকার থাকিতে হইতে পারে। কাজেই দীর্ঘদিনের কথা বিবেচনা করিলে

দ্বিতীয় ব্যক্তির অবস্থাই ভাল বলিতে হয়। দ্বিতীয়ত, কোন কোন কাজে পরিশ্রম এবং বিপদ এত বেশী তাহাতে শীঘ্র মৃত্যু অথবা শরীর নষ্ট হইবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। রেলের ইঞ্জিনচালক সাধারণত দীর্ঘদিন বাঁচে না। বয়লারের অসম্ভব আগুনে বেশী দিন কাজ করা সম্ভব নহে। এই কাজে মাহিনা বেশী হইলেও মোট আয় অন্য কাজ অপেক্ষা অনেক কম হইবে। কারণ সেই কাজ লোকের পক্ষে দীর্ঘ দিন ব্যাপী করা সম্ভব নয়। সুতরাং এই কাজেই আর্থিক মজুরী বেশী হইলেও দীর্ঘদিনের বিবেচনায় সামগ্রিক মজুরী কম। তৃতীয়ত, কোন কোন কাজে উপরি আয় করিবার সুবিধা আছে। সদাগরি অফিসের টাইপিস্ট অফিসের কাজের পর অন্যত্র টাইপের কাজ করিতে পারে। এই উপায়ে সে তাহার রোজগার বাড়াইতে পারে। প্রকৃত আর্থিক অবস্থা জানিতে হইলে এই অতিরিক্ত আয়ও হিসাবে ধরিতে হইবে। অনেক সময়ে চাকুরি বজায় রাখিবার জন্য শ্রমিককে তাহার নির্দিষ্ট আয় হইতে কিছু ব্যয় করিতে হয়। অনেক কারখানার শ্রমিক তাহাদের সর্দারকে নিয়মিত কমিসন দিতে বাধ্য হয়; না দিলে তাহাদের কাজ বজায় থাকে না। কাজেই শ্রমিকের মোট আয় হইতে এই খরচ বাদ দিলে তবে তাহার প্রকৃত আয় জানা যাইবে।

শ্রমিক অনেক সময়ে মজুরী ছাড়া আরও অন্যান্য সুবিধা পায়। যেমন, রেলের শ্রমিকেরা খুব কম ভাড়ায় বাসা পায়; তাহারা অল্প মূল্যে রেসন ও অন্যান্য জিনিষ পায়; বিনা ভাড়ায় রেলে যাতায়াত করিতে পারে এবং আরও অনেক সুবিধা পায। প্রকৃত আয় বা সামগ্রিক মজুরী তাই কেবল তাহার প্রাপ্য আর্থিক মজুরীর উপরে নির্ভর করে না। এই সব সুবিধাগুলিও হিসাবে ধরিতে হইবে।

এই সমস্ত হিসাব করিয়া শ্রমিক মোট কত টাকা আয় করে, কেবল তাহা জানিলেই তাহার প্রকৃত অবস্থা বা সামগ্রিক মজুরী জানা যায় না। তাহা জানিতে হইলে শ্রমিকের নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য কত তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। জিনিষপত্রের গড়পড়তা মূল্য কম হইলে একই টাকা দিয়া বেশী জিনিষ কেনা যায়। তখন আয় কম থাকিলেও শ্রমিকের সামগ্রিক মজুরী বেশী থাকে। আবার জিনিষপত্রের মূল্য বেশী হইলে কম সামগ্রী কিনিতে পারা যায় ও সামগ্রিক মজুরী কম হয়। যুদ্ধের পূর্বে অনেক শ্রমিক মাসে ৩০৲ টাকাও পাইত না। আর এখন তাহাদের হয়ত ৮০৲ টাকা মজুরী হইয়াছে। কিন্তু

জিনিষপত্রের দাম চার পাচ গুণ বাড়িয়া যাওয়াতে মজুরী দ্বিগুণ হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের অবস্থা খারাপ হইয়াছে। অর্থাৎ তাহাদের সামগ্রিক মজুরী কমিয়া গিয়াছে। শ্রমিকের অবস্থা শুধু তাহার আর্থিক আয়ের উপরেই নির্ভর করে না। তাহারা যে সামগ্রিক মজুরী পায়, তাহার উপরেই নির্ভর করে। সামগ্রিক মজুরী কত তাহা বাহির করিতে হইলে শ্রমিকের বেতন, কাজ স্থায়ী কি অস্থায়ী, কাজ বিপদজনক কি না, উপরি আয়ের সম্ভাবনা কি রকম, কাজের অন্যান্য কি সুবিধা, কাজের জন্য অপরিহার্য খরচ করিতে হয় কি না এবং মূল্যস্তর পূর্ব হইতে উচ্চ কি নিম্ন এতগুলি জিনিষের হিসাব করিতে হইবে। শ্রমিকের-সামগ্রিক মজুরী হইতেই বলা যায় তাহার অবস্থা ভাল কি মন্দ, তাহাদিগকে ভাল পারিশ্রমিক দেওয়া হয় কি না; ইহা তাহাদের বেতন বা আর্থিক মজুরী হইতে বলা যায় না।

মজুরী নির্দিষ্ট হয় কিরূপে

জীবনধারণোপযোগী পারিশ্রমিক (Subsistence Theory): শ্রমিকের মজুরী কিরূপে নির্দিষ্ট হয়? উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে লোকে মনে করিত যে, শ্রমিকের এবং তাহার পরিবারে সকলের জন্য মোটা ভাত, কাপড় যোগাইতে যে অর্থের প্রয়োজন মজুরীর হার তাহারই সমান হইবে। ইহা জীবনধারণোপযোগী পারিশ্রমিকতত্ত্ব নামে পরিচিত। যদি একজন শ্রমিককে নিজের ও পরিবারের জন্য দৈনিক এক টাকার জিনিষ পত্র কিনিতে হয়, তবে তাহার দৈনিক মজুরী এক টাকাই হইবে। মজুরী ইহার বেশী হইলে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়িবে। পূর্বাপেক্ষা বেশী মজুর হয়ত বিবাহ করিবে এবং তাহাদের সন্তানাদির সংখ্যা বাড়িবে। ফলে মজুরী আবার এক টাকায় নামিয়া আসিবে। কিন্তু ইহার নীচে মজুরের হার নামিতে পারে না। কারণ তাহা হইলে অনেক মজুর না খাইতে পাইয়া মারা যাইবে। ফলে মজুরের সংখ্যা আবার কমিবে এবং মজুরী বাড়িয়া যাইবে। কাজেই এইরূপে জীবনধারণের নিম্নতম প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনিতে যত অর্থ প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা মজুরী বাড়িলে অথবা কমিলে জনসংখ্যা সঙ্গে সঙ্গে বাড়িবে বা কমিবে। কিন্তু তাহা সত্য নহে। জনসংখ্যা মজুরীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে না। আধুনিক শ্রমিক শুধু জীবনধারণোপযোগী নিম্নতম আয়ে সন্তুষ্ট নহে। আয় বাড়িলেই

শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ে না। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে লোকসংখ্যা বহু বাড়িয়াছে। কিন্তু তাহাদের আয়ও বাড়িয়াছে। সেখানকার অতি সাধারণ শ্রমিকের আয় নিম্নতম জীবনধারণোপযোগী আয়ের অধিক। কাজেই এই মত এখন আর গ্রাহ্য নহে।

জীবনধারণের মান এবং মজুরী (Standard of living and wages): অনেকের ধারণা যে মজুরী এমন হারে নির্দিষ্ট হইবে যাহার দ্বারা শ্রমিকের জীবনধারণের মান বজায় রাখা সম্ভব হয়। যাহাদের জীবনধারণের মান উচ্চ, তাহারা অধিক মজুরী পায় এবং অন্যেরা কম মজুরী পায়। যাহার জীবনধারণের মান উচ্চ সে কম মজুরীতে কখনই কাজ করিবে না। এই মতে কিছু সত্য আছে বটে। কিন্তু একজনের জীবিকা-নির্বাহের মান উচ্চ হইলেই মালিক তাহাকে অধিক মজুরী দেয় না। শ্রমিক দক্ষ হইলেই তাহাকে অধিক মজুরী দেওয়া হয়। উচ্চতর জীবিকানির্বাহের মান যদি শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বাড়ায়, তাহা হইলে সে অধিক মজুরী পাইতে পারে। যাহার জীবিকানির্বাহের মান উচ্চ, সে পুষ্টিকর খাদ্য খায়, উপযুক্ত বস্ত্র পরিধান করে, শিক্ষার জন্য সে অধিক ব্যয় করিতে পারে। এইভাবে তাহার কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি হয়, এবং সে অধিক মজুরী পাইতে পারে। অধিক মজুরী পাইলেই সে তাহার জীবনযাপনের উচ্চ মান বজায় রাখিতে পারে। অতএব বলা যায় যে, জীবিকানির্বাহের মান পরোক্ষভাবে মজুরী নির্ণয় করে, অর্থাৎ শ্রমিকের কর্মদক্ষতা উন্নত করিয়া মজুরী বাড়ায়। জীবিকানির্বাহের মান উচ্চ হইলে জন্মের হার কমিয়া যায়। তাহার ফলে শ্রমিকের সংখ্যা কমে ও মজুরীর হার বৃদ্ধি পায়। যাহার জীবিকানির্বাহের মান উচ্চ সে অধিক সন্তান কামনা করে না। সন্তান বেশী হইলে তাহার পক্ষে জীবিকানির্বাহের মান বজায় রাখা সম্ভব হয় না। শিশু পালন করিতে খুব ব্যয় হয়। শিশুর সংখ্যা কম হইলে শ্রমিকের সংখ্যাও কমিবে। শ্রমিকের সংখ্যা কম হইলে মজুরীর হার বেশী হইবে।

প্রান্তিক উৎপাদন (Marginal productivity) **এবং মজুরীর হার:** এইবারে মজুরীর সম্বন্ধে আধুনিক মত আলোচনা করা যাইতে পারে। এই মতে বলে যে, শ্রমিকের কাজের মূল্য প্রত্যেক জিনিষের মূল্যের মতই চাহিদা এবং যোগান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। শ্রমিকের চাহিদাও অন্য সব

দ্রব্যের চাহিদার মত। জিনিষের উপযোগ থাকিলেই তবে তাহার চাহিদা হইবে। মালিক শ্রমিকের নিকট কাজ চাহে। কারণ তাহার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। মালিকের নিকট শ্রমিকের উপযোগ তাহার উৎপাদন-ক্ষমতা দিয়াই নিরুপিত হয়। ক্রেতা একটি জিনিষের জন্য কত দাম দেয়? তাহা জিনিষটির প্রান্তিক উপযোগের উপর নির্ভর করে। তেমনি শ্রমিকের কাজের মূল্যও তাহার প্রান্তিক উৎপাদনের (Marginal productivity) উপর নির্ভর করে। একজন শ্রমিক নিয়োগ করিলে মোট উৎপাদন কতটা বাড়ে? তাহাই শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ। ধর, কারখানার মালিক ১০০ জন শ্রমিক নিয়োগ করিয়া ৫০,০০০ হাজার টাকার উৎপন্ন জিনিষ পায়। সে যদি আরও একটি শ্রমিক নিয়োগ করে অর্থাৎ সবসমেত ১০১ জন শ্রমিক লাগায়, তাহার উৎপাদনের পরিমাণ ৫০,০৩০ টাকায় দাঁড়ায়। ১০০ এবং ১০১ জন শ্রমিক কর্তৃক উৎপাদনের যে পার্থক্য, তাহাই ১০১ জন শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন। এরূপ ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন ৩০৲ টাকা। শ্রমিকের মজুরী এই প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হইবে। যদি মজুরী ৩০৲ টাকার কম হয়, তাহা হইলে মালিক আরও শ্রমিক নিয়োগ করিয়া লাভবান হইতে পারে। তাই সে আরও অধিক মজুর নিয়োগ করিবে। তাহা হইলে শ্রমিকের চাহিদা বাড়িবে এবং মজুরীর হার বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু আবার যদি প্রান্তিক উৎপাদন অপেক্ষা মজুরীর হার বেশী হয় অর্থাৎ শ্রমিক যদি ৩০৲ টাকার বেশী মজুরী চায়, তবে মালিক অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহা হইলে শ্রমিকের চাহিদা কম হইবে এবং মজুরীও কমিয়া যাইবে। এইভাবে প্রকৃত মজুরী শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হইবে।

একটি নির্দিষ্ট মজুরীর হারে যত লোক কাজ করিতে ইচ্ছুক তাহার উপরে শ্রমিকের যোগান নির্ভর করে। যদি যোগান বাড়ে, তাহা হইলে মজুরী কম হইবার সম্ভাবনা। যোগান কমিলে মজুরী বাড়ে। দুইজন শ্রমিক একই কাজের জন্য উপস্থিত হইলে মজুরী কমিবে। দুইজন মালিক একজন মজুরকে নিয়োগ করিতে চাহিলে মজুরী বৃদ্ধি পাইবে। অতএব চাহিদা এবং যোগানের দ্বারা মজুরী নিয়ন্ত্রিত হয়।

মজুরীর হারের তারতম্য (Differences of wages): এ পর্যন্ত আমরা মজুরীর হার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু দেশে মজুরীর হার

একটি নহে অনেকগুলি। বিভিন্ন কাজে প্রতি ঘণ্টায় বা প্রতি কাজের জন্য বিভিন্ন হারে মজুরী দেওয়া হয়। কোন কোন কাজে শ্রমিক ঘণ্টায় চার আনায়ও পায় না। কিন্তু একই শিল্পে অন্য কাজে ঘণ্টায় মজুরীর হার পাঁচ টাকা হওয়াও অসম্ভব নহে। মজুরীর হারে এই পার্থক্য হইবার কারণ কি?

একটি কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রথমত কোন কোন লোকের কাজ করিবার ক্ষমতা এবং যোগ্যতা অপরের তুলনায় বেশী। তাহাদের মজুরী বা বেতন অন্যের চেয়ে বেশী হইবে তাহা স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, বিশেষভাবে শিক্ষিত শ্রমিকদের চাহিদা বেশী। ভালভাবে কাজ করিতে গেলে যেখানে বিশেষ শিক্ষা প্রয়োজন, সেই সব কাজে অন্য কাজ অপেক্ষা মজুরী স্বভাবত বেশী হইবে। সাধারণ দৈহিক পরিশ্রমের কাজ যে কোন সুস্থ ব্যক্তিই করিতে পারে। কিন্তু রাজমিস্ত্রি বা ছুতারের কাজ করিতে হইলে পূর্বে শিক্ষানবিশী করিয়া কাজের কৌশল আয়ত্ত করিতে হইবে। এইভাবে শিক্ষিত শ্রমিক সাধারণ মজুর অপেক্ষা বেশী মজুরী পাইবে। তাহা না হইলে কাজের শিক্ষানবিশীর জন্য সময় এবং অর্থব্যয় লোকে করিবে কেন? সামগ্রিক মজুরী আলোচনা প্রসঙ্গে একটি জিনিষের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা হইতে মজুরীর পার্থক্য সম্বন্ধে একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কাজ যদি স্থায়ী ও নিরাপদ হয়, তবে সেখানে অস্থায়ী ও বিপজ্জনক কাজ অপেক্ষা মজুরী কম হইবে। কাজ যদি অনিয়মিত হয় এবং কিছুকাল বেকার থাকিবার সম্ভাবনা থাকে, তবে লোকে সেই কাজ ত্যাগ করিয়া কম মজুরীতেও অধিকতর স্থায়ী কাজ লইবে। চতুর্থত, কাজে যদি শীঘ্র উন্নতি হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে লোকে প্রাথমিক বেতন কম হইলেও সেই কাজ গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করে না।

যে সমস্ত কাজ লোকে সাধারণত অপছন্দ করে, কিংবা যাহা সমাজের চক্ষে হীন বলিয়া গণ্য হয়, সেখানে কম লোকেই যাইতে চাহিবে। কাজেই সে সমস্ত কাজে মজুরীর হার অপেক্ষাকৃত বেশী না দিলে শ্রমিক পাওয়া যাইবে না। কিন্তু যে সব কাজ মনোরম, পছন্দসই এবং যে কাজে সমাজে সম্মান পাওয়া যায়, তাহা করিতে লোকের স্বাভাবিক আগ্রহ থাকিবে। এই সব কাজে মজুরী কম হইবার সম্ভাবনা। উপরের আলোচনা হইতে বিভিন্ন কাজে এবং বিভিন্ন জায়গায় কেন কম মজুরী দেওয়া হয়, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। কিন্তু একটি ব্যতিক্রম সর্বদাই থাকে। আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, শ্রমিকেরা

খুশীমত একটি কাজ ছাড়িয়া আর একটি কাজ লইতে পারে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। প্রত্যেক শ্রমিক যে কোন কাজ গ্রহণ করিবার সুযোগ পায় না। বিদেশে (বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডে) শিক্ষিত লোকেরা আমাদের দেশে বেশী মাহিনা পায়। বিদেশগমন বহু ব্যয়সাধ্য। সকলের পক্ষে তত ব্যয় করা সম্ভব নহে। এই কারণে সকলে বিদেশে যাইতে পারে না এবং যাহারা যায় তাহাদের সংখ্যা কম বলিয়া তাহারা অধিক বেতন পায়। যোগ্যতা থাকিলেই সব সময়ে লোকে বেশী টাকা উপার্জন করিতে পারে না। গরীবের ছেলে ধনীপুত্র অপেক্ষা যোগ্যতর হইতে পারে। কিন্তু পিতা তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে অপারগ বলিয়া তাহাকে অল্প বেতনেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। ধনীপুত্রের যোগ্যতা বিশেষ না থাকিলেও তাহার পিতা তাহাকে সব রকম শিক্ষা ও সুযোগ দিয়া থাকে বলিয়া সে অধিক বেতনের ভাল কাজ যোগাড় করিতে পারে। অধিকাংশ লোক সামান্য শিক্ষালাভ করিয়া যে কাজ পায়, তাহাই গ্রহণ করে। গরীবেরা গরীব বলিয়াই কম উপার্জন করে। ধনীর গৃহে জন্মলাভ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধনীর সন্তানেরা অধিক উপার্জন করে।

শ্রমিকসংঘ (Trade Union): আরও একটি বিষয় দ্বারা মজুরীর হার বিশেষ প্রভাবান্বিত হয় তাহার কথা বলা হয় নাই। মালিক শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন অপেক্ষা বেশী মজুরী দিতে পারে না। কিন্তু সে সবদাই শ্রমিককে কম টাকা দিতে চেষ্টা করে। নানা কারণে ইহা সম্ভব হয়। মালিকের সংখ্যা কম, কিন্তু মজুরের সংখ্যা অনেক। কাজেই কম মজুরীতে লোক লাগানো মালিকের পক্ষে সম্ভব হয়। শ্রমিক জানে সে কম বেতনের কাজ না লইলে মালিক অন্য শ্রমিক নিযুক্ত করিতে পারে। শ্রমিকেরা সাধারণত খুব গরীব। তাহারা ভাল কাজের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে না। কাজ না করিলে পেটে ভাত পড়িবে না। তাই মজুরী সন্তোষজনক না হইলেও সে কাজ তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। শ্রমিকেরা সাধারণত অজ্ঞ এবং তাহাদের অভিজ্ঞতাও কম। তাহারা জানে না মালিকের কত মজুরী দিবার ক্ষমতা আছে। এই সব কারণে শ্রমিকেরা দর কষাকষি করিতে পারে না এবং মালিক যে মজুরী দেয় তাহাই লইতে বাধ্য হয়। দারিদ্র্য বহু দুঃখের কারণ। দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতার জন্য ধনী মালিকের নিকট তাহারা অনেক সময়ে ঠকিয়া যায়।

শ্রমিকের এই অক্ষমতা শ্রমিকসংঘ গঠন করিলে অনেকটা দূর হইতে পারে। শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে শ্রমিকসংঘ গঠিত হয়। প্রত্যেক শ্রমিক দুর্বল হইতে পারে, শক্তিমান মালিকের অত্যাচাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার ক্ষমতা তাহার না থাকিতে পারে; কিন্তু সকল শ্রমিক ঐক্যবদ্ধ হইলে মালিক যথোপযুক্ত মজুরী দিতে এবং কাজেব অবস্থার উন্নতি করিতে বাধ্য হয়। সংঘের মারফতে মালিকের সহিত সম্মিলিতভাবে বোঝাপড়া হয় এবং মালিকেরা শ্রমিকদের কাজের জন্য ভাল সর্ত দিতে বাধ্য হয়।

শ্রমিকসংঘের কাজ (Functions of trade unions) : শ্রমিক-সংঘের উদ্দেশ্য শ্রমিকদের মজুরীর হার বাড়ান এবং নানা প্রকারে কাজের অবস্থার উন্নতি করা। কোন শ্রমিকের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিলে অথবা তাহাকে কর্মচ্যুত করিলে সংঘ তাহার পক্ষ সমর্থন করে। এইভাবে এবং আরও অন্যান্য উপায়ে ইহা শ্রমিকদেব কাজের অবস্থা উন্নতি করিতে চেষ্টা করে। সংঘ তাহার সভ্যদের আরও কিছু কিছু সুবিধা দিতে চেষ্টা করে। অনেক সংঘ অসুস্থ বা কর্মচ্যুত শ্রমিকদের ভাতা দেয়। লেখপড়া শিখানো, শিল্পশিক্ষা দেওয়া এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করা সংঘের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই সব উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত কবিবার জন্য সংঘ বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। মজুরী বাড়াইবার জন্য বা কোন অভিযোগ নিষ্পত্তি করিতে সংঘ মালিকের সঙ্গে আলোচনা চালায়। সংঘ হইতে শ্রমিকদের স্বার্থের অনুকূলে প্রচারকার্য চালানো হয় এবং সরকারকে শ্রমিক হিতকর আইন পাস করিতে অনুরোধ ও সাহায্য করে। এই সব উপায়ে কাজ না হইলে সংঘ ধর্মঘট করে। ধর্মঘটের অর্থ শ্রমিকদের একযোগে কাজ বন্ধ করা। তাহারা চিরকালের জন্য কাজ ছাড়িতে চায় না। মালিককে তাহাদের অভাব-অভিযোগ দূর করিতে বাধ্য করিয়া তাহারা আবার কাজে ফিরিয়া যাইতে চাহে।

শ্রমিক সংঘ ও মজুরী : শ্রমিকদের মজুরী বাড়াইতে সংঘ কতটা সাফল্য অর্জন করিয়াছে। পুরাতন কালের ধনবৈজ্ঞানিকেরা মনে করিতেন যে, শ্রমিকসংঘ দ্বারা মজুরী বর্ধিত হয় না। কিন্তু আজকাল এইরূপ মত পরিত্যক্ত হইয়াছে। মালিকেরা যত মজুরী দিতে পারে, তাহারা সব সময়ে তাহা দেয় না। নিজেদের অবস্থার সুযোগ লইয়া তাহাবা শ্রমিকদের কম মজুরী দেয়। বিশেষ করিয়া যে সব কাজে শুধু কায়িক শ্রমই প্রয়োজন, সেখানে মালিকেরা

অধিক সময় খাটাইয়া সামান্য মজুরী দিয়া থাকে। শ্রমিকসংঘ এইসব মালিককে অধিক মজুরী দিতে বাধ্য করিতে পারে। কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করিয়া ও শ্রমিকসংঘ শ্রমিকদের অধিক মজুরী আদায় করিতে সাহায্য করে। কয়েকটি সর্ত পূরণ হইলে একটি শ্রমিকসংঘ মালিকদের নিকট হইতে অধিক মজুরী আদায় করিতে পাবে। প্রথমত, ঐ শ্রমিকদের না হইলে মালিকদের চলিবে না, অবস্থা এইরূপ হওয়া চাই। মালিক যদি জানে যে, ঐ শ্রমিক না হইলে তাহার চলিবে না, তবে বেশী মজুরী তাহাকে দিতেই হইবে। দ্বিতীয়ত, শ্রমিককে যে মজুরী দিতে হয় তাহা উৎপাদনের ব্যয়ের সামান্য একাংশ হইলে তবে মজুরী সহজে বৃদ্ধি হইতে পারে। মজুরী সামান্য বাড়িলে যদি উৎপাদনের ব্যয়ের তেমন উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি না হয়, তবে ধর্মঘটের হাঙ্গামা হইতে বাচিতে মালিক মজুরী বৃদ্ধি করিয়া দিবে। তৃতীয়ত, শ্রমিকেরা যে দ্রব্য উৎপাদন করে, তাহার চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে চলিবে না। ধর্মঘট করিলে উৎপাদন কমে। ফলে দ্রব্যের যোগান কমিয়া যায়। দ্রব্যটির চাহিদা স্থিতিস্থাপক নহে বলিয়া উহার দাম খুব চড়িয়া যাইবে। দাম বাড়িয়া গেলে তখন বেশী মজুরী দিতে মালিকের অসুবিধা হইবে না।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

সুদ

মোট ও নীট সুদ (Gross & net interest) : জমির মালিককে যেমন জমির ব্যবহারের জন্য খাজনা দিতে হয়, মূলধনের মালিককেও মূলধনের জন্য সুদ দিতে হয়। সুদ কাহাকে বলে ? ধার লইলে মাসে মাসে বা বৎসরে মহাজনকে আসল ছাড়া যে টাকা দিতে হয়, সাধারণ লোকে সুদ বলিতে তাহাই বোঝে। টাকা ধার লইলে খাতক মহাজনকে একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ দিতে স্বীকার করে। কিন্তু ধনবৈজ্ঞানিক সুদ কথাটি ঠিক এইভাবে ব্যবহার করে না। যে টাকা ধার দিলে ধার শোধ না হওয়া সম্বন্ধে কোন আশঙ্কা নাই, এবং টাকা আদায় করিতে কোন হাঙ্গামা হয় না, সেই ধারে যে সুদ পাওয়া যায় তাহাকেই ধনবিজ্ঞানে সুদ বলে। অনেক সময়ে ইহাকে নীট বা খাঁটি সুদও বলা হয়। নীট সুদ যে ঋণ হইতে পাওয়া যায়, তাহাতে কোন টাকা খোয়া যাইবার আশঙ্কা নাই এবং মহাজনকে উহার জন্য কিছুই করিতে হয় না। মোট সুদ (Gross interest) ও নীট সুদের মধ্যে পার্থক্য আছে। টাকা ধার দেওয়াতে একটু বিপদ সর্বদাই আছে। নির্দিষ্ট দিনে নানাকারণে খাতক টাকা শোধ না দিতে পারে। এইরূপ সময়মত টাকা ফিরিয়া না পাইবার আশঙ্কা থাকিলে মহাজন বেশী সুদ চাহিয়া বসিবে। যে সমস্ত খাতকের সম্বন্ধে এইরূপ আশঙ্কা বেশী, তাহাদের নিকট হইতে মহাজন তত বেশী সুদ লইবে। দ্বিতীয়ত, মহাজনকে ধারের কারবারের জন্য কিছু কিছু কাজও করিতে হয়। তাহাকে হিসাবপত্র রাখিতে হয়। যে সব খাতক নির্ভরযোগ্য নহে, তাহার বাড়ী গিয়া বা চিঠি লিখিয়া নিয়মত তাগিদ দিয়া টাকা ও সুদ আদায় করিবার চেষ্টা করিতে হয়। এই সব ঝঞ্ঝাটের কাজের জন্য মহাজনেরা পারিশ্রমিক স্বরূপ বেশী সুদ দাবী করে। কাজেই মোট সুদের হার নীট সুদ হইতে উচ্চ থাকে।

সুদের হার কি ভাবে নির্দিষ্ট হয় (What determines interest ?) অন্য জিনিষের মূল্যের ন্যায় সুদও মূলধনের চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে। মূলধন তিন শ্রেণীর লোকে দাবী করে। যথা সরকার, ব্যবসায়ী এবং সাধারণ লোক। ব্যবসায়ীরা নূতন ব্যবসায়ের জন্য অথবা পুরাতন

ব্যবসায় বড় করিয়া তুলিবার জন্য মূলধন চায়। ব্যবসায়ে নূতন মূলধন নিয়োগ করিলে উৎপাদন বাড়ে। কাজেই টাকা ধার লইয়া ব্যবসায়ীরা যন্ত্রপাতি অথবা কাঁচা মাল কেনে। এই মূলধন নিয়োগ করিলে কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ব্যবসায়ে নিয়োগ করিবার মত মূলধনের চাহিদা সুদের হারের উপর নির্ভর করে। মূলধন ব্যবহারে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। সুদের হার বেশী হইলে মূলধনের চাহিদা কম হইবে এবং ঐ হার কম হইলে চাহিদা বেশী হইবে। সরকার দুইটি কারণে টাকা ধার করে—প্রথম, যুদ্ধ পরিচালনা করিবার জন্য; দ্বিতীয়, রেলপথ, সেচের খাল, বাঁধ প্রভৃতি জনহিতকর কাজের জন্য। প্রথমোক্ত কাজের জন্য মূলধনের চাহিদা সুদের হারের উপর নির্ভর করে না। সুদের হার যাহাই হউক না কেন. যুদ্ধ পরিচালনা করিবার জন্য টাকা চাই। ব্যবসায়ীরা যেমন সুদের হার বুঝিয়া টাকা ধার লয়, তেমনি সরকারের দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজের জন্য টাকা ধার করা সুদের হারের উপরে নির্ভর করে। সাধারণ লোককে অনেক সময় প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনিবার জন্য ধার করিতে হয়। কিন্তু মূলধনের চাহিদার মোট পরিমাণের ইহা সামান্য অংশ মাত্র।

মূলধন দুইটি সূত্র হইতে পাওয়া যায়, লোকের সঞ্চয় এবং ব্যাঙ্ক। নানা কারণে লোকে নিজ আয়ের একটি অংশ সঞ্চয় করে। ইহা নগদ জমা রাখিতে পারে, অথবা খাতকদিগকে ধার দিতে পারে। সঞ্চিত অর্থ নগদ রাখিবে কিংবা ধারে বা অন্যান্য ভাবে খাটাইবে তাহা সুদের হারের উপর নির্ভর করে। সুদের হার খুব বেশী হইলে সকলেই বেশী ধার দিতে চাহিবে ও নগদ অর্থ কম জমা রাখিবে। তখন ঋণ দিবার লোকের সংখ্যা বাড়িবে। সুতরাং সুদের হার বাড়িলে মূলধনের যোগান বাড়িবে।

সুদের হার বৃদ্ধি হইলে মূলধনের চাহিদা কমিবে, কিন্তু যোগান যথেষ্ট বাড়িয়া যাইবে। লোকে তখন ধার দিতে উৎসুক হইবে। কিন্তু অত উচ্চ হারে সুদ দেওয়া ব্যবসায়ীর পক্ষে লাভজনক হইবে না। তাহারা কম করিয়া ধার করিতে চাহিবে। কাজেই তখন সুদের হার নামিয়া আসিবে। এই ভাবে চাহিদা এবং যোগান সমান হইলে সেই হারে সুদ নির্দিষ্ট হইবে।

সুদের হারের তারতম্য (Different rates of interest): মূলধনের যোগান ও চাহিদা দ্বারাই সুদের হার নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু সব দেনার সুদ একই হারে নির্দিষ্ট থাকে না। বিভিন্ন প্রকারের ঋণ বিভিন্ন হারে

সুদ দিতে হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও সুদের হার বিভিন্ন রকমের হয়। সুদের হার বিভিন্ন হইবার কারণ কি? ভারত সরকার মাত্র শতকরা ৩৲ টাকা দিয়া ধার কেন পায়, আর গরীব চাষীকে শতকরা ১৫৲ টাকা এমন কি ৩৫৲ টাকা সুদ কেন দিতে হয়? সুদের হারের এত তারতম্য কেন হয়?

মহাজন ধার দিয়া যে ঝুঁকি বহন করে তাহাই এই তারতম্যের প্রধান কারণ। কোন কোন ধারের কারবারে একেবারেই বিপদ নাই। ভারত সরকার কখনই নির্দিষ্ট সময়ে সুদ দিতে অথবা টাকা শোধ দিতে অন্যথা করিবে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অথবা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট দিনে সরকারের পক্ষ হইতে সুদ দেয়। তাই লোকে কম সুদেও সরকারকে ধার দেয়। ব্যবসায়ীদের ধার লইতে হইলে একটু বেশী সুদ দিতে হয়। কারণ তাহাদের ব্যবসায়ে কিছু ঝুঁকি আছে। ব্যবসায়ে লাভ না হইলে মহাজন টাকা আদায় করিতে কষ্ট পায়, কিংবা তাহাকে বন্ধকী মাল বিক্রয় করা প্রভৃতি অপ্রীতিকর পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। যে সব ব্যবসায়ী সুপ্রতিষ্ঠিত বা যাহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল তাহারা কম সুদে ধার পায়। যে খাতক সরকারী ঋণপত্র জামানত দিতে পারে, সে অন্য লোকের তুলনায় কম সুদে ধার পায়। খাতক ধার শোধ দিতে না পারিলে, মহাজন এই সব জিনিষ বিক্রয় করিয়া অনায়াসে টাকা ওয়াশীল করিয়া লইতে পারে। তাই বিনা জামানতে বা অল্প মূল্যের জামানতে ধার দেওয়া অপেক্ষা এইসব জামানতে ধার দিলে ঝুঁকি অনেক কম থাকে। আমাদের চাষীরা খুবই দরিদ্র। তাহাদের আয় এত কম যে ধার লইয়া ঠিক সময়ে সুদ বা আসল দিবার অঙ্গীকার তাহারা করিতে পারে না। কৃষকেরা মোটেই নির্ভরযোগ্য নহে। অনেক সময় ইচ্ছা করিয়াও তাহারা সুদের কিস্তি খেলাপ করে, হাতে টাকা থাকিলেও ধার শোধ দেয় না। ছোট ছোট জমি ছাড়া আর কিছু তাহাবা জামানত দিতে পারে না। তাই কৃষকদের ধার দেওয়াতে ঝুঁকি খুব বেশী বলিয়া সুদের হারও খুব বেশী হয়।

সুদের হারের তারতম্য হইবার আরও একটি কারণ মহাজনকে বিভিন্ন কারবারে বিভিন্ন রকমের পরিশ্রম করিতে হয় এবং ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয়। সে এই কাজ এবং ঝঞ্ঝাটের জন্য পারিশ্রমিক আশা করে। সরকারকে টাকা ধার দিলে কোন কাজই করিতে হয় না। আবার কৃষককে ধার দিলে মহাজনকে বহু ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয়। টাকা আদায় করিবার জন্য বহুবার অপ্রীতিকর

তাগিদ দিতে হয়। তাই মহাজন চাষীর নিকট হইতে অধিক সুদ দাবী করে। মহাজন ছাড়া আর কাহারও নিকট হইতে কৃষক ধার করিবার সুযোগ পায় না। এই একচেটিয়া অবস্থার সুযোগ লইয়া মহাজনেরা চড়া সুদ আদায় করে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

লাভ

উৎপাদনের জন্য উদ্যোক্তা যে পরিশ্রম করে তাহার পুরস্কারই লাভ (Profits)। উদ্যোক্তা (Entrepreneur) ভূমি, শ্রমিক এবং মূলধন নিয়োগ করিয়া নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী উৎপাদন করে। মাল উৎপন্ন হইলে সে উহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। সে জমির মালিককে নির্দিষ্ট হারে খাজনা, শ্রমিককে মজুরী এবং মূলধনের মালিককে সুদ দেয়। সব দিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহাই তাহার লাভ। এমনও হইতে পারে যে, সব প্রাপ্য মিটাইয়া কিছুই আর অবশিষ্ট থাকিল না। এমন অবস্থায় কিছুদিন তাহার কোন লাভ হয় না। আবার অন্য এক সময়ে তাহার খুব বেশী লাভ হইতে পারে। কাজেই লাভের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা অনিশ্চিত এবং অনিয়মিত। হঠাৎ দামের পরিবর্তনে ব্যবসায়ীর প্রচুর অর্থাগম হইতে পারে, অথবা সে দেউলিয়া হইয়া যাইতে পারে। মজুরী, সুদ এবং খাজনা পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট থাকে। লাভ সে ভাবে নির্দিষ্ট করা যায় না। মজুরী, খাজনা এবং সুদ সর্বনিম্ন একটা অঙ্কের নীচে কখনও নামিতে পারে না, কখনও তাহা শূন্যের নীচে যায় না। লাভ শূন্যও হইতে পারে, লাভ না হইয়া লোকসান হওয়াও বিচিত্র নহে। উদ্যোক্তা লাভ করিবার পরিবর্তে তাহার সব মূলধন খোয়াইয়া বসিতে পারে।

সাধারণত বলা হয় যে, খাজনা, মজুরী এবং সুদ দিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহাই লাভ। কিন্তু এই সব প্রাপ্য মিটাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার সবটাকে লাভ বলা যায় না। উদ্যোক্তা নিজের জমির উপরেই হয়ত কারখানা তৈয়ারী করিয়াছে, নিজের মূলধনই হয়ত ব্যবসায়ে খাটাইতেছে। তাহা হইলে এই উদ্যোক্তাকে খাজনা বা সুদ কিছুই দিতে হইবে না, কাজেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে ঐ দুইটি দেয় তাহাকে বাদ দিতে হয় না। কিন্তু জমি নিজের বা অপরের হউক উহার খাজনা এবং মূলধন নিজের বা ধার করা হউক উহার সুদ মোট লাভ হইতে বাদ দিতে হইবে। সব বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই উদ্যোক্তার লাভ।

লাভের উৎপাদন (Elements in profits) : উদ্যোক্তাকে বহু রকম কাজ করিতে হয়। তাহাকে ব্যবসায় পরিচালনা করিতে হয়। ইহার জন্য শ্রমিকের মতই তাহাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। এই কাজের জন্য সে একটি পারিশ্রমিক পাইতে পারে। ইহাকে অনেক সময় পরিচালনার পারিশ্রমিক (Earnings of management) বলা হয়। দ্বিতীয়ত, উদ্যোক্তা ব্যবসায়ের সব ঝুঁকি (Risk) বহন করে। ভবিষ্যতে কিরূপ চাহিদা এবং দাম হইতে পারে তাহা পূর্ব হইতেই চিন্তা করিয়া তাহাকে উৎপাদনের এমন ব্যবস্থা করিতে হয়, যাহাতে লাভ হইতে পারে। কিন্তু তাহার অনুমান ভুল হইতে পারে। চাহিদা হঠাৎ কমিয়া যাইতে পারে, কিংবা তাহার মাল গ্রাহকদের পছন্দসই না হইতেও পারে। তাহা হইলে ব্যবসায়ে লোকসান হইবে। সব ব্যবসায়ে বিপদ আছে। এই সব বিপদ এবং অনিশ্চয়তার জন্য কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলে কেহই ব্যবসায়ের ঝুঁকি বহন করিতে রাজী হইবে না। যে ব্যবসায়ে যত অনিশ্চয়তা এবং ঝুঁকি, তাহা হইতে লাভও তত বেশী হওয়া চাই। কাজেই ঝুঁকি বহন করিবার পুরস্কার লাভের অন্তর্ভুক্ত।

অনেক উদ্যোক্তার একচেটিয়া বা প্রায়-একচেটিয়া ব্যবসায় থাকে। উৎপাদনের ব্যয় কম হয় এইরূপ একটি যান্ত্রিক উন্নতির পেটেণ্ট বা কয়েকজন ব্যবসায়ী সংযুক্ত হইয়া, কিংবা সরকারের নিকট হইতে সনন্দ পাইয়া তাহারা একচেটিয়া অধিকার লাভ করিতে পারে। একচেটিয়া কারবারের অধিকারী উচ্চ মূল্য দাবী করিয়া বেশী লাভ করিতে পারে। এই ভাবে প্রায়ই-একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয়। এই অবস্থাতে অন্য প্রতিযোগী না থাকায় ঈষৎ উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া তাহারা বেশী লাভ করিতে পারে।

অচিন্ত্যনীয় কারণে ব্যবসায়ীদের হঠাৎ খুব লাভ হইতে পারে। ইংলণ্ড এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে জিনিষপত্রের মূল্য বাড়িয়া গেল। যে সব ব্যবসায়ীর নিকট মাল ছিল, তাহারা এই সুযোগে বহু লাভ করিয়াছিল। কাপড়ের উপর নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লইবার পর বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা হঠাৎ প্রচুর লাভ করে।

অতএব লাভের মধ্যে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি থাকে। পরিচালনার পারিশ্রমিক, ব্যবসায়ের ঝুঁকি বহন করিবার পুরস্কার, একচেটিয়া বা

উপ-একচেটিয়া কারবারের আয় এবং তেজীমন্দীর লাভ। মার্সাল প্রথম দুইটিকে স্বাভাবিক লাভ (Normal profit) আখ্যা দিয়াছেন। সব ব্যবসায়ীই কালক্রমে এই স্বাভাবিক লাভের অধিকারী হয়। তাহা না হইলে তাহারা ব্যবসায় ছাড়িয়া দিবে। ফলে উৎপাদন কমিয়া যাইবে। জিনিষের চাহিদা একই থাকিলে মূল্য বাড়িয়া যাইবে ও ব্যবসায়ীবা তাহাদের স্বাভাবিক লাভ অর্জন করিতে পারিবে। অতএব স্বাভাবিক লাভ উৎপাদনের ব্যয়েব একটি অংশ।

ষষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ

করনীতি

এই পরিচ্ছেদে রাষ্ট্রের আয় এবং ব্যয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। আধুনিক যুগে রাষ্ট্র অনেক কাজ করিয়া থাকে। নিরাপত্তা না থাকিলে দেশের আর্থিক উন্নতি হওয়া অসম্ভব। তাহার ব্যবস্থা রাষ্ট্রকেই করিতে হয়। প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জনসাধারণের মঙ্গলের ব্যবস্থাও রাষ্ট্র করিয়া থাকে। আজকাল ক্রমেই রাষ্ট্র অধিকসংখ্যক অর্থনৈতিক কাজে হাত দিতেছে। রেলপথ ও ডাকবিভাগ পরিচালনায়, সাধারণের স্বার্থের সহিত জড়িত শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণ; কারখানার শ্রমিকের কাজ নিয়ন্ত্রণ; বেকার, পীড়িত এবং বৃদ্ধের সহায়তা প্রভৃতি বহু কাজ রাষ্ট্রকে করিতে হয়। এই সব কাজ করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। ধনবিজ্ঞানের এই বিভাগটিতে সরকারী আয় এবং ব্যয়ের আলোচনা করা হয়।

ব্যক্তিগত আয়ব্যয় এবং সরকারী আয়ব্যয় (Private and Public Finance): সরকারী আয়ব্যয় কি সাধারণ-লোকের আয়ব্যয়ের মত একই নিয়মে চলে? সরকারকেও সাধারণ লোকের মত আয় করিতে হয়। এবং কিরূপে তাহা ভালভাবে ব্যয় করা যায়, তাহা চিন্তা করিতে হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত আয়ব্যয়ের সহিত সরকারী আয়ব্যয়ের পার্থক্য আছে। সাধারণ লোক আয় অনুযায়ী ব্যয় করে। আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইলে তাহাকে খরচ কমাইতে হয়। কিন্তু সরকার ব্যয়ের অনুপাতে আয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে। সরকার যদি দেখে যে, রাজস্ব হইতে সব ব্যয় নির্বাহ হইবে না, তাহা হইলে নূতন কর ধার্য করিয়া আয় বাড়াইতে চেষ্টা করে। সাধারণ লোক সরকারের মত আয় বাড়াইতে পারে না। মোটামুটি কি আয় হইতে পারে চিন্তা করিয়া লোকে তদনুযায়ী ব্যয় করে। দুইয়ের মধ্যে আরও একটি পার্থক্য আছে। বহু চেষ্টা করিয়াও লোকে যদি ব্যয় না কমাইতে পারে, তবে সে অপরের নিকট টাকা ধার করে। সরকারও ব্যয়ের তুলনায় আয়ের পরিমাণ বাড়াইতে না পারিলে ধার করে। এই ধার সে বিদেশ হইতে কিংবা দেশবাসীর নিকট হইতে লইতে পারে। আবার কাগজী অর্থ ছাপাইয়াও ব্যয়নিবাহ

করিতে পারে। কিন্তু সাধারণ লোক নিজের হ্যাণ্ডনোটকে বিহিত অর্থ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে না।

রাজস্বের উৎস (Sourcss of revenue) : বিভিন্ন দিক হইতে রাষ্ট্রের আয় হয়।

প্রথমত, সাধারণ ব্যক্তির মতই রাষ্ট্রেরও সম্পত্তি থাকে এবং তাহা হইতে আয় হয়। আমাদের রাজ্য সরকারগুলি বহু বনের মালিক। বনজ উৎপন্ন বিক্রয় করিয়া তাহাদের বেশ আয় হয়।

দ্বিতীয়ত, সাধারণ ব্যক্তির মত সরকারও ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া লাভ করে। ভারত সরকার রেলের মালিক। রেল পরিচালনা করিয়া ও ডাকবিভাগ পরিচালনা করিয়া প্রত্যেক বৎসরই কিছু রাজস্ব পায়। রেল ও ডাকবিভাগ হইতে সরকার যে অর্থ পায়, তাহাকে দাম (Price) বলে।

তৃতীয়, আবার কোন লোকের জন্য কোন কাজ করিয়া সরকার ফি (Fees) আদায় করে। মোটরমালিককে সরকার অনুমতিপত্র দেয়। এই অনুমতিপত্র পাইলেই সে রাজপথে মোটর চালাইবার অধিকার পায়, পরিবর্তে সে সরকারকে ফি বাবদ কিছু অর্থ দেয়।

চতুর্থ, সরকারের আয়ের সর্বাপেক্ষা বড় উপায় হইতেছে কর (Taxes)। কর হইতেই সরকারের অধিকাংশ আয় হয়। আয়কর, উত্তরাধিকার কর, আমদানী-রপ্তানীকর, বিক্রয় কর প্রভৃতি বহু কর ধার্য করিয়া রাজস্ব আদায় করা হয়।

কর (Tax) : সরকার প্রত্যেকের নিকট হইতে কর আদায় করে। কর কাহাকে বলে ? করের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, কর দেওয়া বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ কর প্রত্যেককেই দিতে হয়। দ্বিতীয়ত, কর দিয়া করদাতা সরকারের নিকট হইতে কোন প্রতিদান পায় না। প্রজাদের সাধারণ ভাবে মঙ্গলবিধানের উদ্দেশ্যে কর ধার্য হয়। কাহাকেও কোন বিশেষ সুবিধা দিয়া পরিবর্তে কর লওয়া হয় না। অতএব বলা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্রের সাধারণ উদ্দেশ্যের জন্য কর ধার্য হয়। নাগরিকগণের জন্য সরকার যখন বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করে, তাহার পরিবর্তে দাম অথবা ফি আদায় করে। যেমন মোটর চালাইবার অনুমতি দিয়া চালকের নিকট হইতে সরকার ফি আদায় করে। আয়কর যাহাকে দিতে হয়, সে সরকারের নিকট হইতে কোন বিশেষ সুবিধা পায় না। আয়-করের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে প্রত্যেককে উহা অবশ্য

দিতে হইবে। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী আয় হইলে প্রত্যেককে আয়কর দিতে হয়। কিন্তু চিঠি না লিখিলে বা তার না করিলে কাহাকেও পোস্টকার্ড বা টেলিগ্রাম বাবদ কিছু দিতে হয় না। সুতরাং যাহা দিয়া করদাতা মুখ্যত কোন বিশেষ সুবিধা পায় না, সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট এইরূপ বাধ্যতামূলক দানকে কর বলে।

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর (Direct and Indirect Taxes): কর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়—প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। সরকার কতকগুলি লোকের উপর কর ধার্য করিয়া তাহাদের নিকট হইতে অর্থ আদায় করে। এই লোকগুলি করের বোঝা অপরের কাঁধে চাপাইয়া দিতে পারে, আবার হয়ত তাহা সম্ভব নাও হইতে পারে। যাহার উপরে কর ধার্য হইল সে হয়ত প্রথমে কর দেয়, কিন্তু পরে আবার অপরের নিকট হইতে উহা আদায় করিয়া লয়। এইভাবে যে করের বোঝা অপরের কাঁধে চাপাইয়া দেওয়া যায় তাহাকে পরোক্ষ কর (Indirect tax) বলে। বিক্রয় কর পরোক্ষ করের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। দোকানদারদের উপরে প্রথম এই কর ধার্য করা হয়। দোকানদার আবার বেশী দাম লইয়া গ্রাহকের নিকট হইতে তাহা আদায় করিয়া লয়। এই কর শেষ পর্যন্ত গ্রাহককেই দিতে হয়, যদিও সরকার তাহা দোকানদারদের নিকট হইতে আদায় করে। দ্রব্যের উপরে ধার্য কর এইরূপ পরোক্ষ কর। আবগারী কর, আমদানী শুল্ক প্রভৃতি পরোক্ষকরের দৃষ্টান্ত।

যাহার উপরে কর ধার্য করা হয় সে যখন নিজেই করের বোঝা বহন করে, তখন সেই করকে প্রত্যক্ষ কর (Direct tax) বলে। আয়কর ও উত্তরাধিকারকরকে প্রত্যক্ষ কর বলে। যাহাকে আয়কর দিতে হয়, সে অন্যের ঘাড়ে এই বোঝা চাপাইয়া দিতে পারে না।

প্রত্যক্ষ করের উপযোগিতা (Merits of direct taxes): প্রত্যক্ষ করের কয়েকটি গুণ আছে। প্রথমত, করদাতাকেই করভার বহন করিতে হয়। কাজেই কর যে দিতেছে তাহা সে জানে। আয়কর যাহাকে দিতে হইবে কর দেওয়া সম্বন্ধে তাহার মনে কোন সন্দেহ থাকে না। ফলে করদাতার নাগরিক চেতনা জাগরিত হইবে। তাহা হইলে গণতান্ত্রিক দেশে করদাতা সরকারী ব্যয় বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবে। দ্বিতীয়, প্রত্যক্ষ করের প্রধান গুণ ইহাই যে, সরকার প্রত্যেকের উপরে যথাযথভাবে করভার ধার্য করিতে পারে। পরোক্ষ

করে তাহা সম্ভব নহে। প্রত্যক্ষ করে সরকার জানে কে কর দিবে। তাহা হইলে এমন ভাবে কর ধার্য করা যায় যাহাতে দরিদ্র অপেক্ষা ধনীকে বেশী কর দিতে হয়। আয়কর এমন ভাবে স্থির করা হয় যাহাতে অধিক আয়ের লোকদিগকে কম আয়ের লোক অপেক্ষা বেশী কর দিতে হয়। এই ভাবে যাহার কর দিবার ক্ষমতা অধিক, তাহার উপরেই বেশী করভার পড়ে। তাহা ছাড়া প্রত্যক্ষ করে কর ধার্যের একটি নিয়ম পালিত হয়। ঐ নিয়মটি হইতেছে কর ধার্যের নিশ্চয়তা। করদাতা জানিতে পারে যে তাহাকে কত কর দিতে হইবে।

প্রত্যক্ষ করের অসুবিধা (Demerits of direct taxes) : প্রত্যক্ষ করের প্রধান ত্রুটি হইতেছে ইহা সরকারকে অপ্রিয় করিয়া তোলে। করভার বাড়িতে থাকিলে করদাতা সরকারের উপরে অসন্তুষ্ট হয়। দ্বিতীয়ত, ইহাতে মিথ্যাচার বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। লোকে আয়কর না দিবার জন্য নানা প্রকারের অন্যায় পন্থা অবলম্বন করে। স্বেচ্ছায় নিজের প্রকৃত আয়ের হিসাব সরকারের নিকট দাখিল করিয়াছে একথা জোর করিয়া খুব কম লোকই বলিতে পারে। আয়কর বেশী হারে ধার্য করা হইলে লোককে অসাধু করিয়া তোলা হয়। ইহা ছাড়া আরও একটি ত্রুটি আছে। সরকার যদি শুধু প্রত্যক্ষ কর ধার্য করে, তাহা হইলে প্রত্যেক লোকের নিকট হইতে কিছু না কিছু অর্থ আদায় করা সম্ভব হয় না। প্রত্যেকের নিকট হইতে আয় কর আদায় করা যায় না। বহুলোক সরকারকে কোন কর দিবে না ইহা কাম্য নহে।

পরোক্ষ করের গুণ (Merits of indirect taxes) : যেহেতু প্রকৃত করদাতা বুঝিতে পারে না যে সে কর দিতেছে, তাই কর দেওয়া সম্বন্ধে তাহার অনুযোগ থাকে না। পরোক্ষ কর এই কারণে সাধারণের মধ্যে তত বেশী অসন্তোষ সৃষ্টি করে না। রাজস্ব-সচিবের ইহা একটি মস্ত সুবিধা। দ্বিতীয়ত, দ্রব্যের উপরে পরোক্ষ কর ধার্য করিলে প্রত্যেককেই কিছু কর দিতে হয়। সকলেই লবণ ব্যবহার করে, কাজেই লবণের উপর কর ধার্য করিলে প্রত্যেককেই কিছু কর দিতে হইবে। সুনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত থাকার সুবিধা সকলেই ভোগ করে। কাজেই প্রত্যেকেরই কিছু কর দেওয়া উচিত। তৃতীয়ত, মদ এবং মাদক দ্রব্যের উপরে পরোক্ষ কর ধার্য করিলে উহাদের মূল্য বৃদ্ধি হয়। মূল্য বৃদ্ধি হইলে লোকে তাহা কম ব্যবহার করিবে। এইভাবে পরোক্ষ কর সামাজিক মঙ্গল সাধন করে।

পরোক্ষ করের ত্রুটি (Demerits of indirect taxes) : প্রথমত, পরোক্ষ কর ধার্যের ফলে লোকের নাগরিক চেতনা জাগরিত হয় না। দ্রব্যের উপরে কর ধার্য করিলে ক্রেতাকে অধিক দাম দিতে হয়। এইভাবে করভার তাহাদের স্কন্ধে আসিয়া পড়ে। কিন্তু ক্রেতারা সব সময়ে বুঝিতে পারে না যে তাহারা কর দিতেছে। এই কারণেই তাহাদের কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয় না।

পরোক্ষ করের দ্বিতীয় ত্রুটি এই যে, ইহাতে করধার্যের আদর্শ পালিত হয় না। আদর্শটি হইতেছে করভারের সমতা। লবণ প্রত্যেকেই ব্যবহার করে। কাজেই প্রত্যেককেই লবণকর দিতে হয়। গরীবের লবণের প্রয়োজন ধনী অপেক্ষা কম নহে। অতএব ধনী এবং দরিদ্র উভয়কেই সমান হারে কর দিতে হয়। ইহা ন্যায্য নহে। গরীবের কর দিবার ক্ষমতা ধনী অপেক্ষা অনেক কম বলিয়া তাহার নিকট কম কর আদায় করা উচিত।

সব দিক বিবেচনা করিয়া বলিতে হয় যে, পরোক্ষ কর অপেক্ষা প্রত্যক্ষ কর ধার্য করাই শ্রেয়।

করধার্যের নীতি (Canons of taxation) : আদম স্মিথ কর ধার্য করিবার কয়েকটি আদর্শ বা নিয়ম বলিয়া দেন। চারিটি আদর্শ লক্ষ্য রাখিয়া কর ধার্য করিতে হইবে, যথা, সাম্য, নিশ্চয়তা, সুবিধা এবং ব্যয়বাহুল্যহীনতা।

সাম্যের নীতিতে (Canon of equality) বলে যে, প্রত্যেক নাগরিক নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী কর দিবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণে থাকিবার ফলে প্রত্যেকের যেমন আয় হয়, তদনুযায়ী তাহাকে কর দিতে হইবে। প্রত্যেকে নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী কর দিবে। কিন্তু এই ক্ষমতা কি করিয়া স্থির করা হইবে ? আয় দ্বারাই এই ক্ষমতা পরিমিত হইবে। স্মিথ এই আদর্শ সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, করভারের সমতা আনিতে হইলে প্রত্যেককে তাহার আয় অনুপাতে কর দিতে হইবে। আবার সেই পুস্তকের অন্যত্র বলিয়াছেন যে, গরীব অপেক্ষা ধনী যে অধিক কর দিবে তাহা ন্যায্য। আমাদের নিকট এই মত ঠিক বলিয়া মনে হয়।

নিশ্চয়তার আদর্শ (Canon of certainty) এই যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে কর দিতে হয় তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। খুশীমত কর আদায় করা চলিবে না। কর দিবার সময়, নিয়ম ও পরিমাণ পরিষ্কার করিয়া করদাতাকে

জানাইয়া দিতে হইবে। এই আদর্শ সম্বন্ধে কোনও ব্যাখ্যা প্রয়োজন নাই। যখন রাজারা খুশীমত কর আদায় করিতেন, তখনকার দিনে এই আদর্শের প্রয়োজনীয়তা ছিল।

সুবিধা সম্বন্ধে নীতিটিও (Canon of convenience) করদাতার স্বার্থের অনুকূল। এই নীতিতে বলে যে কর এরূপ সময়ে এবং এরূপ উপায়ে আদায় করা হইবে যাহা করদাতার পক্ষে সুবিধাজনক। করদাতার রক্ত শোষণ করিতে হইলে সরকারের ধারালো ছুরির সাহায্য লওয়াই ভাল। কিন্তু এমন করদাতার সংখ্যা নিতান্তই কম, কোন্ সময়ে যে মনে করে কর দেওয়া তাহার পক্ষে এখন সুবিধাজনক। যাহা হউক, এই নীতি আয়কর কর্মচারীর টেবিলের সম্মুখে লিখিয়া রাখা প্রয়োজন।

ব্যয়বাহুল্য হীনতার নীতিটি (Canon of economy) রাজস্ব সচিবের পক্ষে খুবই মূল্যবান। "এমনভাবে কর ধার্য করিতে হইবে যাহার ফলে রাষ্ট্রের ভাণ্ডারে যাহা জমা হইবে, তদতিরিক্ত লোকের নিকট হইতে কিছুই না লইতে হয়।" অর্থাৎ কর আদায় করিবার ব্যয় যতদূর সম্ভব কম হওয়া উচিত। কর আদায় করিতে বহু অর্থ ব্যয় হইলে সেই কর বর্জনীয়।

উপরোক্ত নীতিগুলির মধ্যে প্রথমটি খুবই প্রয়োজনীয়। এই নীতিতে সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে করভার বণ্টন করিয়া দিবার কথা বলা হইয়াছে। অন্যান্য নীতিগুলি শাসনবিভাগের জন্য রচিত। আজকাল উপরোক্ত নীতিগুলির সহিত আরও দুই একটি নীতি যোগ করা হইয়াছে। প্রত্যেক করব্যবস্থায় এমন দুই একটি কর থাকা উচিত যাহা বাড়ান কমান চলে। প্রয়োজনের সময় এই করের হার সামান্য বাড়াইয়া দিয়া সরকার বহু রাজস্ব আদায় করিতে পারে। ভারত সরকার পূর্বে যখনই প্রয়োজন হইত, লবণকর বাড়াইয়া দিত। একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আয়করও খুব স্থিতিস্থাপক (Canon of elasticity)।

আরও একটি নীতি আছে। কর এইভাবে ধার্য করা উচিত, যাহা হইতে বহু রাজস্ব আদায় হয়। ইহাকে উৎপাদন ক্ষমতার নীতি (Canon of productivity) বলে। কিন্তু তাহা করিতে গিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প ব্যাহত করিলে চলিবে না। যাহা দেশের শিল্প ও বাণিজ্য ব্যাহত করে তাহা হইতে পরিণামে জাতীয় আয়ও কমিয়া যাইবে। তাহার ফলে প্রত্যেকেই অপেক্ষাকৃত গরীব হইয়া পড়িবে এবং দেশের রাজস্বও কমিয়া যাইবে।

করনীতি (Principles of taxation) : কর ধার্য করিতে কোন নিয়ম অবলম্বন করা উচিত? আদম স্মিথ কথিত প্রথম নীতিতেই এই নিয়ম বলা হইয়াছে। প্রত্যেকের দিবার ক্ষমতা অনুযায়ী কর ধার্য হওয়া উচিত। ইহাই ন্যায্য। রাষ্ট্র সকলের মঙ্গলদায়ক প্রতিষ্ঠান। কাজেই সেই সঙ্গে প্রত্যেকেই যথাশক্তি রাষ্ট্রকে পুষ্ট করিবে ইহাই ন্যায়সঙ্গত। এই নীতি সর্বত্র সাম্যমূলক বলিয়া স্বীকৃত। কিন্তু বিরোধ উপস্থিত হয় ক্ষমতার পরিমাপ লইয়া। লোকের কর দিবার ক্ষমতা কি ভাবে মাপা যায়? আদম স্মিথ আয়কেই কর দিবার ক্ষমতার পরিমাপক স্থির করিয়াছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার আয়ের অনুপাতে কর দিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যেকে তাহার আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ সরকারকে দিবে। ইহাকে আনুপাতিক করনীতি (Proportional taxation) বলা হয়।

কিন্তু এই নীতি কি ন্যায়সঙ্গত? প্রত্যেকে যদি শতকরা ১০৲ টাকা কর দেয়, তবে যাহার ১,০০০৲ টাকা আয় তাহাকে ১০০৲ টাকা কর দিতে হইবে এবং যাহার আয় ১০০৲ টাকা তাহাকে ১০৲ টাকা দিতে হইবে। প্রথম ব্যক্তির পক্ষে তাহার আয় হইতে ১০০৲ টাকা দেওয়া কষ্টকর নহে। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির সামান্য আয় হইতে ১০৲ টাকা দেওয়াও কঠিন।

অতএব দ্বিতীয় ব্যক্তির ত্যাগ প্রথম ব্যক্তির ত্যাগ অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে, যদিও করের হার দুইজনের পক্ষেই সমান। আয় যত বাড়ে, কর দিবার ক্ষমতাও তত বৃদ্ধি পায়। এইজন্য যাহাদের আয় বেশী, তাহাদের বেশী কর দেওয়া উচিত। তাহাদের উপর করের অনুপাত অপেক্ষাকৃত কম আয়ের লোকের সমান হইবে না, উহার অনেক বেশী হইবে। আয় যত বেশী হইবে দেয় করের অনুপাত ততই বেশী হইবে। ইহাকে প্রগতিশীল করনীতি (Progressive taxation) বলে। যাহার আয় ১০০৲ টাকা সে শতকরা ৪৲ টাকা কর দিবে, যাহার আয় ৫০০৲ টাকা সে শতকরা ৮৲ টাকা দিবে, যাহার আয় ১,০০০৲ টাকা সে শতকরা ১২৲ টাকা দিবে ইত্যাদি। এই নীতি অনেকেই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করেন। আয় যেমন বাড়িবে করভার তেমনি বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। ধনীদের প্রশস্ত স্কন্ধে করভারের অধিকাংশ চাপাইয়া দিয়া গরীবের আয়ের সামান্য একটা অংশ লওয়া উচিত।

কিন্তু সব কর প্রগতিশীল নীতি মানিয়া বসান হয় না। আয়কর এবং

উত্তরাধিকারীকর সাধারণত প্রগতিশীল। যাহার বার্ষিক আয় ৪,২০০৲ টাকা, সে ৯ পাই আয়কর দেয়। ক্রোড়পতিকে টাকায় ৮৶০ আনা কর দিতে হয়। আমদানী-রপ্তানী শুল্ক, আবগারী কর, বিক্রয় কর প্রভৃতি সর্বপ্রকার পরোক্ষ কর প্রগতিশীল নীতিবিরোধী। ধনীদের অনুপাতে এই সব কর গরীবেরা অনেক বেশী দিয়া থাকে। এইজন্য এই করকে অধোগতিমূলক (Regressive taxation) বলা হয়। ইহাতে ধনী অপেক্ষা গরীবের উপর বেশী চাপ পড়ে।

বিভিন্ন প্রকারের করঃ সবাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর হইল **আয়কর**। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক আয় হইলে এই কর দিতে হয়। সরকার প্রতি বৎসর এই করের হার স্থির করিয়া দেয়। এই করের হার প্রগতিমূলক। আয় যত বাড়িতে থাকে করের হারও তত বৃদ্ধি পায়। এই কর হইতে সরকারের অনেক রাজস্ব আদায় হয়। জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইলে এই করের হার খুবই বাড়ানো হয়। গত যুদ্ধের সময়ে সব দেশেই আয়কর বহুগুণ বৃদ্ধি করা হইয়াছিল।

উত্তরাধিকারী কর (Death duty)ঃ মৃত ব্যক্তি সম্পত্তি রাখিয়া গেলে উত্তরাধিকারীদের কর দিতে হয়। আয়করের মত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যের সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পাইলে কোন কর দিতে হয় না। সম্পত্তির মূল্য যতই বেশী হয় এই করের হারও তত বৃদ্ধি পায়। কখন কখন আর একভাবে কর ধার্য হয়। মৃত ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ যত দূর হয়, করের হারও তত বেশী হয়। সন্তানসন্ততি অপেক্ষা দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের উত্তরাধিকার কর বেশী হারে দিতে হয়।

পরোক্ষ করের মধ্যে সবপ্রধান হইতেছে আগম-নিগম শুল্ক (Customs)। এই শুল্ক দুই প্রকারের, **আমদানী শুল্ক** এবং **রপ্তানী শুল্ক**। বিদেশ হইতে যে সকল মাল আমদানী করা হয়, তাহার উপরে আমদানী শুল্ক (Import duty) ধার্য করা হয়। রাজস্ব আদায় করিতে এবং দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ করিতে, এই দুই কারণে আমদানী শুল্ক ধার্য করা হয়। দেশীয় শিল্প রক্ষা করিতে সরকার অনেক সময়ে খুব উচ্চহারে শুল্ক বসায়। ফলে, আমদানী দ্রব্যের দাম না বাড়াইয়া উপায় থাকে না। তাহা হইলে দেশীয় দ্রব্যের বিক্রয় বাড়িতে পারে। এই উদ্দেশ্য ছাড়াও নিছক রাজস্ব আদায়ের জন্য আমদানী শুল্ক ধার্য করা হয়। বিদেশে যে সকল মাল চালান যায়, তাহার উপরে যে শুল্ক

ধার্য করা হয়, তাহাকে **রপ্তানী শুল্ক** (Export duty) বলা হয়। ভারতে পাটের উপর রপ্তানী শুল্ক ধার্য আছে।

উৎপাদন শুল্ক (Excise Duty) : ইহা এক প্রকারের পরোক্ষ কর। দেশে যে সকল সামগ্রী উৎপন্ন এবং বিক্রয় হয়, তাহার উপরেই এই কর ধার্য করা হয়। নিছক রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে এই শুল্ক ধার্য হইতে পারে। আবার ক্ষতিকর এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিষের ব্যবহার কম বা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যেও এই শুল্ক ধার্য করা হয়। মদের উপরে ধার্য কর ইহারই দৃষ্টান্ত। উচ্চহারে কর ধার্য করিলে মদের মূল্য বৃদ্ধি হয় ও তাহার ফলে ইহার ব্যবহার কমিয়া যায়।

দেশী ও বিদেশী দ্রব্য দেশে বিক্রয় করা হইলে তাহার উপরে অনেক সময়ে কর ধার্য করা হয়। বিক্রয়ের সময়ে এই কর আদায় করা হয় বলিয়া ইহাকে **বিক্রয় কর** (Sales tax) বলে। ইহাও পরোক্ষ কর।

জাতীয় ঋণ (Public Debt) : সরকার নিজের ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য যতদূর সম্ভব রাজস্ব আদায় করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু কর ধার্য করিয়া অনেক সময়ে সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। আজকাল যুদ্ধের জন্য বিরাট ব্যয় হয়। এই ব্যয়ভার কর হইতে নির্বাহ করা যায় না। ইহা নির্বাহ করিতে হইলে যেরূপ উচ্চহারে কর ধার্য করিতে হয়, তাহাতে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি হইতে পারে। সুতরাং যুদ্ধবিগ্রহ এবং জরুরী অবস্থায় সরকার সাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে। অন্যান্য কারণেও এইরূপ ঋণ গ্রহণ করা হয়। যেমন নূতন রেলপথ স্থাপন করিতে বা সেচের খাল খনন করিতে এইরূপ ঋণ গ্রহণ করা প্রয়োজন হইতে পারে। ইহাতে যে আয় হইবে তাহা সুদ এবং আসল পরিশোধ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। এই সব উৎপাদনশীল কার্যের জন্য সরকার ধার করে। সরকার যে ঋণ গ্রহণ করে তাহাকে **জাতীয় ঋণ** বলে। কারণ, এই ঋণ সাধারণের নিকট হইতে সাধারণের হিতার্থেই গ্রহণ করা হয়।

সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় সরকারও ঋণ গ্রহণ করিলে নির্দিষ্ট সময় অন্তে পরিশোধ করিতে অঙ্গীকার করে, তখন ইহাকে **স্বল্পমেয়াদী ঋণ** (Floating or unfunded debt) বলা হয়। ট্রেজারী বিল এই শ্রেণীর ঋণ। তিন মাসে শোধ দিবার অঙ্গীকারে সরকার এই হুণ্ডি সাধারণের নিকট বিক্রয় করে।

সরকারী রাজস্ববিভাগ বা ট্রেজারী হইতে এই হুণ্ডি বিক্রয় হয় বলিয়া ইহাকে ট্রেজারী বিল বলে। দীর্ঘদিনের মেয়াদে ঋণ গ্রহণ করিলে তাহাকে **দীর্ঘমেয়াদী ঋণ** (Funded Loan) বলা হয়। পূর্বে এক কথাটি অনির্দিষ্ট কালের জন্য গৃহীত ঋণের সম্পর্কে ব্যবহৃত হইত ; সরকার শুধু নিয়মিত সময়ে সুদ দিবার অঙ্গীকার করিত।

দেশের লোকদের নিকট হইতে অথবা বিদেশ হইতে এই ঋণ গ্রহণ করা হয়। প্রথমটি আভ্যন্তরীণ এবং দ্বিতীয়টি বাহ্যিক ঋণ। আরও এক উপায়ে জাতীয় ঋণের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। রেলপথ ইত্যাদি তৈয়ারীর জন্য যে ঋণ গ্রহণ করা হয়, তাহাকে উৎপাদনশীল ঋণ (Productive Debt) বলা হয়। ঋণ-লব্ধ অর্থ এইভাবে খাটাইলে তাহা হইতে যে আয় হয়, তাহা সুদ এবং আসল শোধ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। যুদ্ধ ইত্যাদির জন্য যে ঋণ গ্রহণ করা হয় তাহাকে অনুৎপাদনশীল (Unproductive Loan) বলা হয়।

জাতীয় ঋণ পরিশোধ (Repayment of Debts) : জাতীয় ঋণের সুদ সরকারের সাধারণ রাজস্ব হইতে দেওয়া হয়। আসল পরিশোধ করিবার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হয়। সাধারণ উপায় হইতেছে 'নিমজ্জিত তহবিল' (Sinking fund) সৃষ্টি করা। প্রতিবৎসর সাধারণ রাজস্ব দিয়া সরকার একটি অংশ আলাদা করিয়া রাখে। পরে এই টাকা হইতে ঋণ পরিশোধ করা হয়। দ্বিতীয়ত, সরকার উহাদের সুদের ঋণ কম হারে পরিবর্তিত করিয়া দেয়। কিছুদিন পূর্বে আমাদের দেশে শতকরা ৩৷৹ হারের ঋণ শতকরা ৩৲ টাকায় পরিবর্তিত করা হইয়াছে। বাজারে সুদের হার ৩৲ টাকা অথবা তাহার নীচে নামিয়া আসিলে সরকার প্রত্যেক ঋণদাতাকে তাহাদের ঋণপত্র তিন টাকা হারে পরিবর্তিত করিয়া লইতে, অথবা টাকা ফেরৎ লইতে বলে। যাহারা সরকারকে ধার দিয়াছিল, তাহারা হয় টাকা ফেরৎ লয়, আর না হয় সরকারের নির্দিষ্ট সুদ পরিবর্তিত করিয়া লয়। ঋণদাতারা জানে যে বাজারে অর্থ বিনিয়োগ করিলে বিনা ঝুঁকিতে শতকরা ৩৲ টাকার বেশী সুদ পাওয়া সম্ভব নহে। তাই তাহারা পুরাতন ঋণপত্রের বদলে নূতন ঋণপত্র গ্রহণ করিতে রাজী হয়। ইহাকে ঋণপরিবর্তন (Conversion of loans) বলা হয়। ইহাতে অবশ্য পুরাতন ঋণের আসল আদৌ শোধ হয় না, কেবল দেয় সুদের পরিমাণ কমিয়া যায়। যুদ্ধের সময়ে সরকার যে ঋণ গ্রহণ

করে, তাহা আরও এক উপায়ে পরিশোধ করা হয়। যুদ্ধের সময়ে সরকার বহু টাকা ঋণ গ্রহণ করে। যুদ্ধের পরে মূলধন কর (Capital levy) ধার্য করিয়া ঐ ঋণ পরিশোধ করা যায়। প্রত্যেকের মোট ধন হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন বাদ দিয়া যাহা বেশী থাকে, তাহাব উপবে কর ধার্য করা হয়।

ভারতীয় ধনবিজ্ঞান

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ

ভারতবর্ষের নাগরিককে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। দেশে নানারকম অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে তাহাকে মতামত প্রকাশ করিতে হইবে। সুতরাং এই খণ্ডে প্রথমে ভারতের অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রত্যেক সমস্যা বিচার ও তাহার সমাধানের ইঙ্গিত দিবার চেষ্টা করা হইবে।

প্রথমেই ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। ইহাই অর্থনৈতিক কার্যাবলীর ভিত্তি। যে দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ যত বেশী, সেই দেশ তত ঐশ্বর্যশালী হইবার সম্ভাবনা। প্রাকৃতিক সম্পদ এবং তাহার ব্যবহারের উপরেই দেশের ঐশ্বর্য নির্ভর করে। পৃথিবীতে এমন সব দেশ আছে, যেখানে লোকের সামান্য চেষ্টাতেই প্রকৃতি উদার হস্তে আপনার ভাণ্ডারদ্বার খুলিয়া দেয়। আবার সাহারা মরুভূমির মত স্থানে প্রকৃতি এতই কৃপণ যে, সভ্য ভাবে কোন জীবনযাপনই সম্ভব নহে। এইজন্য দেশে ভৌগোলিক পরিস্থিতি, খনিজ-সম্পদ এবং ভূমির গুণাগুণ, আবহাওয়া প্রভৃতির উপর দেশের ঐশ্বর্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ কিরূপ? রাসিয়া এবং ফরাসী দেশ বাদ দিলে ইউরোপের যে আয়তন ভারতবর্ষের আয়তনও ততখানি। উহার পরিমাণ ১২·৬ লক্ষ বর্গমাইল। দেশের আয়তন হিসাবে ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সপ্তম স্থান অধিকার করে। আমাদের দেশ ইংলণ্ড হইতে ১৩ গুণ বড় ও আমেরিকার তিনভাগের একভাগ ও সোভিয়েট রাসিয়ার সপ্তমাংশের এক অংশ। আয়তন যেমন বড়, ইউরোপ ও সুদূর প্রাচ্যের বাণিজ্য পথগুলির মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া ভারতবর্ষের পরিস্থিতিও খুব ভাল। চীন, জাপান, ইরাণ, ইরাক, ঈজিপ্ট, দক্ষিণ আফ্রিকা, বর্মা, শ্যাম, ইন্দোনেসিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, ইংলণ্ড এবং রাসিয়ার সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপন করা ভারতবর্ষের পক্ষে কিছুমাত্র কষ্টকর নহে। ভারতবর্ষে ৩,৫০০ মাইল উপকূল

আছে, কিন্তু ভাল পোতাশ্রয়ের সংখ্যা নিতান্তই কম। পোতাশ্রয়ের সংখ্যা কম বলিয়া কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজই বৈদেশিক বাণিজ্যের কেন্দ্র।

প্রাকৃতিক বিভাগ: ভৌগোলিক দিক হইতে ভারতবর্ষ তিন ভাগে বিভক্ত। উত্তরে হিমালয় পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা। ভারতবর্ষের আর্থিক জীবনে হিমালয়ের প্রভাব অপরিসীম। হিমালয় পর্বতের জন্য এসিয়ার শুষ্ক বাতাস এদেশে আসিতে পারে না, এবং ভারত মহাসমুদ্র হইতে উত্থিত আর্দ্র বায়ু উত্তরে যাইতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই কারণে হিমালয় আমাদের আবহাওয়ার উন্নতি করিয়াছে। হিমালয়ের চিরতুষার চূড়াগুলি ভারতের নদীর জল যোগায়। সুতরাং হিমালয় আমাদের দেশের জমির উবর্তা রক্ষা করিতেছে। হিমালয় হইতে আমরা বহু কাঠ পাই। হিমালয়ের নীচের সমতলভূমি (Indo-Gangetic plains) হিমালয়ের পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিন্ধ্যাচল পর্যন্ত বিস্তৃত। এইস্থানে গম, বাজরা, যব, আখ, তৈলবীজ, ধান, পাট প্রভৃতি প্রায় সকল প্রকার শস্যই হয়। অবশিষ্ট অংশ ভারতবর্ষের প্রাচীনতম প্রদেশ। ইহাকে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি বলে। ইহার দুই পার্শ্বে পূর্ব ঘাট ও পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা। এই অংশের মানচিত্রের চেহারা বিপরীতমুখী ত্রিভুজের মত। দাক্ষিণাত্যে নানারকম কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং এই অংশে খনিজ সম্পদ আছে।

মাটি: ভারতবর্ষে চার প্রকারের মাটি আছে। তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান পলিমাটি (Alluvial soil)। দেশের বহু সংখ্যক নদী এই মাটি বহিয়া আনে। এই প্রকৃতির মাটি পশ্চিম-বাংলা, আসাম, বিহার, গুজরাট, পূর্ব ও পশ্চিম ঘাটের উপকূলে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মাটির উর্বরতা অধিক বলিয়া কৃষিকার্যে ইহার আদর খুব বেশী। এই সব অঞ্চলে নিয়মিত বৃষ্টি হয় ও সবরকম ফসল উৎপন্ন হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মাটিকে 'বদ্ধমাটি' (Trap soil) বলা হয়। দাক্ষিণাত্যের প্রায় সর্বত্র বোম্বাই, বেরার এবং মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাংশে এই শ্রেণীর মাটি দেখিতে পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত কৃষ্ণমৃত্তিকা (Black cotton soil) এই শ্রেণীরই অন্তর্গত। এই মাটির বর্ণ ঈষৎ কালো বলিয়া এই নামকরণ হইয়াছে। এই মাটিতে তুলা খুব বেশী হয়। গম, বাজরা, জোওয়ার, দাইল, প্রভৃতি এই মাটিতে জন্মে।

তৃতীয় শ্রেণীর মৃত্তিকার সাধারণ নাম "লাল মাটি" (Red soil)। মাদ্রাজ, মহীশূর, বোম্বাই রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বাংশ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং নাগপুর অঞ্চলের মাটি এই প্রকারের। পূর্বলিখিত দুই প্রকারের মাটির মত ইহা উর্বর নহে। তবে জল সেচের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ধান এবং অন্যান্য ফসল উৎপন্ন হয়।

আরও এক রকমের মাটি আছে, উহাকে ল্যাটেরাইট মাটি (Laterite soil) বলা হয়। আসাম, মধ্য ভারত, পূর্ব ও পশ্চিম ঘাট এবং পশ্চিম বাংলার কোন কোন অঞ্চলে এই মাটি আছে। ভাল জল দিতে পারিলে এই মাটিতে খুব ভাল ধান হয়।

প্রকৃতি ভারতবর্ষকে সর্বপ্রকার খাদ্য এবং কাঁচা মাল উৎপন্ন করিবার মত মাটি দিয়াছে। কিন্তু সব মাটিরই একটি ত্রুটি আছে। এ দেশের মাটি একটু শুষ্ক, তাই বহু জলসেচের প্রয়োজন। স্বাভাবিক ভাবে মৌশুমী হইতে এই জল পাওয়া যায়। এই কারণে মৌশুমী বৃষ্টির প্রকৃতি এবং প্রাধান্য আলোচনা করা উচিত।

মৌশুমী বায়ু (Monsoons): মৌশুমী কথাটির অর্থ বায়ু-স্রোতের পরিবর্তন। ভারত মহাসমুদ্র হইতে যে আর্দ্র বায়ু ভারতের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া বৃষ্টিপাত করায়, সাধারণ অর্থে তাহাকেই মৌশুমী বলে। এই বায়ুস্রোত একটি দক্ষিণ-পশ্চিম, অপরটি উত্তর-পূর্ব হইতে আসে। জুন মাস হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌশুমী প্রবাহিত হয়। ইহার দুইটি উপস্রোত, একটি আরব সাগর হইতে ও অপরটি বঙ্গোপসাগর হইতে আসে। আরব সাগরের বায়ু-স্রোত হইতে বোম্বাই, পূর্ব-পাঞ্জাব এবং মধ্যভারতে বৃষ্টি হয়। বঙ্গোপসাগর হইতে যে মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা পশ্চিম-বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা এবং উত্তর প্রদেশে বৃষ্টিপাত করায়। এই মৌসুমী খুব প্রয়োজনীয়, কারণ মোট বৃষ্টিপাতের শতকরা ৯০ ভাগই ইহা হইতে পাওয়া যায়। উত্তর-পূর্ব মৌশুমী বায়ু হইতে শীতকালে বৃষ্টি হয়। এই বাতাসের উৎপত্তি স্থলভাগ হইতে হয় বলিয়া ইহা বিশেষ আর্দ্র নহে। ইহা হইতে শতকরা ১০ ভাগ বৃষ্টি হয়। মাদ্রাজ, বেরার, হায়দ্রাবাদ, পূর্ব-পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশের কোন কোন অংশে এবং বোম্বাই রাজ্যে এই মৌশুমী হইতে বৃষ্টি পড়ে।

মৌশুমীর বৃষ্টি সর্বত্র সমান হয় না। আসামের চেরাপুঞ্জি অঞ্চলে বৎসরে ৪৬০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। পশ্চিম-বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, ও উত্তরপ্রদেশে বাৎসরিক

বৃষ্টির পরিমাণ শতকরা ৬০-৭০ ইঞ্চি। আবার এমন স্থান আছে যেখানে বৃষ্টি হয় না বলিলেই চলে। রাজস্থানে মাত্র ৩ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়; পশ্চিম রাজস্থান এবং পাঞ্জাবে বৃষ্টির পরিমাণও এইরূপ। সেচখাল না থাকিলে এই সব অঞ্চলে চাষ করা অসম্ভব। কোন কোন অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ মাঝামাঝি। পশ্চিমঘাট বাদ দিলে বোম্বাই, আজমীঢ়, বরোদা এবং অমৃতসহর হইতে এলাহাবাদ পর্যন্ত অঞ্চলে ১০ হইতে ৩০ ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টি হয়।

মৌশুমী বায়ুর প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহার উপরে নির্ভর করা চলে না। কখন কি পরিমাণ বৃষ্টি হইবে তাহা কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারে না। কোন বৎসরে খুবই বৃষ্টি হইতে পারে, আবার কোন বৎসরে খুব কম বৃষ্টি হওয়াও বিচিত্র নহে। কোন বৎসরে খুব তাড়াতাড়ি বর্ষা শুরু হইয়া তাড়াতাড়ি শেষ হইয়া যায়। আবার কোন বৎসরে বর্ষা সুরু হয় যথাসময়ে বা পরে, কিন্তু অবাঞ্ছিত অতিথির মত তাহা কিছুতেই যাইতে চাহে না। কতখানি বৃষ্টি কবে হইতে সুরু হইবে তাহা কিছুতেই অনুমান করা যায় না। এই কারণেই সমগ্র দেশের লোক আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে, কবে বৃষ্টি নামিবে? কবে আবার জমি ভিজিয়া উঠিবে তবে চাষবাস আরম্ভ করা যাইবে? বৃষ্টি কেমন হইবে? ঠিকমত বৃষ্টি হইবে ত? এই প্রশ্ন সকলেরই মনে উঠে। তাই ভারতবর্ষের বৃষ্টির এত দাম।

মৌশুমী বৃষ্টির অর্থনৈতিক ফলাফল (Economic effects of monsoons): ইউরোপের সমস্ত দেশে বৃষ্টিপাতের তারতম্যের উপরে ফসলের পরিমাণ কিছুটা নির্ভর করে। কিন্তু ভারতবর্ষে উহার প্রভাব দূরপ্রসারী। ভারতবর্ষের জমি শুষ্ক, সেইজন্য জল বেশী চাই। ধান এবং আখ উৎপন্ন করিতে বহু জল লাগে। ভাল বৃষ্টি হইলে এই ফসল খুব বেশী হয়। ফসল হইলেই চাষীর আনন্দ। ভাল ফসল হইলে পরিবার ভরণ-পোষণ করিবার মত যথেষ্ট টাকা পাওয়া যাইবে। জমিদার এবং মহাজন তাহাদের প্রাপ্য লাভ করিবে। কৃষকের টাকা থাকিলে খরচ করিবার ক্ষমতাও থাকিবে। স্ত্রীপুত্রাদির জন্য তখন সে বস্ত্রাদি সামগ্রী ক্রয় করিবে। দেশের শিল্পও তাহা হইলে ভাল চলিবে, কেননা তখন কৃষকদের কাছে শিল্পসম্ভার বিক্রয় করা সম্ভব হইবে। পাটকলের মালিকেরা অধিক পাট ক্রয় করিবে, চিনির কলে বহু আখ প্রয়োজন হইবে। কাপড়ের কলের মালিক তুলা পাইবে। প্রত্যেক শিল্প যথেষ্ট কাঁচামাল

পাইবে ও তাহার দাম অপেক্ষাকৃত কম দিতে হইবে। রপ্তানী বাণিজ্যের ব্যবসায়ীরাও পাট, তূলা এবং অন্যান্য উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্য বিদেশে চালান করিতে পারিবে। বহু মাল চলাচলের জন্য রেলের লাভ বেশী হইবে। এই লাভের মোটা অংশ সরকারী তহবিলে যাইবে। দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি ভাল হইলে সরকারও ভাল রাজস্ব আদায় করিতে পারিবে। কাজেই প্রত্যেক ভারতবাসীর ভাগ্য জলের উপরে নির্ভর করে।

বৃষ্টি ভাল না হইলে সকলেরই ঘোর অমঙ্গল। ফসল ভাল না হইলে কৃষকের অবস্থা ভাল হয় না। আমাদের দেশের শতকরা ৭০ জন লোক কৃষক। তাহাদের আয় ভাল না হইলে তাহারা শিল্পপণ্য কিনিবে না। তাহা হইলে শিল্পগুলির ক্ষতি হইবে। রপ্তানীও কমিয়া যাইবে। রেলের আয় কম হইবে এবং সরকারের বহু সমস্যা দেখা দিবে। যে সব কৃষক খাজনা দিতে পারিবে না তাহাদের খাজনা কিছু কিছু মাপ করিতে হইবে। রেল এবং আগম-নিগম শুল্কের রাজস্ব হ্রাস পাইবে। কিন্তু দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের সাহায্য করিবার জন্য সরকারকে অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। এইজন্য বলে যে সরকারের আয়ব্যয় মৌশুমী বৃষ্টির উপরে নির্ভর করে।

খনিজ সম্পদ (Minerals) : আমাদের প্রধান খনিজ কয়লা, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, তাম্র, স্বর্ণ, তৈল, লবণ এবং চুণাপাথর প্রভৃতি।

কয়লা : ভারতবর্ষে প্রতি বৎসরে প্রায় ৩·৪ কোটি টন কয়লা তোলা হয়। ইহার শতকরা ৮২ ভাগই পশ্চিম-বাংলা ও বিহার হইতে পাওয়া যায়। কয়লার খনিগুলি ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, গিরিডি, ডাল্টনগঞ্জ অঞ্চলে অবস্থিত। হায়দ্রাবাদ, মধ্যভারত, আসাম প্রভৃতি স্থানেও কয়লার খনি আছে। ১৯৪৬ সালে কয়লাখনি কমিটির মতানুযায়ী ভাল কয়লা ৭০ হইতে ৮০ কোটি টন অবশিষ্ট আছে। ইহাও আমাদের আগামী ৬৫ বৎসর মাত্র চলিতে পারে। কাজেই কয়লা-সংরক্ষণের প্রয়োজন। কয়লার খনি সমস্তই দেশের পূর্বদিকে। পশ্চিম বা দক্ষিণ অঞ্চলে কোন খনি নাই। ইহা একটি মস্ত অসুবিধা। প্রতি বৎসরই পাকিস্থান, জাপান, লঙ্কা, দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়া প্রভৃতি দেশে কিছু কিছু কয়লা রপ্তানী করা হয়।

লৌহ : ভরতবর্ষে খুব উচ্চশ্রেণীর খনিজ লৌহ পাওয়া যায়। সিংভূম, কেওনঝার, বোনায়ি, ময়ূরভঞ্জ এবং বরাকরে এই খনি অবস্থিত। মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, মহীশূর, মাদ্রাজ এবং মধ্যভারতে উৎকৃষ্ট খনিজ লৌহ আছে।

বর্তমানে উড়িষ্যা, বিহার, পশ্চিম-বাংলা এবং মহীশূরের খনি হইতেই লৌহ তৈয়ারী করা হইতেছে। অন্যান্য স্থানের খনি ব্যবহার না করিবার কারণ কাছাকাছি কয়লার অভাব। ভরতবর্ষে প্রতি বৎসর দেড়কোটি টন কাঁচা লৌহ তৈয়ারী হইতেছে এবং উৎপন্নের পরিমাণ প্রতি বৎসরই বাড়িতেছে। কাঁচা লোহার এক অংশ বিদেশে রপ্তানী করা হয়।

ম্যাঙ্গানিজ: পৃথিবীর দুইটি প্রধান ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদক দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ অন্যতম। দ্বিতীয় দেশটি রাসিয়া। মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, মহীশূর, মাদ্রাজ, এবং বোম্বাই রাজ্যে ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। কাঁচ, ইস্পাত, রাসায়নিক এবং বৈদ্যুতিক শিল্পে ম্যাঙ্গানিজ ব্যবহৃত হয়।

অভ্র: পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক অভ্র ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়। বৈদ্যুতিক শিল্প, বেতার, মোটর যানবাহন, বাষ্পীয় ইঞ্জিন প্রভৃতিতে অভ্রের প্রয়োজন হয়। হাজারীবাগ, গয়া, মুঙ্গের, গিরিডি প্রভৃতি স্থান হইতে মোট উৎপন্নের ৮০ ভাগ পাওয়া যায়। মাদ্রাজের নেলোর জেলাতে এবং রাজস্থানেও অভ্র পাওয়া যায়।

তাম্র: সিংভূম, মাদ্রাজ, গাবওয়াল, আলমোরা প্রভৃতি স্থানে তাম্র আছে। কিন্তু আমাদের দেশে উৎপন্ন তাম্রের পরিমাণ নিতান্তই কম!

স্বর্ণ: মহীশূরে কোলার স্বর্ণখনি এবং হায়দ্রাবাদে হাট্টি খনি হইতে সোনা পাওয়া যায়। কোন জানা রৌপ্যখনি ভারতবর্ষে নাই।

লবণ: রাজস্থানের সম্বর হ্রদ এবং সমুদ্রোপকূলে সমুদ্রের লোনা জল হইতেও লবণ তৈয়ারী হয়।

তৈল: আসামের ডিগবয় অঞ্চলে তৈলখনি আছে। আমাদের দেশে উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ খুবই কম। পৃথিবীর মোট উৎপন্নের হাজারকরা এক ভাগও আমাদের দেশে উৎপন্ন হয় না।

উপরোক্ত খনিগুলি ছাড়াও এলুমিনিয়াম, ক্রোমিয়াম, চীনামাটি, হীরা, গ্রাফাইট, সোরা প্রভৃতি আমাদের দেশে পাওয়া যায়। অ্যাটমিক শক্তি উৎপন্ন করিবার মত ইউরেনিয়ামও ত্রিবাঙ্কুরে আছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা বেশী লাক্ষা হয়। পৃথিবীর মোট অভ্র উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়। কিন্তু আমাদের দেশে সীসা, দস্তা, টিন, নিকেল, ওলফ্রাম প্রভৃতি পাওয়া যায় না। পেট্রোল আমাদের

দেশে পাওয়া যায় না বলিলেও চলে। ইহাতে চিন্তিত হইবার কারণ নাই। পৃথিবীর কোন দেশেই সবরকম খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায় না। দুঃখের বিষয় এই যে, ইতিপূর্বে ভারতের খনিজ সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হয় নাই। স্বাধীনতা লাভের পরে আমাদের সরকার এই দিকে দৃষ্টি দিবে আশা করা যায়।

শক্তির উৎস (Sources of Power) : কয়লা, তৈল এবং জলপ্রপাত হইতে শক্তি উৎপন্ন করা যায়। কয়লা এবং তৈল আমাদের দেশে কি পরিমাণ আছে তাহা বলা হইয়াছে। কয়লা আমাদের দেশের সর্বত্র পাওয়া যায় না। ভাল তৈলের খনিও আমাদের দেশে নাই। ডিগবয়ে পৃথিবীর মোট উৎপন্ন তৈলের হাজারকরা একভাগ তৈলও পাওয়া যায় না। এই ত্রুটি দূব করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ইক্ষুরস হইতে চিনি তৈয়ারী করিবার পর চিটাগুড় থাকে। এই গুড় হইতে মোটর চালনা করিবার মত পাওয়ার অ্যালকোহল তৈয়ারী হইতে পারে। কয়লা হইতে কৃত্রিম উপায়ে পেট্রোল তৈয়ারী করা যায়। এখন আমাদের এইদিকে নজর দিতে হইবে।

শক্তির অপর প্রধান উৎস হাইড্রো ইলেকট্রিক বা জলবিদ্যুৎ। উত্তর প্রদেশের জলপ্রপাত, পাঞ্জাবের মণ্ডি পরিকল্পনা, বোম্বাইয়ের টাটা এবং অন্ধ্র পরিকল্পনা, মাদ্রাজে মেত্তুর এবং মহীশূরে কাবেরি হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। মহীশূরেব শিবসমুদ্রম্ হইতে কোলার স্বর্ণখনি, মহীশূর, বাঙ্গালোর, এবং আবও দুইশত স্থানে বিদ্যুৎ সববরাহ করা হয়। কাশ্মীরে ঝিলম নদীতে আরও একটি জলবিদ্যুৎ-যন্ত্র বসানো হইয়াছে। আমাদের দেশে স্রোতশীল জলধারার অভাব নাই। কাজেই আমাদের দেশে জলবিদ্যুৎ প্রস্তুত করিবার প্রচুর সুযোগ রহিয়াছে। আমাদের দেশে যত জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতে পারে, হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, একমাত্র আমেরিকাতে তাহা অপেক্ষা বেশী এই জাতীয় বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। স্বাধীনতা অর্জন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের জাতীয় সরকার কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ কবিয়াছে। তাহার মধ্যে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা বিখ্যাত। উত্তর প্রদেশের প্রস্তাবিত রিহান্ত বাঁধের, উড়িষ্যার হীরাকুঁদ বাঁধের কাজও সুরু হইয়াছে। কোশি, ময়ূরাক্ষী, তিস্তা প্রভৃতি বাঁধিবার পরিকল্পনা আছে। কাজেই কয়লা বা তৈলের অভাব থাকিলেও শক্তির অভাবে আমাদের দেশে শিল্প গড়িয়া উঠিবে না তাহা ঠিক বলা যায় না।

বন ঃ বন দেশের একটি বড় প্রাকৃতিক সম্পদ। ভারতবর্ষের মোট জমির শতকরা ২২ ভাগ বনজঙ্গল। আসামে শতকরা ৪০ ভাগ বনভূমি। পশ্চিম-বাংলা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে শতকরা ৯-১৪ ভাগ বনভুমি। সেগুন, শিশু, বাঁশ প্রভৃতি চিরহরিৎ আর্দ্র বন পূর্ব হিমাচলের সানুদেশে, এবং দাক্ষিণাত্যে আছে। দেওদার, পাইন, ফার, ওক, অ্যাস প্রভৃতি পার্বত্য বন হিমালয়ের সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুন, শাল, সুন্দরী, চন্দন প্রভৃতি বৃক্ষের বন দাক্ষিণাত্যে প্রচুর আছে। ভারতের উপকূলের অনেক স্থানেই জঙ্গল আছে। তাহার মধ্যে পশ্চিম-বাংলার সুন্দরবন বিখ্যাত।

দেশের অর্থনৈতিক জীবনে বনসম্পদের প্রাধান্য অস্বীকার করা যায় না। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, দেশে বনভূমি বেশী থাকিলে বৃষ্টিপাত বেশী হয়। ভূমির শুষ্কতা দূর হয় এবং আবহাওয়ার উত্তাপ কমে। হিসাব করিয়া বন না কাটিলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমিয়া যায়। আবার বন না থাকিলে জমির উর্বর উপরিভাগের ক্ষয়বৃদ্ধি হয়। গাছের পাতা মাটিতে পড়িয়া রৌদ্রজলে পচিয়া জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। গাছের শিকড়ে মাটি ধরিয়া রাখে ও সেইজন্ম বৃষ্টির জলে তাহা ধুইয়া যায় না। বনে বহু কাঁচা মাল পাওয়া যায়। লাক্ষা, তারপিন, রজন ও নানারকম তৈল বন হইতে পাওয়া যায়। বনভূমি কৃষকদেরও প্রয়োজন; কারণ, তাহারা পশুচারণ ভূমি হিসাবে বনজঙ্গল ব্যবহার করিতে পারে।

বন কাটিয়া ফেলিলে বৃষ্টিপাত বন্ধ হয় বলিয়া বন রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে সরকারের একটি বিশেষ বিভাগ আছে। বন তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে—পূর্ণরক্ষিত, সাধারণ রক্ষিত এবং অন্যান্য। পূর্ণ-রক্ষিত বনভূমি সরকার রক্ষণাবেক্ষণ করে ও এখানে কঠোর নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে। রক্ষিত বনের নিয়ন্ত্রণ তত কঠোর নহে। তৃতীয় শ্রেণীর বনে কোনই নিয়ন্ত্রণ নাই। অন্য দেশের তুলনায় আমাদের বনসম্পদ্‌ খুব বেশী নহে। জাপানের মোট জমির শতকরা ৫৩ ভাগ এবং রাসিয়ার ৩৮ ভাগ বনভূমি। ভারতবর্ষের মাত্র ২২ ভাগ বনভূমি।

মৎস্যের চাষ ঃ ভারতবাসীদের, বিশেষ করিয়া পূর্বাঞ্চলের লোকদের মাছ যদিও অন্যতম প্রধান খাদ্য, তথাপি মাছের চাষ আমাদের দেশে বিশেষ নাই। জাপান অথবা ইউরোপের তুলনায় ইহা অত্যন্ত নগণ্য। কিন্তু আমাদের

দেশে মৎস্য চাষের সম্ভাবনা খুব বেশী। সমুদ্রে মাছ ধরিবার কোনই ব্যবস্থা নাই। কোচিন উপসাগরে টিউটিকোরিনে মুক্তা তুলিবার ব্যবস্থা আছে।

পশু-সম্পদ ঃ ভারতবর্ষে নানা রকম পশু দেখিতে পাওয়া যায়। গরু এবং মহিষ ভারবাহী পশু হিসাবে নিযুক্ত হয়, কৃষিকার্যে লাগে এবং দুধ দেয়। তাহা ছাড়া ভেড়া, ছাগল, গাধা, উট প্রভৃতি গৃহপালিত পশু আছে। বহু দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে পশুর সংখ্যা বেশী। প্রতি একশত একরে ৬৭টি গরু আছে। ভারতবর্ষে উৎকৃষ্ট পশুর দৃষ্টান্ত যেমন পাওয়া যায়, তেমনি একেবারেই নিকৃষ্ট গরুর অভাব নাই। পাঞ্জাবের হরিয়ানা ও সহিওয়াল, মণ্টগোমরি প্রভৃতি শ্রেণীর গরু পৃথিবীর যে কোন দেশের গরুর সহিত তুলনীয়।

ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ বিচার করিলে বলা যায় যে, প্রকৃতি আমাদের উপর খুবই সদয়। প্রাকৃতিক সম্পদ আমাদের প্রচুর। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজও তাহা আমরা কাজে লাগাইতে পারি নাই। ইহার ফলে আমাদের দেশের কোটি কোটি লোক কঠোর দারিদ্র্যে জীবন অতিবাহিত করিতেছে। দেশ এখন স্বাধীন। কাজেই আশা করা যায়, প্রাকৃতিক সম্পদ দেশের অগণিত জনসাধারণের সেবায় নিযুক্ত করিবার চেষ্টা এখন হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জনসংখ্যা

মানুষই প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগায়, নূতন সম্পদ সৃষ্টি করে। দেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকিতে পারে, কিন্তু দেশের লোকে তাহার ব্যবহার না জানিলে তাহাদিগকে চিরকালই দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করিতে হইবে। সামান্য প্রাকৃতিক সম্পদ লইয়াও লোকের পরিশ্রমের ফলে দেশ সম্পদশালী হইয়া উঠিতে পারে। এই জন্য লোকপরিচয় প্রয়োজন।

১৯৫১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ৩৫·৬৮ কোটি। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ ভারতবাসী। ১৯৪১ সাল হইতে দশ বৎসরে ভারতের জনসংখ্যা শতকরা ১৩·৪ অংশ বাড়িয়াছে। ইহার মধ্যে উত্তরপ্রদেশে ৬·৩২ কোটি, মাদ্রাজে ৫·৭ কোটি, বিহারে ৪·০২ কোটি ও পশ্চিম বাংলায় ২·৪৮ কোটি লোকের বাস।

জনসংখ্যার ঘনত্ব (Density of population): প্রতি বর্গমাইলে গড়ে যত লোকের বসতি, তাহাকেই জনসংখ্যার ঘনত্ব বলে। বর্তমানে আমাদের দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব ৩১২। ইংলণ্ডে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৫৩৬ ও জাপানে ৫৭৯। আবার চীন দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব ১২৩; আমেরিকায় ৫০ ও সোভিয়েট রাশিয়াতে মাত্র ২৩ জন।

আমাদের দেশেও যে জনসংখ্যার ঘনত্ব সবত্র সমান তাহা নহে। ঘনত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী পশ্চিম বাংলায়। এখানে প্রতি বর্গ মাইলে ৮০৬ জন বাস করে। সবচেয়ে কম কচ্ছদেশে (৩৪ জন)। বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও আসামে যথাক্রমে গড় ঘনত্ব ৩২৩, ৫৫৮, ১৬৩, ৫৭২, ১০৬।

জনসংখ্যার ঘনত্বের এই ব্যতিক্রমের কারণ কি? ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। কাজেই কৃষির সুবিধা জনসংখ্যার ঘনত্ব নিয়ন্ত্রিত করে। কৃষির জন্য বৃষ্টিপাত, সেচ, জমির উর্বরতা, অনুকূল প্রকৃতি ও আবহাওয়া প্রভৃতি বিবেচনা করিতে হয়। পশ্চিম বাংলায় জনসংখ্যার ঘনত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী, কারণ বাংলা দেশে বৃষ্টিপাত প্রচুর এবং নিয়মিত; জমি উর্বর, আবহাওয়া সুন্দর এবং চাষোপযোগী সমান জমি অনেক পাওয়া যায়। রাজস্থানের জমি তত উর্বর

নহে, বৃষ্টিপাত নাই বলিলেই হয়। সেচখালও নাই। উপযুক্ত সেচখাল থাকিলেও জনসংখ্যার ঘনত্ব বাড়ে। ১৮৯১ সালে লায়ালপুরের জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গমাইলে ৭ জন। ১৯১১ সালে তাহা বাড়িয়া ২৭২ জনে দাঁড়ায়। ইহার কারণ এই অঞ্চলে বহু সেচের খাল খনন করা হইয়াছে। জমির সমতাও ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করে। পশ্চিম বাংলা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ভারতের জমি সমতল। এইজন্য এখানে জনসংখ্যা বেশী। পর্বত অঞ্চলে জনসংখ্যা কম। যেখানে বৃষ্টি বেশী হয়, সেখানে বসতিও বেশী। কিন্তু আসামে সবাপেক্ষা বেশী বৃষ্টি হইলেও জনসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে মাত্র ১৮৫ জন। ইহার কারণ আসামের আবহাওয়া অস্বাস্থ্যকর এবং আসামে পাহাড় ও বনভূমি বেশী।

শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গেও বসতি বৃদ্ধি পায়। যেখানে শিল্প গড়িয়া উঠে, সেখানে বহু লোক বাস করে। লৌহকারখানা স্থাপিত হইবার পূবে জামসেদপুর একটি ছোট গ্রাম ছিল। এখন সেখানে বহু লোকের বাস।

জীবিকা ঃ ১৯৫১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ভারতবর্ষের শতকরা ৬৯'৮ জন লোক কৃষিজীবী। কলকারখানায় নিযুক্ত লোকের সংখ্যা শতকরা ১০'৮ জন, উহার মধ্যে বড় কারখানায মাত্র ১'৫ জন ও অন্য সকলে ছোট শিল্পে নিযুক্ত ছিল। ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা বেশী কৃষিনির্ভর লোক বাস করে। ইংলণ্ডে শতকরা ৮ জন কৃষিজীবী এবং ৬৮ জনের জীবিকা শিল্পের সহিত জড়িত। ইহাই আমাদের অর্থ নৈতিক জীবনের প্রধান ত্রুটি। সংস্কৃত শ্লোকে আছে যে, বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস করেন, তাহার অর্ধেক লাভ হয় কৃষিকার্যে। এত বেশী কৃষিনির্ভর হইলে আমরা কোন দিনই শিল্পোন্নত দেশের মত সম্পদশালী হইতে পারিব না। শিল্পের উন্নতি করিয়া আমাদের কৃষিনির্ভরতা কমাইতে হইবে।

শিল্পে আমরা যে অনেক পিছনে পড়িয়া আছি, তাহার প্রমাণ আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে। শতকরা ১৭ জন মাত্র শহরে বাস করে। ইংলণ্ডে শহরবাসীর সংখ্যা শতকরা ৮০ এবং আমেরিকায় ৫৬।

জন্মের হার ঃ ভারতবর্ষে জন্মের হার প্রতি হাজারে ২৬'৭ জন। এই জন্মের হার পৃথিবীতে প্রায় সবোচ্চ। অনেক দেশেই জন্মের হার কমিয়া আসিতেছে। ইংলণ্ডে জন্মের হার ১৮৮১-৯১ দশকে ৩২ হইতে ১৯৩৬ সালে ১৫'৫ এ নামিয়া আসে। জার্মানীতে ঐ একই সময় জন্মের হার ৩৭ হইতে ১৬ তে নামে। কিন্তু ভারতবর্ষে জন্মের হার কম বেশী একই আছে।

উচ্চ জন্মহারের কারণগুলি নিম্নলিখিতরূপ। ভারতবর্ষে প্রায় সকলেই বিবাহ করে এবং সাধারণত অল্প বয়সে বিবাহ হয়। অনেকে বাল্যবিবাহ ধর্মসঙ্গত মনে করে। অন্যান্য দেশে বিবাহ এত বেশী হয় না, বিবাহের বয়সও বেশী। ভারতবর্ষে জীবিকার মান অতি নিম্ন। এই সব কারণে ভারতবর্ষে জন্মের হার বেশী।

মৃত্যুহার ঃ ভারতবর্ষে মৃত্যুর হারও খুব বেশী। প্রতি বৎসর হাজারে ১৬ জন লোক মরে। আমেরিকা ও ক্যানাডাতে এই হার যথাক্রমে ৯·৬ ও ৯·১০। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারীতে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসরই বহু লোক মারা যায়। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানারকম জ্বরে মৃত্যু সংখ্যাও খুব বেশী। ক্ষয়রোগে বহু লোক মারা যাইতেছে। লোকের রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতা কম বলিয়া মহামারীতে এত বেশী লোক মারা যায়। যাহারা দরিদ্র, পুষ্টিকর আহার পায় না, অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস করে, তাহারাই নানা রোগে আক্রান্ত হয়। স্বাস্থ্যের নিয়ম না মানার জন্য রোগ সংক্রামিত হয়।

মৃত্যুহার সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার মত দুইটি বিষয় আছে। শিশু ও নারীদের মধ্যেই মৃত্যুর হার বেশী। আর কোনও দেশে ভারতবর্ষের মত এত বেশী শিশু-মৃত্যু হয় না। ১৯৩১-৩৫ সালে প্রতি হাজার শিশুর মধ্যে ইংলণ্ডে ৬৫টি এবং সুইডেনে ৫১টি শিশু মারা যায়। কিন্তু ভারতবর্ষে এক চতুর্থাংশ কিংবা এক পঞ্চমাংশ নবজাতক এক বৎসর বয়স হইবার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং পাঁচ বৎসর হইবার পূর্বে শতকরা ৭৫টি শিশু মারা যায়। ইহা একটি গুরুতর সমস্যা। দারিদ্র্যের জন্য শিশুদের জীবনীশক্তি খুব কম থাকে এবং সহজেই তাহারা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা ও পরিবেশও বহু শিশুমৃত্যুর কারণ। অনেক গ্রামেই চিকিৎসক নাই। এরূপ অবস্থায় আমাদের দেশের শিশুরা যে আদৌ বাঁচিয়া বড় হইয়া উঠে তাহাই আশ্চর্য।

সন্তান ধারণোপযোগী (১৫-৪৫) বয়সের স্ত্রীলোকের মধ্যে মৃত্যুর হারও আমাদের দেশে খুব বেশী। এদেশে প্রসবের সময় প্রতি হাজারে প্রায় ১০০টি স্ত্রীলোক মারা যায়। ইংলণ্ডে এই ধরণের স্ত্রীমৃত্যুর হার হাজারে চারিজন, তাহাতেই ঐ দেশের কর্তৃপক্ষ চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছে। বাল্যবিবাহের ফলে আমাদের দেশের মেয়েদের অল্প বয়সে সন্তান হয়। তাহাতে মেয়েদের জীবনী-শক্তি ক্ষয় হইয়া যায়। এমনিতেই দারিদ্র্যজনিত পুষ্টির অভাবে জীবনীশক্তি কম থাকে। ফলে বহু স্ত্রীলোক সন্তান জন্ম দিতে বা যক্ষ্মা রোগে বা অন্য কারণে

মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গ্রামে শিক্ষিত দাই এবং চিকিৎসকের অভাব স্ত্রীমৃত্যুর অন্যতম কারণ। আমাদের দেশে নারীর জীবনের মূল্য কম গণ্য করা হয়। কেবল যে পুরুষ নারীর যত্ন করে না তাহা নহে, মেয়েদেরও নিজেদেব স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি নাই। এই সমস্ত কারণে স্ত্রীমৃত্যুর হার বেশী।

মৃত্যুহার বেশী হইবার ফলে গড় আয়ুষ্কাল ভারতবর্ষে ২৭ বৎসর মাত্র। ভারতবাসী গড়ে ২৭ বৎসর বাঁচিবে বলিয়া আশা করা যায় এবং একজন ইংরেজ গড়ে ৬১ বৎসর এবং নিউজিল্যাণ্ডেব লোক ৬৪ বৎসব বাঁচে।

জনসংখ্যার বৃদ্ধি: ১৯৫১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী আমাদের দেশের জনসংখ্যা ৩৫·৬ কোটি ছিল। ইহার পূর্বে দশ বৎসরে জনসংখ্যা শতকরা ১৩·৪ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩১-৪১ সালে জনসংখ্যা শতকরা ১৫ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যেহেতু আমাদের দেশের এত লোকের খাদ্য ও বস্ত্র যোগাইতে আমরা অক্ষম, সেজন্য এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি খুবই চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইউরোপে বড় বড় কলকারখানা স্থাপিত হওয়াতে ম্যালথসের লোকসংখ্যাতত্ত্ব অবশ্য ভুল প্রমাণিত হইয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষে তাহা একান্তই প্রযোজ্য। ম্যালথস বলিয়াছেন, জনসংখ্যা বাড়িবার সম্ভাবনাই স্বাভাবিক। ভারতবর্ষে প্রায় প্রত্যেকটি নরনারীর বিবাহ হয়। বিবাহিত নরনারীর সংখ্যা অন্য দেশের তুলনায় এদেশে অনেক বেশী। দুই, একটি দেশ বাদ দিলে জন্মের হারও ভারতবর্ষে সবাধিক। ভারতবর্ষে প্রতি হাজারে ৩৩ জন শিশু জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ প্রত্যেক এক হাজার ভারতবাসী প্রায় ৩৩টি শিশুর জন্ম দেয়। ইংলণ্ডে এই হাজার করা জন্মের হার মাত্র ১৫·৫। ভারতবর্ষের এই জন্মেব হার হইতে প্রমাণিত হয় যে, জনসংখ্যা অবাধে বাড়িয়া চলিয়াছে। ম্যালথস জন্মপ্রতিরোধক সম্বন্ধে যে সব ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন যথা বিবাহ না করা, বেশী বয়সে বিবাহ করা প্রভৃতি, তাহা ভারতবর্ষে নাই বলিলেই চলে। সুতরাং যত সংখ্যক লোকের জীবিকা নিবাহ হইতে পারে, জনসংখ্যা তাহার অধিক বাড়িতেছে। অনেক ধনবৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, জন-বৃদ্ধির তুলনায় খাদ্য উৎপাদন ভারতবর্ষে বাড়ে নাই। ডক্টর জ্ঞানচাঁদ তাঁহার India's Teeming Millions নামক পুস্তকে বলিয়াছেন যে, ১৯০১ হইতে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা শতকরা ১৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু জমির চাষ বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র ১০ ভাগ। জমির উৎপন্নের পরিমাণ একই থাকিলে বলিতে

হইবে যে, খাদ্য উৎপন্নের তুলনায় জনসংখ্যা বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪১-৫১ সালের জনসংখ্যা শতকরা ১২.৫ ভাগ বাড়াতে এই পার্থক্য আরও গভীর হইয়াছে। সেই পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন বাড়ে নাই। কাজেই আমাদের দেশে সত্যই খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে। অবস্থা এইরূপ হইলে ম্যালথসতত্ত্ব অনুযায়ী মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দেখা দিবে ও মৃত্যুহার বাড়িবে। ভারতবর্ষে হইয়াছেও তাহাই। আমাদের দেশে মৃত্যুহার খুব বেশী। প্রতি হাজারে যেখানে ইংলণ্ডে ১২ জন এবং আমেরিকায় ৯.৬ জন মরে, সেইখানে ভারতবর্ষে মরে ১৬ জন। কলেরা, বসন্ত আমাদের দেশে প্রতি বৎসরই হয়। বহু লোক প্রায় অনাহারে দিন কাটায়। ইহা হইতে মনে হয় যে, আমাদের দেশে যত খাদ্য যোগানো সম্ভব তদপেক্ষা অধিক লোক জন্মগ্রহণ করে।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর পি, জে, টমাস প্রমুখ ধনবৈজ্ঞানিক বলেন যে, আমাদের দেশের জনসংখ্যা মাত্রা ছাড়ায় নাই। আমাদের দেশে শিল্পের দ্রুত উন্নতি হইতেছে। কাজেই মোট যে সম্পদ সৃষ্টি হইতেছে, তাহার অনুপাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশী নয়। কিন্তু উচ্চ জন্মের হার, উচ্চ মৃত্যুর হার, জীবিকানির্বাহের নিম্ন মান, শিল্পের অনগ্রসর অবস্থা প্রভৃতি জনসংখ্যা বৃদ্ধিই সূচিত করে। আমাদের যাহা আছে তাহাই কাজে লাগাইয়া প্রত্যেকের জীবনযাত্রা উন্নত করিয়া তুলিবার ও স্বাস্থ্যবান সুন্দর জীবন যাপন করিবার সম্ভাবনা দ্রুত বাড়াইয়া তুলিবার এখন সময় হইয়াছে।

বিভিন্ন রাজ্যের জনসংখ্যা

রাজ্য	মোট জনসংখ্যা	জনসংখ্যার ঘনত্ব
পশ্চিমবঙ্গ	২.৪৮ কোটি	৮০৬
আসাম	.৯০ ,,	১০৬
বিহার	৪.০২ ,,	৫৭২
উড়িষ্যা	১.৪৬ ,,	২৪৩
বোম্বাই	৩.৫৯ ,,	৩২৩
মধ্যপ্রদেশ	২.১২ ,,	১৬৩
পাঞ্জাব	১.২৬ ,,	৩৩৮
মাদ্রাজ	৫.৭০ ,,	৪৪৬

রাজ্য	মোট জনসংখ্যা	জনসংখ্যার ঘনত্ব
উত্তরপ্রদেশ	৬·৩২ কোটি	৫৫৮
হায়দ্রাবাদ	১·৮৬ ,,	২২৭
রাজস্থান	১·৫২ ,,	১১৭
ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন	৯২ লক্ষ	১০১৫
মহীশূব	৯০ ,,	৩০৮
মধ্যভারত	৭৯ ,,	১৭১
সৌরাষ্ট্র	8১ ,,	১৯৩
পেপ্‌সু	৩8 ,,	৩8৭
বিন্ধ্যপ্রদেশ	৩৫ ,,	১৫১
দিল্লী	১৭ ,,	৩০১৭
হিমাচলপ্রদেশ	১১ ,,	৯8
ভূপাল	৮৩ ,,	১২২
ত্রিপুরা	৬·৩ ,,	১৫৮
মণিপুব	৫·৭ ,,	৬৭
কচ্ছ	৫·৬ ,,	৩8
কুর্গ	২·২ ,,	১8৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সমাজ-সংহতি

দেশের লোকের উপরেই দেশের সম্পদ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। কিন্তু মানুষের কাজ দেশের সামাজিক পরিবেশ দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও ধর্মের আদর্শ দেশের অর্থ-নৈতিক উন্নতির সহায়ক হইতেও পারে, আবার নাও হইতে পারে। এই কারণে আমাদের দেশের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা উচিত।

ভারতবর্ষে জাতিভেদপ্রথা এবং যৌথ পরিবার এই দুইটি বিশিষ্ট সামাজিক প্রতিষ্ঠান আছে।

জাতিভেদপ্রথা (Caste system) : জাতিভেদপ্রথা হিন্দু সমাজের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এদেশে জাতির নিয়মদ্বারা মানুষের জন্ম, সামাজিক এবং পারিবারিক সম্বন্ধ ও বৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থ-নৈতিক দিক হইতে জাতিভেদপ্রথার বৈশিষ্ট্য ইহাই যে প্রত্যেককে আপন আপন জাতির পেশা চিরজীবন অনুসরণ করিতে হয়। পিতার যাহা পেশা, সন্তানকেও তাহাই করিতে হইবে।

এই প্রথার দোষগুণ দুইই আছে। এই প্রথার ফলে শ্রমবিভাগ হয় ও লোকের বিশেষজ্ঞতা বাড়ে। এক জাতির লোক একটি বিশেষ জীবিকা বা জাতিগত পেশা অনুসরণ করিবে। যে চিরকাল একটি কাজ লইয়া থাকে, সে ঐ কাজে দক্ষ হইয়া উঠিবে। কাজেই জাতিভেদপ্রথায় শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ত, জীবিকা-অর্জনের জন্য শিক্ষালাভ সহজেই এবং অল্প ব্যয়েই হয়। ছেলেবেলা হইতে লোকে জানে তাহার পেশা কি হইবে। বাপের নিকট হইতে এই পেশার কৌশলও সে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে। বাপ ছেলেকে ব্যবসায়ের সকল কৌশল এবং গুপ্ত তথ্য যত্ন করিয়া শেখায়। কাজেই শিক্ষানবীশিদের ভালভাবে শিক্ষালাভ হয়। তৃতীয়ত, নিজের জাতির লোক বলিয়া বিপদে-আপদে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে।

জাতিভেদপ্রথা আজ যখন বহু নিন্দিত, তখন উহার গুণাবলী স্মরণ রাখা ভাল। কিন্তু জন্মের দ্বারা বৃত্তি নির্ধারণ করা নিতান্তই ভুল। ছুতারের ছেলে যে ছুতারের কর্মক্ষমতা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইবে একথা কেহই

বলিতে পারে না। বরং এমনও হইতে পারে যে বাপের পেশা ছেলে একেবারেই পছন্দ করে না। কিন্তু জাতিভেদপ্রথার ফলে ছুতারের ছেলেকে ছুতার হইতেই হইবে। এই প্রথাতে খুশীমত বা ক্ষমতা অনুযায়ী জীবিকা বাছিয়া লওয়া সম্ভব নহে। এই কারণে ইহা শ্রমের অব্যাহত গতি (mobility of labour) রোধ করিয়াছে। ছুতারের ব্যবসায়ে খুব লাভ হইতে থাকিলেও অপর জাতির লোকের পক্ষে ছুতার হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই চাহিদা অনুযায়ী শ্রমিকের যোগান বড়ান-কমান সম্ভব হইত না। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক জাতিরই এক একটি একচেটিয়া ব্যবসায় থাকে। এইরূপ বংশপরম্পরায় একচেটিয়া ব্যবসায়ে কর্মদক্ষতা কমিয়া আসে এবং উৎপন্ন দ্রব্য নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

জাতিভেদপ্রথা শ্রমিকের নিজ পছন্দানুযায়ী কাজ বাছিয়া লইবার পক্ষে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পিতৃ পিতামহের যে বৃত্তি ছিল ছেলেদেরও তাহাই করিতে হইবে। ফলে লোকের স্বাধীন প্রচেষ্টা এবং উদ্যম নষ্ট হইয়াছে। এই ত্রুটি খুবই বড়। এই কারণেই আমাদের দেশে বড় বড় শিল্প গড়িয়া উঠিতে বাধা পাইয়াছে। জাতিভেদপ্রথা হইতে আরও এক ত্রুটি দেখা দিয়াছে। যাহারা তথাকথিত উচ্চ জাতির লোক তাহাদের মনে দৈহিক শ্রম সম্বন্ধে অবজ্ঞা জন্মিয়াছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে এত বেশী বেকার সমস্যা ইহা তাহার একটি কারণ। এই জাতিভেদপ্রথার জন্যই আমাদের দেশে জাতীয়তাবোধ ঠিক মত জাগরিত হয় নাই।

ইহা অবশ্য ঠিক যে উপরোক্ত ত্রুটি কঠোর জাতিভেদ প্রথার। বর্তমান যুগে ভারতবর্ষে এ ধরণের কঠোর জাতিভেদ নাই। লোকে এখন ক্রমেই বংশগত পেশা পরিত্যাগ করিয়া অন্য জীবিকা গ্রহণ করিতেছে। শ্রমিকেরা এখন বংশগত বৃত্তি ত্যাগ করিয়া নিজের ইচ্ছামত কাজ লইতে পারে।

যৌথ পরিবার (Joint family): পাশ্চাত্য দেশে পরিবার বলিতে স্বামীস্ত্রী ও পুত্রকন্যাকে বুঝায়। ভারতবর্ষের পরিবার এই কয়েকজন ছাড়াও আরও অনেক আত্মীয়স্বজন, বিশেষ করিয়া পিতা, মাতা, পিতামহ, কাকা, জ্যেঠা ইত্যাদি লইয়া গঠিত। বহুলোক এই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া একই বাড়ীতে বাস করে। এই ধরণের পরিবারকে যৌথ পরিবার বলা হয়। বাড়ীর বয়োজ্যেষ্ঠই সাধারণত কর্তা বলিয়া স্বীকৃত হয় এবং পারিবারিক সম্পত্তি তিনি দেখাশোনা করেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী উপার্জন

করে এবং উপার্জনের টাকা কর্তার হাতে তুলিয়া দেয়। পরিবর্তে পরিবারের সকল সুখসুবিধা উপভোগ করে।

যৌথ পরিবারের আদর্শ সমবায়-সমিতির মত। অসুখ-বিসুখ, বেকার অবস্থা, অল্প বা বৃদ্ধ বয়সে পরিবারের সকলেই সমান যত্ন পায়। ইহাতে রাষ্ট্রকে বৃদ্ধদের জন্য অবসরভাতা বা বেকারদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হয় নাই। দ্বিতীয়ত, বহু লোকে একত্র থাকে বলিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যয় কম হয়।

যৌথ পবিবারে বাস করার জন্য প্রত্যেকেরই অনেক সুবিধা হয়। প্রত্যেকে জানে যে বিপদে আপদে বা বেকার থাকিলে পরিবারের আর সকলে তাহার ভরণপোষণেব ভাব লইবে। কাজেই জীবনে দুর্ভাবনার পরিমাণ অনেক কমিয়া যায়। কিন্তু ইহা হইতেই একটি বড় ত্রুটির উদ্ভব হইয়াছে। যৌথ পরিবার হইতে অলসতা বৃদ্ধি পায়। যাহার কোন দায়িত্ব বোধ নাই, যে অলসপ্রকৃতি, সে জানে যে পরিবাবের অন্য লোক তাহার ভার বহন করিবে। সুতরাং তাহাব কাজে কোন উৎসাহ থাকে না। ইহাব ফলে পরিবারে অশান্তি দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, পবিবাবে যে ব্যক্তি উপার্জন করে তাহাকে বহু অক্ষম আত্মীয়স্বজনেব বোঝা বহিতে হয। নিজের আয় হইতে কিছুই সঞ্চয় করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। অতএব যৌথ পরিবার প্রথাব জন্য সঞ্চয়ের পরিমাণ কম হয়। আমাদের দেশে যে মূলধন বেশী নাই, তাহার অন্যতম কাবণ যৌথ পবিবার। আধুনিক পদ্ধতিতে বড বড় শিল্প বেশী মূলধন ছাড়া গড়িয়া তোলা অসম্ভব। যৌথ পরিবারেব আরও একটি ত্রুটি আছে। এই প্রথাতে ব্যক্তি অপেক্ষা পবিবারকে বড করিয়া দেখা হয়। পাবিবারিক প্রভাবের জন্য লোকের উদ্যম ও উৎসাহ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সম্যক বিকাশলাভ করিতে পারে না।

যৌথ পরিবার আজকাল ভাঙিয়া গিয়াছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রসার এবং শিক্ষা-বিস্তাবেব সঙ্গে সঙ্গে যৌথ পরিবার উঠিয়া যাইতেছে। যৌথ পরিবারের দোষ অথবা গুণ যাহাই থাকুক না কেন, এই প্রথার জন্য আমাদের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা স্বতন্ত্র রকমের হয় নাই।

ধর্মের আদর্শঃ ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক হিন্দু। হিন্দুধর্মে পার্থিব সম্পদ ত্যাগ করিয়া ভূমার অনুসরণ করিবার নির্দেশ আছে। অধিকাংশ হিন্দুই অদৃষ্টে বিশ্বাসী। তাহাদের আদর্শ অভাব বাড়ানো নহে, সব অভাব জয়

করা এবং পার্থিব সম্পদ অবহেলায় পরিত্যাগ করা। পাশ্চাত্যের জীবনাদর্শ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পার্থিব বস্তু সম্বন্ধে তাহারা উদাসীন নহে। বরং কঠোর পরিশ্রম করিয়া তাহারা আরও অধিক পার্থিব সম্পদ আহরণ করিতে চায়। এই কারণেই পাশ্চাত্যে অর্থনৈতিক প্রগতি এত বেশী হইয়াছে, আর ভারতবর্ষ সেদিকে এত পিছনে।

কিন্তু এই উক্তি সত্য নহে। খৃষ্ট ধর্মেও ত্যাগ এবং পার্থিব বস্তু লাভ করিবাব ইচ্ছা দমন করিতে শিক্ষা দেয়। যীশুর সে প্রসিদ্ধ বাণী সকলেরই জানা আছে। তিনি বলিয়াছেন যে ছুঁচের ফুটা দিয়া উট গলিয়া যাওয়া যত সহজ, ধনীর পক্ষে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করা তত সহজ নহে। ধর্মের সব শিক্ষা সত্ত্বেও হিন্দুরা সৎ উপায়ে অর্থোপার্জন ত্যাগ করে নাই। অতীতে যখন লোকে আরও নিষ্ঠার সহিত ধর্মাচরণ করিত তখনও হিন্দুরা নানা শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছিল। তাহারা নানা দেশের সহিত বাণিজ্য করিত ও তাহারা যত সম্পদ আহরণ করিয়াছে তাহা পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসারেও হীন নহে। ধর্মের প্রভাব এখন অনেক কম। অদৃষ্টবাদ কঠোর দারিদ্র্যের জন্যই দেখা দিয়াছে। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক দুরবস্থা অন্য কারণে, ধর্মের আদর্শের জন্য নহে। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক প্রগতির পথে ধর্মবোধ কোন দিনই বাধা সৃষ্টি করে নাই, করিবেও না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কৃষি

আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে কৃষির স্থানই প্রধান। দেশের শতকরা প্রায় ৭৩ জন লোকই কৃষিজীবি। আমাদের মোট জাতীয় আয়ের প্রায় শতকরা ৪৫ ভাগই কৃষি হইতে আসে। দেশে যত খাদ্যশস্য এবং কাঁচা মালের প্রযোজন, তাহার প্রায় সবই কৃষি হইতে পাওয়া যায়। দেশের শিল্পের সব কাঁচা মাল যোগাইয়াও বিদেশে বহু রপ্তানী কবা হয়। আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যের একটি বড় অংশ কৃষিজাত কাঁচা মাল। প্রায় প্রত্যেকেরই ভাগ্য কৃষির সহিত জড়িত। ফসল ভাল না হইলে কৃষক, জমিদার, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী এমন কি সবকারেরও তুর্দিন উপস্থিত হয়। আমাদের কৃষক দরিদ্র বটে, কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক জীবনে তাহাদের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

ভারতীয় অর্থনীতির বাস্তব রূপ আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। সুতরাং কৃষিজাত ফসল কি হয় এবং কৃষিব্যবস্থা কিরূপ তাহা ভাল করিয়া জানিতে হইবে।

কৃষিজাত ফসল: ভারতবর্ষে সব রকম মাটি এবং আবহাওয়া আছে বলিয়া নানা শ্রেণীর ফসল উৎপন্ন হয়। ফসল তুই প্রকাব, খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য শস্য।

খাদ্যশস্য: খাদ্যশস্যের মধ্যে **চাউলই** প্রধান। ভারতবর্ষের মোট কর্ষিত জমির শতকরা ৩৫ ভাগ জমিতে ধান হয়। পশ্চিম বাংলা, বিহার, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, আসাম এবং উড়িষ্যাতে ধান হয়। পশ্চিম বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা এবং মাদ্রাজে ইহাই প্রধান খাদ্য। যদিও বহু জমিতে ধান হয়, তথাপি ভারতেব মোট উৎপন্ন ২ কোটি ৭ লক্ষ (১৯৫১-৫২ সালের হিসাব) টন ধান ভারতের প্রয়োজন মিটাইতে পারে না। ঐ বৎসর বহু লক্ষ টনের বেশী চাউল বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইয়াছিল। সিংহল, আরব এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে কিছু কিছু ধান ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী করা হইত।

ধানের পরই **গমের স্থান**। মোট কর্ষিত জমির মাত্র শতকরা ১০.৭ ভাগ জমিতে গম বপন করা হয়। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাই

অঞ্চলে গমের চাষ হয়। পৃথিবীতে মোট উৎপন্ন গমের শতকরা ১০ ভাগ ভারতবর্ষে হয় এবং এ বিষয়ে ভারতবর্ষের স্থান পঞ্চম। ১৯৫১-৫২ সালে ৫৭ লক্ষ টন গম ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইয়াছিল। গম পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলের প্রধান খাদ্য।

অন্যান্য খাদ্যশস্যের মধ্যে **যব** মানুষ এবং গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং পাঞ্জাবে যথেষ্ট যব হয়। **জোওয়ার** এবং **বাজরা** খাদ্যশস্য। মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং হায়দ্রাবাদের সাধারণ লোকেরা ইহা খায়। মোট কর্ষিত জমির শতকরা ১১ এবং ৯.৩ অংশে জোওয়ার ও বাজরা বপন করা হয়। উপরোক্ত শস্যগুলি ছাড়াও ভারতবর্ষে প্রচুর ডাল, ছোলা, ভুট্টা প্রভৃতি খাদ্যশস্য জন্মে। নানারকম শাকশব্জী ও মশলা ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়।

আখ অন্যতম প্রধান খাদ্যশস্য। মোট কর্ষিত জমির শতকরা ২ ভাগ জমিতে আখ হয়। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, পশ্চিম বাংলা এবং বোম্বাই রাজ্যে আখ হয়।

কাঁচামাল (Commercial crops) : খাদ্যশস্য নহে এরূপ কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে পাট, তুলা, চা, কফি, তামাক প্রভৃতি প্রধান। **পাট** ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের একচেটিয়া ; ভারতবর্ষে পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামে পাট হয়। ইংলণ্ড, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, জার্মানী প্রভৃতি দেশে পাট রপ্তানী হয়। ভারতবর্ষে প্রচুর **তুলা** জন্মায়। ১৯৫১-৫২ সালে ১.৬২ কোটি একর জমিতে তুলা চাষ করা হইয়াছে। তুলা উৎপাদনে ভারতবর্ষের স্থান আমেরিকার পরেই। বোম্বাই রাজ্য, হায়দ্রাবাদ, মধ্যপ্রদেশ এবং বেরারে তুলা হয়। যুদ্ধের পূর্বে জাপানে প্রচুর তুলা চালান হইত। লম্বা আঁশযুক্ত তুলা বিদেশ ও পাকিস্তান হইতে ভারতবর্ষে আমদানী করিতে হয়।

তৈলবীজ : ভারতবর্ষে নানারকমের তৈলবীজ হয়। চীনাবাদাম, তিসি, মসিনা, সরিষা, রাই, রেড়ি এবং নারিকেল প্রভৃতি তৈলবীজ। ১৩.১ লক্ষ একর জমিতে তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। চীনাবাদাম প্রধানত মাদ্রাজ, বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ এবং উত্তরপ্রদেশে উৎপন্ন হয়। তিসি মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই এবং পশ্চিম বাংলায় উৎপন্ন হয়। যুদ্ধের পূর্বে ইউরোপে প্রচুর তৈলবীজ চালান যাইত।

চা প্রধানত আসাম, পশ্চিম বাংলা এবং মাদ্রাজের নীলগিরি পর্বতে উৎপন্ন হয়। দেরাদুন এবং কাংড়া উপত্যকাতেও কিছু কিছু চা হয়।

উপরোক্ত ফসলগুলি ছাড়াও তামাক, কফি, সিনকোনা, নীল, আফিম, রবার প্রভৃতি ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়।

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ কত বেশী। প্রায় সব রকম কৃষিজাত দ্রব্যই ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর মোট উৎপন্নের শতকরা ৫০ ভাগ চীনাবাদাম, ৪০ ভাগ চা, ২৫ ভাগ তামাক, ২০ ভাগ আখ, ১০ হইতে ১৫ ভাগ তূলা, তূলার বীজ, গম এবং তিসি ভাবতবর্ষে উৎপন্ন হয়।

যদিও নানারকমের কৃষিজাত শস্য আমাদেব দেশে জন্মে, কিন্তু তাহাদের পবিমাণ খুব বেশী নহে। একজন জাপানী কৃষক প্রতি একবে গড়ে ২৩০৭ পাউণ্ড ও ইতালীর কৃষক ৩০০০ পাউণ্ড চাউল উৎপন্ন করে। কিন্তু ভারতীয় চাষী মাত্র ৭৩১ পাউণ্ড অর্থাৎ জাপানের এক তৃতীয়াংশ মাত্র চাউল উৎপন্ন কবিতে পারে। প্রতি একরে আমাদের দেশে ৬৫১ পাউণ্ড গম হয়, সেইখানে জাপানে ১৫০৮ পাউণ্ড এবং ঈজিপ্টে ১৬৮৮ পাউণ্ড উৎপন্ন হয়। প্রতি একরে যা তূলা হয় তাহা আমেরিকাব তুলনায় শতকরা ৪০ ভাগ মাত্র। কাজেই উৎপাদনক্ষমতা আমাদের দেশে খুবই কম।

শস্যের নাম	মোট কত একর জমিতে চাষ	মোট উৎপাদন
খাদ্যশস্য	১৯৫১-৫২	১৯৫১-৫২
চাউল	৭'৫৫ কোটি	২'০৭ কোটি টন
গম	২'৩২ „	৫'৭৬ „ „
জোয়ার	৩'৮৩ „	৫'৫০ „ „
বাজরা	২'১৮ „	২'১৫ „ „
বার্লি	'৭৪ „	২'১৩ „ „
ছোলা	১'৬৭ „	৩'১৫ „ „
রাগী	৫'২৯ „	১'১৬ „ „
আখ	৪'৭২ „	৫'৮৯ „ „

শস্যের নাম	মোট কত একর জমিতে চাষ	মোট উৎপাদন
অন্যান্য শস্য		
তুলা	১৬'২১ কোটি	৩'১৩ কোটি গাইট
পাট	১'৯৫ „	৪'৬৭ „ „
তামাক	'৭৫ „	'২২ „ টন
চিনাবাদাম	১১'৭৫ „	৩'০৩ „ „
সরিষা	৫'৭০ „	৯ লক্ষ „
তিল	৩'২৯ „	৩ লক্ষ „

আমাদের দেশে চাষের ব্যবস্থা কিরূপ? প্রথমত, ক্ষেতগুলি খুবই ক্ষুদ্র আয়তনের। আমাদের চাষী আদিমযুগের লাঙ্গল এবং বলদ দিয়া তাহার ছোট একখণ্ড জমি চাষ করে। তাহার স্বাস্থ্য ভাল নহে, শিক্ষাও কম। সুদূর অতীতে পূর্বপুরুষেরা কাঠের সঙ্গে একখণ্ড লোহার টুকরা লাগাইয়া যে লাঙ্গল তৈয়ারী করিয়াছিল, আজও সে তাহাই ব্যবহার করিতেছে। চাষের বলদও দুর্বল। এই কারণে জমির উপরিভাগ মাত্র সামান্য কর্ষিত হয়। ভাল বীজ নির্বাচনের বিশেষ ব্যবস্থা আমাদের দেশের কৃষক করিতে পারে না। জমিতে জলসেচের জন্য চাষীকে একান্তভাবে বর্ষার মেঘের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়। কোনখানে কূপ, পুষ্করিণী অথবা খাল থাকিলে তাহা হইতে অবশ্য চাষের জল লওয়া হয়। গরু-বাছুরের হাত হইতে জমি রক্ষা করিবার জন্য জমির চারিদিকে কোন বেড়া দেওয়া হয় না। জমিতে রাসায়নিক সার দিবার কোন ব্যবস্থা নাই। মাঝে মাঝে জমি চাষ না করিয়া ফেলিয়া রাখিলে জমির উর্বরতা রক্ষিত হয়, কিন্তু আমাদের দেশের চাষীরা সাধারণত তাহা করিতে পারে না। জমিতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিভিন্ন দ্রব্য চাষ করিলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। তাহাও আমাদের দেশের চাষীরা জানে না। ফসল কাটিবার সময় হইলে সেই চির-পুরাতন কাস্তে দিয়া ফসল কাটা হয়। সারা বছরের কঠোর পরিশ্রমের পর যে ফসল ঘরে উঠে, তাহার পরিমাণ নিতান্তই সামান্য। উৎপন্নের পরিমাণ এত কম কেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা যাউক।

রাজ্য	মোট কর্ষিত জমি	ধানের জমি	গমের জমি	মোট খাদ্যশস্য ও ডালের জমি	তৈল বীজের জমি	তূলার জমি	পাটের জমি
পশ্চিমবঙ্গ	১২৬ লক্ষ	৯৪ লক্ষ	১০৫ লক্ষ	১০৮ লক্ষ	২০৭ লক্ষ	×	৩'২ লক্ষ
আসাম	৬০ লক্ষ	৩৯ লক্ষ	২ হাজার	৪২ লক্ষ	৩০৪ লক্ষ	৩২ হাজার	২'০ লক্ষ
বিহার	২৯১ লক্ষ	১৩৯ লক্ষ	২'৭ লক্ষ	২৬৩ লক্ষ	১০০ লক্ষ	১'৭ হাজার	৩'৯ লক্ষ
উড়িষ্যা	৭৫ লক্ষ	৫৪ লক্ষ	৭ হাজার	৬৭ লক্ষ	২'৭ লক্ষ	৯ হাজার	১'৬ লক্ষ
বোম্বাই	৪২'৩ লক্ষ	৩১ লক্ষ	২১ লক্ষ	৩০১ লক্ষ	৩৮ লক্ষ	২৪ লক্ষ	
মাদ্রাজ	৩৫৯ লক্ষ	১০৬ লক্ষ	১৩ হাজার	২৫১ লক্ষ	৫৫ লক্ষ	১৫ লক্ষ	
মধ্যপ্রদেশ	৩১৯ লক্ষ	৮৭ লক্ষ	২৪ লক্ষ	৫৫২ লক্ষ	২৭ লক্ষ	২৯ লক্ষ	
পাঞ্জাব	১৪৫ লক্ষ	৪'২ লক্ষ	৩৩ লক্ষ	১১০ লক্ষ	৪'৯ লক্ষ	৩'২ লক্ষ	
উত্তরপ্রদেশ	৪৮৮ লক্ষ	৮২ লক্ষ	১৩২ লক্ষ	৪২৬ লক্ষ	৮'১ লক্ষ	১'৪ লক্ষ	১'১০ লক্ষ

(একর জমি)

কৃষির ত্রুটি (Defects of agriculture) : প্রতি বিঘা জমিতে কৃষিজাত শস্য আমাদের দেশে কেন এত কম হয়? কৃষির সংগঠন বিশ্লেষণ করিলেই এই ত্রুটির কারণ ধরা পড়িবে।

সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি অতি ছোট ছোট ক্ষেতে চাষ করা হয়। প্রত্যেক চাষীর জমির আয়তন খুব অল্প এবং তাহাও গ্রামের নানাস্থানে ছড়ানো। ইহাতে ভালভাবে কৃষিকার্য পরিচালনা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহার ফলে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণও কম হয়। দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশের জমি খুব শুষ্ক। জল সেচের ভাল ব্যবস্থা নাই। যথেষ্ট জলের অভাবে ভাল ফসল হইতে পারে না।

তৃতীয়ত, সব ত্রুটির মূলে রহিয়াছে মূলধনের অভাব। মূলধন বিনিয়োগ করিলে শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বাড়ে, তাহা সকলেই জানে। কিন্তু আমাদের দেশে কৃষিকার্যে সামান্যই মূলধন নিয়োগ করা হয়। কৃষকেরা খুবই দরিদ্র। ধান বীজ বা কৃষির জন্য যন্ত্রাদি কিনিবার অর্থ তাহাদের নাই। ফলে বেশী ফসলও তাহারা পায় না। কৃষকেরা এখনও প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষ করে। ট্রাকটর এবং অন্য যন্ত্রের সাহায্যে পাশ্চাত্যে ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে। আমাদের দেশের কৃষকেরা তাহা জানে না।

জমিতে দিবার জন্য ভাল সার কিনিবার অর্থ কৃষকদের নাই। গোবর খুব ভাল সার। কিন্তু অন্য জ্বালানির অভাবে তাহাও ঘুঁটে করিয়া জ্বালানি হিসাবে কৃষকেরা ব্যবহার করে। জমিতে ভাল সার না দিলে বেশী ফসল হয় না। সারের অভাবে জমির উবরতা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে।

চতুর্থত, মূলধনের অভাব বলিয়া কৃষকেরা গ্রামের মহাজনের নিকট হইতে টাকা ধার করিতে বাধ্য হয়। মহাজন চড়া সুদ আদায় করে। সুদ দেওয়াই কৃষকের পক্ষে কষ্টসাধ্য, আসল শোধ করা প্রায় অসম্ভব। তাই দিনের পর দিন কৃষক ঋণের ভারে ডুবিয়া যাইতেছে। দারিদ্র্যের জন্যই তাহাদের মূলধনের অভাব এবং মূলধনের অভাবহেতু উৎকৃষ্ট চাষের ব্যবস্থা করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হয়।

ফসল বিক্রয়ের ব্যবস্থাও খুবই ত্রুটিপূর্ণ। কৃষক ফসল বিক্রয় করিতে গ্রামের হাটে বা বাজারে যায়। সেখানকার দালালেরা কৃষকদের ঠকায়। তাহার ফলে কৃষকেরা অনেক সময় ফসলের ন্যায্য দাম পায় না। কৃষকেরা

ফসল কাটার অব্যবহিত পরেই সব বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হয়। সে সময় সাধারণত ফসলের মূল্য খুব কম থাকে। আরও কিছুদিন ফসল ঘরে রাখিতে পারিলে হয়ত তাহারা বেশী দাম পাইত। কিন্তু অর্থের অভাবের জন্য তাহা সম্ভব হয় না।

যখন মাঠে কাজ থাকে না, সেই সময়ে করিবার মত কোন কাজ কৃষকের নাই। বছরে অন্তত পাঁচমাস কৃষককে অলসভাবে বসিয়া থাকিতে হয়। এই সময়ে কোন কাজ পাইলে কৃষকের আয় বাড়িতে পারিত।

আমাদের দেশের কৃষকের স্বাস্থ্য ভাল নহে। প্রায়ই তাহারা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে ভোগে। তাহারা নিরক্ষর এবং উদ্যমহীন। অশিক্ষার জন্য কৃষির উন্নত ব্যবস্থার খবর তাহারা রাখে না। উচ্চাশার অভাবে উন্নত জীবন যাপন করিবার প্রেরণাও তাহাদের কম। যে অগণিত জনসাধারণ জমি চাষ করে তাহারা প্রাণে বাচিবার মত আয়ও অনেক সময় পায় না।

প্রতিকার: ত্রুটি কোথায় তাহা জানা থাকিলে প্রতিকারের উপায় বাহির করা কঠিন নহে। প্রথমত খণ্ড খণ্ড জমি একত্র করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আইন করিয়া অথবা পাঞ্জাবের মত সমবায়ব্যবস্থা দ্বারা জমিগুলি একত্র করিতে হইবে। সমবায়কৃষির ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিলেই খুব ভাল হয়।

দ্বিতীয়ত, কূপ, পুকুর, সেচ-খাল প্রভৃতি খনন করিয়া ভালভাবে জলসেচের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বারোমাস উপযুক্ত পরিমাণে জলসেচের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে ভারতবর্ষে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি করা সম্ভব নহে।

তৃতীয়ত, সরকারকে সমবায়-ঋণদান-সমিতি স্থাপন করিয়া কৃষককে অল্প সুদে ধার দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কৃষকদিগকে ভাল বীজ দিবার ব্যবস্থাও সরকারকে করিতে হইবে। চাষীদের মধ্যে সমবায়-ক্রয়-সমিতি স্থাপন করিয়া উহার মারফতে ভাল বীজ, উন্নত যন্ত্রপাতি, সার এবং চাষের জন্য পশু ইত্যাদি ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। চাষীরা কিস্তিবন্দীতে ক্রীত দ্রব্যের দাম শোধ করিতে পারিবে। সরকারী কৃষিবিভাগে ভাল বীজ, উন্নত চাষব্যবস্থা সম্বন্ধে গবেষণা এবং পরীক্ষা চালাইতে হইবে। কৃষকদিগকে তাকাবি ঋণ আরও ব্যাপকভাবে দিতে হইবে।

কৃষকদের বুঝাইতে হইবে যে, কেহ যেন গোবর জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার

-না করিয়া জমিতে সার দেয়। সরকারী তরফ হইতে সস্তা দামে কাঠ এবং অন্যান্য জ্বালানি কৃষককে দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মল, গোময় ইত্যাদি মাটিতে গর্ত করিয়া জমা করিবার ব্যবস্থা করিলে, পরে মাটির সহিত মিশাইয়া উহা হইতে উৎকৃষ্ট সার হইতে পারে।

চতুর্থত, ফসল বিক্রয় করিবার জন্য সমবায় বিক্রয়সমিতি স্থাপন করিতে হইবে। ঋণদান, ফসল বিক্রয়, শস্যভাণ্ডার স্থাপন, বীজ ক্রয়, সার ও যন্ত্রাদি ক্রয় প্রভৃতি বহু উদ্দেশ্য লইয়া এইটি সমবায় সমিতি স্থাপন করা চলিতে পারে। এই সমিতি হইতেই গ্রামোন্নয়নের সব কাজ করা যাইতে পারে। স্কুল স্থাপন, স্বাস্থ্যবিধি শিক্ষা দেওয়া প্রভৃতি কাজ এই সমিতি অনায়াসে করিতে পারে।

জমির বহুবিভাগ (Sub-division and fragmentation of land): ভারতবর্ষের ক্ষেতের আয়তন খুব ছোট। ইংলণ্ডে একজনের জমির আয়তন ৬২ একর মাত্র, আমেরিকায় ২৪৮ একর, কিন্তু ভারতবর্ষে তাহা ৪।৫ একর মাত্র। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রতি পরিবারের জমির পরিমাণ পশ্চিম বাংলায় প্রায় ৪ একর, মাদ্রাজে ৫ একর, মধ্যপ্রদেশে ৮ একর এবং উত্তরপ্রদেশে ২·৫ একর। পশ্চিম বাংলার দিনাজপুর জেলায় প্রতি কৃষকের গড়পড়তা জমির পরিমাণ মাত্র ১·৫ একর। শুধু যে একজনের অধিকৃত জমির পরিমাণ এদেশে কম তাহা নহে, এই জমিও আবার বহু অংশে বিভক্ত এবং তাহাও এক বা একাধিক গ্রামে ছড়ানো। একজন লেখক বলিয়াছেন যে, একজনের একটি জমি নয় খণ্ডে বিভক্ত। বোম্বাইএর কোঙ্কনে এক একর জমিতে নয়টি খণ্ড আছে এবং উহার মালিক নয়জন বিভিন্ন লোক। গ্রামে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় এক খণ্ড জমির চারিপাশে আইল দেওয়া। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে তাহাদের কোনই সামঞ্জস্য নাই। অনেক সময়ে কয়েক গজ মাত্র জমি এইরূপ আইল দিয়া ঘেরা।

ইহার কারণ (Cause of sub-division): খণ্ড খণ্ড জমি এবং তাহাও ছড়ানো বলিয়া আমাদের দেশে চাষের উৎপাদন কম হয়। ক্ষেত ছোট হইবার কারণ মুখ্যত দুইটি। গত ৩০।৪০ বৎসরে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। জীবিকা নির্বাহের জন্য যাহাদের কেবল মাত্র জমির উপরেই নির্ভর করিতে হয়, তাহাদের সংখ্যাও অনেক বাড়িয়াছে। কিন্তু সেই অনুপাতে

কর্ষিত জমির পরিমাণ বাড়ে নাই। তাহার ফলে প্রত্যেক কৃষকের জমির ভাগ কম হইতেছে। উপরন্তু যৌথ পরিবারপ্রথা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে এখন আর একত্র জমি চাষ হয় না। পিতার মৃত্যুর পরে প্রত্যেক উত্তরাধিকারী তাহার সম্পত্তির অংশ ভাগ করিয়া লইতে চায়। ভারতবর্ষের উত্তরাধিকারী আইন অনুযায়ী প্রত্যেক লোকের বহু উত্তরাধিকারী থাকে। হিন্দু আইনে পিতার সম্পত্তিতে প্রত্যেক সন্তানের সমান অধিকার আছে। মুসলমান আইনে ছেলে, বাপ, মা, মেয়ে সকলেই মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে অংশ পাইবার অধিকারী। এই কারণে জমি ক্রমাগত ভাগ হইতেছে। জমি ইতস্তত ছড়াইয়া পড়িবার কারণ প্রত্যেক উত্তরাধিকারী প্রত্যেক জমির ভাগ দাবী করে।

ক্ষেত ছোট হওয়াতে কৃষির ক্ষতি (Effects of sub-division) : ছোট ক্ষেতে ফসলের পরিমাণ বড় জমির তুলনায় স্বভাবতই কম হয়। এই কারণে ভারতবর্ষে জমি হইতে কম ফসল পাওয়া যায়। জমি নানা স্থানে ছড়াইয়া থাকাতে কোন ক্ষেতই ভালভাবে চাষ করা যায় না। দ্বিতীয়ত, আইলের জন্য এবং জমিতে প্রবেশের পথ রাখিবার জন্য বহু জমি নষ্ট হয়। ক্ষেতগুলি একত্র থাকিলে আইলে এত জমি নষ্ট হইত না।

তৃতীয়ত, কৃষকের সব জমি এক জায়গায় থাকিলে কূপ ইত্যাদি খনন করিয়া তাহারা জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করিতে পারে। কিন্তু কৃষকের জমি এক খণ্ড হয়ত গ্রামের উত্তরে, অপর খণ্ড হয়ত দক্ষিণে। কাজেই এইভাবে অবস্থিত জমির জন্য কূপ খনন করিবার কোনই অর্থ নাই।

চতুর্থত, কেবল মাত্র কূপ খনন করিবার ব্যাপারে নহে, টুকরা টুকরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জমির মালিক যে কৃষক, সে কোনরূপ উন্নত কৃষিব্যবস্থাই অবলম্বন করিতে পারে না। এক খণ্ড জমি হইতে অপর জমিতে যাইতে হয় বলিয়া কৃষকের বহু সময় এবং শক্তির অপব্যয় হয়। জমির সীমানা লইয়া প্রায়ই ঝগড়া ও মকদ্দমা লাগিয়া থাকে।

প্রতিকার (Remidies for sub-division) : এই সব ত্রুটি দূর না করিলে কৃষির উন্নতি হইবে না। বিভিন্ন রাজ্যে এ সম্বন্ধে দুইটি পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। প্রথমত, পাঞ্জাবে এবং অন্যান্য অঞ্চলে সমবায়ের ভিত্তিতে জমি একত্র করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পদ্ধতিটি এইরূপ। পাশাপাশি দুইটি খণ্ডের জমির মালিক হয়ত দুইজন। অন্যত্র আবার হয়ত এই

দুইজনেরই পাশাপাশি জমি আছে। দুইজনে সপরিমাণ জমি বদলাবদলী করিয়া লইলে দুইজনের জমি এক জায়গায় হয়। এই ভাবে ছড়ানো টুকরা টুকরা জমির পরিবর্তে একত্র একখণ্ড বড় জমি করিয়া লইবার সুযোগ প্রত্যেক চাষীকে দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়ত, মধ্যপ্রদেশ, পূর্বপাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতিতে সরকার জমি একত্রীকরণ আইন অনুযায়ী প্রত্যেক কৃষককে নিজের জমি একত্র করিয়া লইবার জন্য বলিতে পারে। যদি গ্রামের অর্ধেকের বেশী লোক এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিতে রাজী থাকে, তাহা হইলে বাকি সকলকেও জমি একত্র করিতে বাধ্য করা যাইতে পারে।

এই আইন অনুসারে কিছু কিছু কাজ হইয়াছে। কিন্তু ইহা যথেষ্ট নহে। যে হারে এই সব রাজ্যে জমি একত্র হইতেছে, তাহাতে সব জমি একত্রীকরণ করিতে কয়েক শতাব্দী চলিয়া যাইবে। যে সব সংস্কার নিতান্ত প্রয়োজন, তাহার জন্য এতকাল অপেক্ষা করা সম্ভব নহে। কৃষকের দারিদ্র্য বাড়িতেছে ছাড়া কমিতেছে না। জমির আকার বড় না হইলে কৃষির উল্লেখযোগ্য কোন স্থায়ী উন্নতি সাধন করা সম্ভব নহে। আমাদের দেশে চাষের অবস্থা এখন যেরূপ, রাসিয়াতে বিপ্লবের পূর্বে ঠিক সেইরূপ ছিল। সোভিয়েট রাসিয়া ঐকত্রিক ক্ষেত্র (Collective farm) ব্যবস্থা করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান করিয়াছে। তাহার ফলে ফসলের পরিমাণ খুব বাড়িয়াছে। এই সকল ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রে সরকারী ট্রাকটর দিয়া জমি চাষ করা হয়। ভারতবাসীদের এই দিকে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে।

সব চেয়ে ভাল ব্যবস্থা হইতেছে সমবায় কৃষিপদ্ধতি (Co-operative farming) অবলম্বন করা। গ্রামের চাষীরা একটি সমবায় সমিতি গঠন করিবে এবং এই সমিতি তাহাদের সমস্ত জমি একত্র চাষ করিবে। পরে যাহার যত জমি আছে সেই অনুপাতে নিজেদের মধ্যে ফসল ভাগ করিয়া লইবে।

জলসেচ

আমাদের দেশের জমি শুষ্ক। ইহাই আমাদের কৃষির একটা বড় ত্রুটি। দেশে বিভিন্ন রকমের শস্য উৎপন্ন হইবার মত জমি আছে। কিন্তু জমি শুষ্ক বলিয়া যথেষ্ট জলসেচের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে ফসল ভাল হয় না। দেশের

সর্বত্র সমান বৃষ্টি হয় না। রাজস্থানের মত জায়গায় বৃষ্টি প্রায় হয় না। অন্যান্য জায়গাতেও বৃষ্টি অনিয়মিত এবং অনিশ্চিত। কাজেই বর্ষার উপরে নির্ভর না করিয়া জলসেচের ব্যবস্থা করা আমাদের দরকার।

জলসেচব্যবস্থা (Irrigation works): তিনপ্রকারে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে,—কূপ, পুকুর ও সেচখাল। বহু জায়গায় কৃষকেরাই কূপ খনন করিয়াছে। উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই রাজ্যে বহু কূপ খনন করা হইয়াছে। সরকার টাকা ধার দিয়া কূপ-খননের ব্যয়নির্বাহের সাহায্য করে। ভারতবর্ষে চাষের জন্য প্রায় পঁচিশ লক্ষ কূপ আছে। যে সব জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা আছে, তাহার শতকরা ৩০ ভাগে কূপ হইতে চামড়ার থলিতে জল তোলা হয়। সেই জল নালি বাহিয়া জমিতে গিয়া পড়ে। উত্তরপ্রদেশে সরকার নলকূপ খনন করিয়াছে। বিদ্যুতের সাহায্যে ঐ কূপ হইতে জল তোলা হয়। এইরূপ প্রায় ১,৭০০ নলকূপ বসান হইয়াছে।

পুকুর কাটিয়াও জমিতে জলসেচ করা হয়। পাঞ্জাব ব্যতীত সব রাজ্যেই পুকুর আছে। মাদ্রাজে সেচের জন্য পুকুর খুব বেশী। পুকুরের পার্শ্ববর্তী জমিতে জল দেওয়া হয়।

সেচ-খালই এই দিক হইতে সবপ্রধান। অতি প্রাচীনকালেও হিন্দু এবং মুসলমান রাজারা প্রজাহিতার্থে খাল খনন করিতেন। ভারত সরকার খাল-খননের জন্য এ পর্যন্ত ৩৫০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছে।

খাল তিন প্রকারের। কখন কখন নদী হইতে লম্বা খাল কাটা হয়। খালের গভীরতা নদীর গভীরতা অপেক্ষা কম হয়। বর্ষার সময় নদীর জল বাড়িলে তবে এই খালে জল আসে। কাজেই এই খাল বছরের অনেক সময়েই শুষ্ক থাকে। ইহাকে বর্ষাতি (inundation canal) খাল বলে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর খালের নাম স্থায়ী (perennial canal) খাল। এই খালগুলি এইভাবে কাটা হয় যাহাতে সারা বৎসর ধরিয়া নদীর জল ইহাতে আসিতে পারে।

তৃতীয় শ্রেণীর খালের নাম সঞ্চিত খাল (storage canal)। কোনও উপত্যকায় একটি প্রকাণ্ড বাঁধ নির্মাণ করা হয়। এই বাঁধের ভিতরে বর্ষার জল জমিয়া থাকে। এই সঞ্চিত জল খাল দিয়া দূর দূরান্তরের জমিতে দেওয়া যায়।

খালের সংখ্যা বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন। পূর্ব পাঞ্জাবে সেচ খাল বেশী।

শতদ্রু, ঝিলম প্রভৃতি খাল হইতে পাঞ্জাবের কর্ষিত জমির শতকরা ৬০ ভাগে জলসেচ করা হয়। উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই এবং মধ্যপ্রদেশে সেচ খাল হইতে শতকরা ৩২,৩৫,৭ ভাগ কর্ষিত জমিতে জল দেওয়া হয়। উত্তরপ্রদেশে সরদা খাল, বোম্বাইয়ের ভাণ্ডারধারা ও লয়েড বাঁধ এবং মাদ্রাজের কাবেরী-সেতুর বাঁধ প্রসিদ্ধ। পশ্চিম বাংলা ও আসামের মোট কর্ষিত জমির মাত্র ৬.৪ ভাগ এবং ১৪ ভাগই জমিতে খালের জলের সাহায্যে চাষ করা হয়। দামোদর খাল পশ্চিম বাংলায় প্রসিদ্ধ।

সেচ খাল হইতে রাজ্য সরকারের ভাল রাজস্ব আদায় হয়। যে সব চাষী খালের জল চাষের জন্য ব্যবহার করে, তাহাদের জলকর দিতে হয়। ফসল অনুযায়ী এই কর কম বেশী হইয়া থাকে। খাল হইতে যে রাজস্ব আদায় হয়, তদনুযায়ী তাহাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। একটি উৎপাদনশীল ও অপরটি অনুৎপাদনশাল। উৎপাদনশাল খাল (Productive works) হইতে প্রতি বৎসর ভাল আয় হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর (Unproductive works) খাল হইতে কোনও বিশেষ রাজস্ব আদায় না হইলেও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য উহা খনন করা হইয়াছে।

সরকার এত অর্থ ব্যয় করা সত্ত্বেও মোট কর্ষিত জমির শতকরা মাত্র ১৯ ভাগ সেচখালের জল পায়। দেশের প্রয়োজনের তুলনায় ইহাকে নিতান্তই অল্প বলিতে হইবে। এদিকে করণীয় অনেক কিছু আছে।

সেচখালের সুবিধা (Utility of irrigation): সেচখাল চাষের খুবই সুবিধা করিয়াছে। সেচখাল উষর মরুভূমিকে শস্যশ্যামল করিয়া তুলিয়াছে। খাল কাটিবার পূর্বে পাঞ্জাবের বহু জমি মরুভূমির মত ছিল। লোকে বিনা পয়সাতেও তাহা লইতে চাহিত না। কিন্তু খাল কাটিবার পর এই জমিগুলি খুবই উবর হইয়াছে এবং প্রচুর শস্য তাহাতে হয়। দ্বিতীয়ত, সেচখাল জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে। বোম্বাই রাজ্যে যে জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা নাই, তাহাতে প্রতি একরে ৫৯০ পাউণ্ড চাউল হয়। আর যে জমি সেচখালের জল পায় তাহাতে উৎপন্নের পরিমাণ ১,২০০ পাউণ্ড। তৃতীয়ত, সেচ খাল অনিশ্চিত বর্ষার উপর নির্ভরতা কমায়। ইহার ফলে চাষীর অবস্থা নিরাপদ হয়। সেচখাল খননের ফলে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের ত্রাণকল্পে দেয় টাকা তখন কম লাগে এবং সেচ খাল হইতে সরকারের ভাল রাজস্ব আদায় হয়।

কৃষকের ঋণ

আমাদের দেশের চাষের অবস্থা শোচনীয় হইবার অন্যতম কারণ চাষীর ঋণভাব। যে ঋণভারপীড়িত সে জমির উন্নতিকল্পে কিছুই করিতে পারে না। কৃষকদের মোট ঋণের পরিমাণ বহু টাকা। ১৯৩১ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধানকমিটি হিসাব করিয়া স্থির কবে যে, এই ঋণের পরিমাণ ৯০০ কোটি টাকা। সংযুক্ত বাংলা দেশে কৃষকেব ঋণই প্রায ১০০ কোটি টাকা ছিল। পরবর্তী কয়েক বৎসরে এই ঋণেব বোঝা আরও নিশ্চয়ই বাড়িয়াছিল। তবে যুদ্ধের ফলে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে এই ঋণ কিছু পরিমাণে লাঘব হইয়াছে অনুমান করা অন্যায় হইবে না। কৃষকের ঋণসমস্যা অত্যন্ত গুরুতর। এই সমস্যা সমাধান না করিতে পারিলে কৃষিকার্যের উন্নতি করা সম্ভব নহে।

কৃষিঋণের কারণ (Causes of indebtedness): ইহার প্রধান কারণ কৃষকের ঘোর দারিদ্র্য। তাহাদের আয় কম হওয়াই দারিদ্র্যের কারণ। কৃষি হইতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ কম হয় বলিয়া আয়ও কম হয়। আবার কম ফসল হইবার কারণ বৃষ্টির অনিশ্চয়তা, চাষের জমির ক্ষুদ্রায়তন, জমির উন্নতির জন্য মূলধন বিনিয়োগ না করা প্রভৃতি।

দারিদ্র্যের জন্য কৃষক কিছুই সঞ্চয় করিতে পারে না। যদি কোন বৎসর অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির জন্য ফসল ভাল না হয়, তবে কৃষক ধার করিতে বাধ্য হয়। কিংবা চাষের বলদ মরিয়া গেলে তাহাকে ধার করিয়া বলদ কিনিতে হয়। জমিদারের গোমস্তা খাজনা আদায় করিতে আসিলে কৃষককে বাধ্য হইয়া মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হয়। আবও নানা কারণে গরীব কৃষককে ধার কবিতে হয়।

চাষীদের সঞ্চয়প্রবৃত্তি না থাকাতেও অনেক সময়ে ধার কবিতে হয়। কোনও বছর ফসল খুব ভাল হইলে কৃষক বাড়তি আয় বিবাহ, শ্রাদ্ধাদিতে ব্যয় করে, অনাবশ্যক মামলা-মকদ্দমা করে। ইহাব ফলে চাষীরা কিছুই সঞ্চয় করিতে পারে না।

মহাজনেরাও অনেকেই অসাধু। অনেক মহাজন কৃষকদের নিরক্ষরতার সুযোগ লইতে ইতস্তত করে না। কৃষক হিসাব পরীক্ষা করিতে পারে না, টাকা দিয়া অনেক সময় রসিদ লয় না। মহাজনও এই সুযোগে কৃষককে বঞ্চনা

করে। মহাজনেরা চড়া হারে টাকা ধার দেয়। কৃষকদের আয় এত কম যে, এই চড়া সুদ দিবার পরে আসল শোধ করিবার মত কিছুই উদ্বৃত্ত থাকে না। ইহার ফলে ঋণের বোঝা বাড়িতেই থাকে এবং তাহা শোধ করিবার আর পথ থাকে না। অবশেষে মহাজন দেনার দায়ে জমি ক্রোক করিয়া লয়। এইভাবে কৃষক দিনের পর দিন ঋণে ডুবিয়া যাইতেছে।

ইহার প্রতিকার (Remedies for indebtedness): সমস্যাটির দুইটি দিক। প্রথমত, পুরাতন ঋণ শোধ করিবার উপায় বাহির করিতে হইবে এবং দ্বিতীয়ত, কৃষককে যাহাতে ভবিষ্যতে ঋণ গ্রহণ করিতে না হয় তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

প্রথম সমস্যা সমাধানকল্পে সরকার নানারূপ আইন পাস করিয়াছে, যথা ১৮৭০ সালের দাক্ষিণাত্য কৃষিত্রাণ আইন, ১৯১৮ সালের মহাজনী ঋণ আইন ইত্যাদি। এই সমস্ত আইনে সুদের হারের বোঝা কমাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সমবায় ঋণদানসমিতি স্থাপন করিয়া কৃষকদের ঋণ দিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। প্রথম পন্থাটি বিশেষ কোন কাজে আসে নাই এবং দ্বিতীয়টিও যথেষ্ট নহে। বহুসংখ্যক সমবায়সমিতি অবশ্য স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এই সমিতি হইতে ১৯৪০-৪১ সাল পর্যন্ত মাত্র ৭·৮ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কৃষকের ঋণের পরিমাণ ৯০০ কোটি। এই সমস্ত সমবায়সমিতির এত অর্থ নাই যাহা হইতে কৃষকগণ তাহাদের পূর্ব ঋণ পরিশোধ করিতে পারে। তাই ইদানীং আরও একটু কঠোর পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। কৃষকের ঋণের পরিমাণ ক্রমশ কমাইবার জন্য কৃষিখাতকআইন পাস হইয়াছে। দেশের নানা স্থানে ঋণসালিশী বোর্ড স্থাপন করা হইয়াছে। এই বোর্ড ঋণগ্রস্ত কৃষকের ঋণের পরিমাণ পরীক্ষা করে এবং কৃষকের পরিশোধক্ষমতা অনুযায়ী দাবী কমাইবার জন্য মহাজনকে অনুরোধ করে। কিস্তিবন্দীতে ঋণ শোধের ব্যবস্থাও হইয়াছে। পশ্চিম বাংলায় কৃষকের ঋণভার লাঘব করিবার জন্য সালিশী বোর্ড যথেষ্ট কাজ করিয়াছে। কিন্তু করণীয় আরও অনেক কাজ আছে।

ঋণভারের একটি কুফল ইহাই যে কৃষকের জমি বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। কৃষকদের জমি মহাজনের হাতে যাহাতে না চলিয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে পাঞ্জাব এবং অন্যান্য রাজ্যে আইন পাস করা হইয়াছে। যাহারা প্রকৃত কৃষক নহে বা কৃষি যাহাদের পেশা নহে, তাহারা চাষের জমি কিনিতে পারিবে না।

দ্বিতীয় সমস্যাটি নানাভাবে সমাধান করিবার চেষ্টা হইয়াছে। সরকার বিশেষ বিশেষ কারণে, যথা বীজ এবং চাষের বলদ কিনিতে, কৃষককে টাকা ধার দিয়াছে। ইহাকে তাকাবি ঋণ বলে। অজন্মা উপস্থিত হইলে অথবা জিনিষপত্র দুর্মূল্য হইয়া উঠিলে এই ঋণ দেওয়া হয়। কৃষকেরা এই ঋণ লইতে নারাজ। ইহার দ্বারা সমস্যাটি দূর হয় নাই। সবকার সমবায়-ঋণদান-সমিতি স্থাপন করিয়াছে। এই সমিতি অল্প সুদে কৃষকদিগকে টাকা ধার দেয়। এই সমিতি কৃষকদের খুব সাহায্য কবিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সমিতিগুলির তহবিল খুব কম বলিয়া কৃষকদের সব প্রয়োজন মিটাইতে ইহারা অক্ষম।

মহাজনেরা অনেক সময়ে কৃষকদের বঞ্চনা করে তাহা বলা হইয়াছে। মহাজনদের এই অসাধুতা নিবারণকল্পে রাজ্য সরকার মহাজনী আইন পাস করিয়াছে। এই আইন অনুযায়ী প্রত্যেক মহাজনকে ব্যবসায়ের জন্য অনুমতিপত্র লইতে হইবে এবং খাতকদিগকে নিয়মিত হিসাব দিতে হইবে। শতকরা ৮ হইতে ১২ টাকার বেশী সুদ কেহ লইতে পারিবে না।

এই সব পন্থা অবলম্বন করাতে কিছু কিছু ফল হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে সামান্য সংখ্যক কৃষক সুবিধা লাভ কবিতে পারিয়াছে। কৃষকদের আয় না বাড়িলে প্রকৃত এবং স্থায়ী উপকাব হইতে পাবে না। আয় বাড়াইতে হইলে ফসলের উৎপাদন বাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহার জন্য চাই বড় আয়তনের জমিতে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে চাষের ব্যবস্থা করা। অতএব সমস্ত ব্যাপারটি অপবের উপব নির্ভব করিতেছে। সুপবিকল্পিত উপায়ে কৃষি পুনর্গঠিত হইলে তবে কৃষকের সুদিন দেখা দিবে।

বিক্রয়ব্যবস্থা (Marketing)

বিক্রয়ব্যবস্থার ত্রুটি (Defects of marketing): জমি হইতে প্রত্যেক কৃষক সামান্যই ফসল পায়। ইহা খুব খারাপ সন্দেহ নাই। আরও খারাপ বিষয় এই যে, কৃষক তাহার উৎপন্ন শস্যের উপযুক্ত মূল্য পায় না। যে চাষী সামান্য ফসল উৎপাদন করে, তাহার পক্ষে দূরের বাজারে ফসল বিক্রয় করা সম্ভব নহে। দূরবর্তী বাজার ও গ্রামের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই ভাল রাস্তা নাই। সুতরাং ফসল গ্রামের বাজারে ব্যাপারী, ফড়িয়া, অথবা অন্য দালালের নিকট কৃষক সব বিক্রয় করে। চাষীরা নিরক্ষর বলিয়া ঠিক বাজারদর

জানে না। দালালগণ অনেক সময়ে বাজার-দর অপেক্ষা কম মূল্যে ফসল ক্রয় করে। তাহারা কৃষকদের ওজনেও ঠকায়। অনেক সময়ে কৃষকগণ বীজ বপণ করিবার সময়ে দালালের নিকট হইতে ফসল বিক্রয় করিবার অঙ্গীকারে দাদন লয়। এই মহাজনগণ কৃষকের এই অবস্থার সুযোগ লইয়া ফসলের উপযুক্ত মূল্য দেয় না। নূতন ফসল উঠিলে উহার দাম বাজারে কম থাকে। কিন্তু কৃষকগণ দরিদ্র বলিয়া ফসল কাটা হইলেই তাহা বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। কয়েক মাস ফসল ধরিয়া রাখিতে পারিলে ভাল দাম পাওয়া যায়। দালালগণ ফসল কাটা হইলেই উহা কিনিয়া রাখে এবং কয়েকমাস পরে দাম চড়িলে তাহা বিক্রয় করে। এই ভাবে দালালগণই সব লাভ খায়। গমের প্রকৃত ভোক্তা গম এবং গমজাত দ্রব্যের জন্য যে দাম দেয়, তাহার মধ্যে টাকায় সাত আনা মাত্র পায় চাষী, বাকি নয় আনাই দালালের উদরে যায়।

বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতি (Methods of improving marketing) : বিক্রয়ব্যবস্থা একটু উন্নত হইলে চাষীদের আয় অনায়াসেই দ্বিগুণ হইতে পারে। সরকারের উচিত দেশের সবত্র ঠিক মত ওজন চালু করিবার জন্য আইন পাস করা। বিক্রেতারা যে ওজন ব্যবহার করে তাহা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার। ভাল রাস্তা, রেলপথ প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া গ্রামের সহিত প্রধান প্রধান বাজার ও হাটের যোগস্থাপন করিতে হইবে। কৃষকদিগের মধ্যে সমবায়-বিক্রয়-সমিতি স্থাপন করিতে হইবে। এই সমিতি প্রত্যেক চাষীর ফসল একত্র করিয়া বিক্রয় করিবে ও সরকারের নিকট হইতে টাকা ধার লইয়া ধর্মগোলা (শস্যভাণ্ডার) তৈয়ারী করিবে। চাষীরা এই গোলায় তাহাদের ফসল জমা দিয়া রসিদ পাইবে। সমবায়সমিতি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হইতে এই রসিদ জামানত রাখিয়া প্রয়োজন মত টাকা ধার দিবে। তাহা হইলে চাষীদের টাকার আশু প্রয়োজন মিটিবে। দাম বাড়িলে সমিতি ফসল বিক্রয় করিবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ চাষীদের দিয়া দিবে। অবশ্য তাহা হইতে ঋণ এবং খরচের টাকা কাটিয়া লওয়া হইবে। ফসল কাটিবার পরেই তাহা যদি বিক্রয় না করিতে হয়, তাহা হইলে চাষী অধিক দাম পাইতে পারে।

চাষী : এইবারে চাষীর কথা আলোচনা করা যাইতে পারে। চাষী সম্বন্ধে নানা কথা বলা হইয়াছে। আমাদের দেশের চাষীর যে কর্মকুশলতা কম সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অক্ষমতার জন্য তাহার অস্বাস্থ্য এবং অশিক্ষাই

বেশী দায়ী। দারিদ্র্যের জন্য তাহার ঠিক মত আহার জোটে না, আবাসস্থানও দীনতম; তাই সহজেই সে নানারকম পীড়ায় ভোগে। ইহাতে তাহার জীবনীশক্তি কমিয়া যায়। অশিক্ষিত বলিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে তাহার কিছুই জানা নাই। যুগ যুগ ধরিয়া কঠোর দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে চাষীর সমস্ত উচ্চাশা লোপ পাইয়াছে, সে অদৃষ্টবাদী হইয়া পড়িয়াছে। যাহা জোটে তাহাই অদৃষ্টের লিখন বলিয়া সে গ্রহণ করে। তাই সে অবস্থার উন্নতি করিবার চেষ্টা কদাচিৎ করে। এই সমস্তই সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের দেশের চাষী অলস নহে। আমাদের চাষী কঠোর পরিশ্রমী। তাহার চাষপদ্ধতি প্রাচীন হইলেও বহুযুগসঞ্চিত জ্ঞান সে চাষের কাজে প্রয়োগ করে। কাজেই তাহার সব ত্রুটিই তাহার পরিবেশের; নিজের চরিত্রের নহে। সাধারণ শিক্ষা এবং কৃষি শিক্ষার প্রসার হইলে এই ত্রুটি অনেকখানি কমিয়া যাইবে। দেশে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন করিতে হইবে এবং আধুনিক কৃষিপদ্ধতি সম্বন্ধে কৃষকদের অবহিত করিয়া তুলিতে হইবে।

রাষ্ট্র এবং কৃষি (The State and Agriculture): কৃষির উন্নতির জন্য রাষ্ট্রের অনেক কিছু করিবার আছে। রাষ্ট্র হইতে অবশ্য কিছু কিছু কাজ এখনও করা হয়। গভর্ণমেণ্ট সেচ খাল খনন করিয়াছে, কৃষকদিগকে কূপ এবং পুষ্করিণী খননে উৎসাহ দিয়াছে। পাঞ্জাব এবং অন্যত্র কৃষকের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত টুকরা টুকরা জমি একত্র করিয়া দিতে সাহায্য করিয়াছে। জমি একত্রীকরণ আইন মধ্যপ্রদেশেও পাস করা হইয়াছে। প্রত্যেক রাজ্য সরকার কৃষিবিভাগ স্থাপন করিয়াছে। অনেক জায়গায় কৃষিপ্রদর্শনী প্রতিষ্ঠান খুলিয়া কৃষকদিগকে উন্নত কৃষিপদ্ধতির কাজ দেখিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। সরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে ভাল বীজ সরবরাহ করা হয়। উৎকৃষ্টতর পশু জন্মের জন্য লর্ড লিনলিথগো ভাল ষাঁড় বহু লোককে এবং গ্রামের পঞ্চায়েতকে বিনামূল্যে দান করিয়াছেন। জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য খুবই চেষ্টা হইতেছে। অবশ্য এখনও তাহার ফল বিশেষ দেখা দেয় নাই। বিভিন্ন রাজ্যে বহু কৃষি বিদ্যালয় এবং কলেজ স্থাপন করা হইয়াছে। গবেষণার কাজের সমন্বয়সাধন করিবার জন্য ভারত সরকার কেন্দ্রীয় কৃষিগবেষণাপরিষদ স্থাপন করিয়াছে। এই পরিষদ হইতে বিভিন্ন দিকের গবেষণা হইতেছে। সরকার কৃষিঋণআইন এবং জমি-উন্নয়ন আইন পাস করিয়াছে। কৃষক কষ্টে পড়িলে

সরকার তাহাকে তাকাবি ঋণ দেয়। কৃষককে নানাভাবে সাহায্য করিবার জন্য সমবায়সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। সমবায়-ঋণদান-সমিতি হইতে কৃষককে টাকা ধার দেওয়া হয় এবং পুরাতন ঋণ শোধ করিবার ব্যবস্থাও করা হয়। সমবায়-বিক্রয়-সমিতি হইতে ফসল বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করা হয়। বিক্রয়-ব্যবস্থা আরও উন্নত করিবার জন্য সরকার চেষ্টা করিতেছে। প্রাথমিক পন্থা হিসাবে বিক্রয়-কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে। এই কর্মচারীর কাজ প্রত্যেক ফসলের বাজারের অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করা।

কৃষির উন্নতির জন্য সরকার কিছু মনোযোগ দিয়াছে সন্দেহ নাই। তবুও স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহার কোন উল্লেখযোগ্য ফল এখনও দেখা দেয় নাই। যে হারে কৃষির উন্নতি করা হইতেছে ভারতবর্ষের সব কৃষকের উন্নতি করিতে কয়েক শতাব্দী কাটিয়া যাইবে। আরও কার্যকরী পন্থা অবলম্বন না করিলে কৃষকের অবস্থার কোনই উন্নতি হইবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সমবায়

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সমবায়সমিতি স্থাপন করিয়া কৃষকদের ঋণ দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সমবায়সমিতি কি? পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতা করিবে এই ভিত্তিতে সমবায়সমিতি গঠিত হইয়াছে। 'একতাই বল' ইহাই সমবায়ের নীতি। দরিদ্র দুর্বল ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত চেষ্টায় হয়ত কিছু করিতে পারে না। কিন্তু পাঁচজনের সঙ্গে মিলিত হইলে তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি হয়। তাহারা পুঁজিপতি মালিককে বাদ দিয়া সমবেত ভাবে কাজে করিতে পারে, দালালকে তখন আমল না দিলেও চলে এবং ধনী যে সকল সুবিধা পায়, সবই সমবেত প্রচেষ্টায় পাওয়া যাইবে। কয়েকজন লোক স্বেচ্ছায় একত্র হইয়া সমবায়সমিতি গঠন করে। প্রত্যেক সভ্য হয়ত অকিঞ্চিৎকর হইতে পারে, কিন্তু সমবেত হইয়া তাহারা নানা সুবিধা লাভ করে এবং নৈতিক চরিত্র বিকাশের জন্য চেষ্টা করে।

সমবায়ের নীতি (Principles of co-operation) :সমবায়ের মূল নীতি কি? প্রথম নীতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, **একতাই** বল। সংঘবদ্ধ হইয়া দরিদ্র ও দুর্বল সভ্যেরাও ধনীদের মত কতকগুলি সুবিধা লাভ করে। দ্বিতীয়ত, **সাম্য** ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নীতির উপরে সমবায়সমিতি গঠিত হয়। সংঘের সকল সভ্যেরই সমান অধিকার আছে। আর একটি নীতি হইবে **সংহতি**। সভ্য হইলে প্রত্যেককে সব অবস্থায় অপর সভ্যের পার্শ্বে দাঁড়াইতে হইবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য সংগ্রাম করিবে এবং পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিবে। আর একটি নীতি হইল **নৈকট্য**। সভ্যেরা একে অপরের সহিত ভালভাবে পরিচিত হইবে। এইজন্য সকল সভ্যেরই একই স্থানের লোক হওয়া উচিত। সমবায় এবং যৌথ কোম্পানীর মধ্যে পার্থক্য এইখানে। নানা জায়গার লোক কেহ কাহারও পরিচিত না হইলেও যৌথ কোম্পানী গঠন করিতে পারে। আর একটি নিয়ম **মিতব্যয়িতা**। সমবায়সমিতি পরিচালনা করিবার খরচ অতি সামান্যই হওয়া উচিত। সমবায়সমিতিতে ব্যয়বাহুল্য বর্জনীয়। প্রত্যেক সভ্যকে মিতব্যয়িতা শিখাইতে হইবে। সম্ভব হইলে

সমিতির কার্য পরিচালনায় প্রত্যেক সভ্য স্বেচ্ছায় সাহায্য করিবে। সমবায়-সমিতি সাধারণ সমিতির মত নহে। ইহার আদর্শ খুব উচ্চ। প্রত্যেক সভ্যকে আত্মনির্ভরতা এবং পরার্থপরতার আদর্শ শিক্ষা দিয়া সভ্যদের জীবনের ধারা পরিবর্তিত করিয়া তোলাই সমবায়ের আদর্শ। শুধু টাকা ধার দেওয়া অথবা কেবল ফসল বিক্রয় করাই ইহার উদ্দেশ্য নহে। সভ্যদের নৈতিক চরিত্র উন্নত করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই আর্থিক অবস্থা ভাল করিবার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়।

সমবায়ের ইতিহাস (Growth of the co-operative movement): দরিদ্র কৃষকদের সাহায্যের জন্য হের রাইফাইসেন জার্মানীতে প্রথম সমবায়সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু জার্মানীতে নহে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, আয়র্লণ্ড এবং পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশে সমবায় অসামান্য সাফল্য অর্জন করিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কৃষকদের দুঃখ দূর করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষেও কয়েকটি সমবায়সমিতি স্থাপন করা হয়। ফ্রেডারিক নিকলসন নামে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে মাদ্রাজ সরকার এই বিষয়ে একটি বিবরণী দাখিল করিতে বলিলে, তিনি একটি বাক্যে তাহার সিদ্ধান্ত প্রকাশিত করেন, "রাইফাইসেনকে স্থাপন কর।" অর্থাৎ তিনি সমবায়সমিতি স্থাপন করিয়া কৃষিঋণ দূর করিবার ইঙ্গিত দেন। ১৯০৪ সালে সমবায়সমিতি আইন পাস করিয়া এই সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমে সমবায় ঋণদান সমিতি স্থাপন করিয়া কৃষকদের ঋণ দিবার ব্যবস্থা করা হয়। যে কোন গ্রামের অন্তত দশজন লোক একত্র হইয়া এই সমিতি গঠন করিতে পারে। এই সব সমিতির উদ্দেশ্য ছিল সভ্য এবং অপর লোকের অর্থ আমানত রাখিয়া সভ্যদের তাহা হইতে অল্প সুদে ধার দেওয়া। সভ্যদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ ছিল না। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বহু সমবায়সমিতি স্থাপিত হয় এবং কার্যক্রম অন্যদিকে বিস্তৃত করিবার প্রয়োজনও অনুভূত হইতে থাকে। তাই ১৯১২ সালে আর একটি আইন পাস হয়। এই আইনে ক্রয়, বিক্রয় প্রভৃতি উদ্দেশ্যেও সমিতি গঠন করার ব্যবস্থা করা হইল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সমবায়ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া গ্রামের সমিতিগুলিকে টাকা ধার দিবার ব্যবস্থা হইল। এই আইন অনুযায়ী সমবায়সমিতির গঠন স্পষ্ট আকার ধারণ করে। অবশ্য ইদানীং প্রত্যেক রাজ্যে নূতন আইন করিয়া রাজ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বর্তমানে সমবায় আন্দোলন নিম্নলিখিত ধারায় চলিতেছে। অধিকাংশ

সমিতিই কৃষকদিগকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছে। এই সমিতিগুলি ঋণ দিবার জন্য এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে গঠিত। কিন্তু ঋণদান-সমিতিগুলিই ইহার মধ্যে প্রধান। সমবায় সমিতিগুলির শতকরা ৮০ ভাগই ঋণদানসমিতি। ক্রয়, বিক্রয়, জলসেচ, পশুবীমা প্রভৃতি অন্যান্য সমিতিও কিছু কিছু স্থাপিত হইয়াছে। কৃষক নহে এমন লোকদের জন্য সমিতি গঠিত হইয়াছে। শ্রমিক এবং গ্রামের কারিগরদের জন্য ক্রয়, বিক্রয়, সমবায়ভাণ্ডার প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। প্রাথমিক সমিতিগুলিকে অর্থ ধার দিবার জন্য বহু কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যে সমবায়ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে।

গ্রাম্য সমবায় ঋণদানসমিতি (Primary Co-operative Society): প্রাথমিক সমিতিগুলিই সমবায় আন্দোলনের ভিত্তি। এই সমিতিগুলি ঋণ এবং অন্যান্য শ্রেণীতে বিভক্ত। সমস্ত কৃষি সমিতিগুলির শতকরা ৮০ ভাগ প্রাথমিক ঋণদানসমিতি। কাজেই এই সমিতিগুলির গঠন এবং কার্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা প্রয়োজন।

দশ বা ততোধিক লোকে মিলিয়া এই সমিতি গঠন করিতে পারে। প্রত্যেক সভ্যকেই সাবালক এবং একই স্থানের অধিবাসী হইতে হইবে। সভ্যেরা পরস্পর পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত থাকিবে। প্রত্যেক সমিতি এবং সভ্যের দায়িত্ব সীমাহীন। সমিতি নিজের ঋণ শোধ করিতে না পারিলে মহাজন সমিতির প্রত্যেক সভ্যের সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক করিয়া নিজের প্রাপ্য আদায় করিতে পারিবে। প্রথমে প্রত্যেক সভ্যকে কিছু প্রবেশমূল্য দিয়া ভর্তি হইতে হয় এবং কিছু শেয়ার কিনিতে হয়। সমস্ত সভ্য মিলিয়া সাধারণ সমিতি গঠিত করে এবং নিজেদের মধ্যে কয়েকজনকে লইয়া একটি পরিচালনা সমিতি গঠন করে। পরিচালনাসমিতি একজন সম্পাদকের সাহায্যে সমিতির সব কার্য পরিচালনা করে। সভ্য অথবা সম্পাদক কেহ মাহিনা লয় না। এই সমিতিগুলির কাজ সভ্যদের টাকা ধার দেওয়া। সভ্যদের প্রবেশ মূল্য, তাহাদের শেয়ারের টাকা এবং আমানতী অর্থ হইতেছে সমিতির তহবিল। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক হইতেও প্রাথমিক সমিতিকে টাকা ধার দেওয়া হয়। এই সব টাকা শুধু সভ্যদের ধার দেওয়া হয়। বীজ ক্রয়, কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় ইত্যাদি উৎপাদনশীল কার্যে এবং কন্যা বিবাহাদির ব্যাপারে টাকা ধার দেওয়া হয়। বর্তমান প্রয়োজন এবং পুরাতন ঋণ পরিশোধ উভয়বিধ

কার্যের জন্য টাকা ধার দেওয়া হয়। অন্তত দুইজন সভ্যকে ঋণের জন্য জামিন রাখিতে হয়। অল্প কিস্তিতে ঋণ শোধ করিবার ব্যবস্থা থাকে। বৎসরান্তে লাভ হইলে তাহার অন্তত এক-চতুর্থাংশ সংরক্ষিত তহবিলে (Reserve fund) রাখা হয়। দান এবং অন্যান্য কার্যে লাভের শতকরা দশ টাকা ব্যয় করা যাইতে পারে। নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ বণ্টন করিবারও ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক রাজ্যে সমবায়সমিতির একজন সমবায়-সমিতি-নিয়ামক (Registrar of Co-operative Societies) আছেন। তিনিই সমবায়সমিতিগুলির কার্য নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁহার কর্মচারীরা বৎসরে একবার সমিতির হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখেন। এই সমিতিগুলির কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে। সমিতিগুলিকে আয়কর অথবা স্ট্যাম্প কাগজ ব্যবহার করিতে হয় না। ঋণদান ছাড়াও সভ্যদের মানসিক ও নৈতিক উন্নতির চেষ্টা এই সমিতি হইতে করা হয়। কোন কোন সমিতি বিদ্যালয় স্থাপন ও অন্যান্য হিতকর কাজ করিয়াছে।

সমবায় ও কৃষক (Co-operation and Agriculture) : শুধু ঋণ দেওয়া ছাড়াও সমবায় আন্দোলন কৃষকদের অন্যান্যভাবে সাহায্য করে। কৃষকেরা সমবায়ের ভিত্তিতে জলসেচ সমিতি স্থাপন করে। কোন কোন রাজ্যে পশুবীমাসমিতিও (Cattle Insurance Society) স্থাপন করা হইয়াছে। বলদ মরিয়া গেলে সমিতি কৃষকদের বলদ কিনিবার জন্য টাকা দেয়। সমবায় ক্রয় ও বিক্রয় সমিতির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সমবায় ক্রয়সমিতি সভ্যদের জন্য পাইকারী দরে ভাল বীজ, সার এবং চাষের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনিয়া সভ্যদের নিকট বিক্রয় করে। সভ্যেরা কিস্তিবন্দীতে উহার দাম শোধ করে। বোম্বাইয়ের তুলাবিক্রয়সমিতি, পশ্চিম-বাংলার ধানবিক্রয়সমিতি, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের ইক্ষুবিক্রয়সমিতি প্রভৃতি সমবায় বিক্রয়সমিতিগুলি সভ্যদের ফসল সংগ্রহ করিয়া বাজারে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করে। সমবায় ভিত্তিতে জমি একত্রীকরণের কথাও উল্লেখ করিতে হইবে। পাঞ্জাবে ইহা বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছে। সমিতি গঠন করিয়া সভ্যেরা তাহাদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জমিগুলি একত্র করিয়া লয়। ইহা ব্যতীত সমবায় ম্যালেরিয়ারোধসমিতি, উচ্চতম জীবননির্বাহসমিতি (Better living society), গ্রামোন্নয়নসমিতি প্রভৃতি গঠিত হইয়াছে।

সমিতিগুলির আর্থিক ব্যবস্থা (Financing the co-operative societies) : সমিতিগুলি কোথা হইতে অর্থ পায় ? কৃষকেরা ত নিতান্ত দরিদ্র। দরিদ্র কৃষক লইয়া যে সমিতি গঠিত হয়, তাহার ধার দিবার মত টাকা কোথা হইতে আসে ? প্রত্যেক সভ্যই প্রবেশ মূল্য দেয় এবং কিছু শেয়ার কিনে, সে কথা ঠিক। যে ভাগ্যবান সভ্যের কিছু টাকা উদ্বৃত্ত থাকে, সে সমিতিতে জমা রাখে। কিন্তু এইভাবে বেশী অর্থ পাওয়া যায় না, কারণ অধিকাংশ সভ্যই অত্যন্ত গরীব। যাহারা সভ্য নহে তাহাদের টাকাও সমিতি জমা রাখে। ১৯৩৯-৪০ সালে ১·১৯ কোটি টাকা এইভাবে পাওয়া গিয়াছিল। প্রয়োজনের তুলনায় এই টাকা অতি সামান্য। সমিতি নিজের প্রয়োজনীয় টাকা কেন্দ্রীয় সমবায়ব্যাঙ্ক হইতে ধার করে। প্রাথমিক সমিতি এবং অনেক ব্যক্তি এই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের শেয়ার ক্রয় করে। এই ব্যাঙ্কগুলি জেলার পরগণায় বা সদরে স্থাপিত আছে এবং প্রাথমিক সমিতিকে টাকা ধার দেওয়াই ইহাদের প্রধান কাজ।

কেন্দ্রীয় সমবায়ব্যাঙ্কগুলি আবার রাজ্যের সমবায়ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার করে। রাজ্যের ব্যাঙ্ক রাজ্যের রাজধানীতে স্থাপিত আছে। বোম্বাই, পশ্চিম-বাংলা, বিহার, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, আসাম ও পূর্ব পাঞ্জাবে সমবায় ব্যাঙ্ক আছে। রাজ্যের ব্যাঙ্কগুলি সাধারণ ব্যাঙ্কের মতই টাকা জমা লয় এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অথবা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার করে। প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে টাকা ধার দেয়।

চাষী ব্যতীত অপর শ্রেণীর সমবায়সমিতি (Non-agricultural societies) : সমবায়সমিতি শুধু কৃষকদের জন্যই নহে। কুটিরশিল্পের কর্মীদের এবং শহরের অল্প বেতনভোগী কর্মচারীদের সাহায্যকল্পেও সমবায়সমিতি বহু কাজ করিয়াছে। তাঁত এবং অন্যান্য পরিবারদের টাকা ধার দিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজ্যে সমবায়সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। মাদ্রাজের তন্তুসমবায়সমিতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সমিতি প্রাথমিক সমিতিকে টাকা যোগান দেয়, উৎপাদন সম্বন্ধে পরামর্শ দেয় এবং উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় করে। সমবায়ের ভিত্তিতে ক্রয় এবং বিক্রয়সমিতি স্থাপন করিয়া উৎপাদনের জন্য কাঁচা মাল এবং অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করা এবং উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইরূপ সমিতি বহু সংখ্যায় স্থাপিত করিতে পারিলে কুটিরশিল্পের প্রসার দ্রুত হইবে।

যাহার আয় অল্প বা যাহারা মজুরী পায় শহরে তাহাদের জন্য ঋণদান সমিতিও স্থাপিত হইয়াছে। সমবায়-ভাণ্ডার (Co-operative stores) হইতে সভ্যদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করা হয়। সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি স্থাপন করিয়া মধ্যবিত্তদের নিজেদের গৃহ তৈয়ারীর ব্যবস্থা হইতেছে। সমবায় জীবনবীমা-সমিতিও আছে।

সমবায়ের গুণ (Merits of the Co-operative movement) : সমবায়ের প্রসার খুবই প্রশংসনীয়। ১৯১৪ সালে মোট সমিতির সংখ্যা ছিল ১৬,০০০ হাজার মাত্র। ১৯৩১-৪২ সালে উহা বাড়িয়া ১,২৪,০০০ হাজারে দাঁড়ায়। সমবায় লোকের, বিশেষ করিয়া কৃষকদের, বহু উপকার করিয়াছে। সমবায়সমিতি হইতে কৃষকদের অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়া হইতেছে। সমবায়-সমিতির সহিত প্রতিযোগিতায় বাধ্য হইয়া মহাজনেরাও সুদের হার কমাইয়াছে। অনেক গ্রামে এখন মহাজনের প্রতাপ কমিয়াছে। সভ্যদের মিতব্যয়িতা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। যে অর্থ লোকের বাড়ীতে বা মাটিতে লুকান থাকিত, তাহা এখন সমিতির তহবিলে জমিতেছে। টাকা বিনিয়োগ এবং ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের মৌলিক ব্যাপারগুলি সম্বন্ধেও সভ্যেরা শিক্ষা লাভ করিতেছে। ক্রয়, বিক্রয় এবং অন্যান্য সমিতি হইতে কৃষকেরা বহু সুবিধা লাভ করিতেছে। যেখানে ভাল সমবায়সমিতি আছে, সেই স্থানের অধিবাসীদের আচরণে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। নৈতিক লাভও কম হয় নাই। "মামলা-মকদ্দমা, ব্যয়শীলতা, নেশাকরা এবং জুয়া খেলা ভাল সমবায়সমিতির প্রভাবে কমিয়া আসিতেছে। সেই স্থানে এখন দেখা যায় শ্রমশীলতা, আত্মনিভরতা, সরলতা, শিক্ষা, মধ্যস্থতা স্বীকার, মিতব্যয়িতা এবং পরার্থপরতা।"

সমবায়ের ত্রুটি (Defects of the Co-operative organisation) : সমবায় আন্দোলনের যে ফল পাওয়া গিয়াছে তাহা আশান্বিত করিয়া তোলে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদেব দেশে সমবায় আন্দোলনের কয়েকটি গুরুতর ত্রুটি দেখা দিয়াছে। এই আন্দোলনে এখনও প্রকৃত সহযোগিতার প্রকৃতি গড়িয়া উঠে নাই। ঋণদানসমিতিগুলি সমবায়ের আদর্শ অনুসরণ না করিয়া কেবলমাত্র টাকা ধার দিবার প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে। সমবায়সমিতি মহাজনী কারবার মাত্র নহে। উহার আদর্শ সভ্যদের জীবন উন্নত করিয়া দেওয়া। অনেক সময়েই এই আদর্শ অনুসরণ করা সমিতির পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

সমবায়ের আরও অনেক ত্রুটি আছে। শতকরা পাঁচটি প্রাথমিক ঋণদান-সমিতিরও আর্থিক অবস্থা ভাল নহে। বোম্বাই এবং আসামে শতকরা ৪০টি সমিতি মন্দ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। ইহার কারণ সমিতিগুলি ঠিকমত টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করে নাই। যে সব সভ্য ঋণ শোধ করে না, সমিতি তাহাদের বিরুদ্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে না। নিয়মিত কিস্তিতে ঋণ শোধ করিতে হইবে। অবশ্য ফসল ভাল না হইলে স্বতন্ত্র কথা। সভ্যেরা তাহাদের দেয় টাকা সময়মত শোধ না করিলে সমিতির কাজ কি করিয়া চলিবে? অনেক সময়ে খাতাপত্রে ধার শোধ দেখানো হয়। সম্পাদকের খাতিরের লোক হইলে নির্দিষ্ট দিনে টাকা শোধ হইল লিখিয়া লইয়া পর মুহূর্তেই সেই সভ্যকে ধার দেওয়া হয়। ফলে সভ্যকে আদৌ টাকা দিতে হয় না। এইভাবে ধার পড়িয়া থাকে। ইহা সমবায় নীতিবিরোধী। অনেক সময়ে পরিচালক সমিতির খাতিরের লোক-দিগকে শোধ দিবার ক্ষমতা না থাকিলেও টাকা ধার দেওয়া হয়। এই ধরণের কার্যের ফলে বহু ঋণ বাকি পড়িয়া আছে এবং সমিতিগুলি অর্থাভাবে উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। ব্যবসায় মন্দা এবং কৃষিজাত উৎপন্নের দাম কমিয়া যাওয়া এই অবস্থার জন্য অনেকটা দায়ী, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ১৯৩০ সাল হইতে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিকরূপে কমিয়া যাওয়ায় কৃষকদের আয় খুব কমিয়া যায়। এই কারণেও তাহারা নিজেদের ঋণ শোধ করিতে পারে নাই।

রাজ্যের সরকার সমবায় আন্দোলন দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। সমবায় আন্দোলনের ত্রুটি বড় করিয়া দেখিলে চলিবে না। প্রত্যেক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের শৈশবে এইরূপ ত্রুটি দেখা যায়। চেষ্টা করিলে তাহা দূর করা শক্ত নহে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভূমিব্যবস্থা

এদেশে স্মরণাতীতকাল হইতে রাষ্ট্র জমির ফসলের একাংশ দাবী করিয়া আসিতেছে। রাজস্ব আদায় করিবার জন্য এক এক রাজত্বে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকমের ভূমিব্যবস্থা প্রচলিত করা হইয়াছে। কাহার নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করা হইবে, অথবা কোন নীতি অনুযায়ী উহা আদায় হইবে, তাহা প্রত্যেক অবস্থায় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। ভূমিব্যবস্থা মোটামুটি দুই রকমের—স্থায়ী এবং অস্থায়ী বন্দোবস্ত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রাজস্ব পাকাপাকিভাবে নির্দিষ্ট করা আছে। অস্থায়ী বন্দোবস্তে কিছুদিন পরপর সরকার রাজস্বের পরিবর্তন করে। অস্থায়ী বন্দোবস্ত তিন প্রকারের—রায়তী, মহালওয়ারি, এবং মালগুজারি। একে একে প্রত্যেকটি আলোচনা করা যাইতেছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (Permanent settlement) : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী সরকার জমিদারকে জমির মালিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং প্রত্যেক জমিদারের দেয় রাজস্বের পরিমাণ চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। জমিদারকে যে রাজস্ব দিতে হইবে তাহা কখনই বাড়ান হইবে না। লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৯৩ সালে বাংলাদেশে এই বন্দোবস্ত করেন। পরে উত্তরপ্রদেশের বেনারস জেলায় এবং উত্তর মাদ্রাজেও ইহা প্রচলিত করা হয়। বর্তমানে পশ্চিম বাংলার প্রায় সমস্ত জমি, আসামের এক চতুর্থাংশে (কাছাড় জেলায়), বিহার ও উড়িষ্যায়, বেনারস ও উত্তর মাদ্রাজের জেলাগুলিতে এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। জমিদারদের দেয় খাজনা চিরতরে নির্দিষ্ট হইয়াছে। নির্দিষ্ট দিনে জমিদার রাজস্ব দিতে না পারিলে তাহার জমিদারী নিলাম করিয়া বিক্রয় করা হয়। জমিদার প্রজার নিকট হইতে খুশীমত খাজনা আদায় করিতে পারে। প্রজার অধিকার রক্ষা করিবার জন্য আইন পাস করিবার ক্ষমতা সরকারের আছে। এই ব্যবস্থায় জমিদারের সহিত বন্দোবস্ত হয় বলিয়া ইহাকে জমিদারী বন্দোবস্ত বলা হয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও জমিদার আছে, কিন্তু তাহাদের দেয় রাজস্ব চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট নহে।

অস্থায়ী বন্দোবস্ত (Temporary settlement): এই বন্দোবস্ত

অনুযায়ী জমির মালিকের দেয় রাজস্ব নির্দিষ্ট থাকে না। কয়েক বৎসর পর পর দেয় রাজস্বের হার পরিবর্তন করা হয়। রায়তদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে অথবা যৌথভাবে, মালিকদের সহিত ব্যক্তিগত অথবা যুক্তভাবে বন্দোবস্তের রীতি অনুযায়ী এই প্রথা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা,—রায়তী, মহালওয়ারি এবং মালগুজারি। সরকার রায়তদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদের দেয় খাজনার পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দিলে তাহাকে রায়তী বন্দোবস্ত বলে। বোম্বাই, দক্ষিণ মাদ্রাজ, বেরার একাংশ বাদে আসামে এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। রায়ত সোজাসুজি সরকারকে রাজস্ব দেয়। দশ হইতে তিরিশ বৎসরের জন্য রাজস্বের পরিমাণ স্থির করা হয়।

মহালওয়ারী ব্যবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে রায়তদের সঙ্গে বন্দোবস্ত না করিয়া সমগ্র মহালের সহিত বন্দোবস্ত করা হয়। এক বা একাধিক গ্রাম লইয়া একটি মহাল গঠিত। মহালের রায়ত ব্যক্তিগতভাবে এবং সম্মিলিতভাবে মহালের রাজস্ব দিবার জন্য দায়ী। সরকার প্রথমে মহালের খাজনা স্থির করে। জমির জন্য প্রকৃতপক্ষে যে খাজনা দেওয়া হয় বা দেওয়া উচিত, তাহার ভিত্তিতেই রাজস্ব নির্ধারিত হয়। শতকরা পঞ্চাশভাগের বেশী খাজনা সরকারকে দিতে হয় না। উত্তরপ্রদেশে এবং পূর্ব পাঞ্জাবে ইহার প্রচলন আছে।

পাঞ্জাবের ব্যবস্থা একই, তবে সামান্য প্রভেদ আছে। খাজনা গ্রামের মাতব্বরের মারফত আদায় হয়। তাহাকে লম্বরদার বলে। কিন্তু প্রত্যেক জমির মালিক ব্যক্তিগত এবং যৌথভাবে রাজস্বের জন্য দায়ী। প্রত্যেকের দেয় রাজস্ব স্বতন্ত্রভাবে নির্দিষ্ট করা এবং আদায় করা যাইতে পারে। কাজেই কৃষকদের অবস্থা বোম্বাই এবং মাদ্রাজের মতই।

মধ্যপ্রদেশে **মালগুজারী** ব্যবস্থা প্রচলিত। মারাঠী রাজত্বের সময় মালগুজার জমির রাজস্ব আদায় করিত। সরকার তাহাদিগকে জমির মালিক হিসাবে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাদের রাজস্ব দিবার জন্য দায়ী করে। কাজেই ইহাকেও এক প্রকারের জমিদারী প্রথা বলিতে হয়। তবে রাজস্ব নির্ধারণের উপায় রায়তী প্রথার মত। সরকারী কর্মচারী গ্রামের জমি জরিপ করিয়া প্রজাদের দেয় খাজনার পরিমাণ স্থির করে।

চিরস্থায়ী এবং অস্থায়ী বন্দোবস্ত: এই দুই প্রকার ভূমিব্যবস্থার গুণাগুণ এখন আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমে ব্রিটিশ সরকার চিরস্থায়ী

বন্দোবস্তের পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাহাদের মতের পরিবর্তন হয়। সাধারণ লোকেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরোধী। সংযুক্ত বাংলায় প্রথম চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলন হয়। কিন্তু ১৯৩৮ সালে নিযুক্ত ভূমিরাজস্ব কমিসনের অধিকাংশ সভ্যই এই প্রথা লোপ করিবার পক্ষে রায় দিয়াছে এবং এই প্রদেশেও রায়তী বন্দোবস্ত প্রচলন করিবাব সুপারিশ করেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটি (Defects of Permanent Settlement): অনেক দিক হইতেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা হইয়াছে। ১৭৯৩ সালে যে রাজস্ব আদায় হইত তাহার ভিত্তিতেই চিরকালের জন্য রাজস্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার পরিমাণ বাৎসরিক তিন কোটি টাকা মাত্র। পরে ১৫০ বৎসরে খাজনার হার বহু বৃদ্ধি পাইয়াছে। জমিদার প্রজাদের নিকট হইতে বহু টাকা খাজনা আদায় করিতেছে। কিন্তু তাহাদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ বাড়ে নাই। ইহার ফলে সরকারের বহু টাকা ক্ষতি হইতেছে। অস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকিলে সরকার রাজস্ব বাড়াইতে পারিত। দ্বিতীয়ত, জমিদারী প্রথার জন্য রায়ত এবং জমিদারের অন্তবর্তী বহু মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টি হইয়াছে। এই মধ্যস্বত্বভোগীরা পরগাছার মত। জমিদার অপেক্ষা তাহারা অনেক বেশী অত্যাচারী হইয়া থাকে। ইহাদের হাতে কৃষকদের লাঞ্ছনার অবধি নাই। তৃতীয়ত, জমিদার ক্রমে ক্রমে গ্রাম হইতে বাস উঠাইয়া দিয়াছে। শহরে গিয়া তাহারা বিলাসব্যসনে কালাতিপাত করে। নায়েব গোমস্তারাই জমিদারী পরিচালনা করে। জমিদারের এই কর্মচারীরা প্রজাদের উপর অবাধ অত্যাচার চালায় এবং নানারূপ উপরি আদায় করে। চতুর্থত, জমিদার এখন আর জমির উন্নতিকল্পে কিছুই করে না। পুরাতন যে পুষ্করিণী হইতে গ্রামের জল সরবরাহ হইত সংস্কারের অভাবে তাহা মজিয়া গিয়াছে। তাহার ফলে কৃষির অবস্থা দিনদিনই খারাপ হইয়া পড়িতেছে। পঞ্চমত, কৃষকদের আরও একভাবে ভুগিতে হইতেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী সরকার জমিদারের নিকট হইতে প্রতি বৎসরই রাজস্ব আদায় করে, অকাল অথবা দুর্ভিক্ষেও রেহাই দেয় না। জমিদারও প্রজাদের নিকট হইতে প্রতি বৎসর খাজনা আদায় করিবার চেষ্টা করে। ফসল না হইলেও কৃষক খাজনা মাপ পায় না। কিন্তু অস্থায়ী বন্দোবস্তে অকাল বা অজন্মায় রাজস্ব মাপ হয়। জমিদারী প্রথার সর্বপ্রধান ত্রুটি এই যে, ইহার জন্য দেশের শিল্প ভাল করিয়া

গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। যাহার টাকা আছে, সে জমিদারী কিনিবার চেষ্টা করে। জমিদারীতে লাভ অনেক, ঝুঁকি কম। কাজেই শিল্প গঠনের জন্য অর্থ পাওয়া যায় না।

ইহার গুণঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থকেরা ইহাতে অনেক গুণ আবিষ্কার করিয়াছে। প্রথমত, ইহার ফলে সরকারী রাজস্ব ঠিক ঠিক আদায় হইতেছে। অস্থায়ী বন্দোবস্ত যে সব রাজ্যে প্রচলিত, সেখানে রাজস্বের পরিমাণ বাড়ে কমে। তাহা ছাড়া, রাজস্ব আদায় করিতে সরকারকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রাজস্ব আদায় করা সহজ এবং সরকারী কর্মচারীরা অন্য কাজে মনোযোগ দিতে পারে। দ্বিতীয়ত, মধ্যস্বত্বভোগীরা মধ্যবিত্ত সমাজ গঠন করিয়াছে। পশ্চিম বাংলার শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রসারে জমিদার ও মধ্যবিত্তদের দান অসামান্য। তৃতীয়ত, জমিদারের দান-ধ্যান নগণ্য নহে। শিল্পেও অনেক জমিদার বহু অর্থ বিনিয়োগ করিয়াছে। সরকারের দিক হইতে একটি কারণে জমিদারী প্রথা বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছে। জমিদারেরা রাজভক্ত এবং সরকারের সমর্থক। তাহা ছাড়া মাঝে মাঝে জমির পরিমাণ নির্ধারণ করিতে গেলে জরিপ ইত্যাদির জন্য কৃষকদের খুবই অসুবিধা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এই অসুবিধা থাকে না।

জমিদারী প্রথার যত গুণই থাকুক না কেন আগামী দুই এক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে তাহা লোপ পাইবে। জমিদার জমির উন্নতির জন্য অর্থ ব্যয় করে না। যে সব রাজ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, সেখানকার রাজ্যের সরকার জমির উন্নতিকল্পে কিছু করিতে নারাজ। কারণ ব্যয়ের বিনিময়ে সরকারের নূতন কিছু আয় হইবে না। কৃষকেরা এত দরিদ্র যে, তাহারা নিজেরা জমির কোন উন্নতি করিতে পারে না। অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, জমির উন্নতির দায়িত্ব যেন কাহারও নহে। কাজেই জমিদারী ব্যবস্থা লোপ করা উচিত। সরকার জমিদারের জমি কিনিয়া লইয়া রায়তী প্রথার প্রবর্তন করিবে। সরকার জমিদারের নিকট হইতে জমি কিনিয়া লইলে জমির উন্নতি করিতে তাহার আগ্রহ হইবে—১৯৩৮ সালের সংযুক্ত বাংলার ভূমিরাজস্বকমিসন, যাহাকে সাধারণত ফ্লাউড কমিসন আখ্যা দেওয়া হয়, এই মন্তব্য করিয়াছে। জমিদার যে খাজনা আদায় করে তাহার দশ হইতে পনের গুণ ক্ষতিপূরণ দিয়া

জমি কেনা হইবে। মাদ্রাজ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশে জমিদারী বিলোপ আইন পাস হইয়াছে। পশ্চিম বাংলায়ও শীঘ্রই জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

রায়তওয়ারি প্রথায় রাজস্বনির্ধারণনীতি: ফ্লাউড কমিসন মন্তব্য করিয়াছে যে, জমিদারী ক্রয় করিয়া সরকার রায়তি পদ্ধতিতে জমি বিলি করিবে। কাজেই রায়তি প্রথায় কি ভাবে রাজস্ব নির্ধারিত হয় তাহা জানা প্রয়োজন। এই প্রথায় রায়ত সোজাসুজি সরকারকে রাজস্ব দেয়। দশ হইতে তিরিশ বৎসর পর পর রাজস্ব নির্ধারিত হয়। সরকারের পক্ষ হইতে প্রত্যেক গ্রামের জমি জরিপ করা হয়। জমির উবরতা অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ করা হয়। কোন জমিতে কোন ফসল কি পরিমাণ হইতে পারে তাহার একটি হিসাব করা হয়। এই ফসলের গড়পড়তা দামের সহিত উহার পরিমাণ গুণ করা হয়। গুণফল যত টাকা হইবে তাহা হইতে ফসল উৎপন্ন করিবার খরচ বাদ দেওয়া হয়। যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে নীট উৎপন্ন বলা হয়। এই নীট উৎপন্নের অনধিক শতকরা ৫০ ভাগ দেয় রাজস্ব নির্ধারিত হয়। মাদ্রাজে এইভাবে রাজস্ব ঠিক করা হয়। বোম্বাই রাজ্যে নিধারণ-পদ্ধতি একটু স্বতন্ত্র। প্রথম জরিপের সময় উবরতা অনুযায়ী জমির শ্রেণীভাগ করা হয়। তারপরে সরকারী কর্মচারীরা উহাব খাজনা ও মূল্য স্থির করে। ইহারই একাংশ রাজস্ব হিসাবে নির্ধারিত করা হয়। পরে আবার জরিপ করিবার সময় সাধারণ আর্থিক অথবা জিনিষপত্রের দাম অনুযায়ী রাজস্ব বাড়ানো অথবা কমানো হয়। আসামে মাদ্রাজ অপেক্ষা অল্প সময় অন্তর রাজস্ব নির্ধারিত করা হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দুর্ভিক্ষ

পূর্বে দুর্ভিক্ষ বলিতে দেশের কোন এক অঞ্চলে খাদ্যের অভাব বুঝাইত। একাদিক্রমে দুই বৎসর অথবা এক বৎসর ফসল না হইলে সেই স্থানের অধিবাসী-দের খাদ্যাভাব ঘটিত। দেশের অন্য অংশে ফসল ভাল হইলেও সেখান হইতে দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে খাদ্য আনিবার উপায় ছিল না। ভাল পথ বা রেলপথ ছিল না। দেশের এক অংশে খাদ্যাভাব হইলে অন্য অংশ হইতে সেখানে খাদ্য অল্প সময়ের মধ্যে আনিবার কোন উপায় ছিল না। কাজেই খাদ্যাভাবে বহু লোক মৃত্যুবরণ করিত।

বর্তমান যুগে দুর্ভিক্ষের অর্থ খাদ্যাভাব নহে। ভারতবর্ষের কোন এক অঞ্চলে খাদ্যাভাব ঘটিলেও রেল-স্টিমার প্রভৃতির সাহায্যে ভারতবর্ষের অন্যত্র বা বিদেশ হইতে খাদ্য আনা কষ্টকর নহে। এখন দুর্ভিক্ষের অর্থ টাকার অভাব, খাদ্যাভাব নহে। এখন দুর্ভিক্ষ হইলে খাদ্যাভাবে লোকের মৃত্যু হয়, কারণ খাদ্য কিনিবার মত টাকা তাহাদের নাই।

দুর্ভিক্ষের কারণঃ দুর্ভিক্ষের কারণ আমরা দুই দিক হইতে অনুসন্ধান করিতে পারি। প্রথমত, আশু ও বাহ্যিক কারণ এবং দ্বিতীয়ত, প্রকৃত বা অর্থনৈতিক কারণ।

দুর্ভিক্ষের আশু কারণ অজন্মা। ভাল বৃষ্টি না হইলেই মন্দ ফসল হইবে। বর্ষায় যদি ভাল বৃষ্টি না হয়, কিংবা সময় মত বৃষ্টি না হয়, অথবা তাড়াতড়ি বর্ষা শেষ হইয়া যায়, তবে জলের অভাবে জমি শুকাইয়া যাইবে। ফসলও তাহা হইলে ভাল হইবে না। দ্বিতীয়ত, অনেকে বলেন যে, দেশের বনজঙ্গল কাটিয়া ফেলাতে বৃষ্টি কম বা বেশী হইতেছে। বিশেষ করিয়া পাহাড়ের সানুদেশের বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ফেলিলে বৃষ্টি হয় কম না হয় বেশী হইবে। বৃষ্টি ছাড়া অনেক সময়ে পঙ্গপাল অথবা কীটপতঙ্গ ফসল নষ্ট করিয়া ফেলে।

এই সবই ফসল না হইবার কারণ। কিন্তু এখনকার দুর্ভিক্ষকে খাদ্যাভাব বলা হয় না, লোকের টাকার অভাবেই দুর্ভিক্ষ হয়। দুর্ভিক্ষের আসল কারণ লোকের অপরিসীম দারিদ্র্য। কেন এই দারিদ্র্য তাহার কারণ খুঁজিয়া বাহির

করা কঠিন নহে। দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। অতীতে আমাদের দেশে যে সব কুটির শিল্প ছিল, তাহা ধ্বংস হইয়া যাওয়াতে লোকের ভূমি-নির্ভরতা আরও বাড়িয়াছে। তাই এখন পূর্বের তুলনায় অধিক সংখ্যক লোক কৃষিজীবী হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু জীবিকা হিসাবে আমাদের দেশের কৃষি আদৌ লাভজনক নয়। উহাতে আয় নিতান্তই কম হয়। প্রতি একরে যে ফসল উৎপাদন হয়, তাহা পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষেই সর্বাপেক্ষা কম। কৃষকদের আর কোন উপজীবিকা নাই, কাজেই অন্যভাবে আয় বাড়াইবারও কোন উপায় নাই। চাষীরা যে আয় করে, তাহা হইতে নিজেদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটান সম্ভব নহে। তাহা ছাড়া, বিবাহাদি ব্যাপারে আমাদের দেশের লোক বহু অর্থ ব্যয় করে। কাজেই তাহারা কিছু সঞ্চয় করিতে পারে না। সঞ্চিত কিছুই থাকে না বলিয়া ফসল না হইলে খাদ্য ক্রয় করিবার মত অর্থ তাহাদের থাকে না।

দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের উপায়ঃ দুর্ভিক্ষ নিবারণের দুইটি প্রধান উপায়—জমিতে উপযুক্ত জলসেচের ব্যবস্থা করা এবং চাষীদের আয় বাড়াইবার ব্যবস্থা করা। জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে জলসেচের ব্যবস্থা কবিতে পারিলে অজন্মা হইবে না। কাজেই বহু সংখ্যক পুষ্করিণী ও খাল খনন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বনজঙ্গল বেশী থাকিলে বৃষ্টিপাত বেশী হয় এবং আবহাওয়া আর্দ্র থাকে। সরকারের এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। তৃতীয়ত, দেশের পয়ঃপ্রণালী সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে এবং উহার উন্নতি করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। ইহা করিতে পারিলে অতিবৃষ্টিজনিত জল দেশে প্লাবন সৃষ্টি করিবে না, পয়ঃপ্রণালী বহিয়া তাহা সমুদ্রে গিয়া পড়িবে। ইহার ফলে অতিবর্ষায় ফসলেব কোন ক্ষতি হইবে না। চতুর্থত, পঙ্গপাল এবং অন্যান্য কীটপতঙ্গের আক্রমণ হইতে ফসল রক্ষা করিবার জন্য গবেষণা এবং উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা ছাড়া, রেলপথ এবং রাস্তাঘাটের উন্নতি করিয়া দেশের সর্বত্র যোগস্থাপন করিতে হইবে। পথ-ঘাট থাকিলে দেশের একাংশে অজন্মা হইলে অনায়াসেই অন্যত্র হইতে খাদ্য সরবরাহ করা যাইবে।

সর্বাপেক্ষা জরুরী প্রয়োজন দেশের দারিদ্র্য দূর করা। দারিদ্র্যের জন্যই দুর্ভিক্ষ হয়। লোকের আয় না বাড়িলে দুর্ভিক্ষসমস্যার সমাধান হইবে না। বহু লোক একান্তভাবে ভূমি-নির্ভর। জমির উপর হইতে এই চাপ দূর করিতে না পারিলে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে না। এই উদ্দেশ্যে কুটিরশিল্প এবং

কলকারখানা স্থাপন করিতে হইবে, যাহাতে লোকের জীবিকার সংস্থান হয়। কৃষির উন্নতিকল্পে কয়েকটি পন্থা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। তাহা কার্যকরী করিয়া তুলিতে হইবে। তাহা হইলে কৃষির উৎপাদন বাড়িবে এবং কৃষকের আয়ও বাড়িবে। কৃষকদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার করিতে হইবে। সবদিক হইতেই শিক্ষা প্রয়োজনীয়। কৃষকদিগকে মিতব্যয়িতা শিক্ষা দিতে হইবে।

দুর্ভিক্ষত্রাণসংগঠন (Organisation of Famine Relief): দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বহু লোকে অনাহারে এবং ক্ষুধায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কলেরা এবং অন্যান্য মহামারী দুর্ভিক্ষের পরই দেখা দেয়,—যেন মহামারী দুর্ভিক্ষের সহচর। মহামারীর ফলেও বহু লোক মারা যায়। ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি লোকের কাজ যোগাইবার দায়িত্ব কখনও স্বীকার করে নাই। কিন্তু দুর্ভিক্ষ হইলে লোকের কষ্ট লাঘব করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে। দুর্ভিক্ষত্রাণের কার্য দুই রকমের। প্রথমত, লোকের কষ্ট লাঘব করা এবং দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষ প্রতিবোধেব উপায় করা।

দুর্ভিক্ষের সময় লোকের কষ্ট লাঘব করিতে সরকার নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করে। কষ্ট দূর করিবার কার্যে অগ্রসর হইবার পূর্বে দেখিতে হয় যে, সত্য সত্যই দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে কি না। এই উদ্দেশ্যে সরকারেব পক্ষ হইতে বর্ষার পূর্বাভাষ পরীক্ষা করা হয়। প্রত্যেক জেলায় কি পরিমাণ বর্ষা হইয়াছে, তাহার হিসাব লওয়া হয়। দুর্ভিক্ষের প্রথম লক্ষণ অনাবৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টি। দুই কারণেই অজন্মা দেখা দেয়। দেশেব কোথাও ফসল ভাল না হইলে সেখানে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়, চুরি ডাকাতিব সংখ্যা বাড়ে। অনেক লোকে ভিক্ষা করিতে বাধ্য হয়। এই সবই দুর্ভিক্ষের পূর্বলক্ষণ। এই লক্ষণগুলি প্রকট হইলে সবকার বুঝিতে পারে যে দুর্ভিক্ষ আসন্ন। তখন সরকার পরের ব্যবস্থা অবলম্বন করে ও দুর্ভিক্ষনীতি ঘোষণা করে। সরকারী কর্মচারী ছাড়াও অন্যান্য লোকের সাহায্য প্রার্থনা করা হয় এবং সাধারণের নিকট সাহায্যের আবেদন প্রচার করা হয়।

দুর্ভিক্ষ-আক্রান্ত অঞ্চলে তখন পরীক্ষামূলক সাহায্যকেন্দ্র খোলা হয়। প্রকৃত পক্ষে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে কি না, তাহা দেখিবার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়। সত্য সত্যই দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বহু লোকে এই সাহায্যকেন্দ্রে আসিবে। তখন প্রকৃত সাহায্য দেওয়া আরম্ভ হয়।

তাহার পরে সাহায্যের দ্বিতীয় স্তর। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া যাহাদের আশু সাহায্য প্রয়োজন, তাহাদের নামের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। লঙ্গরখানা খুলিয়া নিঃস্ব এবং অক্ষমদের আহার্য দেওয়া হয়।

স্ত্রীলোক এবং নিম্নমধ্যবিত্তদেরও সাহায্য করা হয়। যাহারা কর্মক্ষম, তাহাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিকে কাজ দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে রাস্তাঘাট তৈয়ারী করা হয়।

কলেরা এবং অন্যান্য মহামারী প্রতিরোধ করিবার জন্য ডাক্তার ও স্বাস্থ্য বিভাগের লোক তৈয়ারী থাকে।

জুন মাসে বর্ষা সুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষত্রাণের কাজ শেষ হয়। গ্রামবাসীদের নিজ নিজ গ্রামে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং সেখানে সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করা হয়। কৃষকেরা যাহাতে কৃষিকাজ চালাইতে পারে, তাহার জন্য তাকাবি ঋণ দিয়া বীজ, বলদ ইত্যাদি ক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। ফসল উঠিলে আর কোন সাহায্য করা হয় না। ভাল ফসল হইলে সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।

সরকারের পক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষ সাহায্যকল্পে উপরোক্ত পন্থা অবলম্বন করা হয়। যাহাতে দুর্ভিক্ষ আবার দেখা না দেয়, সরকার তাহার জন্যও চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্যে নিয়মিত জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়। দুর্ভিক্ষ-নিবারণের জন্য সরকার রেলপথ নির্মাণ করিয়াছে। রেলের সাহায্যে দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে খাদ্য প্রেরণ করা চলে। তৃতীয়ত, সরকার দুর্ভিক্ষ-বীমাভাণ্ডার (Famine Insurance Fund) স্থাপন করিয়াছে। প্রতি বৎসর রাজস্ব হইতে একটি অংশ দুর্ভিক্ষ সাহায্যের জন্য এই তহবিলে স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হয়। জলসেচ, রেলপথ এবং দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্য এই ভাণ্ডার হইতে অর্থব্যয় করা হয়। সরকার কৃষির উন্নতির জন্য যাহা কিছু করিয়াছে, তাহা দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের সহায়ক। কারণ দেশের অধিকাংশ লোকের আয় যদি এখনকার মত নিতান্ত সামান্য থাকে, তবে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করা সম্ভব নহে।

পঞ্চাশের মন্বন্তর

গত যুদ্ধের ফলে আমাদের দেশের খাদ্য-পরিস্থিতি সঙ্কটজনক হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, প্রায় সব রকম ফসলই ভারতবর্ষে হয়। তবুও খাদ্যশস্যের অভাবে ভারতবর্ষকে ভুগিতে হইতেছে। ইহা অপেক্ষা

শোচনীয় আর কি হইতে পারে ? যদিও আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান, তথাপি আমাদের বর্তমান জনসংখ্যার আহার্য যোগাইবার মত খাদ্য আমাদের দেশে উৎপন্ন হয় না। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বেই ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিতে হইত। ১৯৩৯-৪০ সালে কুড়ি লক্ষ টন খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ বর্মার চাউল। স্বাভাবিক সময়ে আমাদের দেশে যে যথেষ্ট খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয় নাই তাহার প্রমাণ ইহাই। যুদ্ধের পূর্বে এক দেশ হইতে অন্য দেশে মাল চলাচল করিবার সুবিধা ছিল। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। বর্মা জাপান কর্তৃক অধিকৃত হওয়াতে বর্মার চাউল আমদানী বন্ধ হইয়া যায়। আমদানী বন্ধ হইয়া গেল বটে, কিন্তু অসংখ্য সৈন্যদের খোরাক যোগাইবার ভার ভারতবাসীর কাঁধে চাপিল। ১৯৪৩ সালে খাদ্য-সমস্যা যে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

বাংলা দেশের ভৌগোলিক অবস্থার জন্য খাদ্যসমস্যা আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। জাপানীদের আক্রমণ আশঙ্কা করিয়া সামরিক নেতৃবৃন্দ 'বঞ্চনা-নীতি' অবলম্বন করে। এই নীতি অনুযায়ী বাংলাদেশ হইতে ধান এবং চাউল অন্যত্র সরাইয়া ফেলা হয়। ইহার ফলে লোকের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। তাহারা ভাবিল যে, প্রয়োজন হইলে আর চাউল পাওয়া যাইবে না। তাই যাহাদের টাকা ছিল, তাহারা চাউল এবং ধান কিনিয়া মজুদ করিতে লাগিল। তাহার উপরে ঝঞ্ঝা এবং প্লাবনের ফলে ধানের উৎপাদন কমিয়া গেল। এই ঝঞ্ঝা মেদিনীপুর, বরিশাল, ২৪ পরগণা, দিনাজপুব প্রভৃতি জেলার উপর দিয়া প্রবাহিত হয়। এই জেলাগুলিতেই ধান বেশী হয়। ধানের উৎপাদন কমিল, ও ধনীব্যক্তিরা চাউল মজুদ করিতে আরম্ভ করায় চাউলের দাম বাড়িয়া গেল। বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি শ্রমিকদের খাদ্য যোগাইবার জন্য বহু চাউল কিনিতে আরম্ভ করে। এই সব কারণে চাউলের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। বাংলা দেশের কোন কোন জায়গায় চাউলের মূল্য ১০০৲ টাকা মণ পর্যন্ত উঠে।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বহু ভুল করে। কেন্দ্রীয় সরকারের তৎপরতার অভাব এবং অক্ষমতার চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাদেশিক সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিল, তাহাতে চাউলের দর আগুন হইয়া উঠে। বাংলা

সরকার কয়েকটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানকে চাউল খরিদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করে। এই প্রতিনিধিগুলির ক্রয়ের ফলে বাজারের অবস্থা একেবারেই খারাপ হইয়া পড়ে এবং দামও ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। চোরাবাজারের কারবার বন্ধ করিবার জন্য সরকার কোন কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করে নাই।

ইহার যে কি ভয়ানক পরিণতি হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলেও হৃৎকম্প হয়। চাউলের দাম এত বাড়িয়া যায় যে, বহু লোকের পক্ষে তাহা ক্রয় করা সাধ্যাতীত হইয়া পড়ে। কিন্তু অত দাম হওয়া সত্ত্বেও বাজারে অনেক সময় চাউল পাওয়া যাইত না। লক্ষ লক্ষ লোক কলিকাতা ও অন্যান্য শহরে এক-আধ মুঠি খাদ্য পাইবার আশায় জমা হইতে লাগিল। অস্থিচর্মসার নরনারী এবং শিশু কাতারে কাতারে রাজপথে ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করে। এই সব হতভাগ্য লোকদের আহার দিবার জন্য লঙ্গরখানা খোলা হইল। সমগ্র ভারতবর্ষ বাংলা দেশকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়া আসিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে এবং অনাহারজনিত রোগে কালগ্রাসে পতিত হইল। অবশেষে প্রকৃতি সাহায্য করিল, পরের বৎসর খুব ভাল ফসল হইল।

সরকার এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে বিবিধ পন্থা অবলম্বন করে। প্রথমত, দেশের সবত্র "ফসল বাড়াও" আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু তাহার ফল কতদূর কি হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। বিদেশ হইতে বহু পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানী করা হইয়াছে। ১৩৫০-এর মন্বন্তরের পরেই প্রায় প্রত্যেক বড় শহর এবং শিল্পাঞ্চলে রেসনিং ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। রেসনিং-এর ফলে খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য একটু হ্রাস পায় এবং উহা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোকের ক্রয়সাধ্য হয়।

আপদবিপদ হইতে কষ্ট হয় নিশ্চয়ই, কিন্তু উহাতে একটি সান্ত্বনা আছে। আপদবিপদে খুব বড় শিক্ষা লাভ হয়। গত দুর্ভিক্ষ হইতে আমরা শিখিয়াছি যে, কৃষির বিশেষ করিয়া খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে একটি পরিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ভাল জলসেচ, ভাল সার এবং বিজ্ঞানসম্মত কৃষিকার্য দ্বারা প্রত্যেক বিঘা জমিতে ফসল বাড়াইতে হইবে।

দুর্ভিক্ষঅনুসন্ধানকমিটির বিবরণী ঃ দুর্ভিক্ষঅনুসন্ধানকমিটির বিবরণীতে আমাদের দেশের খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য কয়েকটি মূল্যবান সুপারিশ আছে। বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, দেশের প্রয়োজনমত খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার দায়িত্ব সরকারকে স্বীকার করিতে হইবে। ধান, গম প্রভৃতি

খাদ্যশস্য ভারতবর্ষের যতটা প্রয়োজন, তাহার সম্পূর্ণই ভারতবর্ষে উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। খাদ্যশস্যের দাম এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে, যাহাতে চাষীর কিছু লাভ থাকে। পুকুর, খাল, কূপ, নলকূপ প্রভৃতি জলসেচের ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে করিতে হইবে। জমিতে ভাল সার দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঘুঁটের পরিবর্তে লোকে যাহাতে অন্য কোন জ্বালানি ব্যবহার করে, তাহার জন্য সরকারকে চেষ্টা করিতে হইবে। তৈলবীজ দেশে পিষিয়া যাহাতে খৈল দেশে থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। খৈল গরু মহিষ ইত্যাদির ভাল খাদ্য এবং উৎকৃষ্ট সার। কৃত্রিম সারের ব্যবহার যাহাতে বাড়ে সেদিকেও চেষ্টা করিতে হইবে। আরও উন্নত বীজ নির্বাচন হওয়া চাই। কৃষিকার্যে বর্তমানে অসংখ্য বলদ লাগানো হয়। বলদ দিয়া চাষ কমাইতে হইবে। কৃষির জন্য যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করিলেই তবেই ইহা সম্ভব হইবে। ভারতবর্ষে যে ধরণের ট্রাক্টর কার্যকরী হইবে, তাহা পরীক্ষা দ্বারা আবিষ্কার করা দরকার। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লোপ করিয়া রায়তী বন্দোবস্ত চালু করা অল্পদিনের মধ্যে সম্ভব না হইলে, জমিদারী পরিচালনার উপরে সরকারের কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে হইবে। প্রত্যেক রাজ্যে দীর্ঘ মেয়াদে টাকা ধার দিবার জন্য জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইবে। আমাদের দেশের বহু লোক নিজ ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয় করে। শিক্ষা বিস্তার করিয়া লোকের এই অভ্যাস দূর করিতে হইবে। কুটিরশিল্পের প্রসার এবং গ্রামের সার্বজনীন কার্যাদি বৃদ্ধি করিতে হইবে। তাহা হইলে লোকের আরও আয়ের পথ হইবে। বহুবিধ উদ্দেশ্য লইয়া প্রত্যেক গ্রামেই সমবায়সমিতি স্থাপন করিতে হইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কুটিরশিল্প

পৃথিবীর শিল্পপ্রধান দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ অষ্টম স্থান অধিকার করে। কিন্তু আমাদের দেশে বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান নিতান্তই কম। প্রায় প্রত্যেক শিল্পই ছোট ছোট আকারের। কত লোকে শিল্পকার্যে নিযুক্ত আছে, তাহা বিশ্লেষণ করিলেই এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। ১৯৫১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০·৩৮ভাগ মাত্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত। ইহাদের মধ্যে বড় বড় শিল্পে মাত্র ১·৫ ভাগ কাজ করে। অবশিষ্ট ৮·৮৮ ভাগ ছোট শিল্পে নিযুক্ত ছিল। কাজেই আমাদের দেশে ছোট শিল্পের গুরুত্ব কতখানি তাহা সহজেই অনুমেয়।

কুটিরশিল্পের পতন কেন হইল? আমাদের দেশে পাশ্চাত্য দেশের মত শুধু বড় বড় শিল্পের কথা ভাবিলেই চলিবে না। কুটিরশিল্পের কথা আমাদের বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হইবে। ছোট শিল্পকে কুটিরশিল্প এই কারণে বলা হয় যে, কারিগর নিজের বাড়িতে কিম্বা ছোট কারখানায় পণ্য তৈয়ারী করে। এক সময় এই জাতীয় শিল্পের জন্য ভারতবর্ষ বিখ্যাত ছিল। ভারতবর্ষে প্রস্তুত সুকুমার বিলাসের সামগ্রী পৃথিবীর সবত্র আদৃত হইত। ব্রিটিশ আমলের পূর্বে রাজদরবারের পোষকতায় এই সব শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল। ব্রিটিশ রাজত্ব স্থাপনের পর রুচির পরিবর্তন হয়, আমাদের দেশের রাজামহারাজারা সেই সব শিল্পের পোষকতা বন্ধ করেন। কাজেই শিল্পগুলি ধীরে ধীরে লোপ পাইতে লাগিল। ইংলণ্ড হইতে আনীত কলের তৈয়ারী জিনিষের প্রতিযোগিতাও কুটিরশিল্পের অবনতির কারণ। কলে-তৈয়ারী জিনিষের দাম কম, কাজেই অপেক্ষাকৃত দামী জিনিষের চাহিদা কমিতে থাকে। কুটিরশিল্প একে একে উঠিয়া গিয়াছে। যেগুলি আজও কোনক্রমে অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে, সেগুলির অবস্থাও কিছু ভাল নয়।

প্রধান প্রধান কুটির শিল্প: কয়েকটি কুটিরশিল্পের কথা এখানে বলা যাইতে পারে। অতীত ভারতে প্রায় প্রত্যেক নারীই সুতা কাটিত। সুতার কল আবিষ্কৃত হওয়ার পর এই শিল্প প্রায় লোপ পাইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের ফলে আবার চরকায় সুতা কাটা আরম্ভ হইয়াছে। কেহ কেহ

বলেন যে, হাতে-কাটা স্থতার কোন ভবিষ্যৎ নাই। হাতে-কাটা স্থতা কম মজবুত এবং কলে বেশী স্থতা হয়। ইহা সত্য বটে। কিন্তু গান্ধীজীর চরকা অবসর সময়ের কাজ। অবসর সময়ে স্থতা কাটিয়া লোকে নিজের পরিধেয় নিজেরাই তৈয়ারী করিতে পারে। অর্থ দিয়া উহার মূল্য স্থির করিতে গেলে গান্ধীজীর অর্থনীতি বুঝিতে পারা যাইবে না।

তাঁত (Handloom Industry): তাঁত আমাদের দেশের সর্বপ্রধান কুটিরশিল্প। এদেশের কৃষির পরেই বয়ন শিল্পের স্থান। ১৯৪০-৪১ সালে ভারতবর্ষে যত বস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার শতকরা ২৭·৮ ভাগ তাঁতে বোনা। প্রায় ষাট লক্ষ লোক তাঁতে কাপড় বুনিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। তাঁত হইতে প্রতি বৎসরে মোট ৫০ কোটি টাকার কাপড় তৈয়ারী হয়। দেশের সর্বত্রই তাঁতের প্রচলন আছে। পশ্চিম বাংলায় শান্তিপুর, ধনেখালি, আটপুর, রাজবলহাট প্রভৃতি স্থান তাঁতের কাপড়ের জন্য বিখ্যাত। আসামের সুর্মা উপত্যকায় নাথ সম্প্রদায়ের লোকে কাপড় বোনে। অবিভক্ত বাংলা দেশে কত কাপড় তাঁতিরা বয়ন করিত, তাহার একটি হিসাব করা হইয়াছিল। সেই হিসাব অনুযায়ী বৎসরে বাংলা দেশের তাঁতিরাই তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকার কাপড় বয়ন করিত।

কলের কাপড়ের সহিত তাঁতিদের কঠোর প্রতিযোগিতা করিতে হইতেছে। তাঁতের কাপড়ের কতকগুলি সুবিধা আছে বলিয়া প্রতিযোগিতায় উহা টিঁকিয়া আছে। তাঁতিদের বয়নকৌশল জন্মগত। সামান্য পুঁজিতে তাহারা কাজ চালাইতে পারে। পরিবারের স্ত্রীপুত্র সকলেই তাঁতের কাজে কিছু কিছু সাহায্য করিতে পারে। কাজেই কাপড় তৈয়ারী করিবার ব্যয় কম পড়ে। তাঁতিরা অনেক সময়ে কৃষির সঙ্গেই তাঁত চালায়। কাজেই তাঁত তাহাদের উপজীবিকা। এই কারণে উৎপাদনের ব্যয় আরও কম। তাহা ছাড়া নানা রকম নক্সার সুদৃশ্য কাপড় একমাত্র তাঁতেই করা সম্ভব। তাঁতে খুব টেঁকসই মোটা কাপড়ও তৈয়ারী হয়। গ্রামের লোকেরা এই সব কাপড় পছন্দ করে। কাজেই তাঁতশিল্প নিশ্চয়ই পুনরুজ্জীবিত হইবে।

রেশমবয়ন: আর একটি কুটিরশিল্প। যদিও স্থতার কাপড়ের মত ইহা তত ব্যাপক নহে, তথাপি দেশের অনেক অঞ্চলে রেশমের কাপড় তৈয়ারী হয়। রেশমের প্রধান কেন্দ্র বোম্বাই, মহীশূর, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিম-বাংলা ও

আসাম। গুটি পোকার চাষ ও রেশমী সূতা-কাটা রেশম বয়নের সহিত সংযুক্ত। মহীশূর, কাশ্মীর, আসাম উপত্যকার জেলাগুলিতে, মুর্শিদাবাদ, মালদহ এবং বীরভূমে এই দুইটি কুটিরশিল্প সমধিক প্রসিদ্ধ।

এক সময়ে সুদৃশ্য শাল ও কার্পেট তৈয়ারীর জন্য ভারতবর্ষের **পশমী শিল্প** বিখ্যাত ছিল। কিন্তু এখন এই শিল্পের অবস্থা শোচনীয়। কাশ্মীর এবং উত্তর-প্রদেশের মির্জাপুর ও বেনারস এই শিল্পের জন্য বিখ্যাত। সাধারণের ব্যবহার্য মোটা কম্বল এই শিল্পজাত।

ইহা ছাড়া আরও অনেক কুটিরশিল্প আছে। পিতল ও কাঁসার কাজ তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তরপ্রদেশের বেনারস ও মোরাদাবাদ, পশ্চিম-বাংলায় মুর্শিদাবাদ এবং শ্রীনগরের কাঁসা ও পিতলের কাজ বিখ্যাত। পশ্চিম-বাংলার কৃষ্ণনগরের এবং উত্তরপ্রদেশের মাটির পুতুল ও বাসন, ফিরোজাবাদ জেলার কাঁচের চুড়ি বিখ্যাত। তাহা ছাড়া সোনারূপার কাজ, বিড়ি তৈয়ারী, তৈলপেষণ, মিঠাইতৈয়ারী, ধানভানা প্রভৃতি কুটিরশিল্পের অন্তর্ভুক্ত। অনেক কারিগরের উপরোক্ত যে কোন একটি শিল্পই একমাত্র পেশা। কৃষকেরা কেহ কেহ উপজীবিকা হিসাবেও কুটিরশিল্পের কাজ করিয়া থাকে। ডালা, ঝুড়ি প্রভৃতি তৈয়ারী, ধানভানা, গুড় তৈয়ারী, বেত ও বাঁশের কাজ কৃষকেরা অবসর সময়ে করিয়া থাকে।

কুটির শিল্পের অসুবিধা (Difficulties of the cottage industries): বর্তমানে কুটিরশিল্পের অবস্থা শোচনীয়। প্রত্যেক শিল্পের অসুবিধা এক প্রকারের। প্রথমত, কুটিরশিল্পের কাজগুলি এখনও প্রাচীন পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। উৎপাদনের ব্যবস্থা মান্ধাতার আমলের। যন্ত্রপাতি অতি প্রাচীন ধরণেব। পশমী তাঁত এবং ঘানীর এখনও প্রাচীন রূপ এতটুকুও পরিবর্তিত হয় নাই। দ্বিতীয়ত, কারিগরেরা অশিক্ষিত, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদন যে পরিবর্তিত করা যাইতে পারে, তাহা তাহারা জানে না। আবার অনেকের উৎপাদন-কৌশলও আয়ত্ত নাই। তৃতীয়ত, অর্থাভাবই সকল অসুবিধার মূলে। কারিগরেরা অত্যন্ত দরিদ্র। কাঁচা মাল এক সঙ্গে বেশী কিনিবার বা তৈয়ারী পণ্য ধরিয়া রাখিবার মত আর্থিক সঙ্গতি তাহাদের নাই। কৃষকদের মত তাহারাও মহাজনের কবলে পড়িয়াছে। মহাজনেরা কারিগরদের টাকা ধার দেয়, সূতা এবং অন্যান্য কাঁচা মাল যোগায়। জিনিষ তৈয়ারী হইলে

তাহা কিনিয়া লয়। অনেক সময় কারিগরদের বাধ্য হইয়া বেশী দামে কাঁচা মাল কিনিয়া সস্তায় তৈয়ারী পণ্য বিক্রয় করিতে হয়। চতুর্থ, কুটিরশিল্পজাত জিনিষগুলি বিক্রয়ের ভাল ব্যবস্থা নাই। কারিগরেরা ভাল দামে তাহা বিক্রয় করিতে পারেন না। পণ্য বিক্রয় করিবার জন্য কোন সংঘ নাই বলিলেই চলে।

কুটিরশিল্পের প্রয়োজনীয়তা (Place and importance of cottage industries): অনেকে মনে করেন যে কুটিরশিল্পগুলি বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা করা হৃদয় দুর্বলতার লক্ষণ। বর্তমান যুগ বড় বড় কলকারখানা যন্ত্রপাতির যুগ। মোটর গাড়ীর যুগে পাল্কী-গাড়ী লইয়া বসিয়া থাকিবার কোন অর্থ নাই। কিন্তু কুটিরশিল্পের উন্নতির চেষ্টা যে শুধু হৃদয়-দুর্বলতা নয় তাহা অনেক ভাবে প্রমাণ করা যায়। সব চেয়ে বড় প্রমাণ হইতেছে এই যে, আমাদের দেশে লোকসংখ্যা বেশী অথচ তুলনায় মূলধনের পরিমাণ খুবই কম। সুতরাং যে শিল্পে কম মূলধনে বেশী সংখ্যক লোককে কাজে লাগান যায়। আমাদের পক্ষে সেই সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠা করাই উচিত। কুটিরশিল্পে মূলধন লাগে কম, এবং সেই অনুপাতে বেশী লোক খাটান যায়। আমাদের দেশের পক্ষে এই জন্যই কুটিরশিল্পের প্রসার বাঞ্ছনীয়। এই যুক্তির যথার্থতা আমাদের প্লানীং কমিসন (Planning Commission) তাহাদের পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় স্বীকার করিয়াছে। দ্বিতীয়ত, কুটিরশিল্প প্রসারের আর একটি গুণ হইতেছে যে, ইহার ফলে দেশের মধ্যে ধন বণ্টন বৈষম্য কমিতে পারে। পাশ্চাত্য দেশে,—যেখানে বড় বড় কলকারখানা সৃষ্টি হইয়াছে, ধন বৈষম্যের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী। দেশের ধনসম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের পকেটস্থ হইতেছে, এবং অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে ধনসম্পদের পরিমাণ কম। কুটিরশিল্পের প্রসারের ফলে অতিধনীর সংখ্যা খুবই কম হইবে। শিল্পগুলির আয়তন ক্ষুদ্র বলিয়া ইহার মালিক ক্রোড়পতি হইতে পারিবে না এবং মালিকের সংখ্যাও অনেক বেশী থাকিবে। ধরা যাউক, দেশের মধ্যে প্রতি বৎসর চার কোটি ধুতি বিক্রয় হয়। ইহা যদি বড় কারখানায় তৈয়ারী হয়, তবে হয়ত একশটি মিল সমস্ত কাপড় তৈয়ারী করিবে। প্রত্যেক মিল চার লক্ষ ধুতি তৈয়ারী করে। এই ধুতি বিক্রয়ের যা মুনাফা তাহা ১০০ জন মালিকের পকেটস্থ হইবে। কুটিরশিল্পের আয়তন অনেক কম। সুতরাং চার কোটি ধুতি তৈয়ার করিতে হয়ত ২০,০০০ কারখানা প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। ফলে চার কোটি ধুতি বিক্রয়ের লাভ ২০,০০০

মালিকের মধ্যে ভাগ হইবে। মালিকের সংখ্যা বেশী হইবে ও প্রত্যেকের আরও অপেক্ষাকৃত কম হইবে। কুটিরশিল্পের প্রসারে ধনবণ্টন বৈষম্য এই ভাবে কমিয়া যাইতে পারে।

কুটিরশিল্পের উন্নতি (Improvement of cottage industries): কুটিরশিল্প আমাদের দেশের অর্থনৈতিক জীবনের অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে। কাজেই তাহার ত্রুটি কি ভাবে দূর হইতে পারে, তাহা আমাদের চিন্তা করা উচিত। প্রথমত, যন্ত্রপাতি এবং উৎপাদনব্যবস্থার উন্নতি করিতে হইবে। প্রত্যেক রাজ্যের শিল্পবিভাগে নূতন নূতন যন্ত্রপাতি, এবং উৎপাদন প্রণালী সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে হইবে। পরীক্ষায় যে ফল লাভ হইবে, তাহা প্রদর্শনী প্রভৃতিতে দেখাইতে হইবে। কারিগরেরা এইসব নূতন যন্ত্রপাতি অল্প কিস্তিতে যাহাতে কিনিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, মূলধনের অভাব দূর করিবার জন্য কারিগরদের মধ্যে সমবায় ঋণদানসমিতি গঠন করিতে হইবে। প্রধান প্রধান শহরে এবং বিদেশে বিক্রয়কেন্দ্র এবং প্রদর্শনী খুলিতে হইবে। নিখিল ভারত কুটিরশিল্পসংঘের মত একটি কেন্দ্রীয় বিক্রয়সমিতি স্থাপন করা দরকার। এই কেন্দ্রীয়সমিতি কুটির শিল্পজাত পণ্যগুলির চাহিদা বাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিবে। আধুনিক রুচি এবং ফ্যাসান অনুযায়ী যাহাতে কারিগরেবা জিনিষ তৈয়ারী করে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। ইহার জন্য কারিগরদের নূতন নূতন নক্সা দিতে হইবে। কারিগরেরা যাহাতে সুদৃশ্য এবং বিশিষ্ট পণ্য উৎপাদন করিতে পারে, সেদিকে নজর দিতে হইবে। বড় বড় শহর ও শিল্পকেন্দ্রে যন্ত্রশিক্ষালয় খুলিয়া কারিগরদের শিল্পশিক্ষা দিতে হইবে। অনেকের অভিমত এই যে, কুটিরশিল্পের জন্য সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে। মহীশূরে সস্তায় বিদ্যুৎ-সরবরাহের ব্যবস্থা আছে।

কিন্তু সব ব্যবস্থা করিয়াও কি কুটিরশিল্প বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব? আমাদের সব চেষ্টা কি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে? বড় বড় কারখানায় উৎপাদনের ব্যয় কম। কাজেই বড় শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় কুটিরশিল্প পারিবে না। কিন্তু বড় কারখানা বহুদিন হইতে থাকা সত্ত্বেও ছোট ছোট শিল্প আজও লোপ পায় নাই। যে সব সুদৃশ্য এবং সুরুচিপূর্ণ জিনিষের চাহিদা খুব সীমাবদ্ধ, তাহা কুটিরশিল্পেই প্রস্তুত হওয়া সম্ভব। বাড়ীর যে সব ছেলেমেয়েরা অলসভাবে কাল

কাটাইতে বাধ্য হয়, তাঁতিরা তাহাদিগকে কাজে লাগাইতে পারে এবং তাহাতে তাঁতির উৎপাদনের ব্যয় কম হয়। তাঁতিরা প্রত্যেক শাড়ীর জন্য নূতন নূতন নক্‌সা করিতে পারে। মেয়েরা তাহা খুবই পছন্দ করে। শান্তিপুর, ঢাকা অথবা বেনারসী সিল্কের শাড়ীর সহিত তুলনায় মিলের শাড়ী দাঁড়াইতে পারে না। আমাদের দেশে কুটিরশিল্প সঞ্জীবিত রাখিবার পক্ষে একটি বড় যুক্তি আছে। আমাদের দেশের কৃষকেরা বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস বাধ্য হইয়া বসিয়া কাটায়। তাহাদের বাড়ীর মেয়েদেরও ঘরকন্নার কাজ ছাড়া করিবার কিছুই নাই। কৃষকেরা অবসর সময়ে কুটিরশিল্পের কাজ করিবে এবং তাহাদের বাড়ীর মেয়েদেরও একটি অর্থকরী কাজ জুটিবে। ইহাতে কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও অবস্থার উন্নতি হইবে। তাহা ছাড়া কুটিরশিল্পের কর্মীদের যে সূক্ষ্ম শিল্পরুচির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা চেষ্টা করিয়া রক্ষা করা উচিত। কারণ তাহা জাতির অমূল্য সম্পদ।

নবম পরিচ্ছেদ

শিল্প ও শ্রমিক

ভারতবর্ষে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রায় ৭০।৮০ বৎসর পূর্বে বিদেশীরাই তাহা আরম্ভ করে। পরে ভারতীয় ব্যবসায়ীরাও বড় বড় কয়েকটি শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

কয়েকটি প্রধান প্রধান শিল্প: প্রথমেই কাপড়ের কলের উল্লেখ করিতে হয়। ভারতবর্ষে প্রথম কাপড়ের কল ১৮১৮ সালে কলিকাতার নিকটে স্থাপিত হয়। কিন্তু ১৮৫৩ সালে বোম্বাইয়ে প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হইবার পরেই এই শিল্পটির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বলা যায়। তারপর হইতে এই শিল্পের দ্রুত উন্নতি হইয়াছে। ভারতবর্ষে মোট যত কাপড় প্রয়োজন, তাহার শতকরা ৬৬ ভাগই এদেশের কাপড়ের কলে তৈয়ারী হয়। বর্তমানে বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিম-বাংলা বয়নশিল্পে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই শিল্প মোটামুটিভাবে বোম্বাই ও আমেদাবাদ শহরে একদেশীভূত। ভারতবর্ষে যত কাপড়ের কল আছে তাহার শতকরা ষাটভাগ বোম্বাই অঞ্চলে। অধিকাংশ কলই যৌথ-মূলধনী-প্রতিষ্ঠান দ্বারা চালিত এবং উহার শেয়ারের টাকা ভারতীয়দের দেওয়া। মিলগুলি ভারতীয়দের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে।

তাহার পরে আসে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রথম লৌহ প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হয়। কিন্তু ১৯০৭ সালে টাটা লৌহ এবং ইস্পাত কোম্পানী জামসেদপুরে প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে লৌহ উৎপাদন আরম্ভ হয়। লৌহ উৎপাদনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষের স্থান দ্বিতীয়। বর্তমানে ভারতবর্ষে চারিটি কি পাঁচটি লোহার কারখানা আছে। মহীশূরের একটি কারখানা ব্যতীত আর সব কয়েকটি পশ্চিম-বাংলা ও বিহারে অবস্থিত। এই শিল্পের মালিক ভারতবাসী এবং ভারতবাসীরাই ইহার পরিচালনা করে।

উপরোক্ত দুইটি শিল্পের তুলনায় চিনির কারখানার প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত আধুনিক যুগের। ১৯৩০ সালে চিনিশিল্প ভারত সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত করা হয়। তাহার পর চার পাঁচ বৎসরের মধ্যেই ইহার পূর্ণ বিকাশ হয়। ১৯৩২ সালে ভারতবর্ষে মাত্র ৩২টি চিনির কল ছিল। এখন চিনির কলের

সংখ্যা ১৫৬টি। চিনির কলগুলির অধিকাংশই ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত। কলগুলির বেশীর ভাগই বিহারে ও উত্তর উদেশে অবস্থিত। প্রাচীন পদ্ধতিতে দেশী চিনিও উৎপাদিত হয়।

পাটের কল ও প্রাচীন শিল্প। ১৮৫৫ সালে রিষড়ায় প্রথম পাটের কল স্থাপিত হয়। এই শিল্পের যথেষ্ট বিকাশ হইয়াছে। কলগুলি কলিকাতার আশে পাশে হুগলী নদীর তীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশের মালিক স্কট্ল্যাণ্ডবাসী। ইদানীং ভারতীয়েরাও কয়েকটি পাটকল স্থাপন করিয়াছে।

কাগজ তৈয়ারী আরম্ভ হয় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে। তখন কলিকাতার নিকট বালিতে একটি কাগজের কল স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার পরে ১১ কি ১২টি কাগজের কল স্থাপিত হইয়াছে। বড় মিলগুলি ইউরোপীয়দের অধীন।

আমাদের দেশে সিমেণ্ট, দিয়াশলাই, কাঁচ, চামড়া, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতির অনেক বড় বড় কল আছে। চা উৎপাদনে ভারতবর্ষের স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয়। ভারতবর্ষে প্রায় ৫,০০০ চা বাগান আছে। ইহার বেশীর ভাগ পশ্চিম বাংলা ও আসামে অবস্থিত। মোট উৎপন্নের মাত্র ১৮ ভাগ চা দক্ষিণ ভারতে হয়। চা বাগানের মালিক অধিকাংশই ইউরোপীয়।

ভারতবর্ষে শিল্পের প্রসার না হইবার কারণ (Factors hindering industrial development): উপরোক্ত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, আমাদের দেশে সামান্য কয়েকটি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষের মত একটি বিরাট দেশের পক্ষে ইহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। ভারতবর্ষের আকার, জনসংখ্যা বা স্বাভাবিক সম্পদের তুলনায় শিল্পের প্রসার তেমন কিছুই নহে। অধিকাংশ কলকারখানার মালিক ইউরোপীয়। ভারতবাসীরা শিল্পোন্নতির জন্য বিশেষ কিছু করে নাই।

কেন ভারতবর্ষে শিল্পোন্নতি এত ধীরে ধীরে হইতেছে। তাহার একটি কারণ এই যে, ইউরোপ বা আমেরিকার মত আমাদের দেশের যুবকেরা শিল্প বা ব্যবসায়ের দিকে ঝোঁকে না। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি এবং সামাজিক আবহাওয়া এইরূপ যে শিক্ষিত ব্যক্তিরা ব্যবসায়বাণিজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। এই মনোভাব অবশ্য দিন দিনই দূর হইতেছে এবং যুবকেরা ক্রমেই ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিকে ঝুঁকিতেছে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশে মূলধনের অভাব। দেশের অধিকাংশ লোক এত দরিদ্র যে তাহাদের পক্ষে কিছু সঞ্চয় করিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিয়োগ করা অসম্ভব। যাহাদের অর্থ আছে, তাহারা জমি কেনে অথবা সরকারী ঋণপত্র কিনিয়া নিরাপদে সুদ ভোগ করে। নূতন নূতন শিল্পে টাকা খাটাইয়া তাহারা কোন ঝুঁকি বহন করিতে চায় না। তাই আমরা পিছনে পড়িয়া আছি এবং ইউরোপীয় মূলধনে আমাদের দেশের শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে। অবশ্য আমাদের দেশের মূলধনের এই 'লাজুকতা' ক্রমে কাটিয়া যাইতেছে। নূতন যৌথ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে এখন অনেকেই শেয়ার কেনে। তৃতীয়ত, আমাদের দেশে দক্ষ শ্রমিকের অভাব। আমাদের দেশের শ্রমিকের অক্ষমতার জন্য ভারতীয় শিল্পপতিরা বিদেশী প্রতিযোগীর সহিত পারিতেছে না। চতুর্থত, শক্তি উৎপাদনের ভাল ব্যবস্থা না থাকাতেও আমরা শিল্পে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। কয়লার খনিগুলি বিহারে ও পশ্চিম বাংলায় অবস্থিত। ভারতবর্ষের অন্যত্র অনেক ভাড়া দিয়া কয়লা লইয়া যাইতে হয়। ইহাতে উৎপাদনের ব্যয় বাড়ে। জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের ভাল ব্যবস্থা করা হয় নাই। রাষ্ট্রের সহায়তা ছাড়া শিল্প সম্যক বিকাশ লাভ করিতে পারে না। জাপান এবং জার্মানীতে সরকারী সাহায্যে শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ভারত সরকার এতদিন এদিকে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। স্বাধীনতা লাভের পরে এখন আমরা সুপরিকল্পিত কর্মসূচী লইয়া এদিকে অগ্রসর হইতে পারিব বলিয়া আশা করা যায়।

শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা (Suggestions for hastening industrial development): ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর। ভারতের খনিজ সম্পদ অতুলনীয়। কয়লা, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, তাম্র, এবং আরও নানারকম খনিজ এদেশে আছে। পাট ও তুলা উৎপাদনে ভারতবর্ষের স্থান দ্বিতীয়। ভারতবর্ষের শক্তির উৎস অফুরন্ত, কিন্তু তাহার উৎপাদনের সম্যক ব্যবস্থা এখনও করা হয় নাই। ভারতে যেরূপ বিপুল জনসংখ্যা, তাহাতে শ্রমিকের জন্য ও পণ্য বিক্রয়ের জন্য কোন সমস্যাই দেখা দিবে না। আমাদের নাই শুধু মূলধন এবং উদ্যম। কিন্তু তাহাও বড় বাধা নহে। মূলধনের 'লাজুকতা' কমিয়া আসিতেছে, ইহা ভাল লক্ষণ। দেশের 'ব্যাঙ্কিং' ব্যবস্থা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ব্যাঙ্কগুলিতে লোকের সঞ্চিত অর্থ জমা

হইবে ও ব্যাঙ্ক সেই অর্থ শিল্পোন্নতির জন্য নিয়োগ করিবে। যুবকদের শিল্প এবং ব্যবসায়ের দিকে আকৃষ্ট করিতে হইবে। প্রতিভাবান যুবকদের বিদেশে পাঠাইয়া শিল্পকৌশল শিখাইতে হইবে। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লইয়া ভাল চাকুরী পাইবার মোহ দূর করিতে হইবে। বিদেশে যদি আমাদের দেশের যুবকেরা যায়ই, তবে তাহারা ডিগ্রিলাভ করিবার চেষ্টা না করিয়া যাহাতে ব্যবসায় শেখে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এইদিকে সরকারের করণীয় অনেক কিছু আছে; এখন দেশ স্বাধীন হইয়াছে। বর্তমানে যে কয়েকটি সমস্যা আছে, তাহার সমাধান এখনই করিতে হইবে। এই সমস্যা সমাধানান্তে শিল্পোন্নতির জন্য চেষ্টা নিশ্চয়ই করা হইবে। বাস্তবপক্ষে জাতীয় সরকার সবেমাত্র এদিকে দৃষ্টি দিয়াছে। সরকার নানাভাবে শিল্পোন্নতির সহায়তা করিতে পারে। যথা—সংরক্ষণ, আর্থিক সাহায্য, অন্যান্য সুবিধা দান, নিজের জন্য দেশী জিনিষ কেনা, শিল্প-প্রদর্শনী খোলা প্রভৃতি। ইদানীং সরকার বিশিষ্ট কোম্পানীর শেয়ার কিনিতেছে এবং পরিচালকসংঘে একাধিক সরকারের মনোনীত ব্যক্তি নিযুক্ত হইতেছে। ধনী লোকেরা যদি বুঝিতে পারে যে সরকার সত্যসত্যই নূতন শিল্পের সহায়তা করিবে, তবে তাহারাও শেয়ার কিনিতে দ্বিধা বোধ করিবে না।

কৃষি না শিল্প (Agriculture or Industry)? আমাদের দেশের শিল্পোন্নতির চেষ্টা অনেক ইংরাজ লেখক সমর্থন করেন না। তাঁহারা বলেন যে, ভারতবর্ষ প্রধানত কৃষিপ্রধান দেশ। কাজেই কৃষি ভারতের প্রধান জীবিকা হওয়া উচিত। প্রকৃতি ভারতবর্ষকে কৃষিপ্রধান দেশ হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতে কৃষিকার্যের অনেক স্বাভাবিক সুবিধা আছে। ভারতীয়দের মূলধন নাই। প্রভূত মূলধন না থাকিলে বড় বড় কলকারখানা গড়িয়া তোলা যায় না। আমাদের যা অল্পস্বল্প পুঁজি আছে, তাহা কৃষির উন্নতির জন্যই বিনিয়োগ করা ভাল। ভারতে শুধু পুঁজি কম তাহা নহে, দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যাও বেশী নাই। কাজেই যে সব দেশে শিল্পপ্রসার লাভ করিয়াছে, তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ দাঁড়াইতে পারিবে না। ঐ সব দেশে অল্পব্যয়ে জিনিষ উৎপন্ন হইবে। এবং তাহা ভারতীয় পণ্য অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় হইবে। অপরদিকে জমির উর্বরতার জন্য পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা কম ব্যয়ে এখানে কৃষিজাত পণ্য উৎপাদিত হইতে পারে। কাজেই এদেশের উচিত

কৃষির উন্নতির জন্যই চেষ্টা করা এবং পরিবর্তে অল্প ব্যয়ে পাশ্চাত্য দেশ হইতে শিল্পজাত পণ্য আমদানী করা।

এই যুক্তি নিতান্তই এক তরফা। আমাদের দেশের কৃষির উন্নতির সম্ভাবনা প্রচুর, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু একান্তভাবে কৃষিনির্ভর হওয়াই আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের বড় ত্রুটি। আমাদের দেশে ভূমি-নির্ভর লোকের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। কৃষির উন্নতি করিতে হইলে ক্ষেত-গুলির আয়তন অনেক বড় করিয়া গড়িতে হইবে। তাহা হইলে বহু চাষী জমি হারাইবে। এইসব লোকেরা কোথায় যাইবে? একমাত্র শিল্পোন্নতি হইলেই এইসব লোকের কাজ জুটিতে পারে। যেভাবে আমাদের দেশের জনসংখ্যা বাড়িতেছে, তাহাতে শিল্পের প্রসার ব্যতীত কৃষির উন্নতি করা অসম্ভব। তাহা ছাড়া একটি মাত্র পেশার উপর নির্ভর করা ঠিক নহে। বৃষ্টির অভাবে একবার ফসল ভাল না হইলে কি হইবে? কেবলমাত্র ভূমির উপরেই নির্ভর করিলে চলিবে না।

আমাদের দেশে শিল্পোন্নতির পক্ষে যথেষ্ট সুযোগ নাই, একথা ঠিক নহে। উপরে যে কয়টি শিল্পের কথা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই আমরা বলিতে পারি যে, আর যে কোন দেশের মতই আমাদের দেশে শিল্প গড়িয়া তুলিবার সুযোগ যথেষ্ট আছে। একটু যত্ন লইলে এবং রাষ্ট্রের সাহায্য পাইলে আমাদের দেশেও যথেষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবে। জগৎসভায় ভারতবর্ষ শীর্ষ আসন লাভ করিবার আশা রাখে। তাই আমাদের দেশে শিল্পোন্নতি আরও দ্রুত করিতে হইবে। গত যুদ্ধে আমরা শিখিয়াছি যে শিল্পের প্রসার না হইলে জাতি হিসাবে বাঁচিয়া থাকাই অসম্ভব। শিল্পের প্রসার হইলে আমাদের জাতীয় আয় বাড়িবে। দেশের লোকের দারিদ্র্য দূর হইবে। অতএব শিল্প হইতে আমরা প্রভূত উপকার লাভ করিব এ কথা বলা যায়।

ভারতীয় শ্রমিকের কর্মদক্ষতা (Efficiency of Indian labour): আমাদের দেশের শিল্প অনগ্রসর হইবার একটি কারণ শ্রমিকদের দক্ষতার অভাব। কাজেই এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করা দরকার। তুলনা করিয়া অনেকে বলেন যে, ভারতীয় শ্রমিদের দক্ষতা ব্রিটিশ শ্রমিকের এক তৃতীয়াংশ। ইহার কারণ অতি স্পষ্ট। ভারতীয় শ্রমিক অর্ধাহারে, স্বল্পবস্ত্রে, অস্বাস্থ্যকর নোংরা বস্তিতে বাস করে। পেট ভরিয়া আহার সকলের জোটে না; শীতাতপ নিবারণ

করিবার মত বস্ত্র তাহাদের নাই। বস্তিগুলি এত নোংরা ও লোকসংখ্যা এত বেশী যে তাহা রোগের আবাসভূমি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাজেই এই বস্তিবাসী শ্রমিকদের যে স্বাস্থ্য খারাপ হইবে তাহাতে আশ্চর্য কি? শ্রমিকদের দক্ষতার অভাবের জন্য ভারতবর্ষের আবহাওয়া অনেকটা দায়ী। গরমে দীর্ঘ সময় কঠোর পরিশ্রম করিলে স্বাস্থ্য খারাপ হয়। স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে কর্মদক্ষতা কোথা হইতে আসিবে? তদুপরি শ্রমিকেরা যে কারখানায় কাজ করে, তাহার কলকব্জা সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা নিতান্তই কম। স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা শ্রমিকের কমদক্ষতার দুইটি প্রধান ভিত্তি, কিন্তু এ দুইটির এদেশের অভাব। কর্মদক্ষতা কম বলিয়া শ্রমিকেরা কম মজুরী পায়। আবার মজুরী কম হইলে স্বাস্থ্য ও কর্মদক্ষতা বজায় রাখা শক্ত হয়। অল্প মজুরী পাইলে পুষ্টিকর খাদ্য, বস্ত্র, বাসযোগ্য গৃহ, কোনটাই ঠিকমত পাওয়া যায় না। দক্ষতা না থাকিলে মজুরী কম হয়, আবার কম মজুরী হইলে দক্ষতা বাড়িতে পারে না। শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা কম বলিয়া তাহাদের জীবনযাত্রার মানও অত্যন্ত নিম্ন। তাহার ফলে দক্ষতা কম হয়। কারখানার পারিপার্শ্বিক অবস্থাও নিতান্ত শোচনীয়। মালিকেরা শ্রেষ্ঠ যন্ত্রপাতি রাখে না, কাজ করিবার সময় যাহাতে মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি হয়, সেদিকে তাহাদের লক্ষ্য নাই।

ইহার প্রতিকার ঃ দেশের শিল্পোন্নতি করিতে হইলে শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বেশী হওয়া চাই। দক্ষ শ্রমিক বেশী উৎপাদন করে। তাহা হইলে সেই শ্রমিকের আয় বেশী হইবে এবং জীবনযাত্রার মানও উচ্চ হইবে। সুতরাং শ্রমিকের কমদক্ষতা বাড়াইবার জন্য উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করা দরকার। শ্রমিকদের যথেষ্ট আহার্য এবং পরিষ্কার বস্ত্র দিতে হইবে। বিভিন্ন স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় শ্রমিকদের জন্য উন্নত ধরণের আলো-হাওয়া বিশিষ্ট আবাস মালিকেরা যাহাতে নির্মাণ করিয়া দেয়, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশের সাধারণ স্বাস্থ্য উন্নত করিবার দিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। শ্রমিদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষা ছাড়া শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বা স্বাস্থ্যের স্থায়ী উন্নতি সম্ভব নহে। যান্ত্রিক শিক্ষার প্রচলনও হওয়া প্রয়োজন। ভারতীয় শ্রমিকদের বুদ্ধি ব্রিটিশ বা আমেরিকার শ্রমিক অপেক্ষা কম নহে। কিন্তু এই বুদ্ধি বিকাশের সুযোগ তাহারা পায় না। আমাদের একটি বিশেষ সুবিধা এই যে আমাদের দেশের

প্রাকৃতিক সম্পদ যথেষ্ট, যদি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া আমরা শ্রমিকদের কর্মদক্ষ করিয়া তুলি, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

বিদেশী মূলধন (Foreign capital): আমাদের দেশে মূলধন কম, এইজন্য আমাদের অধিকাংশ শিল্পই বিদেশী মূলধন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সঞ্চয়ের পরিমাণ আমাদের দেশে কম। যাহার কিছু মূলধন আছে সে তাহা শিল্পে বিনিয়োগ করিতে নারাজ। বিদেশীরা, বিশেষ করিয়া ইংরাজরা এই অবস্থায় সুযোগ লইয়া চা, কফি, কাগজ, কয়লা, সোনার খনি, পাট, রবার, ট্রাম কোম্পানীতে মূলধন খাটাইতেছে। লবণ, বয়নশিল্প, লৌহ এবং চিনির কারখানাতে বেশীর ভাগ মূলধন ভারতীয়েরা যোগাইতেছে।

বিদেশী মূলধনের সুবিধা (Advantages of foreign capital): বিদেশী মূলধন হইতে লাভ কি হইয়াছে, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যায়। আমাদের মূলধন কম বলিয়া তাহা দিয়া সব শিল্প গড়িয়া তোলা সম্ভব নহে। মূলধন দিয়া বিদেশীরা অনেক শিল্প গড়িতে সাহায্য করিয়াছে। রেল, ট্রাম প্রভৃতি যদি বিদেশী মূলধনের সাহায্যে গড়িয়া না উঠিত, তবে আমরা আরও দরিদ্র থাকিতাম; নূতন শিল্প গড়িয়া তুলিবার ঝুঁকি অনেক। লাভ হইবে কি লোকসান হইবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সম্ভব নহে। একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান সফলতা অর্জন করিতে না পারিলে যাহারা উহাতে শেয়ার কেনে তাহাদের মূলধন মারা যায়। নূতন শিল্প গড়িয়া তুলিবার সমস্ত ঝুঁকি বিদেশীরা বহন করিয়াছে। বিদেশীরা যে সমস্ত শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছে তাহা দেখিয়া ভারতীয়েরা শিক্ষা লাভ করিয়াছে। ব্যবসায় পরিচালনা শিখিবার একটি প্রত্যক্ষ সুযোগ এইভাবে মিলিয়াছে। বিদেশীদের সাফল্যে আমাদের দেশের ধনীরা শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ করিবার প্রেরণা পাইয়াছে। কাজেই বলা যায় যে, বিদেশী মূলধনে আমাদের দেশের উন্নতি হওয়ায় দেশের সঞ্চিত মূলধন বিনিয়োগের পথ খুলিয়া গিয়াছে।

উহার ত্রুটি (Dangers of foreign capital): বিদেশী মূলধনের ত্রুটিও অনেক। বিদেশী মূলধনের সাহায্যে অনেক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে সে কথা সত্য। কিন্তু এই শিল্পের লাভ লোকসান দেশবাসী ভোগ করিতে পারে না। এই লভ্যাংশ দেশের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। ভারতীয়ের ভাগ্যে জুটিয়াছে শুধু কেরাণীগিরি এবং শ্রমিকের কাজ। দায়িত্বপূর্ণপদেও সব সময়ে

ভারতীয়দের নিযুক্ত করা হয় না, বড় বড় চাকুরীগুলি বিদেশীদের জন্যই বাঁধা থাকে। ব্যবসায়ের গোপন খবর জানা বা বড় চাকুরীলাভ ভারতীয়দের ভাগ্যে সাধারণত জুটে নাই। বিদেশীরা দেশের ভবিষ্যতের জন্য আদৌ চিন্তা না করিয়া আমাদের খনিজ সম্পদ নিঃশেষ করিতেছে। তাহারা নিজেদের লভ্যাংশের দিকেই বেশী দৃষ্টি দেয়। কয়লার খনিগুলিতে বহু কয়লা অযথা নষ্ট করা হইয়াছে। আমাদের সম্পদ আমরা যে ভাবে রক্ষা করিয়া কাজ করিব বিদেশীরা তাহা করিবে না। বিদেশী মূলধনের কায়েমী স্বার্থের জন্য আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন বহুবার বাধা পাইয়াছে। ভারতীয়দের নূতন শিল্পপ্রচেষ্টায় বিদেশী পুঁজিপতিরা সর্বদা বাধা দিয়াছে। এক দিকে ভারতীয় জাহাজ-কোম্পানীর দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। বিদেশী কোম্পানীর অন্যায় প্রতিযোগিতায় ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীগুলি দাঁড়াইতে পারে নাই। বিদেশীদের ক্ষমতা বেশী ছিল, তাহারা প্রতিযোগিতায় প্রায়ই অন্যায় পন্থা অবলম্বন করিয়াছে।

এই সমস্ত কারণে বিদেশী মূলধন নিয়োগ ভারতীয়েরা ভাল চোখে দেখে না। অনেক ধনবৈজ্ঞানিক বলেন যে, বিদেশী মূলধন আর এদেশে নূতন করিয়া আসিতে দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হইবার পর বিদেশী মূলধন ততটা ক্ষতিকর হইবে না। এখন মূলধন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ভারতীয়দের হস্তে থাকিবে। স্বাধীন ভারতে বিদেশী মূলধন বিশেষত বিদেশী যন্ত্রপাতির প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমাদের শিল্পের উপরে বিদেশীদের কোন কর্তৃত্ব দেওয়া হইবে না।

দশম পরিচ্ছেদ

সরকার ও শিল্প

দেশের শিল্প গড়িয়া তুলিতে যে সরকারী সাহায্য প্রয়োজন তাহা এখন প্রায় সকলেই স্বীকার করে। অবাধনীতি (Laissez-faire) এখন আর কেহ গ্রহণ করে না। জার্মানী এবং জাপানে সরকারী সাহায্যে অতি দ্রুত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারত সরকার এদিকে দৃষ্টি দেয় নাই। সরকার অবাধনীতিতে বিশ্বাস করিত এবং সেইজন্য ভারতীয় শিল্প গড়িয়া তুলিতে বিশেষ কিছু সাহায্য করে নাই। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় দুই একটি প্রাদেশিক সরকার, বিশেষ করিয়া মাদ্রাজের সরকার, কয়েকটি শিল্পকে টাকা ধার দিয়াছিল এবং নিজেরাও কয়েকটি কারখানা খুলিয়াছিল। কিন্তু ইউরোপীয়েরা তাহাতে খুব বাধা দেয়। তাহাদের আন্দোলনের ফলে ভারতসচিব ইহা বন্ধ করিয়া দেয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় শিল্প-গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। যুদ্ধের সরঞ্জাম কিনিবার জন্য যে মিউনিসন বোর্ড স্থাপিত হইয়াছিল, ইহা ভারতীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার নীতি গ্রহণ করে। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে শিল্প-কমিসন নিয়োগ করিয়া ভারতীয় শিল্প গঠন করিবার বিষয়টি অনুসন্ধান করা হয়। এই কমিসন অভিমত প্রকাশ করে যে, শিল্প গড়িয়া তুলিতে সরকারকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিতে হইবে। কমিশনের মতে—গবেষণা, নূতন শিল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধান, ব্যবসায় সম্বন্ধে খবরাখবর, প্রচার, যান্ত্রিক শিক্ষালয় স্থাপন এবং ভারতীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া সরকার শিল্প গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিতে পারে। সরকার কমিসনের এই সিদ্ধান্তগুলি মানিয়া লয়। স্টোরস্ বিভাগ খুলিয়া সরকার ভারতীয় পণ্য ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করে।

প্রত্যেক রাজ্যে শিল্পবিভাগ গঠন করিয়া একজন মন্ত্রীর অধীনে ঐ বিভাগ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বিভাগ রাজ্যের শিল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া নূতন উদ্যোক্তাদের সকল রকম তথ্য সরবরাহ করে। পশ্চিম বাংলা এবং অন্যান্য রাজ্যে শিল্পে রাষ্ট্রীয় সাহায্য আইন পাস করা হইয়াছে। এই আইনে

শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী ঋণ দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার দ্বারা কোন স্থায়ী ফল পাওয়া যায় নাই।

১৯২২ সালের রাজস্ব কমিসনের নির্দেশে সরকার প্রভেদাত্মক সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করে। ইহার পর লৌহ ও ইস্পাত, কাগজ, চিনি, দিয়াশলাই, বয়নশিল্প প্রভৃতি শিল্পকে সংরক্ষিত করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শিল্পকে আরও সাহায্য করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয়। বৈজ্ঞানিক ও শিল্পগবেষণাসমিতি স্থাপন করিয়া গবেষণার ব্যবস্থা হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনকমিটি স্থাপন করিয়া শিল্পোন্নতির চেষ্টার মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিবার চেষ্টা হইতেছে।

প্রয়োজনীয় সমস্ত শিল্পগুলির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ঠিক হইয়াছে যে, কতকগুলি শিল্পপরিচালনা সরকারের হস্তে ন্যস্ত করা হইবে। অন্যান্য শিল্পের মালিকদের যথাসাধ্য সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে।

সংরক্ষণনীতি (Protection) : ১৯২২ সালে সংরক্ষণ সম্বন্ধে মতামত দিবার জন্য ভারতীয় শিল্প ও ব্যবসায়-কমিসন নিযুক্ত করা হয়। কমিসন সংরক্ষণের পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি দিয়াছে।

সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি : ভারতীয়েরা সকলেই সংরক্ষণের পক্ষপাতী। সংরক্ষণের পক্ষে শিশুশিল্পবিষয়ক যুক্তি ভারতবর্ষে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ভারতবর্ষে কাঁচা মালের অভাব নাই এবং শিল্পবিকাশের সম্ভাবনাও প্রচুর। কয়েকটি শিল্প ইতিমধ্যেই স্থাপিত হইয়াছে। এই শিল্পগুলি পাশ্চাত্যের এবং জাপানের সংহত এবং শক্তিশালী শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে না। কাজেই বিদেশীর প্রতিযোগিতা হইতে ভারতের শিশুশিল্পগুলি রক্ষা করিতে হইবে।

অন্য দিক হইতেও সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি আছে। ভারতবর্ষ প্রধানত কৃষিপ্রধান দেশ। একটিমাত্র জীবিকার উপর নির্ভর করা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। বর্ষার উপরে নির্ভর করিতে হয় বলিয়া কৃষি হইতে আয় অনিশ্চিত। কৃষির উপরে এই একান্ত নির্ভরশীলতা দূর করিবার জন্য শিল্প গড়িয়া তোলা উচিত। নানা রকম শিল্প গড়িয়া তুলিলে দেশের লোকের নানা জাতীয় প্রতিভাও বিকাশ

লাভ করিবে। লোকের মোট আয় তাহাতে বাড়িবে। সকলেই স্বীকার করে যে, শিল্প বিকাশ লাভ না করিলে ভারতবর্ষে দারিদ্র্য ঘুচিবে না। কিন্তু বিদেশীয় প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা না করিলে শিল্প গড়িয়া উঠা অসম্ভব।

বিচারমূলক সংরক্ষণনীতি (Discriminating protection): কিন্তু সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করিলে দেশের লোকের উপরে খুব চাপ পড়ে। সেইজন্য কমিসন এই সিদ্ধান্ত করে যে, সব শিল্পকেই নির্বিচারে সংরক্ষিত করা উচিত নহে। কমিসন বিচারমূলক সংরক্ষণনীতির পক্ষে রায় দেয়। যে সব শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহাদের বাছিয়া বাছিয়া সংরক্ষিত করা হইবে। কোন শিল্পকে সংরক্ষিত করা হইবে কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখিবার জন্য কমিসন তিনটি সর্তের উল্লেখ করিয়াছে।

(১) কাঁচা মাল, সস্তায় কারখানা চালাইবার শক্তি, উপযুক্ত শ্রমিক এবং ভাল বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা প্রভৃতি অনেক সুবিধা সে শিল্পের থাকিবে। (২) দেশের স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া সে শিল্পের দ্রুত বিকাশ কাম্য, অথচ সংরক্ষণ ব্যতীত তাহার বিকাশলাভের আদৌ সম্ভাবনা নাই। (৩) সে শিল্প কয়েক বৎসর পরেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবে।

যদি পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, উপরোক্ত সর্তগুলি পালিত হইতেছে, তবেই সেই শিল্পটি সংরক্ষিত হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। কোনও শিল্পকে সংরক্ষণ দিবার পূর্বে শুল্ক-সমিতি দ্বারা শিল্পের পরিস্থিতি পরীক্ষা করা হইবে। এই বোর্ডের নাম ভারতীয় শুল্ক-সমিতি। তিনজন সভ্য লইয়া সরকার এই সমিতি গঠন করিবে। কোন শিল্প সংরক্ষণের দাবী করিলে তাহা এই সমিতি কর্তৃক বিবেচিত হইবে। সংরক্ষণ দেওয়া উচিত বলিয়া বিবেচিত হইলে সমিতি সরকারের নিকট উপযুক্ত সুপারিশ করিবে।

কয়েকটি শিল্পকে সংরক্ষণ করা হইয়াছে। সর্বপ্রথমে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সংরক্ষণ করা হয়। এই শিল্প এখন পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে এবং যে কোন দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে। কাগজ, দিয়াশলাই, চিনি প্রভৃতি শিল্পকেও সংরক্ষণ করা হইয়াছে। চিনির কলগুলির প্রতিষ্ঠা অনন্যসাধারণ। সংরক্ষিত হইবার পাঁচ বৎসরের মধ্যে দেশের যত চিনির প্রয়োজন তাহা এখন দেশীয় কলে উৎপাদিত চিনি হইতে মিটিতে পারে।

সাম্রাজ্য পক্ষপাতিত্বনীতি (Imperial Preference) : কিছুদিন হইল এই নীতি অনুযায়ী সরকার ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ রাষ্ট্রসংঘ হইতে আগত দ্রব্যগুলির উপরে অপেক্ষাকৃত কম শুল্ক ধার্য করে। ব্রিটেনে এবং রাষ্ট্রসংঘের অন্য দেশে ভারতবর্ষ হইতে মাল পাঠাইলে তাহার উপরেও কম শুল্ক ধার্য হইবে। এই নীতির উদ্দেশ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করা।

ভারতবাসীরা এই নীতির বিরুদ্ধে। এই নীতি গ্রহণ করিলে ভারতবর্ষের কোন লাভ নাই। ভারতবর্ষের বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৩২ সালে অটোয়া সম্মেলনে এই চুক্তি গৃহীত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ভারতবর্ষ উপরোক্ত সাম্রাজ্য-পক্ষপাতিত্ব নীতি অনুসরণ করিতে বাধ্য হয়। সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি হইতে আগত দ্রব্যের উপরে ভারত সরকার কম শুল্ক ধার্য করে। ভারতীয় আইন পরিষদে এই নীতির নিন্দাপ্রস্তাব গৃহীত হয়। পরে ইহার পরিবর্তে ইঙ্গ-ভারতীয় চুক্তি গৃহীত হয়। ইহার ফলে অনেক বিলাতী জিনিষের উপর শুল্ক হ্রাস করা হয় এবং গ্রেটব্রিটেনও অনুরূপ শুল্ক হ্রাস করে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

রেলপথ ও যানবাহন

যানবাহনের ব্যবস্থা : দেশের উৎপাদনব্যবস্থা কার্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে ভাল যানবাহনের ব্যবস্থা থাকা উচিত। ভারতবর্ষের মত বৃহৎ দেশে ভাল যানবাহন আরও প্রয়োজনীয়। যানবাহনের সুবিধা না থাকিলে মাল ও যাত্রী দেশের এক স্থান হইতে স্থানান্তরে অনায়াসে যাইতে পারে না। আমাদের দেশে রেল, রাজপথ এবং সামুদ্রিক পথে যাতায়াতের কিরূপ ব্যবস্থা তাহা নীচে আলোচিত হইল।

রেলপথ : ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ই, আই, আর; জি আই, পি, এবং মাদ্রাজ রেলপথ তৈয়ারীর অনুমতি দিলে আমাদের দেশে প্রথম রেলপথ নির্মাণ হয়। ১৮৫৩ সালে লর্ড ডালহৌসি ভারতবর্ষে রেলপথ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া বিলাতে পত্র লিখেন। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে সরকার ভারতে রেলপথ তৈয়ারী করিবার জন্য আটটি ব্রিটিশ কোম্পানীর সহিত চুক্তি করে। কিন্তু কোম্পানীগুলি ভারতবর্ষে কাজ আরম্ভ করিতে দ্বিধা বোধ করে। তখন সরকার বলে যে, শতকরা ৪½ হইতে ৫ টাকা লাভ না হইলে সরকার ঐ হারে লাভের টাকা পূরণ করিয়া দিবে। কিন্তু লাভ বেশী হইলে অতিরিক্ত লাভের অর্ধেক সরকারের প্রাপ্য হইবে। সরকার বিনা মূল্যে কোম্পানীগুলিকে জমি দেয়। তাহাদের কার্য নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার সরকারের থাকিবে এবং ২৫ বৎসর পরে ইচ্ছা করিলে সরকার এইগুলি ক্রয় করিয়া লইতে পারিবে। ইহাকে 'গ্যারান্টি' ব্যবস্থা বলে।

এই ব্যবস্থায় সরকারের বহু ক্ষতি হয়। কোম্পানীগুলি প্রথম প্রথম লাভ করিতে পারে নাই। কাজেই সরকারকে সাধারণ রাজস্ব হইতে এই ক্ষতি পূরণ করিতে হয়। পরে সরকার নিজেই রেলপথ তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই নীতি ত্যাগ করিয়া আবার কম সুদে (৩½ টাকা হারে) অন্যান্য ব্রিটিশ কোম্পানীর সহিত চুক্তি করা হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে রেল কোম্পানীগুলি খুব লাভ করিতে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে সরকার রাষ্ট্রদ্বারা রেলপথ পরিচালনা করিবার নীতি গ্রহণ করে। একে

একে প্রায় সব কয়টি রেলপথ সরকার নিজে ক্রয় করিয়াছে এবং এখন এইগুলি সরকারই পরিচালনা করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে সরকার রেলের সব ঋণ শোধ করিয়া দিয়াছে। এখন ভারতীয় করদাতারাই রেলের মালিক।

রেল স্থাপনের ফল ঃ প্রথমে ব্রিটিশের ব্যবসায় ভারতবর্ষে চালু করিবার জন্য ও শাসনকার্যের সুবিধার জন্য রেলপথ স্থাপিত হইয়াছিল। প্রথমে যে উদ্দেশ্যেই রেলপথ স্থাপিত হইয়া থাকুক, ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে তাহা সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। দ্রুত রেল স্থাপিত হইবার ফলে ইংরাজ বণিকেরা ভারতের সবত্র তাহাদের মাল প্রেরণ করিতে পারে। যন্ত্রনির্মিত পণ্য আমাদের দেশের কুটিরশিল্পজাত পণ্য অপেক্ষা দামে সস্তা ছিল। কাজেই কুটিরশিল্প প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারিল না। একে একে কুটিরশিল্প লোপ পাইল। আমাদেব কুটিরশিল্প লোপ পাইবার একটি প্রধান কারণ রেলপথের বিস্তার। রেলপথ নির্মাণের ফলে আমাদের গ্রাম এবং কৃষিব্যবস্থারও অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। কুটিরশিল্প লোপ পাওয়াতে কারিগরেরা বেকার হইয়া পড়ে। তাহাদের সম্মুখে কৃষি ছাড়া জীবিকা নিবাহের আর কোন পথ উন্মুক্ত ছিল না। কাজেই জমির উপরে লোকের নির্ভরতা বাড়িল, জমি খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িতে লাগিল। আমাদের দেশের কৃষির প্রধান ত্রুটি এই যে, জমিগুলির আকার ছোট। তাহার জন্য রেলনিমাণ পরোক্ষভাবে দায়ী। গ্রামেব জীবনে রেলপথ আরও একভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়াব সৃষ্টি করিয়াছে। রেলপথের বাঁধ ও পুলগুলি জলের স্বাভাবিক স্রোতে বাধা দিয়াছে। আমাদের দেশে, বিশেষত পশ্চিম বাংলায় যে এত বন্যা হয়, তাহার কারণ এই পুল ও রেলের উচ্চ বাঁধ; ইহাই অনেক পণ্ডিতের মত। রেলপথের দুই পাশে বহু জায়গায় জল জমিয়া থাকে। উহাতে ম্যালেরিয়ার মশা জন্মে। ইহার ফলে গ্রামাঞ্চলে ম্যালেরিয়ার বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং গ্রামের স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া পড়িয়াছে।

রেলপথের এই সব ত্রুটি উপেক্ষনায় নহে। কিন্তু রেলপথ দেশের বহু উপকারও করিয়াছে। রেলপথ আমাদের দেশের কৃষির উপরে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা আমরা বলিয়াছি। কিন্তু সুফলও অনেক হইয়াছে। রেলপথ দ্বারা গ্রামের সহিত পৃথিবীর বাজারের যোগ স্থাপিত হইয়াছে। আজ আমাদের দেশের কৃষিজাত দ্রব্য পৃথিবীর সর্বত্র বিক্রয় হইতেছে। বাজার

বড় হওয়াতে কৃষকেরা তাহাদের পণ্যের ভাল দাম পাইতেছে। রেল হওয়াতে চালান দেওয়া সহজ বলিয়া পাট, তুলা প্রভৃতির চাষ বাড়িয়াছে। এই পণ্যগুলি পৃথিবীর সর্বত্র রপ্তানী হয়। ফলে কৃষি এবং ব্যবসায়ের অনেক উন্নতি হইয়াছে।

গ্রামের লোকের একদিক হইতে সুবিধা হইয়াছে। দুর্ভিক্ষের সময়ে রেল থাকায় অনেক উপকার হয়। দেশের কোন অঞ্চলে ফসল ভাল না হইলে সেখানকার লোকের এখন আর না খাইয়া মরিবার সম্ভাবনা নাই। দেশের অন্যত্র হইতে রেলযোগে খাদ্য আনা যাইবে।

শিল্পের উপরে রেলের প্রভাবও অবিমিশ্র মন্দ নহে। বহু কুটির-শিল্প ধ্বংস হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু সেইখানে নূতন নূতন শিল্প ও কলকারখানা গড়িয়া উঠিতেছে। যানবাহনের সুবিধার জন্য ইহা সম্ভব হইয়াছে। রেলপথ না থাকিলে বড় বড় কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নহে। রেলপথে কয়লা, তেল ও কাঁচা মাল সস্তায় কারখানায় পৌছাইয়া দেওয়া হয়, আবার তৈয়ারী মাল দেশের বিভিন্ন স্থানে চালান যায়। রেলপথ ছাড়া আসাম ও পশ্চিম বাংলার চা, পাট ইত্যাদি শিল্পপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হইত না। আধুনিক শিল্প এতটা রেলপথের উপর নির্ভরশীল যে, ইহা ছাড়া আধুনিক শিল্পের প্রসার কল্পনাই করা যায় না।

রেলপথের জন্য আমদানী ও রপ্তানীবাণিজ্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশের বিভিন্ন অংশ হইতে ফসল রেলপথে বন্দরে আনীত হয় এবং সেখান হইতে পৃথিবীর নানাস্থানে প্রেরিত হয়। দেশের সর্বত্র যোগস্থাপন করিয়া রেলপথ বিদেশী পণ্যের বাজারও বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে। কাজেই আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। রেলপথ হইতে ভারত সরকারের যথেষ্ট আয় হয়। আরও নানাভাবে ইহা দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে।

সামাজিক জীবনেও রেলপথ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। লোকে এখন অনায়াসে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারে। দূর দেশের লোকের সঙ্গে মিশিতে পারায় গ্রামের লোকের মনে উদারতা বাড়িয়াছে। সংরক্ষণশীলতা এবং জাতিভেদের সংস্কার দূর করিতে রেলপথ অনেকখানি সাহায্য করিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন লোকের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিয়া ভারতবাসীকে এক অখণ্ড জাতি হিসাবে গড়িয়া তুলিতে রেলপথের দান অতুলনীয়।

রেলপথের বিস্তার: রেলপথের বিস্তার অনেক হইয়াছে বটে, কিন্তু

তাহা যথেষ্ট নহে। আমাদের দেশে ৩৩,০৮৪ মাইল রেলপথ আছে। রেলপথে সরকারের ৭৩২ কোটি টাকা খাটিতেছে। ভারতবর্ষের যতটা প্রয়োজন তাহার পক্ষে এই রেলপথ যথেষ্ট নহে। আমেরিকায় ২৫০,০০০ মাইল রেলপথ আছে। আমাদের দেশে প্রতি হাজার বর্গমাইলে মাত্র ২০ মাইল রেলপথ ও ইংলণ্ডে এবং জার্মানীতে অনুরূপ স্থানে ১৯৫ মাইল রেলপথ আছে। আমাদের দেশে অন্তত ১,০০,০০০ মাইল রেলপথ থাকা উচিত। আমাদের দেশে আরও বহু রেলপথ নির্মিত হইতে পারে।

রাজপথ : চলাচলের পথেরও প্রয়োজন আছে। ভাল পথ থাকিলে শহরের সহিত গ্রামের যোগ স্থাপিত হইতে পারে। তাহা হইলে চাষীরা কৃষিজাত পণ্য দূরের বাজারে পাঠাইতে পারে। কৃষির উন্নতির জন্য ভাল পথ বিশেষ প্রয়োজন। মোটর চলাচল বাড়িবার জন্য ভাল পথ আরও প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। মোটর এবং লরীর সাহায্যে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে দ্রুত লোক চলাচল এবং মাল চালান করা সম্ভব। রেলের এতটা সুবিধা নাই। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে মোটর চলিবার মত পথ নাই বলিলেই হয়। অতএব আরও রাস্তা তৈয়ারী করা দরকার। এই প্রয়োজন সরকারও অনুভব করিতেছে। পেট্রোলের উপরে অধিক শুল্ক ধার্য করিয়া তাহার একাংশ ভাল রাজপথ তৈয়ারীর জন্য রাখা হইতেছে। রাজ্যের পথোন্নয়নসংঘের হস্তে এই অর্থ দেওয়া হয়। এই সংঘ হইতে পুরাতন পথ মেরামত এবং নূতন পথ তৈয়ারী করা হয়। কিন্তু ইহা অত্যন্ত ধীর গতিতে চলিতেছে।

জলপথ : জাহাজ যানবাহনের একটি প্রধান উপায়। একদা ভারতবর্ষ জাহাজ নির্মাণের জন্য বিখ্যাত ছিল। ভারতীয় পোতে দেশদেশান্তরের পণ্য আসিত; নানা দেশের সহিত ব্যবসায়বাণিজ্য চলিত। কিন্তু ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হইবার পরে জাহাজ তৈয়ারী একেবারেই লোপ পাইয়াছে। দেশের পণ্য বিদেশে রপ্তানী করিতে এখন ভারতবর্ষকে বিদেশী জাহাজের উপরে নির্ভর করিতে হয়। সম্প্রতি দুই একটি ভারতীয় জাহাজ-কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। এই জাহাজগুলি উপকূল বাণিজ্যে নিযুক্ত হয় মাত্র। বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতীয় পোত নিযুক্ত হয় না বলিলেই চলে। দেশে জাহাজ তৈয়ারীর কোন কারখানা ছিল না। কিছুদিন পূর্বে বিশাখাপত্তমে জাহাজ তৈয়ারীর একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

ভারতীয় বাণিজ্যপোতের প্রয়োজনীয়তা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। নিজেদের জাহাজ ব্যতীত কোন জাতিই উন্নতি করিতে পারে না। জাহাজ তৈয়ারী করিবার স্বাভাবিক সুবিধা আমাদের দেশে যথেষ্ট আছে। এখন যে অর্থ বিদেশী জাহাজ কোম্পানীকে মালবহনের মূল্য হিসাবে দিতে হয়, নিজেদের জাহাজ থাকিলে তাহা দেশেই থাকিবে। দেশীয় জাহাজ দেশের লোকের নূতন জীবিকার পথ উন্মুক্ত করিবে। যুদ্ধের সময় বাণিজ্যপোত নিতান্তই প্রয়োজন। ভারত সরকারের উচিত জাহাজ তৈয়ারীর জন্য সাহায্য করিতে অগ্রসর হওয়া এবং জাহাজ-নির্মাণকার্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যে বিদেশী জাহাজ কোম্পানীগুলিকে কাজ করিতে দেওয়া হইবে না, ইহার ব্যবস্থা করাও আশু প্রয়োজন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য

বৈদেশিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত (Balance of Trade) : বিদেশের সহিত ভারতবর্ষের বহু প্রকার বাণিজ্য হইয়া থাকে। ১৯৫২-৫৩ সালে ভারতবর্ষে আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য মোট ৬৫৭·৯২ কোটি টাকা ও ৫৭৪·৯২ কোটি টাকা হইয়াছিল। কাজেই বাণিজ্যের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত (Unfavourable balance of trade) ছিল ৮৩·০০ কোটি টাকা।

স্বাধীনতার পর গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে ১৯৫০ সাল ব্যতীত আর কোন বৎসরেই আমাদের বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত অনুকূল ছিল না। আর চারি বৎসরই বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত প্রতিকূল ছিল। কিন্তু তাহার পূর্বে বেশীসংখ্যক বৎসরেই আমাদের বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত অনুকূল থাকিত। এই পরিবর্তনের কারণ কি ?

প্রধান কারণ এখন প্রতি বৎসরই বিদেশ হইতে বহু পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হয়। ১৯৫১-৫২ সালে মোট ২২৪·১ কোটি টাকা মূল্যের খাদ্যশস্য, ডাল ও ময়দা প্রভৃতি আমদানী করা হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে কিছু খাদ্যশস্য অবশ্য আমদানী করিতে হইত কিন্তু তাহার পরিমাণ অনেক কম ছিল। দেশের মধ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন লোকসংখ্যার তুলনায় কম হইতেছে বলিয়াই এত বেশী মূল্যের খাদ্যদ্রব্যাদি আমদানী করিতে হয়। কৃষির উন্নতি করিয়া খাদ্যশস্যের উৎপাদন না বাড়াইলে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইবে না।

দ্বিতীয় কারণ আমাদের দেশ বিভক্ত হওয়া। অবিভক্ত ভারতবর্ষ প্রতি বৎসরই প্রচুর পরিমাণে তুলা ও পাট দেশবিদেশে রপ্তানী করিত। কিন্তু যে সমস্ত অঞ্চলে তুলা ও পাট হইত, তাহার বেশী অংশ দেশ বিভাগের জন্য পাকিস্তানের অন্তর্গত হয়। ফলে রপ্তানী ত দূরে থাকুক, ভারতকে পাকিস্তান হইতে বহু পরিমাণ পাট ও তুলা আমদানী করিতে হইতেছে। যাহা পূর্বে রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে ছিল, তাহা এখন আমদানীর মধ্যে পড়িল। ১৯৫:-৫২ সালে আমাদের ১৩৬·৪ কোটি টাকা মূল্যের তুলা বিদেশ হইতে রপ্তানী করিতে হইয়াছে। ফলে বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত যাহা অনুকূল ছিল, তাহা প্রতিকূল হইল।

তৃতীয় কারণ মুদ্রাস্ফীতি। আমাদের দেশে মুদ্রাস্ফীতির জন্য জিনিষপত্রের উৎপাদন-ব্যয় অত্যন্ত বেশী; এবং সেইজন্য রপ্তানী দ্রব্যের দামও অত্যধিক। ইহার ফলে বিদেশে আমাদের রপ্তানী দ্রব্যের চাহিদা কমিয়া যাইতেছে ও রপ্তানীর পরিমাণও কমিতেছে। রপ্তানী কমিতেছে অথচ আমদানী বাড়িতেছে। ফলে বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইতেছে।

বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য (Features of foreign trade): আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রথম বৈশিষ্ট্য গত কয়েক বৎসরই (১৯৫০ ব্যতীত) বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইতেছে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পূর্বে বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত সাধারণত অনুকূল হইত। এই পরিবর্তনের কারণ বর্তমানে আমাদের দেশে খাদ্যাভাবের জন্য বহু পরিমাণ খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইতেছে। দ্বিতীয়ত, পূর্বে ভারতবর্ষ বহু পরিমাণ তুলা ও পাট রপ্তানী করিত। কিন্তু যে সমস্ত অঞ্চলে পাট ও তুলা হয় তাহার বেশী অংশই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে বর্তমানে আমাদের বহু তুলা ও পাট আমদানী করিতে হইতেছে। দেশে জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধির ফলে রপ্তানীর পরিমাণও কমিতেছে। কাজেই বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইতেছে।

রপ্তানী ও আমদানীর মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্য ও কাঁচা মালের পরিমাণ হিসাব করিলে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাইবে। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষের রপ্তানীর মধ্যে কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু কুটিরশিল্প লোপ পাইবার পর হইতে আমাদের রপ্তানীর মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের পরিমাণ কমিয়া যায় ও কাঁচা মালের পরিমাণ বাড়ে। আবার আমদানীর মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের পরিমাণই বেশী ছিল। কিন্তু দেশের মধ্যে কিছু কিছু শিল্পোন্নতি হওয়ার ফলে কয়েক বৎসর হইতে আমাদের কাঁচামালের রপ্তানী কমিতেছে ও আমদানী বাড়িতেছে ও শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানী বাড়িতেছে ও আমদানী কমিতেছে। ১৯৫১-৫২ সালে, মোট রপ্তানীর শতকরা ৫৬·৭ ভাগ শিল্পজাত দ্রব্য ও মাত্র ২১ ভাগ কাঁচা মাল। আমদানীর মধ্যে শতকরা ২৯·৪ ভাগ কাঁচা মাল ও ৪০ ভাগ শিল্পজাত দ্রব্য। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশে যন্ত্রাদি তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা ভাল নহে। ফলে আমাদিগকে প্রতি বৎসর বহু টাকার যন্ত্রাদি বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। অবশ্য এই সমস্ত যন্ত্র ব্যবহার দ্বারাই শিল্পোন্নতি সম্ভব হইতেছে। ১৯৫১-৫২ সালে মোট ১০৪ কোটি টাকার যন্ত্রাদি আমদানী

হইয়াছে। ইহা বাদ দিলে মোট আমদানীর মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের পরিমাণ দাঁড়ায় শতকরা ২৭.৪ ভাগ। ইহাকে মূলধন বলা যায়।

আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে ইংলণ্ড ও আমেরিকার অংশ অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক বেশী। ১৯৫১-৫২ সালে আমরা ইংলণ্ড হইতে ১৫৭.৮ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি আমদানী করি ও ইংলণ্ডকে ১৮৯.৫ কোটি টাকার জিনিষ রপ্তানী করি। ঐ বৎসরে আমেরিকা হইতে ২৮৭.৯ কোটি টাকার জিনিষপত্র আমদানী ও ১৩২.১ কোটি টাকার জিনিষপত্র আমেরিকায় রপ্তানী করি। আর কোন দেশ হইতে এত বেশী মূল্যের জিনিষ আমদানী কিংবা রপ্তানী হয় না। সোভিয়েট রাসিয়া আমাদের নিকট হইতে মাত্র ৬.৯ কোটি টাকার জিনিষ কিনিয়াছে ও মাত্র ১.৩ কোটি টাকার জিনিষ বিক্রয় করিয়াছে।

আমদানী ও রপ্তানীর প্রকৃতি : যে সকল দ্রব্য রপ্তানী করা হয়, তাহার মধ্যে পাট, তুলা, চা, চাউল, গম, তৈলবীজ, চামড়া, গালা, পশম, তামাক, অভ্র, রবার, নারিকেলের ছোবড়াজাত দ্রব্য, ফল ও সব্জী, মশলা, কফি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

রপ্তানী : পাট এবং পাটজাত দ্রব্য, যথা—বস্তা, চট ইত্যাদি ইংলণ্ড, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, বর্মা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশ, জাপান ফ্রান্স, জার্মানী, ব্রেজিল, আর্জেনটিনা প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়। ১৯৫২-৫৩ সালে ১২৬.২৫ কোটি টাকার পাট ও পাটজাতদ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে। আমাদের মোট রপ্তানীর ইহা শতকরা ৩৬ ভাগ। তুলা ও সূতির কাপড় দুইই রপ্তানী হয়। তুলা জাপান, ইংলণ্ড, চীন, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি ক্রয় করিত। সূতির কাপড় বর্মা, সিংহল, স্ট্রেট সেটেলমেণ্ট, মিশর, ইরাণ ইরাক প্রভৃতি দেশে চালান যায়। ১৯৫২-৫৩ সালে ৯৯.৬ কোটি টাকার তুলা এবং তুলাজাত দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে। ইহা মোট রপ্তানীর শতকরা ১১ ভাগ। চা বেশীর ভাগই ইংলণ্ডে চালান যায়। মোট রপ্তানীর ৯০ ভাগই ইংলণ্ড ক্রয় করে। ইংলণ্ডের পরে কানাডা, বর্মা, আমেরিকা ইত্যাদি চা ক্রয় করে। ভারতবর্ষে যত চা উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ৭৫ ভাগই রপ্তানী হয়। ১৯৫২-৫৩ সালে মোট ৮০.১ কোটি টাকার চা রপ্তানী হইয়াছিল। চাউল, গম, যব, জাওয়ার, বাজরা প্রভৃতি খাদ্যশস্য আরব দেশ, ইরাক, ইরাণ, ইংলণ্ড ও জার্মানী প্রভৃতি দেশে চালান যায়। তৈলবীজের মধ্যে তিসি, ইংলণ্ড,

ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে এবং রেড়ি আমেরিকা ও ইংলণ্ডে চালান হয়। অন্যান্য তৈলবীজও কমবেশী নানাস্থানে রপ্তানী হয়। ১৯৫২-৫৩ সালে ৭·৫৫ কোটি টাকার তৈলবীজ রপ্তানী হইয়াছে। চামড়া প্রধানত আমেরিকা, ইংলণ্ড, ইতালী, জার্মানী প্রভৃতি দেশে যায়। ১৯৫২-৫৩ সালে ৫·৬ কোটি টাকার চামড়া রপ্তানী হইয়াছে। প্রায় আট কোটি টাকা মূল্যের গালা আমেরিকা, ইংলণ্ড ও জার্মানীতে যায়।

মোট ১৪৮·৮৭ কোটি টাকার কাঁচা মাল রপ্তানী হইয়াছে এবং ৪০৪·৮২ কোটি টাকার শিল্পজাতপণ্য এবং ১৫৭·৮৮ কোটি টাকার খাদ্য রপ্তানী হইয়াছে।

আমদানী: তুলা ও সূতির কাপড়, যন্ত্রপাতি, রেশম, পশম, কাগজ, পিচবোর্ড, লৌহদ্রব্য, রং, ঔষধ, কাঁচের বাসন, তামাক, মসলা, খাদ্য, মদ, কাঠ, শস্য ইত্যাদি আমদানী হয়।

তুলা ও সূতির কাপড় ভারতবর্ষে আমদানী হয়। লম্বা আঁইশযুক্ত তুলা ব্রিটিশ পূব আফ্রিকা, ঈজিপ্ট ও আমেরিকা হইতে আমদানী হইত। সূতির কাপড় ইংলণ্ড, জাপান, চীন, সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, ইতালী প্রভৃতি দেশ হইতে আসিত। ১৯৫১-৫২ সালে ১৩৬ কোটি টাকার তুলা ও ৬·৫ কোটি টাকার কাপড় আমদানী হইয়াছে। মোট আমদানীর ইহা শতকরা ১৬ ভাগ। পশম এবং পশমী জিনিষও বহু আমদানী হয়। ১৯৫১-৫২ সালে ১০·৮১ কোটি টাকার পশম ও পশমী জিনিষ আসিয়াছে। সাধারণত ইংলণ্ড, জাপান, ইতালী জার্মানী ও ফ্রান্স হইতে পশমী জিনিষ আসিত। রেশম ও রেশমী দ্রব্যাদি চীন, জাপান, ইংলণ্ড ও ইতালী হইতে আমদানী হয়। কৃত্রিম রেশমও বহু পরিমাণে ভারতবর্ষে আমদানী হয়। ১৯৫১-৫২ সালে ২০ কোটি টাকার কৃত্রিম রেশম আমদানী হইয়াছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্মানী, বেলজিয়ম প্রভৃতি দেশ হইতে ১৯৫১-৫২ সালে ১০৪ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি যথা বৈদ্যুতিক, যন্ত্রাদি, কৃষিযন্ত্র, চিনি ও চায়ের কারখানার যন্ত্রাদি এবং যন্ত্রের অংশ আমদানী হয়। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদিও বহু আমদানী হয়। ১৯৫১-৫২ সালে আমেরিকা, ইংলণ্ড, জাপান প্রভৃতি অঞ্চল হইতে ১০·৩৫ কোটি টাকার যন্ত্রাদি আমদানী হয়। ইংলণ্ড, জাপান, আমেরিকা, জার্মানী প্রভৃতি দেশ হইতে ২১·৯৬ কোটি টাকার লৌহ ও ধাতবদ্রব্য আমদানী করা হয়। ঔষধ ইংলণ্ড, জাপান, আমেরিকা, জার্মানী প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানী হয়। কাগজ ও পীচবোর্ড কানাডা,

আমেরিকা, সুইডেন, জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে আসে। মোট আমদানীর মধ্যে ৩৩৯.৭ কোটি টাকার (শতকরা ৪০ ভাগ) শিল্পজাতদ্রব্য ২৬২.০ কোটি টাকার (শতকরা ৩০ ভাগ) খাদ্য এবং ২৫৩.০ কোটি টাকার (শতকরা ২৯.৪ ভাগ) কাঁচা মাল ছিল।

বিভিন্ন দেশের সহিত ব্যবসায়ঃ ইংলণ্ড ভারতবর্ষে সুতির কাপড়, যন্ত্রপাতি, ঔষধ, ধাতব দ্রব্য, খাদ্য, রং, চামড়া পাকা করিবার সরঞ্জাম, কাগজ, রবারের দ্রব্য, তামাক ইত্যাদি রপ্তানী করে। ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড পাট ও পাটজাতদ্রব্য, চামড়া, তুলা, তৈলবীজ, চীনাবাদাম, চা, পশম ও পশমী জিনিষ, চা, নারিকেলের ছোবড়াজাত জিনিষ, কফি, গালা, রবার প্রভৃতি কেনে। অনেক জিনিষেরই ইংলণ্ড আমাদের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ খরিদ্দার।

আমেরিকা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। গালা, চামড়া, চট আমেরিকাই সবাপেক্ষা অধিক ক্রয় করে। তাহা ছাড়া, তুলা, পশমী জিনিষ, চা, ফল এবং সব্জীও আমেরিকা ক্রয় করে। আমেরিকা হইতে যন্ত্রপাতি, রং ও চামড়ার কাজের জিনিষ, কাগজ, বোর্ড, তুলা, রবারজাত দ্রব্য, তামা, কেরোসিন ও পেট্রোল রপ্তানী হয়।

পাকিস্তানের স্থান তৃতীয়। পাকিস্তান ভারতবর্ষ হইতে কয়লা, কাপড়, লোহা ও ইস্পাত, সরিষার তৈল, চিনি, পাটজাত দ্রব্যাদি ক্রয় করে। পাকিস্তান হইতে আমরা কাঁচা পাট, তুলা, জিপসাম, চামড়া ইত্যাদি ক্রয় করি। বর্মা হইতে চাউল, কেরোসিন তৈল, পেট্রোল, ও সেগুন কাঠ আসে এবং সুতির কাপড়, পাটজাত দ্রব্যাদি, লৌহ ও ইস্পাত, চা, চিনি, কয়লা প্রভৃতি ভারতবর্ষ হইতে ক্রয় করে। বর্মা আমাদের কয়লা এবং সুতির কাপড়ের একজন বড় খরিদ্দার।

জাপান সুতির কাপড়, রেশমী কাপড়, পশমী কাপড়, কাঁচের বাসন, ধাতবদ্রব্য, যন্ত্রপাতি, খেলনা, রবারজাত দ্রব্য, কাগজ ও বোর্ড রপ্তানী করিত। তুলা এবং লোহের জাপানই ছিল বড় খরিদ্দার। তাহা ছাড়া, পাট এবং পাটজাত দ্রব্য, অভ্র, গালা, চামড়া ইত্যাদিও জাপান প্রচুর কিনিত।

জার্মানীর স্থান পঞ্চম ছিল। জার্মানী পাট, তুলা, চীনাবাদাম, খৈল, তিসি, চামড়া, গালা, চা, নারিকেলের ছোবড়াজাত দ্রব্য ইত্যাদি কিনিত। যন্ত্রপাতি, রং, চামড়ার জিনিষ, ঔষধ, ধাতব দ্রব্য, কাগজী বোর্ড, কাচের বাসন, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি রপ্তানী করিত।

ফ্রান্স তুলা, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চীনাবাদাম, চামড়া, কফি, নারিকেলের ছোবড়াত দ্রব্য, গালা ইত্যাদি কিনিত এবং মদ, যন্ত্রপাতি, রং, সুতির কাপড়, ঔষধ, পশমী ও রেশমী জিনিষ, টয়লেট ইত্যাদি রপ্তানী করিত। সোভিয়েট রাসিয়া চায়ের বাক্স ইত্যাদি পাঠাইত এবং পাট, চা প্রভৃতি কিনিত। চীন তুলা, পাট ও পাটজাত দ্রব্য ইত্যাদি কেনে এবং সুতি ও রেশমী কাপড় ইত্যাদি পাঠায়। অস্ট্রেলিয়া পাটের থলি, সুতির কাপড়, চামড়া, চা ইত্যাদি কেনে এবং ঘোড়া, পশম, খাদ্য, গম ইত্যাদি পাঠায়। সিংহল আমাদের প্রতিবেশী দ্বীপ। সিংহল হইতে শুষ্ক নারিকেল, নারিকেলের তৈল, চা, মাছ, বীজ ইত্যাদি আমদানী হয় এবং চাউল, বস্ত্র, কয়লা, দাইল, ফল ইত্যাদি ভারতবর্ষ হইতে ক্রয় করে।

বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত অদৃষ্ট বিষয়ের তালিকা (Invisible items in the balance of trade): যে যে বিষয়ের তালিকা লইয়া বাণিজ্যের উদ্বৃত্তের হিসাব করা হয়, তাহাদিগকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমভাগে পরে যে সমস্ত দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী করা হয়। যেমন ভারত পাট ও পাটজাত দ্রব্য, তুলা ও বস্ত্র, যন্ত্রাদি প্রভৃতি নানাপ্রকারের জিনিষ আমদানী ও রপ্তানী করে। এই জিনিষগুলির তালিকাকে দৃষ্ট বিষয়ের (Visible Items) তালিকা বলা হয়। কারণ ইহাদের হিসাব প্রতিমাসে ও বৎসরে সরকারী দপ্তর হইতে প্রকাশ করা হয়। দ্বিতীয়ভাগে পরে এমন কতকগুলি বিষয় যাহার হিসাব বা তালিকা সরকারী আগমনিগম দপ্তর (Customs Dept.) হইতে প্রকাশ করা হয় না। সেইজন্য দ্বিতীয় বিষয়গুলিকে অদৃষ্ট বিষয়ের (invisible items) তালিকা বলা হয়। যেমন ভারতবর্ষের বাণিজ্যপোতের সংখ্যা খুবই কম বলিয়া আমাদিগকে বহু বিদেশী জাহাজে মাল পাঠাইতে হয় কিংবা মাল আনাইতে হয়। এই বাবদ বিদেশী জাহাজের মালিকদের প্রতি বৎসর অনেক টাকা দিতে হয়। দ্বিতীয়ত, বহু বিদেশী ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী এদেশে ব্যবসা করে এবং তাহাদের পারিশ্রমিক ও মুনাফা বাবদ ভারতের লোককে প্রতি বৎসর অনেক টাকা দিতে হয়। তেমনি প্রতি বৎসর বহু ভারতীয় ছাত্র বিদেশে পড়াশুনা করিতে যায় ও দেশের অর্থ বিদেশে ব্যয় করে। ভারতবর্ষের অনেক লোক আবার বিদেশ ভ্রমণে যাইয়া সেই সব দেশে অর্থব্যয় করিয়া আসেন। এই বাবদ প্রতিবৎসর কিছু কিছু অর্থ

আমাদিগকে বিদেশে পাঠাইতে হয়। অবশ্য অনেক বিদেশীও ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসেন এবং এদেশে অর্থ ব্যয় করেন। সেই বাবদ আমরাও বিদেশ হইতে কিছু টাকা পাই। কোন দেশ যদি বিদেশ হইতে ধার করিয়া থাকে, তবে তাহাকে প্রতি বৎসর সুদ বিদেশে পাঠাইতে হয় ও আসলের কিছু কিছু শোধ দিতে হয়। এই সমস্ত বিষয় বাবদ যে দেনা পাওনার হিসাব করা যায়, তাহাদিগকে অদৃষ্ট বিষয়ের তালিকা বলা হয়।

১৯৫২-৫৩ সালের প্রধান প্রধান আমদানী ও রপ্তানীর তালিকা

(কোটি টাকা মূল্যের)

রপ্তানী

জিনিষ	মূল্য	
পাটজাত দ্রব্য	১২৬·২৫	কোটি
বস্ত্রাদি	৬৪·৮	,,
চা	৮০·১	,,
মসলাপাতি	২০·২	,,
চামড়াজাত দ্রব্য	২০·০	,,
কাঁচা চামড়া	৫·৬	,,
তৈল	২১·৯	,,
তূলা	২৮·৮	,,
তামাক	১২·৮	,,
ফল ও তরকারী	১৫·৫	,,
লাক্ষা প্রভৃতি	৮·২	,,
ধাতু দ্রব্যাদি	৩৬·৯৯	,,
তৈলবীজ	৪·৫৫	,,
পশম প্রভৃতি	৮·৪২	,,

আমদানী

খাদ্যশস্য	১৫২·৭২	কোটি
তূলা	৭৬·৭৮	,,
যন্ত্রাদি	৮৭·৮	,,
তৈল	৮১·৭৮	,,
ঔষধপত্রাদি	২৭·৮৮	,,
গাড়ী	২৮·০৫	,,
লৌহ ও লৌহ নির্মিত দ্রব্যাদি	২৩·৭	,,
অন্যান্য ধাতুজাত দ্রব্যাদি	১৯·৩৭	,,
কাগজপত্র	১২·৭৯	,,
হার্ডওয়ার কাটলারী	১৮·২৬	,,
রং	১০·৪২	,,
সূতা ও বস্ত্র	৪·৯৯	,,
উলের কাপড়	৬·৭২	,,
ইলেক্ট্রিকের জিনিষ	১৩·৮১	,,
তামাক প্রভৃতি	১·৮০	,,

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মুদ্রানীতি ও ব্যাঙ্কিং

মুদ্রাঃ টাকাই ভারতবর্ষের মুদ্রার মান। যুদ্ধের পূর্বে রৌপ্য টাকার ওজন ছিল ১৮০ গ্রেন, তাহার মধ্যে ১৬০ গ্রেন রূপা ও ২০ গ্রেন খাদ ছিল। এখনকার টাকায় রূপা একেবারেই নাই। উহা প্রধানত নিকেল দিয়া প্রস্তুত। এক টাকার নোটও প্রচলিত আছে।

সরকার আধুলি, সিকি, দু'আনি, এক আনি, আধ আনি ও এক পয়সার মুদ্রা তৈয়ারী করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখা ও সরকারী কোষাগার হইতে লোকের প্রয়োজন মত এই সমস্ত মুদ্রা দেওয়া হয়।

কাগজী অর্থঃ আমাদের দেশে কাগজী অর্থ চালু আছে। ইহা পরিবর্তনীয় কাগজী অর্থ। পূর্বে ইহা ভারত সরকার ইস্যু করিত। এখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কই ইহা চালু করিবার একমাত্র অধিকারী। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইহার পরিবর্তে টাকা না দিতে পারিলে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিবে বলিয়া আশ্বাস দেওয়া আছে। ২৲, ৫৲, ১০৲, ৫০৲, ১০০৲ টাকার কাগজী অর্থ এখন চালু আছে। ১০০৲ টাকা অপেক্ষা বড় নোট বিহিত অর্থ নহে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই নোটের জন্য নগদ টাকা ও স্বর্ণ এবং স্টার্লিং জমা রাখে। আইন অনুসারে মোট চালু নোটের অন্তত ৪০ ভাগ মূল্যের স্বর্ণ অথবা স্টার্লিং জমা রাখিতে হইবে। যে পরিমাণ স্বর্ণ তহবিলে রাখা হইবে তাহার মূল্য কখনই চল্লিশ কোটি টাকার কম হইবে না। বাকি মূল্যের টাকা এবং জাতীয় সরকারের ঋণপত্র জমা রাখা চলিবে।

১৯৪৯ সালের ২৭শে মে মোট চালু কাগজী অর্থের পরিমাণ ছিল ১১৭৮·৩৭ কোটি টাকা। সংরক্ষিত তহবিলে ৭০·০২ কোটি টাকার স্বর্ণ ও স্বর্ণ মুদ্রা, ব্রিটিশ সরকারের স্টার্লিং ঋণপত্রী ৭১০·৩৭ কোটি টাকার, ৪৭·০৪ কোটি টাকার রৌপ্যমুদ্রা এবং ৪১৩·৭২ কোটি টাকার ভারত সরকারের ঋণপত্র ছিল।

বর্তমান মুদ্রানীতি: ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক আর্থিক ভাণ্ডারের সভ্য হইয়াছে। টাকার সহিত ডলার ও স্টার্লিং কত হারে বিনিময় হইবে, তাহা সরকার নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। টাকার স্টার্লিং বিনিময়ের হার টাকা প্রতি ১ শিলিং ৬ পেন্স। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সকলের নিকট হইতেই এই হারে স্টার্লিং কিনিবে ও বেচিবে। ইহা ছাড়া টাকার বিনিময়ে অন্যান্য বিদেশী মুদ্রাও নির্দিষ্ট হারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে পাওয়া যাইতেছে।

স্বর্ণবিনিময় মান (Gold Exchange Standard): স্বর্ণবিনিময় মান স্বর্ণ মানের একটি শ্রেণী বিশেষ। কোন দেশে স্বর্ণবিনিময় মান থাকিতে হইলে সেই দেশের মুদ্রাব্যবস্থার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। প্রথমত, সে দেশের মধ্যে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন থাকিবে না এবং অন্যান্য ধাতুমুদ্রা কিংবা কাগজীমুদ্রার প্রচলন থাকিবে। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য মুদ্রা বা কাগজীমুদ্রার বিনিময়ে বিদেশে একটি নির্দিষ্ট মূল্যে স্বর্ণ ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা সরকার হইতে করিতে হইবে। সরকার কিংবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের মধ্যে স্বর্ণ ক্রয় বিক্রয় করিবে না। কিন্তু বিদেশে করিতে রাজী থাকিবে। তৃতীয়ত, এই ব্যবস্থা চালু রাখিবার জন্য কোন একটি বিদেশে সংরক্ষিত তহবিলে কিছু স্বর্ণ জমা রাখা হয়। অবশ্য যে দেশে এই তহবিল রাখা হইবে সেখানে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি থাকিলে সে দেশের মুদ্রাব্যবস্থাকে স্বর্ণবিনিময় মান বলা হয়।

ভারতবর্ষে ১৯০০ সাল হইতে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত স্বর্ণ বিনিময় মান বহাল ছিল। এই সময় দেশের অভ্যন্তরে স্বর্ণমুদ্রার বিশেষ প্রচলন ছিল না। রূপার টাকা ও কাগজী নোট বাজারে চালু ছিল। কিন্তু ইহার বিনিময়ে ভারত সরকার এক পাউণ্ড ১৫৲ টাকা হিসাবে লণ্ডনে স্বর্ণ ক্রয়বিক্রয় করিতেন। ইংলণ্ডে এই সময়ে স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল ও এক পাউণ্ডের বদলে সেই মূল্যের সোনা পাওয়া যাইত। ভারতীয় টাকা দিয়া কেহ যদি তখন সোনা কিনিতে চাহিত তবে তাহাকে লণ্ডনে ভারত সরকারের সংরক্ষিত তহবিল হইতে সোনা দেওয়া হইত। এই তহবিলকে স্বর্ণমান তহবিল (Gold Standard Reserve) বলা হইত। ১৯১৭ সালে নানা কারণে ভারত সরকার এই ব্যবস্থা প্রচলিত রাখিতে অক্ষম হইয়া পড়ায় ইহা তুলিয়া দেওয়া হয়।

M. B. B. College Library.
Agartala. Tripura State

ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবাসী ব্যাঙ্কিং কারবারে অভ্যস্ত। ব্যাঙ্কারদিগকে শ্রেষ্ঠি অথবা চেটি বলা হইত। তাহারা সর্বত্র সম্মানিত হইত। আধুনিক পদ্ধতিতে ব্যাঙ্কিং আরম্ভ হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। বর্তমান ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, যৌথমূলধনী ব্যাঙ্ক এবং কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান আছে।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। ১৯৩৫ সালে ইহা স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে এই ব্যাঙ্কের মালিক কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট। একটি কেন্দ্রীয় পরিচালকসংঘ ব্যাঙ্কের কার্য পরিচালনা করে। এই সংঘের চৌদ্দ জন সভ্য আছে। রাষ্ট্রপাল সংঘের সভ্যদের নিযুক্ত করেন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কাগজী অর্থ চালু করিবার একমাত্র অধিকারী। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারের ব্যাঙ্ক। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের সব অর্থ এই ব্যাঙ্কে জমা থাকে। ইহা অন্যান্য যৌথ ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্কার। তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের চলতি আমানতের শতকরা পাঁচ ভাগ এবং স্থায়ী আমানতের শতকরা দুইভাগ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে সর্বদাই জমা রাখিতে হয়। প্রয়োজন হইলে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট ধার লইতে পারে।

ভারতবর্ষে বহু যৌথ ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আছে। তাহার মধ্যে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক সর্বাপেক্ষা বড়। যেখানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখা নাই সেখানে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে। বাঙ্গালীদের ব্যাঙ্কের মধ্যেই কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এবং বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কই সর্বাপেক্ষা বড় ব্যাঙ্ক ছিল। বর্তমানে এই ব্যাঙ্কগুলি সম্মিলিত করিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া নামে একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক প্রভৃতি বড়। ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি জনসাধারণের নিকট হইতে টাকা জমা রাখে এবং জামানত রাখিয়া ব্যবসায়ীদের টাকা ধার দেয়, বিল এবং হুণ্ডি বাটার (Discount) কাজ করে, সুরক্ষিতভাবে রাখিবার জন্য অলঙ্কার এবং দলিলপত্র জমা রাখে।

আর এক শ্রেণীর ব্যাঙ্ক আছে। তাহাদিগকে বিনিময় ব্যাঙ্ক বলে

(Exchange Banks)। তাহারা বৈদেশিক মুদ্রা বেচা-কেনা করে এবং বৈদেশিক বিল বাটার (Discount) কাজ করে। এই ব্যাঙ্কগুলির সবই বিদেশী এবং ইহাদের প্রধান কার্যালয় বিদেশে অবস্থিত।

উপরে যে সকল ব্যাঙ্কের বর্ণনা করা হইল, তাহা আধুনিক পদ্ধতিতে পরিচালিত। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ব্যাঙ্কের কাজ হইয়া আসিতেছে। এইগুলিকে দেশী ব্যাঙ্ক বলে। এই ব্যাঙ্কগুলিকে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত আধুনিক ব্যাঙ্ক হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখা হয়। দেশী ব্যাঙ্কারগণ বহু নামে পরিচিত—যথা শ্রেষ্ঠী, সাহুকার, শ্রফ, চেট্টি ইত্যাদি। দেশী ব্যাঙ্কগুলি পারিবারিক প্রতিষ্ঠান। নিজেদের মূলধন লইয়া ইহারা ব্যবসায় করে; লোককে টাকা ধার দেয় ও হুণ্ডি বাটার (Discount) কাজ করে।

পোস্ট অফিসের সেভিংস ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক, জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানও এদেশে আছে। ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কে লোক টাকা জমা রাখিতে পারে। কিন্তু এখান হইতে ধার দেওয়া হয় না। সমবায়ব্যাঙ্ক ১৯০৪ সাল হইতে গঠিত হইয়াছে। কৃষক, শ্রমিক বা বেতনভোগী লোকদের ধার দিবার জন্য গ্রামে এবং শহরে প্রাথমিক সমবায়সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এই সব ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র সভ্যদেরই টাকা ধার দেয়। প্রত্যেক জেলায় অথবা পরগণার প্রধান যায়গায় একটি করিয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক আছে। প্রাথমিক ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে ধার পায়।

কোন কোন জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কও স্থাপিত হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কগুলিও সমবায়নীতিতে গঠিত। জমি বন্ধক রাখিয়া ইহারা টাকা ধার দেয়।

উপরে নানারূপ ব্যাঙ্কের বর্ণনা করা হইল। তৎসত্ত্বেও বলিতে হইবে যে আমাদের দেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা নিতান্তই কম। জনসংখ্যার তুলনায় ইংলণ্ড, আমেরিকা বা কানাডায় অনেক বেশী ব্যাঙ্ক আছে। মাথাপিছু আমানতও আমাদের দেশে খুব কম। প্রকৃতপক্ষে গ্রামে সঞ্চিত টাকা জমা রাখিবার মত কোন ব্যাঙ্ক নাই। কয়েকটি শহরে যৌথ ব্যাঙ্কিং কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত আছে। আমাদের দেশে আরও বহু ব্যাঙ্কের প্রয়োজন আছে। তবে ব্যাঙ্কগুলি দৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপিত করিতে হইবে। গত যুদ্ধের সময় বহু ব্যাঙ্ক নানা কারণে উঠিয়া গিয়াছে। পরিচালনার ত্রুটিই তাহার প্রধান কারণ। রিজার্ভ

ব্যাঙ্ককে আরও ব্যাপক ক্ষমতা দিলে এই সব ব্যাঙ্কের পরিচালনার উপরে দৃষ্টি রাখা সম্ভব হইবে।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঃ ১৯৩৫ সালে এই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। এই ব্যাঙ্ক জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া গঠিত হইয়াছিল। প্রত্যেক শেয়ারের দাম ১০০৲ টাকা এবং মোট মূলধন ৫ কোটি টাকা। বর্তমান সব শেয়ারই ভারত সরকার ক্রয় করিয়াছে। এই ব্যাঙ্ক এখন রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক। কেন্দ্রীয় পরিচালকসংঘ এই ব্যাঙ্ক পরিচালনা করে। এই সংঘের সভ্যসংখ্যা ১৪ জন। রাষ্ট্রপাল একজন গভর্ণর এবং দুইজন ডেপুটি গভর্ণর ও দশজন পরিচালক ও একজন সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত করেন। গভর্ণরই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রধান কর্মকর্তা। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং দিল্লীতে চারিটি স্থানীয় সমিতি আছে। কেন্দ্রীয়সংঘ কিছু কিছু কাজ এই স্থানীয়সমিতির হস্তে ছাড়িয়া দেয়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বহুপ্রকার কাজ করে। ভারতবর্ষের মুদ্রানীতি পরিচালনা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ। ইহা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে কতকগুলি কাজের ভার দেওয়া হইয়াছে। প্রথম, কাগজী নোট প্রচলন করিবার ক্ষমতা একমাত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্কেরই আছে। মোট চালু নোটের শতকরা অন্তত ৪০ ভাগ স্বর্ণ এবং স্টার্লিংএ এবং বাকী সরকারী ঋণপত্র, রৌপ্যমুদ্রা প্রভৃতিতে রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারী ব্যাঙ্কার। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার তাহাদের সব অর্থ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা রাখে। প্রয়োজন হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সাধারণের নিকট হইতে সরকারী ঋণ তুলিবার ব্যবস্থা করে, এবং সরকারকে টাকা ধার দেয়। তৃতীয়ত, দেশের অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্কারও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। যে সকল ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন এবং সংরক্ষিত তহবিল মিলাইয়া পাঁচ লক্ষ টাকা বা ততোধিক হয়, তাহারা তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক হইবার অধিকারী। প্রত্যেক তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক তাহাদের চলতি আমানতের শতকরা ৫ ভাগ এবং স্থায়ী আমানতের শতকরা ২ ভাগ অর্থ সর্বদা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে বাধ্য। প্রয়োজন হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ইহারা টাকা ধার পায়। চতুর্থত, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকার বিনিময়ে স্টার্লিং কেনাবেচা করে। বিনিময় হার এক টাকায় এক শিলিং ছয় পেন্স। বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ডলার ও অন্যান্য বিদেশী

মুদ্রাও নির্দিষ্ট হারে কেনাবেচা করে। পঞ্চমত, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বোম্বাই, মাদ্রাজ, এবং দিল্লীতে চেক-বিনিময়-কেন্দ্রের কাজ করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি কৃষিঋণবিভাগ আছে। কৃষকদিগকে ঋণ দেওয়া সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় লইয়া এই বিভাগ আলোচনা করে।

ইহা ছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিনাসুদে টাকা আমানত রাখিতে পারে এবং বিশেষ কতকগুলি সর্তে টাকা ধার দিতেও পারে।

জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক (Land Mortgage Bank): নাম হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই ব্যাঙ্ক জমি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেয়। পুষ্করিণী খনন, নলকূপ খনন প্রভৃতি জমির উন্নতিকর কার্যের জন্য কৃষকের অর্থের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাহাদের উদ্বৃত্ত অর্থ প্রায়ই থাকে না বলিয়া ইহার জন্য টাকা ধার না করিয়া উপায় নাই। সাধারণ ব্যাঙ্ক অথবা সমবায়ব্যাঙ্কগুলি দীর্ঘদিনের মেয়াদে টাকা ধার দিতে পারে না। এই কারণে এই বিশেষ শ্রেণীর ব্যাঙ্ক স্থাপন প্রয়োজন হয়।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাহা ফেল হয়। পরবর্তী ব্যাঙ্ক ১৯২০ সালে পাঞ্জাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাজ ও বোম্বাই রাজ্যেও এই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে, এবং এই দুইটি রাজ্যে বন্ধকী ব্যাঙ্ক দ্রুত প্রসার লাভ করিয়াছে। অনেক রাজ্যে কেন্দ্রীয় জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক এবং প্রাথমিক বন্ধকী ব্যাঙ্ক আছে। অবিভক্ত বাংলা সরকার পরীক্ষা-মূলকভাবে পাঁচটি ব্যাঙ্ক স্থাপিত করিয়াছিল। আসামে ৪টি এবং মধ্যপ্রদেশে ২টি জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক আছে।

জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক তিন প্রকারে গঠন করা যায়। প্রথম, সমবায়নীতিতে ইহা গঠিত হইতে পারে। কোন এক অঞ্চলের কৃষকেরা শেয়ার কিনিয়া নিজেদের জন্য একটি ব্যাঙ্ক স্থাপিত করিতে পারে। ভারতবর্ষে এই ভাবেই প্রাথমিক বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, সাধারণ যৌথকোম্পানী যে ভাবে সাধারণের মধ্যে শেয়ার বিক্রয় করিয়া গঠিত হয়, সেই ভাবেও এই ব্যাঙ্ক স্থাপন করা যায়। আবার উপরোক্ত দুইটি পন্থা মিলাইয়াও এই ব্যাঙ্ক গঠন করা যায়। কেন্দ্রীয় বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি এইভাবে গঠিত। প্রাথমিক বন্ধকী ব্যাঙ্ক এবং জনসাধারণ, উভয়েই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের শেয়ার কিনিয়াছে।

এই ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ দীর্ঘদিনের মেয়াদে চাষীদের টাকা ধার দেওয়া।

প্রত্যেক সভ্য জমির স্থায়ী উন্নতি করিবার জন্য, পুরাতন ঋণ শোধ করিরার জন্য এবং নূতন জমি কিনিবার জন্য জমি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার করিতে পারে। প্রত্যেক খাতককে তাহার জমি ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখিতে হইবে। বন্ধকী জমির দামের শতকরা ৫০ ভাগের বেশী ব্যাঙ্ক ধার দিবে না। অনেক ক্ষেত্রে একজন খাতককে পাঁচ হাজার টাকার বেশী ধার দেওয়া হয় না। অল্প কিস্তিতে বিশ বছরের মধ্যে এই ঋণ শোধ দিতে হয়। চাষীদের ধার দিবার মত টাকা সংগ্রহ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি ডিবেঞ্চার বা ঋণপত্র বিক্রয় করিতে পারে। সরকার এই ঋণপত্র ও সুদ শোধ দিবার নিশ্চয়তা দেয় বলিয়া লোকে তাহা ক্রয় করে।

বোম্বাই ও মাদ্রাজে এই ব্যাঙ্ক কিছু সাফল্য অর্জন করিয়াছে। কিন্তু এই ব্যাঙ্কের সংখ্যা অত্যন্ত কম। কেবলমাত্র পুরাতন ঋণ শোধ করিবার জন্যই অনেক ব্যাঙ্ক টাকা ধার দিয়াছে। জমির স্থায়ী উন্নতিকল্পে টাকা ধার দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

দেশী ব্যাঙ্ক (Indigenous Bankers) : এই ব্যাঙ্কগুলি প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া কারবার করে। এই ব্যাঙ্ক বহু নামে পরিচিত, যথা, শেঠ, সাহুকার, মহাজন, চেট্টি ইত্যাদি। আধুনিক ব্যাঙ্কের মত দেশী ব্যাঙ্ক যৌথ-পদ্ধতিতে গঠিত নহে। সাধারণত ইহা ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ব্যবসায়। ইহারা নিজেদের মূলধন লোককে ধার দেয়। সাধারণ ব্যাঙ্কের মত ইহারা টাকা আমানত রাখে, কিন্তু চেক-বই দেয় না। যাহারা ব্যবসায় করে, অথবা ছোটখাট শিল্প পরিচালনা করে, ইহারা তাহাদের টাকা ধার দেয়। মফঃস্বল হইতে শহরে শস্য আমদানী করিবার জন্যও ইহারা টাকা ধার দেয়। হুণ্ডি কাটা বা উহার বাটা দেওয়া (Discount) ইহাদের অন্যতম কাজ। অনেক সময়ে ইহারা কোন বিশেষ জামানত না রাখিয়াও টাকা ধার দেয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের ব্যাঙ্কের কাজ ইহারাই করে।

বিনিময় ব্যাঙ্ক (Exchange Bank) : যে সকল বৈদেশিক ব্যাঙ্ক বৈদেশিক বাণিজ্যে টাকা লেনদেন করিবার জন্য আমাদের দেশে শাখা খুলিয়াছে, তাহাদের বিনিময় ব্যাঙ্ক বলা হয়। এই ব্যাঙ্কের মালিকানা এবং পরিচালনা বিদেশীদের হস্তে। সাধারণ ব্যাঙ্কের মতই এই ব্যাঙ্কগুলি লোকের টাকা আমানত রাখে এবং লোককে টাকা ধার দেয়। যাহারা

বৈদেশিক বাণিজ্যে নিযুক্ত আছে, তাহাদেরই সাধারণত এই ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার দেওয়া হয়। যাহারা পণ্য আমদানী বা রপ্তানী করে, তাহাদের বিলে বাটা লইয়া টাকা দেওয়া এই সব ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ। ইদানীং এই ব্যাঙ্ক হইতে আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিযুক্ত লোকদেরও টাকা ধার দেওয়া হইতেছে। এই ব্যাঙ্কের মালিক বিদেশী, কাজেই আমাদের দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় ইহা অবাঞ্ছনীয়। ভারতীয় বড় বড় ব্যাঙ্কগুলির এই ধরণের ব্যবসায় আরম্ভ করা উচিত। · একটি বিনিময়-ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে সরকারের সাহায্য করা উচিত। তাহা হইলে বৈদেশিক বিনিময়ের সব লাভ ভারতীয়েরাই পাইবে।

শিল্পীয় ব্যাঙ্ক (Industrial Bank): শ্রমশিল্পের পরিচালনার জন্য মূলধনের প্রয়োজন হয়। যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে দুই শ্রেণীর মূলধন প্রয়োজন। প্রথমে কারখানা নির্মাণ করা চাই, যন্ত্রপাতি ক্রয় করা চাই। ইহার জন্য দীর্ঘ দিনের মেয়াদী মূলধন প্রয়োজন অর্থাৎ এই মূলধন একবার লগ্নী করিলে ইহা সম্পূর্ণ তুলিতে বহু সময় লাগিবে। দ্বিতীয়ত, কাঁচা মাল কিনিবার জন্য ও শ্রমিকদের মজুরী দিবার জন্য মূলধনের প্রয়োজন আছে। ইহার জন্য অল্প দিনের মেয়াদী মূলধন পাইলেই চলিবে। কারণ কাঁচামালে ও মজুরীতে যে মূলধন লগ্নী থাকে, তাহা উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া তোলা সম্ভব হয়। উদ্যোক্তা হয়ত এই দুই শ্রেণীর মূলধন সংগ্রহ করিবার মত অর্থ নিজেই দিতে পারে। কিন্তু তাহা সম্ভব হয় না। কারণ শিল্প পরিচালনায় প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয় এবং তাহা এক জনের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নহে। যৌথ প্রতিষ্ঠান সংগঠন করিয়া বাজারে শেয়ার বিক্রয় করিয়া সাধারণত মূলধন সংগ্রহ করা হয়। আবার অনেক সময়ে অল্পমেয়াদী মূলধন ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ধার লওয়া হয়।

শিল্প পরিচালনার জন্য মূলধন সংগ্রহ করিতে গিয়া আমাদের দেশের উদ্যোক্তাদের নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। তাহার প্রধান কারণ শেয়ার বিক্রয় করিয়া বেশী মূলধন সংগ্রহ করা প্রায়ই সম্ভব হয় না। এদেশের ধনী লোকেরা শেয়ার কিনিতে বিশেষ ইচ্ছুক নহেন। তাঁহারা কোম্পানীর কাগজ কিংবা জমিতে টাকা লগ্নী করা পছন্দ করেন। ব্যাঙ্কের নিকট টাকা ধার লইতে গেলেও অসুবিধা অনেক। প্রথমত, ব্যাঙ্কগুলি দীর্ঘ দিনের

মেয়াদী ঋণ দেয় না। তাহারা যে ঋণ দেয়, তাহা তিন চার মাস কি বড় জোর ছয় মাসের মধ্যে শোধ দিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্কগুলি অনেক সময়ে উচ্চ হারে সুদ দাবী করে। এই সর্তে সম্মত হইলে ব্যবসায়ীদের বিশেষ কিছুই লাভ থাকে না। তাহা ছাড়া, ব্যাঙ্ক অনেক সময়ে টাকা ধার দিবার পূর্বে কঠিন কঠিন সর্তপূরণের দাবী করে, যে দাবী মেটান উদ্যোক্তার পক্ষে সম্ভব নাও হইতে পারে। অনেক ব্যবসায়ী দেশীয় ব্যাঙ্কারের নিকট টাকা ধার করে। কিন্তু তাহাদের খুব উচ্চ হারে সুদ দিতে হয়। আহমাদাবাদে ও বোম্বাইএ অনেক কাপড়ের কলের মালিক জনসাধারণের নিকট হইতে টাকা আমানত লয়। কিন্তু এ ব্যবস্থা মঙ্গলদায়ক নয় এবং যত শীঘ্র সম্ভব ইহা পরিত্যাগ করা উচিত।

শিল্পপরিচালনার জন্য মূলধন সংগ্রহের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য শিল্পীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার কথা অনেক দিন ধরিয়াই হইতেছে। ১৯১৮ সালের শিল্প কমিসন সর্বপ্রথম এই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সুপারিস করে। এই ব্যাঙ্কের কাজ হইবে শিল্পপতিদের দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেওয়া। ১৯৪৮ সালে ভারত সরকার এইরূপ একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার জন্য আইন পাস করিয়াছে। এই আইনে "শিল্পীয় মূলধন-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান" (Industrial Finance Corporation) গঠন করা হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের মূলধন মোট ১০ কোটি টাকা। ভারত সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, যৌথ ব্যাঙ্কিং কোম্পানীগুলি ও অন্যান্য সেই সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ইহার শেয়ার ক্রয় করিয়াছে। ইহার কার্যের উপরে ভারত-সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে। এই প্রতিষ্ঠান বাজারে ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিতে পারিবে। এই ডিবেঞ্চারের দেয় সুদ ও আসল সম্বন্ধে ভারতসরকারের গ্যারান্টি থাকিবে। ইহা দীর্ঘ দিনের মেয়াদী আমানত লইতে পারে। ইহার প্রধান কাজ হইবে উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনমত ঋণ দেওয়া। এই ঋণ শোধ করিবার জন্য দীর্ঘ, এমন কি ২০ বৎসর পর্যন্ত সময় দেওয়া হইবে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

বণ্টন

ভারতের জাতীয় আয়ঃ দেশের সমস্ত লোকের আয়ের উৎস জাতীয় আয়। জাতীয় আয় যে ভাবে লোকের মধ্যে ভাগ হয়, তাহার উপরেই দেশের আর্থিক স্বাচ্ছল্য নির্ভর করে। এই আয় যত বেশী হয়, লোকের স্বাচ্ছল্যও তত বাড়ে। যে ভাবে এই জাতীয় আয় লোকের মধ্যে ভাগ হয়, তাহার উপরেও তাহাদের স্বাচ্ছল্য অনেকখানি নির্ভর করে। বণ্টন যদি ন্যায্য হয়, তাহা হইলে লোকের আর্থিক অবস্থা সত্যই ভাল হইবে। দেশের লোকের আর্থিক অবস্থা কিরূপ তাহা ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়। অন্য দেশের সহিত তুলনা করিলে আমাদের অবস্থা কি তাহা ভাল বুঝিতে পারা যাইবে।

মোট জাতীয় আয়কে দেশের লোকসংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে আমরা জনপ্রতি আয় কত জানিতে পারি। ভারতের মাথা পিছু আয় কত তাহা স্থির করিবার চেষ্টা মাঝে মাঝে হইয়াছে। দাদাভাই নওরোজী ১৮৭০ সালে প্রথম এই চেষ্টা করেন। তাঁহার হিসাব অনুসারে ভারতীয়দের মাথাপিছু আয় বৎসরে কুড়ি টাকা মাত্র। ১৯০১ সালে লর্ড কার্জন হিসাব করিয়া বলেন যে, এই আয় বৎসরে ৩০ টাকা। অধ্যাপক ওয়াদিয়া এবং যোশী বার বৎসর পরে হিসাব করিয়া বলেন যে, মাথা-পিছু আয় চুয়াল্লিশ টাকা। ১৯১২ সালে মিঃ ফিন্‌ড্‌লে সিরাস একটি হিসাব করেন। তাঁহার মতে মাথা-পিছু আয় ১১৬ টাকা হইয়াছে। ইদানীং ডক্টর ভি, কে, আর, ভি, রাও একটি হিসাব করিয়াছেন। তিনি বলেন, ১৩৩১-৩২ সালে ভারতীয়দের মাথা পিছু আয় ৬৫ টাকার অধিক ছিল না। তালিকা করিলে হিসাবটি এইরূপ দাঁড়ায়।

সাল	হিসাবকারক	মাথা পিছু বাৎসরিক আয়
১৮৭০	দাদাভাই নওরোজী	২০ টাকা
১৯০১	লর্ড কার্জন	৩০ „
১৯১৩-১৪	অধ্যাপক ওয়াদিয়া এবং যোশী	৪৪ „

সাল	হিসাবকারক	মাথা পিছু বাৎসারিক আয়
১৯২২	মিঃ সিরাস	১১৬ "
১৯৩১-৩২	ডক্টর রাও	৬৫ "
১৯৪৮	রাষ্ট্রীয় আয় সমিতি	২৫৫ "

এই হিসাব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। এই হিসাব নির্ভুল নহে, কারণ জাতীয় আয় নির্ধারণ করিবার মত সব পরিসংখ্যান (Statistics) পাইবার উপায় নাই। অনেক সময়েই এই পরিসংখ্যান নির্ভরযোগ্য নহে। কাজেই জাতীয় আয়ের উপরোক্ত হিসাব একেবারে নির্ভুল মনে করিবার কারণ নাই। তাহা ছাড়া জাতীয় আয় ২০ টাকা হইতে ৬৫ টাকাতে উঠিয়াছে বলিয়া আমাদের দেশের আর্থিক উন্নতি হইয়াছে মনে করিবার কারণ নাই। ইতিমধ্যে টাকার দামও বহুগুণ কমিয়া গিয়াছে। কাজেই বেশী আয় হইলেই যে লোকের অবস্থা ভাল হইবে তাহা বলা যায় না।

আমরা যে অত্যন্ত গরীব তাহা উপরের হিসাব হইতে বুঝিতে পারা যায়। ভারতীয়দের গড়ে মাসিক আয় ২০ টাকা ৪ আনা মাত্র। আমেরিকানদের আয় ১৭১৲ টাকা, ইংরেজদের আয় ৯১৲ টাকা এবং জাপানীদের আয় ২২৷৷০ টাকা। আমরা যে কত দরিদ্র তাহা ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। এই সামান্য আয়ও আবার সকলের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করা হয় নাই। অধ্যাপক শাহ এবং শ্রীমতী খাম্বাটা হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে, মোট জাতীয় আয়ের এক-তৃতীয়াংশ শতকরা পাঁচজন লোকের পেটে যায়। শতকরা ষাটজন আর এক-তৃতীয়াংশ পায়। আমাদের দেশের জনসাধারণ যে নিতান্ত দরিদ্র ইহাতে আর আশ্চর্য কি? জাতীয় আয়ের ভাগ পাঁচটাকা সাড়ে ছয় আনাও তাহাদের ভাগ্যে জোটে না, কারণ উহার মোটা অংশ যায় ধনীদের গহ্বরে।

দারিদ্র্যের কারণঃ আমাদের দেশ অতি দরিদ্র। এই দারিদ্র্যের কারণ কিছু সামাজিক, ও কিছু অর্থনৈতিক। সামাজিক প্রথা অনুযায়ী বিবাহ, শ্রাদ্ধাদিতে আমাদের বহু অর্থব্যয় করিতে হয়। এইসব ক্রিয়াকর্মে বহু লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে হয়। এইভাবে সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হয়। অনেক সময়ে আবার ধারও করিতে হয়। এই প্রথা একান্ত নিন্দনীয়। একান্ত ভূমিনির্ভরতা, জমির কম উৎপাদন, অনগ্রসর শিল্প এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধি—এইগুলি

দারিদ্র্যের অর্থনৈতিক কারণ বলা যায়। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, আমাদের দেশের শতকরা ৬৬ জন লোক কৃষিজীবি ও কৃষিজীবির সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। কাজেই প্রত্যেকের জন্য চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমিতেছে। আমাদের দেশে উত্তরাধিকার আইনের জন্য জমি খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িতেছে। ক্ষেতের আকার ছোট হইলে তাহাতে ফসল কম হইবে। আমাদের দেশে বিঘা প্রতি ফসল সর্বাপেক্ষা কম হয়। জাপানে প্রতি বিঘায় যে চাউল হয়, তাহা অবিভক্ত বাংলাদেশের তিনগুণ। চীনের জনসংখ্যা ভারতবর্ষের মতই বেশী। কিন্তু চীনে প্রতি বিঘায় পশ্চিমবাংলার দ্বিগুণ ধান হয়। ফসল কম হইলে আয় কম হইবে। বছরের সব ফসলের যে দাম পাওয়া যায়, তাহার মাথা পিছু হিসাব করিলে চাষীর আয় বৎসরে মাত্র ৪৩ টাকা পড়ে। অর্থাৎ মাসিক আয় সাড়ে তিন টাকার মত দাঁড়ায়। গ্রামের শিল্প লোপ পাওয়াতে কৃষকদের বাড়তি আয়ের কোনই পথ নাই। এই সামান্য আয় হইতে কৃষককে জমিদারের খাজনা ও মহাজনের সুদ যোগাইতে হয়। যাহারা কৃষিজীবি ও যাহাদের আয়ের পরিমাণ ইহাই, তাহারা যে ঘোর দারিদ্র্যে কালাতিপাত করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি ?

দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় শিল্প প্রতিষ্ঠা কিছুই হয় নাই বলা যায়। শিল্প অনগ্রসর থাকাতে শ্রমিকেরা মজুরী কম পায়। অন্যান্য লোকেরও আয় কম হয়। আরও শিল্প না বাড়িলে দেশের লোকের ভূমিনির্ভরতা দূর করা যাইবে না। অনেকে বলেন যে, ভারতবর্ষে এই অপরিসীম দারিদ্র্যের মূলে রহিয়াছে জনসংখ্যাবৃদ্ধি। "বিয়ে হলে, পুত্রকন্যা আসে যেন প্রবল বন্যা"। সাধারণ পরিবারের সকল আর্থিক উন্নতির পথে বাধা হয় ক্রমবর্ধমান পোষ্য-সংখ্যা। কেন এই জনসংখ্যা বাড়িতেছে তাহা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। আমাদের দেশের জনসংখ্যবৃদ্ধি আমাদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। আমাদের সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার করিতে পারিলে আমাদের দেশের জনসংখ্যা বেশী হইলেও তাহাদের সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখা যাইবে। কিন্তু জনসংখ্যাবৃদ্ধি রোধ করিতে না পারিলে দারিদ্র্যসমস্যা সমাধান করা কঠিন হইবে, একথাও স্বীকার্য।

এতদিন আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা না থাকাতে আমাদের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, একথাও স্বীকার করিতে হইবে। এই দারিদ্র্য সমস্যা দূর করিতে

হইলে আমাদের সামাজিক কুপ্রথাগুলি দূর করিতে হইবে এবং অর্থনৈতিক ভিত্তির মৌলিক পরিবর্তন করিতে হইবে। বিদেশী সরকারের উপরে দেশের লোকের বিশ্বাস ছিল না, কাজেই তাহাদের পক্ষে কোন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। তাহা ছাড়া পূর্বে জনসাধারণের প্রতি ভারত সরকারের সহানুভূতি একান্ত অভাব ছিল। আমাদের দেশে শিল্প গড়িয়া তুলিতে পূর্বতন ভারত সরকার কোনই চেষ্টা করে নাই। একে একে আমাদের কুটির শিল্প লোপ পাইয়াছে, সরকার তখন নির্বাক দর্শক ছিল। অনেক সময়েই সরকারের আইনের জন্যই তাহা লোপ পাইয়াছে। ইদানীং অবশ্য কুটিরশিল্প পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিলে কোনই লাভ হয় না। কৃষির উন্নতির জন্যও পূর্বে সরকারের বিশেষ চেষ্টা দেখা যায় নাই। আমাদের দেশে যে বিপুল ব্যয়সাধ্য শাসনব্যবস্থা ছিল তাহা সুবিধা ভোগ করিয়াছে ব্রিটেনের শিল্পপতিরা। সরকারী কর্মচারীদের বেতন আমাদের দেশের গড় আয়ের তুলনায় অত্যন্ত বেশী।

এখন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের সামাজিক এবং শিক্ষার কাঠামোর সংস্কার না করিলে দারিদ্র্যসমস্যার দূর করা কঠিন। সব জিনিষের মূলে থাকে জ্ঞান। সাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার না হইলে কোন স্থায়ী উন্নতি অসম্ভব। ব্রিটিশ সরকারের সমর্থকেরা আমাদের দারিদ্র্যের জন্য আমাদের চারিত্রিক ত্রুটি, অভ্যাস এবং সামাজিক ত্রুটিকে দোষ দিয়াছে। যাহারা দেশের লোককে শিক্ষা দেবার কোন চেষ্টাই করে নাই, তাহারা দেশকে কুসংস্কারের জন্য দোষ দিতে পারে না। তাই চাই শিক্ষার বিস্তার। প্রত্যেক ভারতীয়কে এই শিক্ষায় দীক্ষিত করিতে হইবে যে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতির পথে জাতি বা ধর্মের বাধা কিছুই নহে। কৃষি এবং শিল্পের উন্নতির জন্য উপযুক্ত পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে। পূর্বে এই বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। আমাদের দেশের নানা শ্রেণীর বড় বড় কারখানা গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহা হইলে দেশের সম্পদ বাড়িবে এবং কৃষিজীবিদের নূতন জীবিকার পথ উন্মুক্ত হইবে। আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষিব্যবস্থা করিয়া খণ্ড খণ্ড জমিগুলি একত্র করিতে হইবে। আমাদের দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য একটি সুবিস্তৃত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।

বণ্টন

খাজনা কি ভাবে ধার্য হয়? রিকার্ডোর খাজনা সম্পর্কিত তত্ত্ব ভারতবর্ষে কতখানি প্রযোজ্য? রিকার্ডো বলিয়াছেন যে, যদি প্রজাদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকে, তবেই জমিদার পূর্ণ খাজনা দাবী করিতে পারিবে। প্রজাদের মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে যাহা উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা জমিদারকে দিতে তাহারা বাধ্য হইবে। কিন্তু বাস্তব জীবনে সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা কখনই থাকে না। প্রজার সহিত জমিদারের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ থাকিতে পারে। তাহা থাকিলে সেই প্রজার নিকট হইতে অধিক খাজনা আদায় করা জমিদারের পক্ষে সম্ভব নাও হইতে পারে। কাজেই বাস্তব অবস্থা দেখিয়া রিকার্ডোর খাজনা সম্বন্ধীয় তত্ত্ব পরিবর্তিত করিতে হইবে।

ভারতবর্ষেও এই তত্ত্ব পরিবর্তিত করিলে তবে প্রযোজ্য হইবে। আমাদের দেশে জমির জন্য কঠোর প্রতিযোগিতা রহিয়াছে। প্রতি বৎসর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহার ফলে কৃষিজীবির সংখ্যাও বাড়িতেছে। কিন্তু চাষযোগ্য জমি সেই তুলনায় বাড়ে নাই কাজেই জমির চাহিদা বাড়িতেছে। জমির জন্য প্রতিযোগিতা তীব্র হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া জমির খাজনাও দিন দিন বাড়িতেছে। ইহা রিকার্ডোতত্ত্বসম্মত। তিনি বলিয়াছেন যে, জনসংখ্যা বাড়িলে জমির চাহিদা ও খাজনা বাড়িবে।

কিন্তু প্রতিযোগিতার ফল দুইভাবে রোধ হইয়াছে—প্রথম, চিরাচরিতপ্রথা ও দ্বিতীয়, আইন। ভারতবর্ষের মত প্রাচীন দেশে প্রথার প্রভাব খুবই বেশী। জমিদার প্রথাসম্মত খাজনার বেশী অনেক সময় দাবী করিতে পারে না। প্রজাও বেশী খাজনা দিতে নারাজ হয়। শুধু খাজনা নহে, জমির সত্ত্বও প্রথা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রতিযোগিতার কাছে প্রথা অবশ্য ক্রমশই হার মানিতেছে। কাজেই খাজনার হার বাড়িয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় সরকার আইন করিয়া প্রতিযোগিতার প্রভাব রোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। বিভিন্ন ভূস্বত্ববিষয়ক আইন এবং প্রজাস্বত্ব আইন দ্বারা খাজনার হার নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। এই জন্যই বলা হয় যে "চাষের জমির খাজনা-প্রথা প্রতিযোগিতা এবং আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।"

সুদের হার: আমাদের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ যে নিতান্তই কম, তাহা

পূবে বলা হইয়াছে। মূলধন আমাদের দেশে খুবই কম। কাজেই সুদের গড়পড়তা হার আমাদের দেশে অন্য দেশের তুলনায় বেশী। যাহারা মূলধন ধার করিয়া শিল্প গড়িয়া তুলিতে চায়, তাহাদের ইহাতে খুবই ক্ষতি হয়।

আমাদের দেশে সুদের হার যে কেবল বেশী তাহাই নহে, বিভিন্ন রকমের ঋণে সুদের হার আমাদের দেশে যতটা স্বতন্ত্র, অন্যত্র তত নহে। সরকার ২½% হইতে ৩% হারে টাকা ধার করিতে পারে। ব্যাঙ্কগুলি ৬ হইতে ১২% সুদ লয়। কৃষকেরা শতকরা ১৫৲ হইতে ৭৫৲ টাকা পর্যন্ত সুদ দেয়। বিভিন্ন রকম ঋণের সুদ কেন এত বিভিন্ন হয়?

সুদ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে সংক্ষেপে তাহার পুনরাবৃত্তি করা হইবে। সুদের হার বিভিন্ন হইবার প্রধান কারণ ঋণদাতাকে বিভিন্ন রকমের ঝুঁকি বহন করিতে হয়। সরকারকে টাকা ধার দেওয়ার কোন ঝুঁকি নাই। টাকা শোধ করিতে সরকারের কোন অসুবিধা বা দেরী হইবে না। কাজেই সরকার অল্প সুদে টাকা পায়। কৃষকদের টাকা ধার দেওয়া বিপজ্জনক। জামানত রাখিবার মত তাহাদের কিছু নাই। তাহাদের আয় এত কম যে, তাহারা আদৌ ধার শোধ করিতে পারিবে কি না তাহা অনিশ্চিত। কাজেই মহাজনেরা কৃষকদের নিকট হইতে বেশী সুদ দাবী করে।

দ্বিতীয়ত, সরকারকে টাকা ধার দিলে সুদ এবং আসল আদায় করিবার জন্য কোন পরিশ্রম করিতে হয় না। কিন্তু কৃষকদের টাকা ধার দিয়া মহাজনকে খুবই ঝঞ্চাট পোহাইতে হয়। খাতককে প্রায়ই তাগিদ দিতে হয়। এই কারণেই কৃষকদের সুদের হার বেশী।

সরকারকে টাকা ধার দিবার জন্য খুব প্রতিযোগিতা হয়। কিন্তু কৃষকদের বেলায় প্রতিযোগিতা নাই। মহাজনদের গ্রামে একচেটিয়া কারবার। কাজেই তাহারা চড়া সুদ দাবী করিতে পারে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ভারতের করনীতি

কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের মধ্যে রাজস্ব বিভাগ (Division of sources of revenue between the centre and states) : ভারতবর্ষে এককশাসন ব্যবস্থা নাই। ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসের পরে বর্তমান শাসনতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। দেশে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য এই দুই শ্রেণীর সরকার প্রতিষ্ঠিত আছে। এই দুই শ্রেণীর সরকার পরিচালনা করিতে যথেষ্ট রাজস্ব প্রয়োজন। সেই জন্য দেশের সংবিধানে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের রাজস্ব ভাগ করা আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব আমদানী শুল্ক, যৌথ কোম্পানীর লাভের উপর দেয় কর, রেল, ডাকবিভাগ, টাঁকশালের লাভ, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাভ, উৎপাদনশুল্ক, ও রপ্তানী শুল্ক, হইতে আদায় হয়। ইহার মধ্যে আয়করের শতকরা ৫৫ ভাগ রাজ্য সরকারের প্রাপ্য। রাজ্যসরকার, জমির খাজনা, বন, সেচকর, রেজিষ্ট্রী, আদালতের আয়, মদের ও ঔষধের উপরে ধার্য কর, দলিলের ষ্ট্যাম্প, ব্যবসায়ের উপরে ধার্য কর, জুয়া ও আমোদ-প্রমোদের উপরে ধার্য কর, উত্তরাধিকার কর ইত্যাদি হইতে রাজস্ব আদায় করে। রাজ্যসরকার আয়করের শতকরা ৫৫ ভাগ পায়। পশ্চিম বাংলা, বিহার, আসাম এবং উড়িষ্যা পাট-রপ্তানিশুল্কের বিনিময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে কিছু অর্থ ভাগ পায়। কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের কিছু উদ্বৃত্ত থাকিলে উৎপাদন এবং রপ্তানী শুল্কের সম্পূর্ণ বা কিছু অংশ রাজ্য সবকারগুলিকে দিতে পারে। এখন একে একে রাজস্বের পন্থাগুলি আলোচনা করা যাক।

বনস্পতি ঘি, তামাক ও দিয়াশলাইএর ধার্য উৎপাদন শুল্ক হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের শতকরা ৪০ ভাগ বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে জনসংখ্যা অনুপাতে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়।

নিম্নলিখিত খাতে প্রাপ্ত রাজস্ব কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে জমা হয়। (১) আগম-নিগম শুল্ক ; (২) যৌথ কোম্পানীর লাভের উপর ধার্য কর ; (৩) রেল বিভাগের লাভের অংশ ; (৪) ডাক বিভাগের লাভের অংশ ; (৫) টাঁকশালের ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাভের অংশ ; (৬) আয়করের শতকরা ৪৫ ভাগ ; (৭) তামাক, দিয়াশলাই ও বনস্পতি ঘিএর উপর ধার্য উৎপাদন শুল্কের শতকরা ৬০

ভাগ; (৮) অন্যান্য উৎপাদন শুল্ক ইত্যাদি। রাজ্যসরকারের তহবিলে নিম্নলিখিত রাজস্ব জমা হয়। (১) ভূমিরাজস্ব; (২) সেচকর; (৩) রেজেষ্ট্রী বিভাগের প্রাপ্ত অর্থ; (৪) বনবিভাগের লাভ; (৫) মদ ও ঔষধের উপর ধার্য করা; (৬) আদালত ও দলিলের স্ট্যাম্পের আয়; (৭) জুয়া খেলা ও আমোদ-প্রমোদের উপর ধার্য কর; (৮) আয়করের শতকরা ৫৫ ভাগ; (৯) তামাক, দিয়াশলাই ও বনস্পতি ঘিএর উৎপাদন শুল্কের শতকরা ৪০ ভাগ; (১০) বিক্রয় কর; (১১) উত্তরাধিকার কর; (১২) কেন্দ্রীয় সরকার হইতে সাহায্য বাবদ প্রাপ্ত অর্থ ইত্যাদি।

কেন্দ্রীয় সরকার নিম্নলিখিত উপায়ে রাজস্ব আদায় করে (Sources of revenue of the Union Government)।

১। **আগম-নিগম শুল্ক** (Customs)। ছয় সাত বৎসর পূর্বে এই শুল্ক হইতে ভাবত সরকারের সর্বাধিক আয় হইত। বিদেশ হইতে আমদানী বা রপ্তানী সামগ্রীর উপরে এই শুল্ক ধার্য হয়। পাট এবং চাউলেব উপরে রপ্তানী শুল্ক ধার্য আছে। যে সকল রাজ্যে পাট উৎপন্ন হয়, পাট রপ্তানী শুল্কের কিছু অংশ সেইসব রাজ্যকে দেওয়া হয়। ১৯৫৩-৫৪ সালে এই সব শুল্ক হইতে ১৭০ কোটি টাকা আয় হইবে।

২। **উৎপাদন শুল্ক** (Excise Duty): চিনি, দিয়াশলাই, কেরোসিন, রবার, টায়ার এবং বনস্পতি প্রভৃতির উপরেই উৎপাদনশুল্ক ধার্য আছে। এখন তামাক ও সুপারীর উপরেও ইহা ধার্য আছে। এই দ্রব্যগুলি ভারতে উৎপন্ন হয় এবং এদেশেই বিক্রয় হয়। ১৯৫৩-৫৪ সালে এই শুল্ক হইতে ৯৪ কোটি টাকা আয় হইবে।

৩। **আয়কর**: যাহাদের আয় বৎসবে ৪,২০০ টাকার বেশী, তাহাদিগকে আয় অনুপাতে কর দিতে হয়। এই করের হার আয় অনুপাতে ক্রমশ বাড়ে। ব্যবসায়ের লাভের উপরে ধার্য কর এবং আয়কর এই দুইটি মাত্র প্রত্যক্ষ কর এদেশে আছে। এই কর হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ ক্রমশই বাড়িতেছে। বর্তমানে আয়কর হইতে ১১৩.৩৮ কোটি অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা রাজস্ব আদায় হয়। কিন্তু আয়কর হইতে প্রাপ্য সমস্ত রাজস্ব কেন্দ্রীয় সরকার একাই লয় না। কেন্দ্রীয় সরকার আয়করের শতকরা ৪৫ ভাগ রাখিয়া বাকী রাজস্ব রাজ্যগুলিকে ভাগ করিয়া দেয়। যে সকল যৌথ কোম্পানী ভারতবর্ষে ব্যবসায় করে, ভাবত

সরকার তাহাদের লাভের উপরেও কর ধার্য করে। ইহাকে যৌথ কোম্পানী আয়কর বলে। এই কর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য। ১৯৫৩-৫৪ সালে এই কর বাবদ ৩৬·৬ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হইবে।

৪। **রেলপথ ঃ** রেল হইতে সরকার রাজস্ব পাইয়া থাকে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ রেলপথের মালিকই এখন ভারত সরকার। রেলপথ হইতে যে লাভ হয়, তাহার একাংশ সরকারী তহবিলে জমা হয়। ১৯৫৩-৫৪ সালে এই আয়ের পরিমাণ ৭·৬৫ কোটি টাকা হইবে।

৫। **মুদ্রা ঃ** টাঁকশালে টাকা তৈয়ারী করিয়াও সবকারের লাভ হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে লাভ করে, তাহার একাংশ সরকারের প্রাপ্য। ১৯৫৩-৫৪ সালে এই লাভ ১০·৬ কোটি টাকা হইবে।

৬। **ডাকবিভাগ ঃ** ডাকবিভাগ হইতে সবকারের কিছু রাজস্ব আদায় হয়। ১৯৫৩-৫৪ সালে এই বিভাগেব অনুমিত বাজস্ব ৪০ লক্ষ টাকা হইবে।

ব্যয়ের হিসাব (Heads of expenditure) ঃ ১। দেশরক্ষা বিভাগেই সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় হয়। ১৯৫৩-৫৭ সালে দেশরক্ষার জন্ম ১৯৯·৮৬ কোটি টাকা ব্যয় ধার্য হইযাছে। যুদ্ধেব সময় এই বিভাগের ব্যয় অতিরিক্ত না হইয়া উপায় নাই। সেনাবাহিনীতে এখন ভাবতীয় কর্মচারী লওয়া হইতেছে। ব্রিটিশ সামবিক কর্মচাবীদেব যে বেতন দেওয়া হইত, তাহা অপেক্ষা দেশীয় কর্মচারীদের বেতন অল্প হইবে। কাজেই দেশের স্বাভাবিক অবস্থা ফিবিয়া আসিলে এই বিভাগের ব্যয় কম হইবে।

২। দেশ-শাসন : ১৯৫৩-৫৭ সালে সমস্ত বিভাগের শাসনের ব্যয় ৭১·২৭ কোটি টাকা নির্ধারিত হইয়াছে। ডাক, অর্থ, শিল্প, শিক্ষা, বেতাব, আইন, মুদ্রা ও টাঁকশাল প্রভৃতি সমস্ত বিভাগেব ব্যয় ইহাব অন্তর্ভুক্ত।

৩। ঋণপবিশোধ : সরকার সাধারণের নিকট হইতে পূর্বে ঋণ গ্রহণ করিয়াছে ও এখনও ঋণ গ্রহণ করে। এই ঋণের সুদ দিতে হয়। সময় হইলে পরিশোধ কবিতে হয়। কাজেই ঋণ পরিশোধের জন্ম বহু অর্থ ব্যয় হয়।

৪। রাজ্যসরকারের সাহায্য : ভারত সরকার রাজ্য সরকারকে নানা বিষয়ে সাহায্য দেয়।

১৯৫৩-৫৪ সালে ভারত সরকারের অনুমিত ব্যয় ৪৩৮·৮১ কোটি টাকা ও আয় ৪৩৭·৭৬ কোটি টাকা।

রাজ্যসরকারের রাজস্বের উৎস (Sources of revenue of the State Government) : রাজ্যসরকারগুলি নিম্নলিখিত উপায়ে রাজস্ব আদায় করে।

১। ভূমিরাজস্ব (Land Revenue) : ইহা জমিদার এবং রায়তদের নিকট হইতে আদায় করা হয়। মধ্যপ্রদেশের মোট ৪·০৫ কোটি, আসামে ১·৬৮ কোটি, উত্তরপ্রদেশে ১৪·০৭ কোটি, মাদ্রাজে ৭·১৭ কোটি, পশ্চিম বাংলায় ২·০৪ কোটি টাকা এই বাবদ সংগ্রহ হয়। এই রাজস্বের পরিমাণ সাধারণত কম বেশী হয় না। কাজেই এই উৎসের স্থিতিস্থাপকতা আদৌ নাই। লাভ হউক বা না হউক প্রত্যেক চাষী এবং জমিদারকে এই কর দিতেই হইবে। আমাদের দেশের কৃষকেরা দরিদ্র, কাজেই এই করভার লাঘব করিবার জন্য আন্দোলন হইতেছে।

২। আবগারীকর (Excise Duty) : ঔষধ, মদ ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যের উপরে আবগারী কর ধার্য হয়। পশ্চিম বাংলা ও আসামে মোট রাজস্বের ইহা যথাক্রমে ৫·৯৮ কোটি এবং ৭৯ লক্ষ টাকা আদায় হয়। এই উৎস হইতে বেশী রাজস্ব আদায় হইলে বুঝিতে হইবে যে, লোকে বেশী মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিতেছে। ইহা কাম্য নহে। আমাদের দেশে মাদক দ্রব্য নিবারণের জন্য আন্দোলন চলিতেছে। মাদক দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইলে রাজস্ব অনেক কমিয়া যাইবে।

৩। স্ট্যাম্প শুল্ক (Stamp Duty) : দলিল পত্রের উপর স্ট্যাম্প বসান বাবদ বহু রাজস্ব আদায় হয়। মকদ্দমার জন্য কোর্ট ফি এবং হুণ্ডির উপরে ধার্য স্ট্যাম্প শুল্ক হইতে এই রাজস্ব আদায় হয়। রাজ্য সরকার এই রাজস্ব আদায় করে। ইহা হইতে বেশী টাকা আদায় হইলে বুঝিতে হইবে, দেশে মামলা-মকদ্দমা বাড়িতেছে। ইহাও কাম্য নহে। বিলের উপরে যে স্ট্যাম্প শুল্ক ধার্য আছে, তাহা কেন্দ্রীয় সরকার আদায় করে; আদায়ীকৃত রাজস্বের সমস্তই রাজ্য-সরকারদের দেওয়া হয়। যাহাতে এই শুল্ক ভারতবর্ষের সর্বত্র সমান হারে ধার্য হয়, এইজন্য কেন্দ্রীয় সরকার ইহা ধার্য করে। এই উৎস হইতে পশ্চিম বাংলা ও আসাম সরকারের ২·৭০ কোটি ও ১৯ লক্ষ টাকা আদায় হয়।

৪। সেচন (Irrigation) : জলসেচের ব্যবস্থা হইতে রাজ্যসরকার রাজস্ব আদায় করে। ইহা হইতে অবিভক্ত পাঞ্জাবের মোট রাজস্বের শতকরা

৩৮ ভাগ, উত্তরপ্রদেশের ১২ ভাগ, মাদ্রাজের ১৩ ভাগ, বোম্বাইয়ের ২'৭ ভাগ এবং মধ্যপ্রদেশের ১ ভাগ রাজস্ব আদায় হয়।

৫। বন: বন হইতে মধ্যপ্রদেশের মোট রাজস্বের শতকরা ১০ ভাগ, আসামের ৮ ভাগ, উত্তরপ্রদেশের ৩'৭ ভাগ, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ রাজ্যের ৩'৩ ভাগ, এবং পশ্চিম বাংলার ১'৭ ভাগ আদায় হয়। বনের কাঠ ও অন্যান্য বনজ দ্রব্য বিক্রয় করিয়া এই আয় হয়।

৬। নিবন্ধন (Registration): রেজিস্টারি ফি হইতে মাদ্রাজ ও বিহারে মোট রাজস্বের ২ ভাগ, পশ্চিম বাংলায় ১'৬ ভাগ, বোম্বাই এবং মধ্যপ্রদেশেও প্রায় ১ ভাগ আদায় হয়। যাহারা দলিল রেজিস্টারি করিতে চায়, তাহাদিগকে রেজিস্টারির সময় কিছু ফি দিতে হয়।

৭। আয়কর: প্রত্যেক রাজ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে আয়করের একটি অংশ পায়। ১৯৫১-৫২ সালের বাজেটে পশ্চিম বাংলা ৬'৩৪ কোটি টাকা ও বোম্বাই ৯'৮৬ কোটি টাকা পাইয়াছে; মাদ্রাজ এবং উত্তরপ্রদেশ ৮'২২ কোটি ও ৮'৪৫ কোটি টাকা করিয়া পাইয়াছে; বিহার পাইয়াছে ৫'৮৭ কোটি টাকা; মধ্যপ্রদেশ ২'৪১ কোটি টাকা পাইয়াছে। আসাম ও উড়িষ্যা প্রত্যেকে ১'৪০ কোটি টাকা পাইয়াছে।

৮। অন্যান্য উৎস: রাজ্যসরকার মোটর গাড়ী এবং পেট্রোলের উপরে কর ধার্য করিয়াছে। এখন প্রায় প্রত্যেক রাজ্যেই বিক্রয়কর ধার্য হইয়াছে। আসাম, বিহার ও পশ্চিম-বাংলায় কৃষি-আয়কর হইতেও কিছু রাজস্ব আদায় হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এরূপ কোন কর ধার্য করে না। প্রায় প্রত্যেক রাজ্যেই বিদ্যুৎ, আমোদপ্রমোদ, ও জুয়াখেলার উপরে কর ধার্য আছে। পশ্চিম-বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা ও বিহার পাটরপ্তানীশুল্কের কিছু অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে পায়।

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে রাজ্যসরকারের করধার্য করিবার ক্ষমতা অনেক বাড়িয়াছে। পশ্চিম-বাংলায় বিক্রয়কর এক পয়সা হিসাবে ধার্য হইয়াছিল, ক্রমে তাহা বাড়াইয়া তিন পয়সা করা হইয়াছে। যে সকল লোকের কৃষি হইতে ৩,৫০০ টাকার বেশী আয় হয়, তাহাদের উপরে কৃষি আয়কর ধার্য করা হইয়াছে। আসাম সরকার কৃষি হইতে ৫,০০০ টাকা আয়ের উপরে

আয়কর ধার্য করিয়াছে। তাহা ছাড়া, প্রায় প্রত্যেক রাজ্যই পেট্রোল, তৈল, বিদ্যুৎ, জুয়াখেলার উপরে কর ধার্য করিয়াছে।

ব্যয়ের হিসাব (Heads of expenditure of the State Government) :

১। শাসন : পুলিস ও সাধারণ শাসন ব্যাপারেই রাজ্য সরকারের সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় হয়। শাসন কার্যে নিযুক্ত কর্মচারীদের মাহিনা দেওয়ার জন্যই এই ব্যয় হয়। উচ্চ কর্মচারীদের যত মাহিনা দেওয়া হয়, তাহা কমাইয়া দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। যে দেশের লোক এত দরিদ্র, সেখানে শাসনের জন্য বেশী ব্যয় পরিহাস মাত্র।

২। পুলিস : পুলিসের জন্য ব্যয়ও খুব বেশী। পশ্চিম-বাংলা ও আসামে মোট ব্যয়ের শতকরা ১৪ ও ৯২ ভাগ এই বাবদ ব্যয় হয়। দেশে এখন এমন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যে, এই বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি ছাড়া কমিবার কোন সম্ভাবনা নাই।

৩। বিচার ও কারাগার : বিচার বিভাগে ও কারাগার রক্ষা করিবার জন্য ব্যয় হয়। প্রথম ৩টি বিভাগে যে ব্যয় হয়, তাহা রাজ্য সরকারের মোট ব্যয়ের দুই-তৃতীয়াংশ। অন্যান্য বিভাগে ব্যয় করিবার জন্য মাত্র এক-তৃতীয়াংশ অর্থ বাকি থাকে।

৪। শিক্ষা : জাতি গড়িতে এই বিভাগের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর। দেশের লোককে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইলে এই বাবদ আরও বেশী ব্যয় করা দরকার।

রাজ্য সরকার চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য, কৃষির উন্নতি, শিল্পের উন্নতি, সমবায়ের প্রসার প্রভৃতির জন্য অর্থ ব্যয় করে। সাধারণের ব্যবহার্য পথঘাট, আফিস, আদালত, থানা প্রভৃতি নির্মাণ ও সংস্কারের জন্যও বহু ব্যয় হয়।

১৯৫৩-৫৪ সালে সমস্ত প্রথম শ্রেণীর রাজ্যগুলির আয় হইয়াছে ৩২০.৫১ কোটি টাকা এবং ব্যয় হইয়াছে ৩৬২.৯৩ কোটি টাকা। দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজ্য-গুলির আয় ১১৫.২৯ কোটি ও মোট ব্যয় ১১৮.৬২ কোটি টাকা ও তৃতীয় শ্রেণীর রাজ্যগুলির মোট আয় ১৫.৫৩ কোটি ও ব্যয় ১৫.৫২ কোটি টাকা।

রাজ্যগুলির রাজস্বের হিসাব—১৯৫৩-৫৪ সাল

(লক্ষ টাকা)

নাম	ভূমি রাজস্ব	আয়কর ও রপ্তানীকর	বিক্রয় কর	আবগারী	স্টাম্প	মোট রাজস্ব
আসাম	১৬৬	১৯০	৭১	১৫৪	২৪	১৩০১
পশ্চিম বঙ্গ	২১০	৭২৭	৫৫৮	৬৮৭	২৮৭	৩৮১৫
বিহার	৩৩১	৬০৮	২৭০	৬৫৫	২০৭	৩৩০০
উড়িষ্যা	১১৯	২১৫	১০০	২২২	৭৪	১২৫৭
উত্তরপ্রদেশ	১৮৫২	৯৭২	৫২৪	৮৭১	২৫৫	৭৪৩৮
মধ্যপ্রদেশ	৫৪৪	৩০৮	২১২	৩৩৯	১০৩	২৫০৬
মাদ্রাজ	৭৩৬	৮৯৫	১৪০০	৩৩২	৫৪৮	৬৫৭২
বোম্বাই	৬৬৭	১০৩১	১৪০০	২৯৫	৪২০	৬৭৮৪
পাঞ্জাব	২১২	১৮৯	১৭৮	২৯৫	৫৮	১৯৭৪
হায়দ্রাবাদ	৫০২	২৪৫	১৯৭	১০২৮	৫১	২৮০২
মহীশূর	১২১	—	৯৪	১৭২	৪৮	২০৬২
ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন	৮৭	৭৫	২১২	২৪০	৯০	১৭১৪
সৌরাষ্ট্র	২৭৯	—	৫১	৯	২২	৯৬২
মধ্যভারত	৩৪৬	৯৩	১৩৮	২২০	৪০	১৪৩০
পেপসু	১৩১	৪০	৪৫	১৭৬	২০	৬৩৫

ভারতের করনীতির সমালোচনা

প্রত্যেক রাজ্যের এবং কেন্দ্রের বাজেট আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, মোট রাজস্বের মোটা অংশ পরোক্ষ কর হইতে আদায় করা হয়। কাজেই করভার সকলের উপরে সমানভাবে পড়ে না। গরীবেরাই বেশী কর দেয়। তুলনায় ধনীরা কম কর দেয়। করনীতির প্রথম আদর্শ এই যে, লোকের ক্ষমতানুযায়ী কর ধার্য হইবে। আমাদের দেশে তাহা মানা হয় না। নিরাপত্তা নামক 'অপার্থিব' বস্তুটি ছাড়া এই বিপুল করভারের পরিবর্তে দরিদ্র লোকেরা আর কোন সুবিধা পায় না। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য গ্রামাঞ্চলে অতি সামান্যই অর্থ ব্যয় করা হয়। কৃষি আমাদের দেশের প্রধান জীবিকা। এই কৃষির উন্নতির জন্য কোন উল্লেখযোগ্য ব্যয় করা হয় না। রেলে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরাই রেলের আয়ের বেশী অংশ যোগায়। কিন্তু রেলকর্তৃপক্ষ এই যাত্রীদের আরামের কোনই ব্যবস্থা করে নাই। যাহারা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী, রেলের সমস্ত আয়োজন এবং আরাম তাহাদের জন্যই। করনীতিতেও তাহাই করা হয়। যাহাদের দিবার ক্ষমতা খুব কম, তাহারাই সর্বাধিক কর দেয়। অথচ তাহারা বিনিময়ে রাষ্ট্রের নিকট হইতে কমই সুবিধা ভোগ করে। ধনীদের কর দেওয়ার ক্ষমতা বেশী হইলেও তাহারা কর দেয় কম। এখন দেশ স্বাধীন হইয়াছে, আশা করা যায় এখন করনীতির পরিবর্তন হইবে।

ভারতবর্ষের সরকারী ঋণ : সময়ে সময়ে শাসনের ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য ভারত সরকার অন্যান্য দেশের সরকারের মত সাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে। ইহাকেই সরকারী ঋণ (Public debt) বলে। সরকারী রাজস্ব হইতে এই ঋণের সুদ নিয়মিত দেওয়া হয়। যে ঋণ অল্পদিনের মেয়াদে পরিশোধ্য তাহাকে স্বল্পমেয়াদী (floating) ঋণ বলা হয়। যাহা দীর্ঘদিনের মেয়াদে পরিশোধ করা হয়, তাহাকে মেয়াদী (funded) ঋণ বলা হয়।

ভারত সরকার মেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী দুই প্রকার ঋণই গ্রহণ করিয়াছে। দেশরক্ষা বণ্ড ১০।১২ বৎসর পরে শোধ করা হইবে। ইহা মেয়াদী ঋণ। ট্রেজারি বিল, পোস্টাফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কের জমা টাকা স্বল্পমেয়াদী ঋণ।

১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ২,১৩৯ কোটি টাকা। উহার মধ্যে স্বল্পমেয়াদী ঋণ ৪০২ কোটি টাকা।

যুদ্ধের পূর্বে সরকার ভারতবর্ষের বাহিরেও ঋণ গ্রহণ করিত। ভারতবর্ষে যে ঋণ গ্রহণ করা হয় তাহাকে দেশী ঋণ (Rupee loan) বলে। ইংলণ্ডেও সরকার বহু ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল, ইহাকে স্টার্লিং ঋণ বলে। কারণ এই ঋণ স্টার্লিংএর হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। গত যুদ্ধের পূবে এই স্টার্লিং ঋণের পরিমাণ ৪৪৫ কোটি টাকা ছিল। যুদ্ধের সময় ভারত সরকার এই স্টার্লিং ঋণ শোধ করিয়া দিয়াছে। এখন মাত্র ৫৯ কোটি টাকাব স্টার্লিং ঋণ অবশিষ্ট আছে।

আমাদের সরকারী ঋণের বৈশিষ্ট্য ইহাই যে, উহার অধিকাংশই উৎপাদক (Productive) ঋণ। যদি যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনার জন্য ঋণ গ্রহণ করা হয়, তবে তাহাকে অনুৎপাদক ঋণ (Unproductive) বলে। ধরা যাক্, একজন লোক ১,০০০৲ টাকা ঋণ করিয়া মদ ও বদমায়েসীতে খরচ কবিল। এই ঋণ অনুৎপাদক। কিন্তু এই ঋণ লইয়া যদি সে গৃহ নির্মাণে ব্যয় করে, তাহা হইলে বাড়ী ভাড়া দিয়া সে আয়ের পথ কবিতে পারে। ইহাকে উৎপাদক ঋণ বলে। আমাদের দেশের সবকারী ঋণেব অধিকাংশ রেলপথ-নির্মাণ, সেচখাল-খনন প্রভৃতিতে ব্যয় হইয়াছে। কাজেই আমাদের ঋণের অধিকাংশই উৎপাদক। মোট ঋণেব মধ্যে ৮৭০ কোটি টাকা মাত্র উৎপাদক কাজে নিযুক্ত হয় নাই। ইহা খুবই ভাল লক্ষণ। ইংলণ্ডের সরকাবী ঋণের অধিকাংশ যুদ্ধ পরিচালনা প্রভৃতি অনুৎপাদক কার্যে ব্যয়িত হইয়াছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

ভারতবাসীর দারিদ্র্য সবজনবিদিত। ভারতবাসী ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহার মনে এতটুকুও ভালবাসা আছে, তাহাদের উচিত এই দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য সর্ববিধ উপায় অবলম্বন করা। রাসিয়ার বামপন্থী সরকার একই সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিল। সে দেশেও দারিদ্র্যসমস্যা, খাদ্যাভাব আমাদের দেশের মতই তীব্র ছিল। রাসিয়ার জাতীয় সরকার প্রবল উৎসাহ ও তীব্র প্রেরণা লইয়া সাধারণ লোকের অবস্থার উন্নতি করিবার দিকে দৃষ্টি দিয়াছিল। তাহারা দেশের কৃষি ও শিল্পোন্নতির জন্য চেষ্টা করে। প্রথমে তাহারা স্থির করে লক্ষ্য কি হইবে এবং কোন শিল্প কি ভাবে প্রতিষ্ঠা করা হইবে। পূর্ব হইতেই এইভাবে একটি পরিকল্পনা স্থির করিয়া তাহারা কর্মে প্রবৃত্ত হয়। রাসিয়া এইভাবে জাতীয় আয় বাড়াইতে পারিয়াছে এবং লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিয়াছে।

একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া দেশের কৃষি এবং শিল্পের উন্নতি করিবার চেষ্টা আমাদের সরকারের করা উচিত। পূর্বকল্পিত কর্মসূচী অনুযায়ী দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাইয়া শিল্প এবং কৃষির দ্রুত উন্নতি করিতে না পারিলে আমাদের দেশের দারিদ্র্য দূর হইবে না। আমাদের খাদ্যসমস্যার সমাধান করিতে হইলে কৃষির আশু উন্নতি প্রয়োজন। এ পর্যন্ত সরকার এ দিকে কিছুই করে নাই। কিছুদিন পূর্বে আমাদের দেশের কয়েকজন শিল্পপতি মিলিয়া যুদ্ধোত্তর ভারতের আর্থিক উন্নতির জন্য একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার চলতি নাম **'বোম্বাই পরিকল্পনা'**।

এই পরিকল্পনার লক্ষ্য আমাদের দেশের দারিদ্র্য দূর করা। আমাদের দেশের লোকের এখন পেটে ভাত নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, থাকিবার আবাস অতি দীন। আমাদের মাথা-পিছু আয় ৬৫ টাকা মাত্র। এই পরিকল্পনার প্রণেতারা আমাদের দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাহেন, যাহাতে পনের বৎসরে দেশের প্রত্যেকের মাথা-পিছু আয় অন্তত দ্বিগুণ হইবে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিলে জনসাধারণের অবস্থাও উন্নত হইবে। আমাদের খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ হইয়া যাইবে ও প্রত্যেকে উপযুক্ত এবং পুষ্টিকর খাদ্য পাইবে। এখন প্রত্যেক ভারতবাসী

মাথা-পিছু ষোল গজ কাপড় ব্যবহার করে। পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইলে তাহারা মাথা-পিছু ৩০ গজ কাপড় পাইবে। মাথা পিছু ১০০ ফুট স্থান আবাসের জন্য প্রত্যেকে পাইবে। এখন যে সব বাড়ী আছে তাহা ভাঙ্গিয়া এই মান অনুযায়ী গড়িতে হইবে। দেশের সর্বত্র বহু ডাক্তারখানা, হাসপাতাল, প্রসূতিসদন স্থাপিত হইবে। চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত হইবে। পানীয় জলের জন্য ভাল ব্যবস্থা করা হইবে। জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করা হইবে। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য এই, জাতির প্রত্যেককে যথেষ্ট এবং পুষ্টিকর খাদ্য, ৩০ গজ বস্ত্র, ১০০ ফুট আবাসগৃহ দিবার ব্যবস্থা করা। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা এবং চিকিৎসা এই সবই পনের বৎসরের মধ্যে করিতে হইবে।

এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে পনের বৎসরে ১০,০০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। পরিকল্পনার জন্য তাহারা নিম্নলিখিত উপায়ে এই অর্থ সংগ্রহ করিবে। লোকের সঞ্চিত অর্থ হইতে ৩০০ কোটি টাকা, স্টার্লিং তহবিলের ১,০০০ কোটি টাকা এবং ৭০০ কোটি টাকা বিদেশে ঋণ করিয়া তুলিতে হইবে। বাকি টাকা প্রত্যেকের উদ্বৃত্ত সঞ্চয় হইতে পাওয়া যাইবে। ইহার মধ্যে ৪,৪৮০ কোটি টাকা শিল্পে এবং ১,২৮০ কোটি টাকা কৃষির উন্নতির জন্য, ৯৪০ কোটি টাকা যানবাহন এবং রাস্তাঘাটের উন্নতির জন্য, ৪৯০ কোটি টাকা শিক্ষার জন্য, ৪৫০ কোটি টাকা চিকিৎসার জন্য, ২,২০০ কোটি টাকা বাসগৃহ-নির্মাণের জন্য এবং বাকি টাকা অন্যান্য কাজে ব্যয় হইবে। জমি একত্র করিয়া সমবায়পদ্ধতিতে চাষ এবং উন্নত চাষপদ্ধতি অবলম্বনে কৃষিজাত ফসল বাড়াইয়া তোলা হইবে। মৌলিক শিল্পগুলির অন্য শিল্প অপেক্ষা দ্রুত উন্নতি করিতে হইবে। শিল্প হইতে উৎপাদন ৫০০ শত গুণ বৃদ্ধি পাইবে। ইহাতে আমাদের কৃষিনির্ভরতা কমিয়া যাইবে।

এই পরিকল্পনা সফল করিয়া তুলিবার পথে বহু বাধা আছে, সাধু এবং কর্মঠ লোকের অভাব তাহার মধ্যে অন্যতম। টাকার অভাবও একটি অসুবিধা সন্দেহ নাই। পনের বৎসরে এত অর্থ তোলা নিতান্ত সহজ নহে। কিন্তু ইহা অসাধ্যও নহে। অনেক দেশের সরকার ইহা অপেক্ষা কঠিন কার্য সমাধা করিয়াছে। আমাদের দেশের জনসাধারণ যে অবস্থায় কালাতিপাত করে তাহা আর সহ্য করা যায় না। বহুদিন তাহারা বহু কষ্ট সহ্য করিয়াছে। আমরা সমবেতভাবে চেষ্টা করিলে এই অবস্থার উন্নতি হইতে পারে। যাহাদের অবস্থা

একটু ভাল, সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিদের দেশের লোকের অবস্থার উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে।

স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম কয়েক বৎসর ভারত সরকারকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। এইজন্য তিন বৎসর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে বেশী কিছু করা সম্ভব হয় নাই। ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে ভারত সরকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গঠন করিবার উদ্দেশ্যে একটি প্ল্যানিং কমিসন (Planing Commission) নিযুক্ত করে। এই কমিসন ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই রিপোর্টে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি খসড়া জনসাধারণের আলোচনার জন্য দাখিল করা হয়। আলোচনান্তে পরিকল্পনাটির উপযুক্ত সংশোধন করা হইয়াছে ও তাহা ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হইয়াছে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Five-year plan): ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি কার্যত চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় এবং ইহাকে কার্যে পরিণত করিতে নানা ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইতেছে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে আশা করা যায়, আগামী ২৭ বৎসরে ভারতীয় জনগণের মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হইবে। দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধির জন্য ইহার মোট ব্যয় নির্দিষ্ট হইয়াছে ২,০৬৯ কোটি টাকা এবং ইহার কার্যকাল নিরূপিত হইয়াছে ১৯৫১-৫২ হইতে ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত। উক্ত টাকা নিম্নলিখিত ব্যবস্থামত ব্যয় করা হইবে।

		১৯৫১-৫২ সালের ব্যয়ের হিসাব	মোট ব্যয়ের শতকরা হার
১।	কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন	৩৬১	১৭.৫
২।	সেচ, ব্যবস্থা ও শক্তি উৎপাদন	৫৬১	২৭.১
৩।	পরিবহন ব্যবস্থা	৪৯৭	২৪.০
৪।	শিল্পোন্নতি	১৭৩	৮.৪
৫।	সমাজসেবা	৩৪০	১৬.৪
৬।	পুনর্বাসন	৮৫	৪.১
৭।	বিবিধ	৫২	২.৫
		২,০৬৯	১০০

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মোট ২,০৬৯ কোটি টাকার মধ্যে ৯২২ কোটি টাকা, অর্থাৎ শতকরা ৪৪'৬ ভাগই সেচ্ এবং কৃষির উন্নতির জন্য এবং ১৭৩ কোটি টাকা শিল্পোন্নতির উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হইবে। বস্তুত, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতি ব্যবস্থার উপরেই বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কৃষির উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া ঠিকই হইয়াছে। ভারতবর্ষ প্রধানত কৃষিপ্রধান দেশ। প্রথমত এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন কৃষিকার্যের দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে। সুতরাং কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি না হইলে দেশের বেশীর ভাগ লোকের আয় বাড়িতে পারে না। দ্বিতীয়ত, কৃষিই মূলত শিল্পের অবলম্বন, কারণ কৃষিই জনসাধারণের খাদ্য এবং শিল্পের জন্য কাঁচা মাল যোগান দেয়। পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কৃষির উন্নতি-বিধানের সঙ্গে খাদ্যশস্য সরবরাহ ১৯৫০-৫১ সালের ৫২'৭ লক্ষ টন হইতে ১৯৫৫-৫৬ সালে ৬১'৬ লক্ষ টন অবধি বৃদ্ধি হইবে; কাঁচা তুলার সরবরাহ ১৯৫০-৫১ সালের ২৯'৭ লক্ষ বেল হইতে ১৯৫৫-৫৬ সালে বৃদ্ধি পাইবে ৪২'২ লক্ষ বেল; কাঁচা পাটের সরবরাহ বাড়িবে ৩৩ লক্ষ বেল হইতে ৫৩'৯ বেল এবং ইক্ষু উৎপাদন বাড়িবে ৫'৬ লক্ষ টন হইতে ৬'৩ লক্ষ টন অবধি।

কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে জলসেচের ভাল ব্যবস্থা করিতে হইবে; জমিতে ভাল সার দিতে হইবে; উৎকৃষ্ট বীজের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের উন্নতি বিধানের জন্য এই পরিকল্পনায় সেচ্ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি, জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির জন্য ভাল সারের ব্যবস্থা এবং উৎকৃষ্ট বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নূতন নতন সেচ্ পরিকল্পনা এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অঙ্গীভূত। যেমন, দামোদর, হীরাকুঁদ বাঁধ প্রভৃতি পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে ২০ লক্ষ একর হইতে ৬৯'৭ লক্ষ একর জমি পর্যন্ত চাষোপযোগী জমি প্রস্তুত হইবে। এই পরিকল্পনায় কৃষিকার্যের বিস্তৃত সংগঠন ও উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। কৃষকদিগকে কৃষিকার্যে উৎসাহিত করিতে হইবে এবং সরকারের সহযোগিতায় সমবায়-কৃষি-সমিতি সংগঠন করিয়া কৃষিকার্যের উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা (Community project) দ্বারা গ্রামবাসীদের সামাজিক ও আর্থিক উভয়বিধ উন্নতি সম্ভবপর হইবে।

শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে শিল্পপতিদের সহযোগিতা বিশেষ প্রয়োজন।

সরকার শুধু কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় শিল্পের সম্প্রসারণের ভার গ্রহণ করিবে। যেমন, সরকার কর্তৃক একটি ইস্পাত ও লৌহ শিল্পের প্রতিষ্ঠা। ইহা ছাড়া সিমেণ্ট, পেট্রোল শোধনাগার, এলুমিনিয়ম, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্প শিল্পপতিদের উৎসাহ ও অর্থানুকুল্যেই গড়িয়া উঠিবে এবং সম্প্রসারিত হইবে। এই উদ্দেশ্যে শিল্পপতিগণ ২৩০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করিবে আশা করা যায়। এই পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পগুলি বিশেষত কুটির শিল্পগুলির সম্প্রসারণ ও বৃদ্ধির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। কুটিরশিল্পগুলি তাহাদের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যাহাতে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে কাঁচা মালমশলার যোগান পায় তাহার প্রতিও সরকারকে সবিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। সুতরাং এই পরিকল্পনায় কুটির শিল্পোন্নয়নের সমস্যা নিরসন কল্পে কেন্দ্রীয় গবেষণাগার স্থাপনেরও প্রস্তাব করা হইয়াছে।

শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাথমিক, মাধ্যমিক, বুনিয়াদী বিদ্যালয়সমূহ সম্প্রসারণের ব্যবস্থাও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আছে। এই বাবদ শতকরা ১৭ ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরুণ, ১৮ ভাগ বুনিয়াদী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের দরুণ এবং শতকরা ৫৭ ভাগ টেক্‌নিকল ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায়তনগুলির উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হইবে। জনসাধারণের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও চিকিৎসখাতেও ব্যয়ের হার বৃদ্ধি করা হইবে। ইহা ছাড়া ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা ও অন্যান্য রোগের প্রতিরোধকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করা হইবে।

এত সমস্ত ব্যবস্থা কার্যকরী করিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই সরকার এই পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় এবং অন্যান্য রাজ্যসরকার হইতে এই পাঁচ বৎসরে অতিরিক্ত ৭৩৮ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া আশা করে। ৫২০ কোটি টাকা সবসাধারণের নিকট হইতে ঋণ বাবদ এবং ন্যাসনাল সেভিংস সার্টিফিকেট বিক্রয় করিয়া সংগৃহীত হইবে। এই উপায়ে ১,২৫৮ কোটি টাকা সংগ্রহ করা যাইবে। ইতিমধ্যে সরকার ১৫৬ কোটি টাকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কসমূহ হইতে সাহায্য স্বরূপ পাইয়াছে। সুতরাং ২,০৬৯ কোটি টাকা নির্দিষ্ট ব্যয়ের মধ্যে ৬৫৫ কোটি টাকা বাদে ১৪১৪ কোটি টাকা এইভাবে সংগৃহীত হইবে। কিন্তু এই টাকাও বিদেশের সাহায্যে, বাড়তি কর স্থাপন এবং ঋণ গ্রহণ করিয়া সংগৃহীত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহাতেও যদি প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ সংগৃহীত না হয়, তবে সরকার

অতিরিক্ত নোট প্রচলন দ্বারা এই ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

অতএব দেখা যাইতেছে, এই অর্থ যখন বিভিন্ন পরিকল্পনাতে ব্যয়িত হইবে তখন ১৯৫৬ সালের শেষে শতকরা ১১ ভাগ আয় বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু সেই সঙ্গে দেশের লোক সংখ্যাও শতকরা ৬'৫ ভাগ হিসাবে বাড়িবে। সুতরাং গড়পড়তা লোকের আয় শতকরা ৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে মাত্র। প্রকৃতপ্রস্তাবে এ বৃদ্ধি আশাতীত নহে।

বস্তুত এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সুচিন্তিত এবং পরিকল্পনার খসড়া কার্যোপযোগী হইলে নিঃসন্দেহে দেশের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। পরিকল্পনায় কৃষিকার্যের উপর সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্ব আরোপ করা যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে। খসড়া পরিকল্পনায় কমিশন শিল্পোন্নতির জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করিয়াছিলেন চূড়ান্ত পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের জন্য আরও বেশী অর্থ ব্যয় করা সাব্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু অনেকের মতে শিল্পোন্নতির পক্ষে এই অর্থ যথেষ্ট নহে। শিল্পোন্নতির জন্য আরও অর্থ নির্দ্দিষ্ট করা উচিত ছিল। যাহা হউক এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যে একটি সুষ্ঠু এবং ফলপ্রসূ পরিকল্পনা তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রচেষ্টায় দেশের ভাবী সমৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

কমিউনিটি প্রজেক্ট (Community Project) : ভারতবর্ষ গ্রামপ্রধান দেশ। গ্রামগুলির সর্বাঙ্গীন উন্নতি করিতে না পারিলে দেশের আসল উপকার হইবে না তাহা বহু লেখক ও নেতা বুঝিয়াছিলেন। গ্রামোন্নতির বহু চেষ্টা এদেশে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ১৯৩৬ সালের পর মধ্যপ্রদেশের সেবাগ্রামে ও উত্তর প্রদেশের এটোয়া ও গোরক্ষপুর অঞ্চলে গ্রামোন্নতির পরিকল্পনা বিশেষভাবে কার্যকরী করিবার চেষ্টা হইতেছে। এই স্কীমগুলির সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া প্ল্যানিং কমিসন কমিউনিটি প্রজেক্ট পরিকল্পনা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি প্রধান অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেন। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কমিউনিটি প্রজেক্ট বাবদ মোট ৯০ কোটি টাকা ব্যয় করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কমিউনিটি প্রজেক্টের উদ্দেশ্য হইল গ্রামগুলির সর্বাঙ্গীন উন্নতির ব্যবস্থা করা। উন্নত প্রণালীতে চাষ করিয়া ফসলের উৎপাদন যতদূর সম্ভব বাড়ান, গ্রামের বেকার সমস্যার সমাধান, প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার ; গ্রামের লোকের স্বাস্থ্যোন্নতির

ব্যবস্থা ; রাস্তাঘাটের উন্নতি ও গ্রামস্থ কুটিরশিল্পের অবস্থা ভাল করা প্রভৃতি এই প্রজেক্টের অন্তর্ভুক্ত। এই ব্যবস্থাগুলি যাহাতে যতদূর সম্ভব গ্রামবাসীদের নিজের চেষ্টার ফলেই অবলম্বিত হয় তাহার জন্য গ্রামবাসীদের অনুপ্রাণিত করিতে হইবে।

বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যে মোট ৫৫টি প্রোজেক্টের কাজ চলিতেছে। প্রত্যেকটি প্রোজেক্টের মধ্যে মোট ৩০০ গ্রাম, প্রায় ২ লক্ষ লোক ও দেড় লক্ষ একর চাষের জমি আছে। যে সমস্ত অঞ্চলে যথেষ্ট বর্ষা হয় ও ভাল জলসেচের ব্যবস্থা আছে সেই সমস্ত অঞ্চলে প্রজেক্ট গঠন করা হইয়াছে। পশ্চিম বাংলায় মোট আটটি ও আসামে চারটি প্রজেক্ট আছে। প্রত্যেক প্রজেক্ট আবার তিনটি ডেভেলপ্‌মেণ্ট ব্লকে বিভক্ত। এক একটি ডেভেলপ্‌মেণ্ট ব্লকে প্রায় ১০০টি গ্রাম থাকিবে। এহ ব্লকের কেন্দ্রস্থলে একটি ছোট শহর স্থাপনের কথা আছে। এই শহরে প্রায় এক হাজার পরিবারের জন্য বাসগৃহ নিমাণ করা হইবে। ইহা ছাড়া স্কুল, কৃষি, শিক্ষালয়, কুটির ও অন্যান্য ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইবে। প্রত্যেক ডেভেলপ্‌মেণ্ট ব্লক আবার চার কিংবা পাঁচটি মণ্ডিতে ভাগ করা হইবে। ১৫ হইতে ২৫টি গ্রাম লইয়া একটি মণ্ডি গঠন করা হইবে। বর্তমানে অবশ্য মণ্ডি স্থাপনের কোন ব্যবস্থা করা হইবে না। সর্বনিম্নে প্রত্যেক গ্রামে একটি গ্রাম ইউনিট খোলা হইবে। প্রত্যেক গ্রামেই অন্তত দুইটি ইন্দারা বা টিউব-ওয়েল বা পুকুর কাটার ব্যবস্থা হইবে। প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে ও উপযুক্ত জলসেচের ব্যবস্থা হইবে। ইহা ছাড়া চাষের উন্নতির জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

প্রত্যেকটি প্রজেক্টের জন্য আগামী তিন বৎসরে ৬৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হইবে। আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে আমাদের কিছু অর্থ সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

কমিউনিটি প্রজেক্ট লইয়া ঠিকমত কাজ করিতে পারিলে যে দেশের অনেক উন্নতি হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু গ্রামবাসীদের মধ্যে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহ জাগাইতে না পারিলে প্রকৃত উপকার কিছুই হইবে না। দু'চারজন উদ্যোগী সরকারী কর্মচারীর প্রচেষ্টায় কোন কোন অঞ্চলে সাময়িক উন্নতি হইতে পারে। এই কর্মচারিগণ বদলী হইয়া গেলেই হয়ত আবার পূর্বাবস্থা ফিরিয়া আসিবে। অনেকে আমেরিকান সাহায্য লওয়া হইতেছে বলিয়া এই স্কীমকে

সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছেন। আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট হইতে সামান্য সাহায্য লইলেই যে কমিউনিটি প্রজেক্ট দোষদুষ্ট হইবে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। ইহার ফলে সত্যিকারের উন্নতি হইবে কিনা তাহাই দেখিতে হইবে। গ্রামবাসী না জাগিলে ভারত জাগিবে না। কমিউনিটি প্রজেক্ট কি গ্রামবাসীদের জাগাইতে পারিবে? তাহাই হইল প্রশ্ন।

প্রশ্নাবলী

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

প্রথম পরিচ্ছেদ

1. What is meant by Civics, and what does it deal with? (C. U. 1927 ; D. U. 1950).

2. Define the scope of Civics. (C.U. 1930; P.U. 1948, 1949).

3. Explain how Civics is related to Sociology, Ethics and History. (U.P. 1941).

4. Indicate the place of Civics in Social sciences. (P.U. 1950, 1951).

5. What is the justification for teaching Civics at Colleges? (U.P. 1929 ; P.U. 1949, 1950).

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

1. Explain the proposition that man is a social animal. (U.P. 1936 ; P.U. 1948, 1950).

2. Why is it necessary for man to move in association? (U.P. 1937 ; P.U. 1951, 1952).

3. "Man is a social animal." Examine this statement, and explain the inter-dependence between man and society. (Pat. 1941).

4. Distinguish between society and state. (U.P. 1930 ; D.U. 1949 ; P.U. 1949, 1951, 1952).

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

1. "A State is a people organised for law within a definite territory." Explain. (C. U. 1927).

2. What are the essential characteristics of the State? (C. U. 1929, 1943, 1945, 1951 ; P. U. 1949, 1950, 1952).

3. Is India a state? (C. U. 1943). Is the state of New York a state? (C. U. 1951).

4. Distinguish between State and Government. (C.U. 1929, 1931, 1934, 1937, 1943, 1949 ; P. U. 1950, 1951 ; D. U. 1948).

5. How does the State differ from other associations? (U.P. 1942, 1951 ; Pat. 1941 ; Bom. 1940 ; Cal. 1945).

6. What do you understand by 'Sovereignty'? Explain its chief characteristics. (U. P. 1935, 1942 ; Bom. 1942 ; Pat. 1941 ; P. U. 1951).

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

1. "The State is the result of brute force." Discuss the validity of this theory of the State. (C. U. 1941, 1945, 1948 ; Pat. 1939).

2. Discuss critically the social contract theory of the origin of the State. (C. U. 1939 ; U. P. 1944, 1947 ; Utkal 1948).

3. "The State is a living organised unity, not a lifeless instrument." Discuss the soundness or otherwise of this view. (C. U. 1940, 1946 ; Utkal. 1948).

4. Discuss briefly the more important theories regarding the origin of the State. (U. P. 1937, 1932).

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

1. What is a nation ? (C. U. 1930).

2. What are the elements of nationality ? (C. U. 1931 ; D. U. 1948, 1950).

What are the essential factors that go to create the consciousness of a common nationality ? (C. U. 1948).

3. Is India a nation ? (C. U. 1930).

4. Is nationality a satisfactory basis of modern states ? (C. U. 1938 ; Pat. 1939).

5. Discuss the rights of nationalities. Why is nationality the most dominant factor in modern politics ? (C. U. 1943).

6. "The development of the principle of nationalism and of the idea of the nation-state has contributed to a material change in the essential character of the State." Elucidate. (C. U. 1940).

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

1. Discuss briefly the different forms of government, and their respective merits and demerits. (C. U. 1936 ; P. U. 1948, '50 ; D. U. 1950).

সপ্তম পরিচ্ছেদ

1. "Democracy may be classified broadly, under two distinct divisions direct and representative." Explain and illustrate. (C. U. 1935, '45 ; P. U. 1952).

2. Define democracy. (C. U. 1929).

3. Point out the merits and demerits of a representative democracy. (C. U. 1928, '31, '34, '37, '41, '47, '50 ; P. U. 1951 ; D. U. 1948).

4. In the light of modern political development, do you think that democracy will survive ? (C. U. 1941).

5. Compare the advantages and disadvantages of a Unitary State with those of a Federal State. (C. U. 1945).

6. What are the aims and objects of totalitarian states ? Do they differ from the ideals of democratic states ? (C. U. 1942).

7. What is dictatorship ? How will you distinguish between dictatorship and democracy ? (P. U. 1944, '51).

8. Discuss the comparative advantages of a dictatorship and a parliamentary democracy. (Bom. 1942).

৩. What are the conditions for the success of modern democracy ? (C. U. 1945 ; P. U. 1951).

অষ্টম পরিচ্ছেদ

1. Discuss the merits and defects of the Federal form of government. (C. U. 1935, '39, '42, '45, '49 ; P. U. 1946, '49).

2. "The greatest lesson of this war is that federation is the only means of saving the sovereignty of small nations and this principle applies to India with redoubled force." Discuss. (C. U. 1932).

3. "Many political thinkers look upon federalism as the key to the organisation of a world-state." Discuss the statement. (C. U. 1943).

4. Distinguish between Cabinet form of government and Presidential form of government. Discuss their respective merits and demerits. (C. U. 1940, '46 ; Pat. 1937 ; Bom. 1940 ; P. U. 1947 ; Nag. 1946).

5. What do you mean by 'responsible government'? To what extent was responsible government introduced in India under the Government of India Act of 1935 ? (C. U. 1949).

নবম পরিচ্ছেদ

1. Enunciate some of the functions of a modern government. (C. U. 1928, 1949, 1951).

2. Describe the functions of the State. "It is considered to be the duty of the state to concern itself with the well-being of the entire body of its citizens in every sphere of their activity." Is this view sound ? (C. U. 1938, 1940 ; P. U. 1948).

3. State the view of the individualist and socialistic schools relating to the functions of government. (C. U. 1939).

4. Should the State enforce temperance, truth-telling, sanitation and literacy?

দশম পরিচ্ছেদ

1. What do you understand by the term "constitution" ? (C. U. 1926, '29, '30, '31, '43, '45 ; D. U. 1950).

2. Distinguish between (*a*) written and unwritten constitution, and (*b*) rigid and flexible constitution. (C. U. 1929, 1939, 1943 ; D. U. 1950).

3. Indicate in brief the merits and demerits of rigid and flexible constitutions. (C. U. 1926, 1945 ; R. B. 1943).

4. How can the constitution of (*a*) Great Britain, and (*b*) India be amended ? (C. U. 1939).

একাদশ পরিচ্ছেদ

1. Define citizenship. (C.U. 1928, 1947).

2. What are the characteristics of a citizen ? Distinguish a citizen from an alien. (C. U. 1929, 1930).

3. Distinguish between a natural citizen and a naturalised citizen. (C. U. 1931, 1933).

4. How is citizenship acquired and lost ? (C. U. 1928, 1943 ; P. U. 1950).

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

1. Define Rights. (C. U. 1931, 1948 ; P. U. 1949, 1950, 1951, 1952).

2. Enumerate the rights of a citizen in a modern state. (C. U. 1927, 1928, 1931, 1934, 1935, 1937, 1940, 1943 ; P. U. 1949, 1950, 1951, 1952).

3. What are the rights of a citizen to (*a*) public meeting, (*b*) freedom of speech, (*c*) freedom of the press ? (C. U. 1932, 1933).

4. "Rights imply duties." (C. U. 1927, 1930, 1932, 1948 ; P. U. 1948, 1952).

5. What are the duties of a citizen ? (C. U. 1928, 1930, 1935, 1937, 1940, 1943, 1950). What are the fundamental obligations of a citizen ? (C. U. 1929, 1931 ; Bom. 1942 ; P. U. 1950, 1951, 1952).

6. What does the citizen of a modern state expect from the government and what does the government expect from the citizen ? (Pat. 1940).

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

1. Discuss the main obstacles to the exercise of good citizenship. (C. U. 1928, 1931, 1940, 1947).

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

1. Define law. (C. U. 1928, 1931). Describe the sources of law. (D. U. 1949 ; P. U. 1951, '52).

2. Explain the term liebrty. (C. U. 1926, '50, '51).

3. What do you mean by Civil and Political liberty ? (C. U. 1927, '28, '32, '50 ; P. U. 1950, '51).

4. "Civil liberty arises from the state." Explain. (C. U. 1947).

5. Is liberty consistent with authority ? (C. U. 1926).

6. "The recognition of political authority is the indispensable condition of liberty." Explain fully. (C. U. 1926).

7. "Law is the condition of liberty." Amplify. (C. U. 1932, '33, '35, '37, '39, '51 ; P. U. 1951).

8. "The true test of liberty lies in the extent to which the law of the land helps the citizen to develop all that is good in him." Discuss. (C. U. 1943).

9. "Civil liberty is not the absence of restraint, but an opportunity for self-realisation." Discuss. (C. U. 1949).

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

1. What do you understand by 'equality'? Is it desirable to establish equality for all men in society? (U. P. 1938).

2. What do you understand by the terms "equality" and "liberty"? (U. P. 1932).

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

1. "The business of a modern government divides itself into three main parts—legislative, judicial and executive." Illustrate. (C. U. 1935, 1937 ; Nag. 1939).

2. What are the principal organs of government and what are their respective functions? (C. U. 1937, 1941 ; P. U. 1948, 1949, 1951).

3. "The function of the legislature is not merely the making of laws." What other functions does the legislature in a democratic country discharge? (C. U. 1942, 1947 ; U. P. 1945, 1946).

4. Indicate the advantages of separation of powers and illustrate them from Indian conditions. (C. U. 1926, 1946, 1948, 1951 ; P. U. 1952).

5. How are the powers of a modern state distributed? (C. U. 1938).

6. "The strict separation of powers is not only impracticable as a working principle of government, but it is one to be desired in practice." Comment on this statement. (C. U. 1934). Is it desirable in the interests of political liberty to have an absolute separation of powers? (C. U. 1941).

7. Discuss the reasons for the existence of the bi-cameral system of legislature. (C. U. 1941 ; Bom. 1942). Which do you prefer a uni-cameral or a bi-cameral legislature? (U. P. 1941, 1945).

8. Discuss the nature, forms and functions of the executive. (P. U. 1949, 1950).

9. What are the functions of the Judiciary? (P. U. 1948, 1949). Why is an independent Judiciary necessary in a civilised state? (P. U. 1952 ; U. P. 1939).

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

1. Describe the arguments for and against "universal adult suffrage." (C. U. 1947 ; P. U. 1951, 1952).

2. What do you consider to be the true basis of franchise? (C. U. 1926, '50).

3. Write a short essay on manhood suffrage, as applicable to India. (C. U. 1933, '49 ; Pat. 1936).

4. "Universal teaching must precede universal enfranchisement" Discuss. (C. U. 1936).

5. Is education the sole qualification for citizenship or

other qualifications necessary ? If so. what are they. (C. U. 1930).

6. What, in your opinion, should be the qualifications for the exercise of the franchise ? Do you advocate universal suffrage ? (C. U. 1939).

7. Discuss the merits and demerits of direct and indirect elections respectively. (C. U. 1936, '39, '43, '46).

8. Describe the different systems of electing representatives for a legislature and discuss their merits and defects. (P. U. 1952).

9. Describe the methods that have been suggested for the representation of minorities in legislature. (C. U. 1939).

10. Consider carefully the arguments for and against communal representation in India. (C. U. 1929).

11. "The introduction of separate electorate is impeding the growth of Indian nationalism." Do you accept this proposition ? Give reasons for your answer. (C. U. 1941, '43).

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

1. Distinguish between a faction and a political party. (C. U. 1932).

2. Describe the essential functions of political parties in a democracy. (C.U. 1935 ; P. U. 1950). Are parties inevitable in a democracy ? (C.U. 1951).

3. Indicate the advantages and disadvantages of the party system. (C. U. 1926, '32, '40, '42 : P. U. 1947, '51).

4. What is meant by public opinion ? (C. U. 1929, 1930, 1945, 1948, 1950 ; P. U. 1950).

5. What are the chief agencies that mould public opinion in modern times ? Discuss the strength and limitations of these agencies. (C. U. 1934, '45, '48 ; D. U. 1949 ; U. P. 1948).

6. "An alert and intelligent public opinion is the first essential of democracy." Discuss. (C. U. 1930).

7. How does public opinion influence popular government and legislation ? (C. U. 1929, '30, '50).

8. "Successful administration in a modern state depends largely upon the way in which public opinion is formed and expressed." Discuss. (C. U. 1938).

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

1. Estimate the value of local institutions as agencies for training of the people in the art of self-government. Illustrate your answer from the working of those institutions in Bengal. (C. U. 1931, '49, '51).

2. "The first lessons of self-government should be learnt in local institutions." Explain and illustrate this statement with reference to the working of local bodies in Bengal. (C. U. 1936).

3. What are the conditions of their success ? (C. U. 1951).

বিংশ পরিচ্ছেদ

1. Discuss briefly the constitution and the functions of the League of Nations. (C. U. 1936 ; Pat. 1935 ; P. U. 1948, '49, 50).

একবিংশ পরিচ্ছেদ

1. What are the ideals which the citizens should follow ? How far are these ideals capable of realisation ?

ভারতীয় শাসনতন্ত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

1. Indicate briefly the policy enunciated by His Majesty's Government in the Declaration of August 20, 1917. (C. U. 1929).

2. Outline the main features of the constitution of an Indian province under the Dyarchy. (C. U. 1930).

3. Explain clearly transferred and reserved subjects in Indian provinces. Enumerate the principal transferred subjects in Bengal. (C. U. 1928).

4. Define Dominion status. (C. U. 1929, '41, '47).

5. Trace the evolution of the central legislature in India. (C. U. 1941).

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

1. "The general *control, superintendence* and *division* of the affairs of India rest in the Secretary of State for India." Explain the terms italicised and show by examples how each of these functions is exercised. (C. U. 1934).

2. Describe the powers and duties of the Secretary of State for India. (C. U. 1934).

3. What are the main features of Indian Federation as embodied in the Government of India Act, 1935 ? (C. U. 1941, '48 ; Pat. 1939).

4. Describe the composition and functions of the Federal Executive in India under the new constitution. (C. U. 1940).

5. Describe the power of the Governor-General to-day over (*a*) legislation, and (*b*) finance. (C. U. 1945).

6. Decribe the composition and functions of the Executive Council of the Governor-General. (C. U. 1935).

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

1. Write short notes on (*a*) The Cabinet Mission Proposals. (*b*) Indian Independence Act.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

1. Describe the characteristics or features of the new constitution of India.

2. Is it correct to say that the Indian constitution is more unitary than federal ?

3. Describe the process of amendment of the new Indian constitution.

4. Write notes on:—(a) Fundamental Rights. (b) Directive Principles of State Legislation.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

1. Describe the position of the President of India in relation to his Council of Minister. (C. U. 1951).

2. Discuss the powers of the President of India over the administration, legislation and finance.

3. State the composition and functions of the Council of Ministers of the Union. What is its relation with (a) the President, and (b) the Parliament ?

4. Examine the position of the Prime Minister of India in relation to the President and the Council of Ministers of the Union.

5 Write notes on the functions of the Vice-President of India.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

1. Discuss the composition and functions of the Parliament of India.

2. Describe the relation between the Council of States and the House of the People.

3. Describe the procedure for passing Bills in the Parliament

সপ্তম পরিচ্ছেদ

1. What do you understand by Central and Provincial subjects ? Enumerate some of them. (C. U. 1928).

2. Write notes on Provincial subjects. (C. U. 1917).

অষ্টম পরিচ্ছেদ

1. What is Provincial autonomy? Mention its chief characteristics. How far has it been introduced by the Act of 1935 ? (C. U. 1933, 1942, 1946 ; Pat. 1940).

2. Does Bengal enjoy Provincial autonomy ? (C. U. 1929, 1946)

3. Describe the relation between the Central Government and the Provincial Government. (C. U. 1937).

নবম পরিচ্ছেদ

1. Indicate the constitutional position of the Governor in an Indian province or State. (C. U. 1938, 1943, 1950 ; P. U. 1951).

2. What are the legislative powers of the Governors ? (C.U. 1940. 1946).

3. Describe the special responsibilities of the Governors. (C. U. 1947).

4. Discuss the relation between the Council of Ministers and the State Legislature under the new constitution. (C. U. 1939, 1943, 1948 ; P. U. 1951).

5. Discuss the relations between a Governor and his ministers under the Act of 1935. (C. U. 1941, 1949 ; Pat. 1938).

6. Examine the position and powers of ministers in a Province. (C. U. 1947, 1949).

দশম পরিচ্ছেদ

1. Describe the constitution and functions of the legislature in Bengal or Assam. (C. U. 1938, 1940, 1946).

Describe the nature of control exercised by the legislature of an Indian province over finances of the province. (C. U. 1945).

2. Describe the stages through which a bill must pass before it becomes an Act of a provincial legislature in India. (C. U. 1941, 1949 ; Pat. 1941 ; U. P. 1939, 1940 ; P. U. 1948).

3. Point out the distinction between a Bill and an Act. (C. U. 1949).

একাদশ পরিচ্ছেদ

1. Name the principal parties in India and indicate their stand-points. (C. U. 1932, U. P. 1938).

2. Describe the main provisions of the Communal Award. What are the chief points of criticism against it ? (U. P. 1941).

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

1. Describe the system of administration of justice in India. (C. U. 1934, 1937, 1939. 1942, 1943, 1950).

2. Describe the composition and functions of the Supreme Court of India.

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

1. What is the status of the Native States of India within the British Empire ? (C. U. 1935, 1942, 1951).

2. What do you understand by 'Paramountcy' ? (U. P. 1938; Nag. 1947).

3. How will the introduction of federation affect their status ? (C. U. 1942 ; Pat. 1940).

4. What are the rights and obligations of the British Crown in relation to the Indian states ? (C. U. 1945).

5. Describe the present position of what were formerly known as the Native States. (C. U. 1951).

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

1. Write short notes on:—

(*a*) The Civil Service in India. (C. U. 1936).

(*b*) Public Service Commission. (C. U. 1933, 1936, 1947).

2. Describe as briefly as you can the functions of a Collector Magistrate in a Bengal district. (C. U. 1933, 1941).

3. What is meant by the statement that the District Officer is the pivot of Indian administration ? (C.U. 1937, 1951).

4. "The District Administration in India constitutes an essential part of the government." Show how this administration is carried on. (C. U. 1943, 1948).

5. Write a short note on the Board of Revenue. (C. U. 1933).

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

1. Enumerate the various institutions for local self-government in Bengal. Point out briefly the functions that each of them performs. (C. U. 1929).

2. Describe the constitution of the Calcutta Corporation. (C. U. 1926, 1933, 1934).

3. Give an idea of how administration is carried on in a mofussil municipality in Bengal. (C. U. 1931, 1948).

4. What are the functions of municipal government ? Mention the principal sources of revenue of an Indian municipality. (C. U. 1926, 1928, 1940, 1942, 1948).

5. Briefly describe the organisation of rural self-government in Bengal or Assam. (C. U. 1937, 1938, 1941, 1917, 1949).

6. Describe briefly the constitution and functions of the District Boards in Bengal. (C. U. 1921, 1931, 1935).

7. Indicate the powers and duties of a Local Board and of a Union Board. (C. U. 1931, 1950).

8. How far Union Boards help to solve the rural problems of Bengal ? (C. U. 1928).

9. What are the conditions for the successful administration of Local bodies? C. U. 1940).

10. Write short notes on Calcutta Port Trust.(C. U. 1933).

11. Indicate the difficulties which have been experienced in working local self-governing institutions in India. (C. U. 1949).

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

1. State your own views about the proper activities of a citizen, (*a*) in a rural area, and (*b*) in a municipal town. (C. U. 1930).

2. Give your own ideas for improving the water supply of the village or town you live in. (C. U. 1928).

3. If your village has no adequate milk supply or proper water supply, what should be your and your neighbour's duties as villagers ? (C. U. 1931).

4. What would you do to make your town or village more healthy and beautiful ? (Pat. 1939).

5. What steps would you suggest for the spread of primary education in Bengal ? (C. U. 1931).

ধনবিজ্ঞান

প্রথম পরিচ্ছেদ

1. "Economics is the science of wealth." Do you agree with this definition ? Give your reasons in full. (C. U. 1929, 1949).

2. "Economics is the study of mankind in the ordinary business of life." Explain. (C. U. 1933).

3. What is your idea of the scope of Economics ? (C. U. 1932).

4. Discuss the value and limitations of the chief methods of its study ? (C. U. 1932).

5. Define the term 'economic laws.' (C. U. 1933).

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

1. Trace the development of economic life through the various stages from the earliest to the modern times, giving briefly the characteristics of each stage of development. (C. U. 1942).

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

1. How would you define wealth ? Illustrate your answer with examples. (C. U. 1943).

2. Distinguish between value-in-use and value-in-exchange. (C. U. 1931).

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

1. Discuss the main characteristics of human wants. (U. P. 1942 ; Bom. 1939).

2. Human wants are usually classified as necessaries, comforts and luxuries. Examine the classification. (C. U. 1948).

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

1. State and explain the law of diminishing utility, with the help of a diagram. (U.P. 1942 ; Pat. 1936).

2. State the relation between marginal utility and total utility. Illustrate your answer with the aid of an example. (C. U. 1942, Comp. 1944).

3. What do you understand by elasticity of demand? Consider the elasticity of demand in the case of wheat, salt, watches and furniture. (C. U. 1931).

4. Discuss (*a*) The best way to benefit a community is to spend one's income. (*b*) From the social point of view saving is always better than spending. (C. U. 1934 ; Pat. 1941).

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

2. Define "spending" and discuss the general principles which underlie the spending and incomes. (C.U. 1949).

সপ্তম পরিচ্ছেদ

1. What is production ? (C. U. 1927).

What do you mean by production of wealth in economics ? (C. U. 1949).

2. Distinguish between productive and unproductive labour. (C. U. 1931, 1934).

"What is of real importance to us to-day is—not whether the labour is productive or unproductive—but whether it is more or less productive, *i.e.,* whether the effort expended results in the production of a large or small amount of wealth." Explain. (C. U. 1934).

3. What are the factors of production ? (C. U. 1927, 1932).

অষ্টম পরিচ্ছেদ

1. What is meant by 'land' in economics? In what respects is it fundamentally different from other factors of production ? (C. U. 1936).

2. Explain the law of diminshing returns. Does it operate with equal rigour in industry and in agriculture ? Support your answer by reasons. (C. U. 1926, 1949, 1951).

Is it applicable to (*a*) mines, and (*b*) manufacturing industries ? (C. U. 1949).

নবম পরিচ্ছেদ

1. What are the causes of the efficiency of labour ? (C. U. 1926, 1936).

2. State and comment on the Malthusian theory of population. (Bom. 1941).

দশম পরিচ্ছেদ

1. Define capital. (C. U. 1931).

2. Distinguish between

(*a*) Wealth and Capital. (C. U. 1938; Comm. 1944).

(*b*) Fixed and circulating capital. (C. U. 1931, 1940, 1943).

3. Discuss the functions of capital in production. (C. U. 1926, 1931, 1936).

4. How does capital originate ? (C. U. 1926).

5. What are the main causes which influence the accumulation of wealth in a country ? How far are those causes present in India to-day ? (C. U. 1928, 1940).

একাদশ পরিচ্ছেদ

1. What do you mean by Division of labour ? (C. U. 1927).

2. Mention the advantages and disadvantages of division of labour. (C. U. 1926, 1931, 1933, 1938, Comp. 1944, 1946).

3. Discuss the effects of the introduction and use of machinery. (C. U. 1940).

4. Examine the causes leading to the localisaton of industries in particular areas. (C. U. 1937, 1941).

What are the advantages and drawbacks of localisation of industries ? (C. U. 1941).

5. What are the advantages and disadvantages of large-scale production ? (C. U. 1928, 1930, 1933, 1935).

6. Compare the relative advantages and disadvantages of large-scale and small-scale production. (C. U. 1935).

Can a smaller producer hold his own in the presence of large scale manufactures in modern times ? (C. U. 1933).

7. State and explain the laws of increasing and diminishing returns. (C. U. 1947, 1948).

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

1. What are the functions of the entrepreneur in modern business and industrial organisation ? (C. U. 1928, 1930, 1941, 1943).

2. What are the various ways in which a typical joint-stock company raises its capital ? (C. U. 1934).

3. Comment on the advantages and limitations of production by joint-stock companies. (C. U. 1939).

4. Explain and discuss the different forms of business organisation. (Pat. 1939).

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

1. Distinguish between value and price. (C. U. 1938, 1945).

2. What is meant by "markets" in economics ? What are the conditions that govern the extent of a market ? (C. U. 1940).

3. What are the conditions of exchange ? Explain how both parties gain in utility by exchange. (U. P. 1940).

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

1. How is value determined ? Give examples. (C. U. 1927).

2. "Value is determined by the general relations of demand and supply." Explain and illustrate. (C. U. 1928, 1945).

3. "The equilibrium or market price measures at a given time and place both the marginal utility to those just induced to buy and cost of production to the marginal sellers." Elucidate. (C. U. 1947, 1951 ; Nag. 1948).

4. Distinguish between market value and normal value. Show how market value is determined. (C. U. 1932).

5. What is the relation between cost of production and value ? (Bom. 1939 ; U. P. 1941).

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

1. How is monopoly price determined ? (C. U. 1939).

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

1. Mention the difficulties and inconveniences attending exchange by barter. Show how these difficulties are overcome by the introduction of money. (C. U. 1934).

2. What are the characteristics to be looked for in the commodity selected as money ? Discuss the comparative fitness of precious metals, precious stones and staple food-stuffs to serve as "money". (C. U. 1928, 1930, 1938).

3. Describe the functions of money. (C. U. 1928, 1939, 1941).

4. How is production facilitated by the use of money ? (C. U. 1931).

5. Distinguish between standard and token money. Illustrate with reference to the Indian rupee. (C. U. 1928, 1937)

6. Describe the merits and demerits of paper money. (C. U. 1936, 1943, 1947).

7. State and explain Gresham's law. (C. U. 1937, 1947, Comp. 1944).

"Bad money drives out good money" Explain. (C U. 1933, 1939, 1943).

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

1. Explain why general prices rise and fall within a country. (C. U. 1942, 1949).

How are businessmen and wage-earners affected by rising or falling prices ? (C. U. 1949).

2. State and explain the Quantity Theory of money. (Pat. 1940 ; Cal. 1945).

What is meant by the term, 'value of money' ? "The value of money is determined by the demand for, and the supply of money." Explain. (C. U. 1951).

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

1. Explain clearly what is a cheque. How does it differ from money ? (C. U. 1940).

2. "A cheque is not money". Explain. (C. U. 1935).

3. Give an account of the functions and utility of cheques. (C. U. 1940, 1948).

4. Describe a bill of exchange and the economic service it renders. (C. U. 1936, 1940, 1946, 1948).

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

1. What are the functions of banks ? (C. U. 1935, 1939).

2. "Banks are dispensers of credit". Discuss this statement. (C. U. 1941).

3. Show how a good banking system can further the economic well-being of a country. (C. U. 1939, 1942 ; Comp. 1944, 1945).

4. What is a Central Bank ? What are its functions ? (C. U. 1949).

বিংশ পরিচ্ছেদ

1. "International trade is in the last analysis a kind of barter." Elucidate. (C. U. 1948).

2. Indicate the advantages and disadvantages of international trade. (C. U. 1937, 1942, 1945).

3. What is meant by balance of trade? (C. U. 1937, 1945).

4. State the infant industry argument for protection. How far is it applicable to Indian conditions ? (C. U. 1941).

একবিংশ পরিচ্ছেদ

1. Define Distribution, National Dividend. (C. U. 1929).

2. What are the chief principles determining the remuneration of the factors of production ? (C. U. 1933).

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

1. Define, "economic rent". (C. U. 1930, 1943).

2. Explain the Ricardian theory of rent. (C. U. 1939).

Examine the effects of the pressure of population on the rent of land. (C. U. 1945).

3. "The price paid for the use of land tends to approximate to the producer's surplus, *i.e.*, to the economic rent." Explain. (C. U. 1935, 1946).

4. What do you understand when it is said that "rents are high because prices are high and no *vice versa ?*" (U. P. 1941).

5. Explain "unearned increment." Show how it arises. (C. U. 1948).

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

1. Indicate the main factors which determine real wages. Distinguish between 'money' wages, and 'real' wages. (C. U. 1936, 1947).

2. "The labourer is rich or poor, is well or ill rewarded in proportion to the real, not the nominal wages of his labour." Elucidate. (C. U. 1941).

3. Show how wages are determined. (C. U. 1940).

4. Explain why wages rates vary in different occupations within a country. (C. U. 1937).

5. What is a Trade Union ? What are the effects of Trade Union on wages ? (C. U. 1933).

6. Discuss the aims and methods of Trade Unions. (C. U. 1934).

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

1. What do you mean by interest ? Distinguish between gross interest and net interest. (C. U. 1941, 1951 ; Comp. 1944).

2. How is interest determined ? (C. U. 1941, Comp. 1944, 1949).

3. "The interaction of the forces which influence borrowers and lenders results in a price for the service of capital—the rate of interests." Elucidate this statement. (C. U. 1938).

4. Why does the Government of India borrow at cheaper rates than the Indian peasants in the villages? (C. U. 1942).

5. How is it that there is not one rate of interest in a country ? (C. U. 1949).

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

1. Indicate the different elements in profits. (C. U. 1943).

ষষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ

1. Define a Tax. How should the burden of taxes be distributed among the people ? (C. U. 1949).

2. Distinguish between a direct and indirect tax. Give some examples of both from the Indian tax system. (C. U. 1930, 1935, 1938, 1945).

3. Compare the relative merits and demerits of a direct and indirect tax. (C. U. 1938, 1940 ; Bom. 1940).

4. On what main principles can equity in taxation be secured ? (C. U. 1932).

5. "The rich should pay more in taxes than the poor." Why ? Do all taxes obey this principle ? (C. U. 1931 ; Pat. 1941 ; Bom. 1939).

6. What are the essentials of a good tax system ? (Bom. 1942 ; Pat. 1939).

ভারতীয় ধনবিজ্ঞান

প্রথম পরিচ্ছেদ

1. "The prosperity of India depends entirely on the monsoons." Elucidate this proposition. (C. U. 1937).

2. Describe the economic consequences of variations in rainfall in India. (C. U. 1939).

"In European countries the variations in rainfall may increase or diminish the abundance of a crop, but in India they produce far greater consequences." Elucidate. (C. U. Comp. 1944).

3. Give a brief account of India's mineral resources. (C. U. 1933).

4. Give an account of the coal and iron resources of India. (C. U. 1936).

5. Discuss the importance of forests in the economic life of India. (C. U. 1940).

6. Give an account of the soils and climates of India and explain their effects upon the economy of the country. (C. U. 1933).

7. Mention power resources of India and state to what extent they are being utilised at present. (U. P. 1933, 1939).

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

1. What are the chief factors which influence the growth of population in India ?

2. Discuss the causes of the unequal density and distribution of population in the various parts of India. (U. P. 1937).

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

1. Illustrate the influence of the prevailing social and religious customs on the economic life of the country. (C. U. 1933).

2. Discuss the economic aspects of the joint family and the caste system in India. (C. U. 1935).

Discuss the economic significance of the caste system. (C. U. 1945).

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

1. Draw a map of India showing the distribution of principal crops. (U. P. 1940).

2. Mention the principal food crops of India and indicate the areas in which they are grown. (C.U. 1948).

3. What are the main drawbacks of agriculture in India ? Suggest some measures for its improvement. (C. U. 1931, 1938, 1947).

4. "Though agriculture is the primary industry of India, yet it lags far behind that of other countries." Why is Indian agriculture backward ? Can you suggest measures for its improvement ? (C. U. 1926).

5. "One of the principal handicaps of Indian agriculture is the endless subdivision and fragmentation of land." Elucidate. (C. U. 1941).

6. Write a note on the various types of irrigation works in India and indicate their economic importance. (C. U. 1936, 1938, 1943).

7. Indicate the main causes of agricultural indebtedness in India and suggest methods for alleviating the burden. (C. U. 1929, 1932, 1935, Comp. 1944).

8. Describe the measures that have been adopted in India to check the indebtedness of the agriculturists. (C. U. 1937, 1942).

9. What steps have the Government taken to improve agriculture in India ? (C. U. 1927).

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

1. State the fundamental principles of co-operation. (C. U. 1926, 1929).

2. Describe the main features of the co-operative movement in India. (C. U. 1939).

3. Explain fully the organisation of a rural co-operative credit society. What qualities are required in the villages for its success ? (C. U. 1929, 1931, 1941).

4. Describe the functions of co-operative banks in India. (C. U. 1936).

5. In what different ways has the co-operative movement helped to remove the agricultural indebtedness of India ? (C. U. 1926).

6. Indicate the various lines on which the co-operative system of India has benefited the country. (C. U. 1932).

7. Indicate the different ways in which the co-operative movement has benefited the agriculturists, artisans and, in general, persons of limited means. (C. U. 1945).

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

1. Discuss the main types of land tenure in India. (C. U. 1942, Comp. 1944, 1945, 1946, 1948). State the principles which govern land revenue assessment. (C. U. 1948).

2. Examine the merits and defects of the permanent settlement of land revenue in Bengal. (C. U. 1936, 1939, 1941).

"The Zemindari system is at the root of the poverty of the Bengal peasant". Do you agree with this statement ? Give reasons for your answer. (C. U. 1934).

3. Compare the merits of permanent and temporary settlement of land revenue. (C. U. 1937).

4. Do you advocate abolition of Zemindaries in your province ? If so, why ? (C. U. 1949).

সপ্তম পরিচ্ছেদ

1. What is a famine ? (C. U. 1929).

2. Why do Indian famines now-a-days indicate a scarcity of employment rather than a scarcity of food ? (Dac. 1941).

3. Indicate the causes of Indian famines. What steps have been taken to fight them ? (C. U. 1926, 1927, 1929, 1931).

4. Describe the organisation of famine relief in India. (C. U. 1935).

অষ্টম পরিচ্ছেদ

1. Describe some of the more important cottage industries of India. (C. U. 1936, 1941).

2. Name some of the home industries of Bengal. (C. U. 1929).

Enumerate some of the principal cottage industries of Bengal which can be carried on as subsidiary to agriculture. (C. U. 1932).

3. Estimate the possibilities of the hand-loom industries in India. (C. U. 1930).

4. Indicate the importance of cottage industries in Indian rural economy. (C. U. 1940, 1943).

5. Indicate the difficulties experienced by them. (C. U. 1941, 1943).

6. Indicate the various ways in which you can develop the cottage industries of India. (C. U. 1928, 1929, 1932, 1940).

নবম পরিচ্ছেদ

1. "India possesses an abundance of natural resources and a plentiful supply of cheap labour, but she lacks capital, enterprise and organisation. The defects are, however, remediable." Elucidate this statement. (C. U. 1939).

2. Examine the main factors which influence (*a*) the efficiency, and (*b*) the mobility of labour in India. (C. U. 1948).

3. Do you agree with the view that nature has destined India to be an agricultural, not a manufacturing country? State reasons for your answer. (C. U. 1942).

4. Discuss briefly the causes of the low level of efficiency of industrial labour in India. (C. U. 1934).

5. Examine the part played by foreign capital in Indian industrial development. (C. U. 1928, 1933, 1950).

দশম পরিচ্ছেদ

1. What do you think should be the attitude of the Government of India towards industrial development in India? (C. U. 1929).

2. Which do you advocate for India—Free Trade Protection, and why? (C. U. 1936, Comp. 1944).

3. How far is the infant industry argument for protection applicable to Indian conditions? (C. U. 1911).

4. What is meant by discriminating protection? What are the principal industries which have been granted protection in India? (C. U. 1940).

5. Write a note on the Indian Tariff Board (C. U. 1927).

6. State the ground on which a policy of discriminating protection was recommended for India in 1922. (C. U. 1927).

একাদশ পরিচ্ছেদ

1. Discuss the influence of railway development in India on Indian industries and her internal and external trade. (C. U. 1926, 1928).

2. Discuss the influence of the development of the railway system in India upon (*a*) the rural economy of the country, and (*b*) its foreign trade. (C. U. 1932, 1935).

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

1. Point out the chief characteristics of India's foreign trade. (C. U. 1934).

2. Why has India in normal years a favourable balance of trade ? (C. U. 1938, 1945).

3. Give an account of India's foreign trade. (C. U. 1940).

4. Give some idea of the distribution of India's foreign trade (*a*) by principal countries and (*b*) by chief commodities. (C. U. 1935).

5. Mention some of the invisible items in India's foreign trade. (C. U. 1951).

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

1. Give an account of the principal types of banks in India. (C. U. 1936, 1938, 1947).

2. Explain the constitution and function of land mortgage banks in India. How far have they succeeded in achieving their aims ? (C. U. 1941).

3. Describe the functions of the following types of banks in India. (*a*) Co-operative Banks, (*b*) Postal Savings Banks, (*c*) Exchange Banks. (C. U. 1936).

4. State the functions of the Reserve Bank of India. (C. U. 1944, 1948, 1951).

5. Describe the financial needs of Indian industries. What measures would you suggest for meeting these needs ? (C. U. 1949).

6. Describe the main features of the Gold Exchange Standard. (C. U. 1951).

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

1. What factors enter into the determination of rent in India ? (C. U. 1930).

2. "Rent of agricultural land in India depends on the interaction of three forces,—custom, competition and legislation." Explain the statement. (C. U. 1937).

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

1. What are the principal heads of revenue and expenditure of the Government of India ? (C. U. 1927, 1928, 1942, 1946

2. State and discuss the chief heads of (*a*) Central and (*b*) Provincial revenue in India. (C. U. 1939).

3. Mention the chief sources of a Provincial Government in India. (C. U. 1926, 1942, 1943).

4. Enumerate the principal heads of revenue and expenditure of the Government of West Bengal. (C. U. 1929, 1937, 1947).

5. Indicate the place and potentialities of (*a*) income tax, and (*b*) such tax in the revenue system of India. (C. U. 1936).

6. The revenue of the Government of India may be divided into (*a*) tax revenue and (*b*) non-tax revenue. Elucidate. (C. U. 1948).

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

1. Give a brief outline of the Five Year Plan.
2. Describe the place of agriculture in the Five Year Plan.
3. Write notes on the Community Projects.